তবু একলব্য

TABU EKALABYA
ISSN 0976-9463

ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি
বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

ইউ.জি.সি. অনুমোদিত গবেষণা পত্রিকা, সূচক নম্বর ৪২৩১৮

১২ বর্ষ • ২০১৭ • ১ম সংখ্যা
জানুয়ারি - মার্চ ২০১৭

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা

৩২

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল
অ্যাসোসিয়েশন
-এর মননশীল পত্রিকা

এই সংখ্যার পত্রিকা কমিটি

মুখ্য উপদেষ্টা
স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, রামকুমার মুখোপাধ্যায়

সভাপতি
বিপ্লব মাজী

সম্পাদক
দীপঙ্কর মল্লিক

কার্যকরী সম্পাদক
দেবারতি মল্লিক, তাপস পাল

সহ-সম্পাদক
দিব্যেন্দু পালধি

আহ্বায়ক
রামকৃষ্ণ মণ্ডল

উপদেষ্টামণ্ডলী
সমীর রক্ষিত, জয়া মিত্র, শুভময় মণ্ডল
ব্রততী চক্রবর্তী।

কৃতজ্ঞতা
রুশতী সেন, পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
মিত্র ও ঘোষ, দে'জ, পুস্তক বিপণি
বাংলা আকাদেমি।

সম্পাদকমণ্ডলী
পবিত্র সরকার, সুমিতা চক্রবর্তী, সত্যবতী গিরি, তপন মণ্ডল, বরেন্দু মণ্ডল
সুশীল সাহা, তিমিরবরণ চক্রবর্তী, রাধেশ্যাম সাহা, বিদিশা সিন্হা
জয়িতা দত্ত, প্রিয়ব্রত ঘোষাল, শুভঙ্কর রায়, প্রসেনজিৎ বিশ্বাস
অর্ণব সাধুখাঁ, দীপঙ্কর মণ্ডল, তাপস সাহা।

পত্রিকা কমিটির সদস্য
পুষ্পেন্দু মজুমদার, দীপক ঘোষ, অরুণাভ চক্রবর্তী
আশিস রায়, বাপ্পা প্রামাণিক, দীপায়ন পাল।

TABU EKOLABYA : A peer reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture. Editor : Dipankar Mallik, Executive Editor Debarati Mallik & Tapas Pal. Printed & Published by *Debarati Mallik* on behalf of *DIYA PUBLICATION,* Kolkata- 700009, West Bengal, India.
Contact No. : 9836733383 / 9836733393
e-mail : diyapublication@gmail.com / diyapublication64@gmail.com
Website : www.diyapublication.com

মূল্য ১৬০ টাকা

সম্পাদকীয়

একটি নদীর যেমন জোয়ার-ভাটা চলে; কুল ভাঙা-কুল গড়ার কাজ চলে—একটি পত্রিকারও তেমন ক্রমাগত ভাঙন-গড়নের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। লিটল ম্যাগাজিন করবার ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল—

১.

সবার কাছে থেকে একই সময় লেখা পাওয়া যায় না। কেউ বছরের প্রথমে লেখা দেন তো; কেউ পরের বছরের শেষে দেন। যাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকেন প্রথমে লেখা দিয়ে তিন মাসের মধ্যে সজীব, প্রাণময় একটা বই হাতে পাবেন; তাঁরা প্রতি মুহূর্তে শাপ-শাপান্ত করেন। আর যিনি শেষে লেখা দেন এবং অতি দ্রুত ছাপার অক্ষরে নিজেকে দেখার সুযোগ পান তিনি প্রুফ রিডিং-এ কোনো বানান ভুল হলে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করতে ভোলেন না।

২.

অধিকাংশ প্রজ্ঞাবান লেখক লিটল ম্যাগাজিনে তাঁর মূল্যবান লেখা দিতে পরশুরামের মতো নিরাসক্ত ও নির্বিকার থাকায় সম্পাদককে অনেক সময় ক্ষীণদেহী, অপুষ্ট, অপরিণত লেখা নিতে বাধ্য থাকতে হয়। কারণ এই লেখকরাই লিটল ম্যাগাজিনকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকেন। এঁরাই রামায়ণের রামভক্ত হনুমানের মতো।

৩.

যেসব লেখক 'কলমজীবী' বলে দাবি করেন, তাঁরা অর্থের আদান-প্রদানকে 'মুখ্য লক্ষ্য' করায় ছোটো ছোটো কাগজ সেইসব কলমজীবীদের 'অসাধারণ', 'অসামান্য' লেখা প্রাপ্তির সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়।

৪.

পত্রিকায় যাঁরা লেখা দেন, তাঁদের অধিকাংশই পত্রিকার বাঁচা-মরা নিয়ে ভাবিত নন। ফলে পত্রিকা-জননী সবাইকে রান্নার সব আয়োজন বিলিয়ে দিয়ে নিজে রক্তশূন্য হন। ফলে অধিকাংশ সময় লিটল ম্যাগাজিন যক্ষ্মা রোগীর মতো ধুকে ধুকে মরে।

৫.

রঙিন কাগজে ভরা ও প্রচুর বিজ্ঞাপনের জাহাজে ভ্রমণশীল পত্রিকাগুলির দানবীয় উল্লাসের পাশে বা কাছে আসার মতো স্নায়বিক সক্ষমতা 'তবু একলব্য'র মতো ক্ষুদ্র পত্রিকার না থাকায় সারা বছরই অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত রোগী যেভাবে নিত্য যন্ত্রণার জীবন কাটায়; সেভাবে টিকে থাকতে হয়।

৬.

পত্রিকাগোষ্ঠীর অনেকেই জীবন-জীবিকা, পরিবার-পরিজন, ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বান্দ্বিকতায় ভিতরে ভিতরে অন্তঃক্ষরিত হওয়ায় পত্রিকা দপ্তরকে 'এহো বাহ্য' বলে পরিত্যাগ করেন। ফলে পত্রিকা-জননী একাকী বৃদ্ধাবাসে বসে সন্তানের মুখ চেয়ে তাকিয়ে থাকেন। কোনো কোনো সন্তান দয়া করেন; কেউ কেউ মৃতপ্রায় মায়ের অগ্রিম আত্মার শান্তি কামনায় মৃত সংবাদ শোনার অপেক্ষায় থাকেন। তবু কোনোরকমে সাঁতার না জানা মানুষের মতো হাত-পা ছুঁড়ে কূলে আসার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেন কোনো কোনো সম্পাদক। হাজারতর চড়াই-উৎরাই পথ চলতে চলতে তাঁর বেঁচে থাকতে হয়। প্রেমিকা আর পত্নীর পার্থক্য হল এই—প্রেমিকা যন্ত্রণার বালুকাবেলায় শেষ পর্যন্ত না-ও সঙ্গী হতে পারেন; কিন্তু মাতৃত্বে উপনীত পত্নী সন্তানকে বাঁচানোর দায় থেকে সর্বস্ব বিসর্জন দেন। পত্রিকা সম্পাদক সেই দায়বদ্ধ জনক/জননী যিনি তাঁর সন্তানকে বাঁচানোর জন্যে সুকঠিন সবিতাব্রত পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে ব্যাপকতায় 'চৈতন্য হোক' বলে ভিতরের ঘুমন্ত মানুষটিকে জাগাতে চেয়েছিলেন, বিশ্বাস করি সেই চৈতন্য থেকেই লিটল ম্যাগাজিনের পাঠকরা সারস্বত সাধনার এই মাধ্যমকে বাঁচিয়ে রাখার সংকল্প নেবেন। পাঠকদের যথাযথ সম্মান জানিয়ে এই নাতিদীর্ঘ সম্পাদনার মুখবন্ধ শেষ করা গেল। পরে বিস্তারিত বলা যাবে।

সূ ◆ চি

উপন্যাস নিয়ে

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
মৃত্যু-অনন্ত-অপু ৯

বিপ্লব মাজী
'অপরাজিত' : ব্যক্তিত্ব উন্মেষের উপন্যাস ১৮

কিরণশঙ্কর মৈত্র
বিভূতিভূষণের 'দৃষ্টি-প্রদীপ' পাঠ-প্রতিক্রিয়া ৫৫

নন্দিতা ভট্টাচার্য
'চাঁদের পাহাড়' : পাঠকের ব্যক্তিগত অনুভূতি ৭০

তাপস পাল
'চাঁদের পাহাড়' : ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সাংস্কৃতিক বিরোধ ১০৭

অর্জুনদেব সেনশর্মা
'আরণ্যক' : চলমান সময়ের কথকতা ১১৩

সহেলী বিশ্বাস
সহজিয়া জীবন পাঁচালি : 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' ১১৬

নিলয় বক্‌সী
নীল দিগন্তে ভালোবাসা : 'বিপিনের সংসার' ১২৮

সুজয় বসাক
বিভূতিভূষণের 'দুই বাড়ি' : বাস্তব ও রোমান্টিকতার মিশেল ১৪২

পিয়ালী খাঁ
বিভূতিভূষণের 'অনুবর্তন' : শিক্ষককুলের 'সুখ-দুঃখের লীলাভূমি' ১৫০

রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
বিভূতিভূষণের 'দেবযান' : ক্লোস রিডিং ১৫৮

শৈবাল কুমার নন্দ
'কেদাররাজা' : এক গ্রাম্য ভূস্বামীর আখ্যান ১৯৩

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য
অজানার অভিসারে : 'হীরামানিক জ্বলে' ২০৮

পার্থ ভোঁড়
'অথৈ জল' : নীতিবাগীশের মূর্খামি অথবা সংযমীর ভেসে যাওয়া ২১৭

রণজিৎ অধিকারী
'ইছামতী' : সহজ গভীর বহমান জীবনধারা ২২৫

নির্মাল্য মণ্ডল
ইছামতীর তীরে জীবনদর্শী এক মানুষ ২৩১

ঋতবৃতা সাহা
বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' : তখন ও এখন ২৪৬

রামকৃষ্ণ মণ্ডল
'ইছামতি' : এক ইচ্ছামতী নদীর আখ্যান ২৫৩

অরুন্ধতী সুর
'অশনি সংকেত' : জীবনের জলছবি ২৫৯

দীপঙ্কর মল্লিক
লোকায়ত পাঠ : বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত' ২৬৮

কৌশিক ঘোষ
'দম্পতি' : কামনার অভিঘাতে ব্যর্থ দাম্পত্যের বৃত্তান্ত ২৮২

গল্প নিয়ে

বিজিত ঘোষ
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প-গ্রন্থ : 'মেঘমল্লার' ২৯৭

দীপায়ন পাল
'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' : অলৌকিকতা ও পরাবাস্তবতা ৩০২

নাজিমুল হক
প্রাত্যহিকতার শিল্পিত রূপ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিনলিপি' ৩০৬

সামগ্রিক ভাবনা

গোপাল হালদার
বিভূতিভূষণের জীয়ন-কাঠি ৩১৫

দেবারতি মল্লিক
বিভূতিভূষণ : এক অনন্য আধুনিক ৩২৫

শৌভিক চট্টোপাধ্যায়
সতীন ভাবনার অফ্‌রোডে বিভূতিভূষণ ৩৩৬

ত্রয়ী চ্যাটার্জ্জী
পথের দেবতা পথের মানুষ ৩৪২

কামরুজ্জামান
বিভূতিভূষণের উপন্যাসে মুসলিম নর-নারী ৩৪৭

আমিনুল ইসলাম
মুসলিম অনুষঙ্গে বিভূতিভূষণের ছোটোগল্প ৩৬১

কৌশিক পণ্ডা
বিভূতি-ব্যঞ্জন ৩৭০

এক নজরে বিভূতিভূষণ

বিভূতিভূষণের জীবনপঞ্জি ৩৮৪

বিভূতিভূষণের রচনাপঞ্জি ৩৮৯

*এ পত্রিকায় প্রকাশিত সকল লেখার মতামত, মন্তব্য, ভাবনা, বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণত লেখকের—'তবু একলব্য'-এর সম্পাদকের নয়।

*এ পত্রিকায় প্রকাশিত সকল লেখার মতামত, মন্তব্য, ভাবনা, বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণত লেখকের—'তবু একলব্য'-এর সম্পাদকের নয়।

উপন্যাস নিয়ে

মৃত্যু-অনন্ত-অপু

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

মৃত্যুর মানে কী? মৃত্যু আমাদের আত্মীয় না অনাত্মীয়? মৃত্যুর মধ্যে স্বতই বেঁচে থাকে যে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা, তা কি কেবল অনবচ্ছিন্ন বেদনার জন্ম দেয়, নাকি সেই বেদনার নিরন্তর আস্বাদনের মাঝে জীবনের প্রতিটি বেঁচে থাকার মুহূর্ত শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্ন সত্তার মানসিক স্তরে এক আন্বয়িক তৃপ্তির জন্ম দিয়ে যায়? বেঁচে থাকার নির্বাচিত ক্ষণে যাকে কাছ থেকে দেখেছি, মৃত্যুর পরে তাকে দেখি 'ভিতরে-বাহিরে', যখন চাই তখনই, হয়তোবা অনুক্ষণ। মৃত্যু তাই এক রহস্যের চিরায়ত উৎস। চেনা-অল্পচেনা-না-চেনা অজস্র মানুষের মৃত্যুর খবরে আমাদের কত না প্রতিক্রিয়া নিত্য বেরিয়ে আসছে অনুভবের গভীর দেশ মন্থন করে। মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী, একথা সবাই জানে। কিন্তু মৃত্যু নিয়ে চিন্তা করতে অনেকেই নারাজ—সেখানে কখনো অপছন্দ কাজ করে, কখনো বা ভয়, কখনো বা মননের সীমাবদ্ধতা। জন্মান্তরে বিশ্বাসীরা মনে করেন, মৃত্যু আসলে শেষ নয়, নতুন শুরুর আহ্বান। এই দর্শনে অবিশ্বাসীরা মনে করেন, মৃত্যু একটা সমাপ্তি। মৃত্যুর পরে কোনো অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রার প্রয়াস অবান্তর। আঠারো শতকের শেষ আর উনিশ শতকের শুরুর দিকের আমেরিকার আদি জনজাতি গোষ্ঠীর বিখ্যাত যোদ্ধা-নেতা Tecumseh নাকি বলতেন—

> When your time comes to die, be not like those whose hearts are filled with fear of death, so that when their time comes they weep and pray for a little more time to live their lives over again in a different way. Sing your death song, and die like a hero going home. (Tecumseh Brainy Quote.com. Xplore Inc. 2017 https:www. brainyquote. com/quotes/t/tecumseh 190019 html. accessed July 31, 2017)

এর মধ্যে এক ধরনের বীরত্ব আছে। মৃত্যুকে উপভোগ করার এই পথ প্রায় প্রতিটি সংগ্রামী মানুষের কাছেই আদর্শ হয়ে আছে। কিন্তু জীবনের উদার আনন্দ-বেদনার পাশে মৃত্যুকে অন্য রূপেও দেখেছেন আরো কতজন। *The Canterville Ghost*-এ Oscar Wilde লিখছেন—

> Death must be so beautiful. To lie in the soft brown earth, with the grasses waving above one's head, and listen to silence. To have no yesterday, and no to-morow. To forget time, to forget life, to be at peace.

আসলে লড়াই-ই বলুন আর প্রশান্ত সৌন্দর্যই বলুন, মৃত্যু আমাদের কাছে যখন এসে পৌঁছায়, তখন সে সঙ্গে নিয়ে আসে এমন এক চিন্তার তরঙ্গ যা জীবনের অন্য পাঁচটা চিন্তার সাথে সমগোত্রীয় নয়। কম-বেশি যাই হোক, সে কিছুটা সময়ের জন্যে হলেও পালটে দেয় আমাদের কর্মের জগতকে, আমাদের ভাবনার জগতকে। জীবন-মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটা দার্শনিকতা গ্রাস করে আমাদের। কোনো ভুল নেই, পৃথিবীর অনেক উচ্চ দর্শনচিন্তার জন্মস্থল তাই মৃত্যুই। সাহিত্য-শিল্পেও তাই মৃত্যুকে নিয়ে অসামান্য সৃজনলীলা চলেছে বহুকাল। সাহিত্যিকের হাতে সবসময়েই থাকে 'কল্পনা' নামে এক যন্ত্র। সৃষ্টির পরীক্ষণাগারে এই কল্পনাকে ব্যবহার করেই সাহিত্যিক 'দৃষ্টির দর্শনে'র নব নব ভূমি খুঁজে পান। আর সেই কল্পনাতেই জীবন-মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় সন্ধিস্থলের কত বিচিত্র কথা সৃষ্টি হয়। তৈরি হয় ক্ষণিককে নিত্যের সাথে মেলানোর সেতুবন্ধ। জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে অস্তিত্বের কোনো এক ধ্রুবককে সন্ধানের চেষ্টায় শিল্পী আঁকেন বন্ধনহীন জীবনের ছবি, সমাপ্তিহীন মৃত্যুর আলপনা। একথাটা মনে পড়ে ততবার, যতবার 'পথের পাঁচালী'র দুর্গার মৃত্যু, হরিহরের মৃত্যু—এই দুটি মৃত্যুদৃশ্য পাঠ করি। মনে হয়, এই দুটি মৃত্যুর কোনো দ্রষ্টা নেই, আছে কেবল একজন শিল্পী—যিনি জীবনের কোনো অন্তিম মুহূর্তের ক্যানভাসে রং বোলাচ্ছেন না, যিনি মৃত্যুর স্বচ্ছ এক যবনিকার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে দেখাচ্ছেন কোনো একটি জীবনের দিগন্তরেখা—সে রেখা চলেছে সভ্যতার সৃজনখেলার এক সূর্যোদয় থেকে আর এক সূর্যোদয় পর্যন্ত। সেখানে মর্ত্যলুণ্ঠিত জীবনের 'রুদ্ধ ঘরে'র 'ধূমাঙ্কিত কালি' নেই। সেখানে আবিল-অতীত নন্দিত স্বজনতার, আত্মীয়ত্বের অশ্রুলাঞ্ছিত বিহ্বলতার মৃদু বৈতালিকী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়।

আসুন দুর্গার মৃত্যুর ছবিটা দেখি—

> সর্বজয়া ভাসুর-সম্পর্কের প্রবীণ প্রতিবেশীর ঘরের মধ্যে উপস্থিতি ভুলিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, কি হোল, মেয়ে অমন করছে কেন?
>
> দুর্গা আর চাহিল না।

> আকাশের নীল আস্তরণ ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অনন্তের হাতছানি আসে—পৃথিবীর বুক থেকে ছেলেমেয়েরা চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া গিয়া অনন্ত নীলিমার মধ্যে ডুবিয়া নিজেদের হারাইয়া ফেলে—পরিচিত ও গতানুগতিক পথের বহুদূরপারে কোন পথহীন পথে-দুর্গার অশান্ত, চঞ্চল প্রাণের বেলায় জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক পৌঁছিয়াছে!
>
> (বি. র. ১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৪০১, কলকাতা, পৃ ১১৬)

দুর্গা আর চাইল না। কিন্তু 'আকাশের' যে 'নীল আস্তরণ ভেদ' করে তার কাছেও এসে পৌঁছল 'অনন্তের হাতছানি'টা—সেটা তো সে দেখতে পেল। 'জীবনের সেই সর্বাপেক্ষা বড় অজানার ডাক' তারই কাছে এসে পৌঁছেছে, সেই তা শুনতে পেয়েছে—যদিও তা 'অজানা'। জীবনের কোনো একটি ঘাটে 'এই সর্বাপেক্ষা বড় অজানা' অপেক্ষা করে আছে প্রতিটি মানুষের জন্যে অনাদ্যন্ত কাল থেকে। একদিন-না-একদিন তার ডাক এসে যাবে সকলেরই কাছে। কিন্তু এই যে 'কোন পথহীন পথে' একটি 'অশান্ত চঞ্চল প্রাণ' পা রাখতে যাচ্ছে, সে 'পথ' তো অপরিচিত নয় কারুর কাছে। তাই যে কেউ সেই পথের উপরে খুঁজে পেতে পারে এই প্রাণটিকে—অবশ্যই যদি খুঁজে পেতে চায়, অবশ্যই যদি ঐ প্রাণের সাথে কোনো দেখা-শোনা বোঝার অতীত যোগ থেকে থাকে।

'পথের পাঁচালী'র পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে, দুর্গার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে জীবনের নতুন ঠিকানার সন্ধানে হরিহর-সর্বজয়া-অপু পা বাড়িয়েছিল। সেই দিনটিতে এক বালকের অনুভূতির চাক্ষুষতা দিয়ে শিল্পী তৈরী করেছিলেন আর একটি ক্যানভাস—

> মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালখানাও ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে!... অনেক দিন আগের সে দিনটা!
>
> সে ও দিদি যেদিন দুজনে খুঁজিতে খুঁজিতে মাঠ-জলা ভাঙিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে রেলের রাস্তা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল! সেদিন-আর আজ?
>
> ঐ যেখানে আকাশের তলে আষাঢু-দুর্গাপুরের বাঁধা সড়কের গাছের সারি ক্রমশ দূর হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে, ওরই ওদিকে যেখানে তাহাদের গাঁইয়ের পথ বাঁকিয়া আসিয়া সোনাডাঙা মাঠের মধ্যে উঠিয়াছে, সেখানে পথের ঠিক সেই মোড়টিতে, গ্রামের প্রান্তের বুড়ো জামতলাটায় তাহার দিদি যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের রেলগাড়ির দিকে চাহিয়া আছে!...তাহাকে কেহ লইয়া আসে নাই, সবাই

ফেলিয়ে আসিয়াছে, দিদি মারা গেলেও দুজনের খেলা করার পথেঘাটে, বাঁশবনে, আমতলায় সে দিদিকে যেন এতদিন কাছে কাছে পাইয়াছে, দিদির অদৃশ্য স্নেহস্পর্শ ছিল নিশ্চিন্দিপুরের ভাঙা কোঠাবাড়ির প্রতি গৃহ-কোণে—আজ কিন্তু সত্য-সত্যই দিদির সহিত চিরকালের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল!...

তাহার যেন মনে হয় দিদিকে আর কেহ ভালবাসিত না, মা নয়, কেউ নয়! কেহ তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে দুঃখিত নয়।

হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল। তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কি সে জানে না। কত কি মনে আসিল অল্প এক মুহূর্তের মধ্যে...আতুরি ডাইনি...নদীর ঘাট...তাহাদের কোঠাবাড়িটা...চাল্‌তে তলার পথ...রাণুদি...কত বৈকাল, কত দুপুর...কতদিনের কত হাসিখেলা...পটু...দিদির মুখ...দিদির কত না মেটা সাধ...

দিদি এখনও একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—

পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যের অবাক ভাষা চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বার বার বলিতে চাহিল—আমি চাই নি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি, ইচ্ছে করে ফেলেও আসিনি—ওরা আমায় নিয়ে যাচ্চে—

সত্যই সে ভুলে নাই। উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর সঙ্গে তাহার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু যখনই গতির পুলকে তাহার সারা দেহ শিহরিয়া উঠিতে থাকিত, সমুদ্রগামী জাহাজের ডেক হইতে প্রতি মুহূর্তে নীল আকাশের নব নব মায়ারূপ চোখে পড়িত, হয়তো দ্রাক্ষাকুঞ্জবেষ্টিত কোন নীল পর্বতসানু সমুদ্রের বিলীন চক্রবাল সীমায় দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইয়া পড়িত, দূরের অস্পষ্ট আবছায়া দেখিতে পাওয়া বেলাভূমি এক প্রতিভাশালী সুরস্রষ্টার প্রতিভার দানের মত মহামধুর কুহকের সৃষ্টি করিত তাহার ভাবময় মনে—তখনই, এইসব সময়েই, তাহার মনে পড়িত এক ঘণবর্ষার রাতে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দের মধ্যে এক পুরানো কোঠার অন্ধকার ঘরে, রোগশয্যাগ্রস্ত এক পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মেয়ের কথা—

—অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি? মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যালখানা দেখিতে দেখিতে কতদূরে অস্পষ্ট হইতে হইতে শেষে মিলাইয়া গেল।

(বি. র. ১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি. জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৪০১, কলকাতা, পৃ. ১৪২-১৪৩)

যদি গুণতে ভুল না করে থাকি, তাহলে দেখব চোদ্দোটি ত্রিবিন্দু চিহ্ন, সাতটি ড্যাশ চিহ্ন আর পাঁচটি আশ্চর্যসূচক চিহ্ন রয়েছে এই অংশটিতে। সচেতন পাঠকের একে আকস্মিক বলে মনে হয় না। মৃত্যু কোনো দাঁড়ি টানতে পারেনি। প্রাণমুখর

চঞ্চলতার অভিরাম অভিজ্ঞানখানি ছড়িয়ে আছে তাই সর্বত্র। ঐ যে একটু আগে প্রাণের যোগের কথা বলেছিলাম, সেই পথ ধরেই একটি প্রাণ আর একটি প্রাণের জন্যে চোখের জল ফেলে—মরণের চ্যালেঞ্জকে হাসতে হাসতে অস্বীকার করে অনিঃশেষ জীবনের জয় ঘোষণা করে। সেই জয়ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'উত্তরজীবনে নীলকুন্তলা সাগরমেখলা ধরণীর' পায়ে চলা পথে এগিয়ে যাওয়া একটি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। এই বোধহয় Presentism থেকে Eternalism-এর দিকে যাওয়ার চেষ্টা। J.M.E. McTaggart তাঁর 'The Unreality of Time' গ্রন্থে ঘটনা এবং ঘটনা-সমৃদ্ধ সময়ের ধারণাকে বোঝাবার জন্যে তিনটি সময়-ধারণার কথা বলেছিলেন—

১. A Series
২. B Series এবং
৩. C Series

প্রথমটির ধারণা আমরা ব্যবহার করি যখন ক্রিয়ার কাল অনুসারে ঘটনা ও তৎসংক্রান্ত সময়কে নির্দেশ করি; অর্থাৎ ভবিষ্যত, বর্তমান ও অতীতকাল সম্পর্কিত ধারণা। দ্বিতীয় ধারণা আমরা ব্যবহার করি যখন কোনো একাধিক ঘটনার পারস্পরিক সময়-অবস্থা বোঝাই, অর্থাৎ কোন্‌টি আগে ঘটেছে বা কোন্‌টি পরে ঘটেছে। বস্তুত, এই দুটি ধারণা সাধারণভাবে আমাদের ব্যবহারে সব সময়ই উপস্থিত থাকে। কিন্তু এর বাইরে তৃতীয় যে সময়সংক্রান্ত তত্ত্বটি তিনি নিজে যোগ করলেন সেটি C Series। বস্তুত, এই ধারণায় ঘটনা সংঘটনের একটি শৃঙ্খলাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, কিন্তু সেখানে সময়ের কালানুক্রমী অথবা পৌর্বাপর্যগত ধারাকে মানার প্রয়োজন হয় না। এই ধারণাগুলি নিয়ে অনেক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সেই প্রসঙ্গ অন্যত্র অবতারণা করা যেতে পারে। আমাদের কাছে যেটা প্রাসঙ্গিক, সেটা হল এই যে, সময়ের এই তিনটি ধারণার কোনোটিই অনন্তের বৈদান্তিক ধারণাকে গ্রহণ করেনি। যদিও তিনটি সিরিজের মধ্যে বৌদ্ধ দর্শনের সময় সম্পর্কিত আলোচনার সম্বন্ধ কম-বেশি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। Presentism প্রথম দুটি সিরিজকে মেনে নেয়, আর তৃতীয়টি আসলে Presentism-এর ধারণার একটি বর্ধিত রূপ। কিন্তু এখানেই ইউরো-আমেরিকান বিজ্ঞান ও দর্শনের সময় সম্পর্কিত ধারণার Eternalism-এর প্রসঙ্গটি এসে পড়ে। এই ধারণা মনে করে যে আগে বা পরে, ত্রিকালিক অবস্থান বা যৌক্তিক শৃঙ্খলার ধারণা ছাড়াও মানুষ বুঝতে পারে যে, সময়ের যেকোনো পর্বে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা অবশ্যই বাস্তব। আর এই বাস্তবতা যুগপৎ একাধিক অস্তিত্বের সাপেক্ষে ঘটতে পারে। ১৯৮৬-৮৭-তে America Comic-Book

Limited series নামক প্রকাশক সংস্থা থেকে Alan Moore-এর লেখা 'Watchmen' বেরোয়, যার বিখ্যাত চরিত্র ড. ম্যানহাটান জানান যে, কেমন করে তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে একটি নির্দিষ্ট সময়েই একেবারে বাস্তব হিসেবে প্রত্যক্ষ করেন। এই গ্রন্থের একেবারে শেষে ড. ম্যানহাটান বলেছেন, 'Nothing ends, Adrian. Nothing ever ends.' এত কথা বললাম এই কারণে যে, উপরে উদ্ধৃত অপুর স্বগতোক্তি আর লেখকের প্রতিক্রিয়া দুটি পড়তে পড়তে মনে হয়, বিভূতিভূষণ যেন এক ধরনের নতুন Time series তৈরি করতে চেয়েছেন, যে Presentism-কে অতিক্রম করে যায়। Eternalism-এর কাছাকাছি পৌঁছেও স্বভাবসিদ্ধভাবে বিভূতিভূষণ নির্মাণ করেন ঘটনা ও সময়ের সম্পর্কের নিজস্ব অভিধান। যে দিন অপু রওনা দিল, দুর্গা মারা গেছে তার থেকে বেশ কিছুটা আগে। কিন্তু অপুর স্মৃতিতে সে বেঁচে আছে। শুধু স্মৃতিতে বেঁচে আছে, তাই নয়; Space-কে সঙ্গে নিয়ে একটা অনন্ত বর্তমান Time-কে অপু ক্রমাগত নিজের মনে আউড়ে যাচ্ছে। আদ্রিয়ানকে ম্যানহাটান যেমন বলছেন কিছুই না শেষ হওয়ার কথা, অপুও যেন নিজেকে সেই সান্ত্বনাবাক্যটাই শোনাতে চাইছে। আর তখনই উপস্থিত হচ্ছেন লেখক স্বয়ং। যে ভবিষ্যত জীবনটা অপু এখন পার হয়নি, সেই ভাবীকালের ছবিটা আগে থেকেই বলে দিয়ে তাকেও টেনে আনছেন এই বর্তমানে। দুর্গার মৃত্যুর অতীত, অপুর ভাবীকালের পথ চলা অপুর অশ্রুক্লান্ত বর্তমানের অনুভূতির নিবিড়তায় ধরা পড়ছে। Space এবং Time দুটিই যেন লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে মনে হয়—আসলে লঙ্ঘন নয়, যা ঘটেছে, তা হল 'Timeless' যে 'Eternal' তাকেই 'Real' করে তোলা।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে আর একটি মৃত্যুদৃশ্য আছে অপুর জীবনকে কেন্দ্র করে। তার বাবার মারা যাওয়ার কাহিনি। একটু দীর্ঘ হলেও এই দৃশ্যটিও আমরা যথাসম্ভব পুরোটা উদ্ধৃত করব লেখার সুবিধার কথা ভেবে—

> মাঝ-বর্ষার ধারামুখর কুয়াসাচ্ছন্ন দিনে মনে হয় যে পৃথিবীর রৌদ্রদীপ্ত দিনগুলো স্বপ্ন না সত্য? এই মেঘ, এই দুর্দিন, অনন্ত ভবিষ্যতের পথে এরাই রহিল চিরসাথী—দিগন্তের মায়া-লীলার মত চৈত্র-বৈশাখের যে দিনগুলো অতীতে মিলাইয়া গিয়াছে—আর কি তাহা ফিরিয়া আসে?
>
> চারিধার হইতে সর্বজয়াকে কি এক কুয়াশায় ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার মধ্য দিয়া না দেখা যায় পথ, না চেনা যায় সাথী, না জানা যায় কোথায় আছি। সন্দেহ হয় এ কুয়াশা বোধহয় বেলা হইলে রৌদ্র উঠিলেও কাটিবে না, এর পেছনে আছে আকাশ-ছাওয়া ফিকে ধূসর রং-এর সারাদিনব্যাপী অকাল বাদলের মেঘ।

বিপদের দিনে পাঞ্জাবী ওভারসিয়ার জালিম সিং এবং তাহার স্ত্রী যথেষ্ট উপকার করিল। জালিম সিং অফিস কামাই করিয়া সৎকারের লোকের জন্য বাঙালীটোলায় ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। খবর পাইয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সেবকও আসিয়া পৌঁছিল।

মণিকর্ণীকার ঘাটে সৎকার-অন্তে সন্ধ্যাবেলা অপু স্নান করিয়া ঠাণ্ডা পশ্চিমে বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে পৈঠার উপর উঠিল। রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সেবক ও নন্দবাবু তাহাকে উত্তরীয় পরাইতেছিল। বেলা খুব পড়িয়া গিয়াছে, অস্ত-দিগন্তের ম্লান আলো পাথরের মন্দিরগুলার আগাটুকুতে মাত্র চিক্‌চিক্ করিতেছে। সারাদিনের ব্যাপারে দিশেহারা অপুর মনে হইল তাহার বাবার পরিচিত গলায় উৎসুক শ্রোতাগণের সম্মুখে কে যেন বসিয়া আবৃত্তি করিতেছে—

কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী...
লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ...

যে বাবাকে সকলে মিলিয়া আজ মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করিতে আনিয়াছিল, —রোগে, জীবনের যুদ্ধে পরাজিত সে বাবা স্বপ্ন মাত্র—অপু তাহাকে চেনে না, জানে না,—তাহার চিরদিনের একান্ত নির্ভরতার পাত্র, সুপরিচিত, হাসিমুখ বাবা জ্ঞান হইয়া অবধি পরিচিত সহজ সুরে, সুকণ্ঠে, প্রতিদিনের মত কোথায় বসিয়া যেন উদাস পূরবীর সুরে আর্শীবাচন গান করিতেছে—

কালে বর্ষতু পর্জন্যং পৃথিবী শস্যশালিনী...
লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ...

(বি. র. ১, ঐ, পৃ ১৫৯)

এখানে চেতনার জগতে অপু মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। মৃত্যু যে বিচ্ছেদকে অনিবার্যভাবে নিয়ে আসে, তাকেই অস্বীকার করে অপু অনবচ্ছিন্ন জীবনকে খুঁজে পেয়েছে। সে উপলব্ধিতে পৌঁছে কেউ শোক করে না। গীতার 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ' শ্লোকটিকে এখানে মনে পড়ে। ঐ শ্লোকটির মধ্যেও অনন্ত অনশ্বর চৈতন্যকে অনুভবের মধ্যে আপাত মরণের সীমানা ছাড়িয়ে এক অন্য রকমের বাঁচার খবর দেওয়া আছে। জীবনের সুখকে পেয়ে কখনও মনে হয়, তারই মধ্যে লুকিয়ে আছে চিরকালের শান্তি আর আশ্রয়। ভুল ভাঙে, যখন সেই সুখ হারিয়ে যায়। অপুর জীবনে এমনটাই হয়েছে বাবা মারা যাওয়ার পরে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অপুর মধ্যে এর ফলেই তৈরি হয়েছে সেই পরিণতিবোধ যা আসলে তাকে তার নিজের মননের সাথে আরো বেশি করে সম্পৃক্ত করেছে। বাবার জীবনের খবর সে নিশ্চয়ই জানত। বাবা যে একদিন তার ঘর ছেড়ে পথে নেমেছিল, পথকে ভালোবেসে—এ কেবল সংবাদ নয় তার কাছে; এ একটা উত্তরাধিকার। বাবা যে

ঘর করেছে, সেও যে সংসারের আসক্তি থেকে নয়—এ অনুভবের উত্তরাধিকারও অপুর কাছে এসে পৌঁছে গেছে। কাশীর ঘাটে যে বাবার মুখে সুললিত আশীর্বচন সে শুনত অনেকের মাঝে, অনেকের আড়ালে দাঁড়িয়ে, সেই বাবার তাই মৃত্যু নেই অপুর জীবনে। কারণ এই পথ চলার প্রেরণা, এই জীবনকে ভালোবেসে, লাভ-ক্ষতির বেড়া ডিঙিয়ে বেঁচে থাকা তো সবার পক্ষে হয় না। জীবনের 'অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ' নিয়ে যারা লড়াই করে আর ভাবে সেটাই বাঁচা, হরিহরের জীবনযাপন-প্রশিক্ষণে অপু তাদের দলে ঢুকবে না কখনও। তাই মৃত্যুর দুঃখ থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে এক অনন্ত জীবনকে বাবার বিদেহী সত্তার মধ্য দিয়ে খুঁজে পায় অপু।

দিদিকে সে বাঁচিয়ে রেখেছে এই অনন্ত জীবনের মাঝে, বাবাকেও সে বাঁচিয়ে রাখবে সেই একই অনন্তের বেদীতে। এক মহাসময়ের জাতক সে। সেই মহাসময়ের তৈরি করা পথে তার চলা। মানুষ আর বিশ্বের ছোটো-বড়ো নানা ঘটনা সেই মহাসময়ের মধ্যে এসে বাসা নেয়। একক মানুষ সাধারণত সেই মহাসময়ের সবটুকু বুঝতে পারে না, তার বিরাটত্বের মাঝে পড়ে অসহায় বোধ করে। কিন্তু অপু এই মহাসময়ের কল্পনাতেই আশ্রয় পায়, আনন্দ বোধ করে, জীবনের অনশ্বর বেদধ্বনি শুনতে পায়। অপুর স্রষ্টা যে অনন্তের দীক্ষামন্ত্র অপুর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন, তা পাশ্চাত্যের Eternal নয়, একথা আগেই আমরা বলেছি। মনে হয়, এই মহাসময়ের (Grand Time) মধ্যে নিত্যজীবী অনন্তের তত্ত্বটি বিভূতিভূষণের নিজস্ব দান। আমাদের জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা, প্রতিটি সময়ের আখ্যান বেঁচে থাকে এই মহাসময়ের শেষহীন আশ্রয়ে। তারই কিছু কিছু স্মৃতি আঁকড়ে আমাদের জীবন মুখরিত তৃপ্তির আস্বাদ বোধ করে। তাই এই অনন্ত পথের আখ্যান আপাত মূর্তিহীন হলেও আসলে বিমূর্ত নয়—মানবজীবন-প্রবাহে সে নিত্য-মূর্ত, কখনো প্রকাশিত, কখনো প্রচ্ছন্ন। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের একেবারে শেষে লেখকের অনুভবটি সেই মহাসময়ের পথে চলা অপুর জন্যে উচ্চারিত হয়—

> পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো তোমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায় কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়? তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে...দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে...
>
> দিন রাত্রি পার হয়ে, জন্ম মরণ পার হয়ে, মাস, বর্ষ, মন্বন্তর, মহাযুগ পার

> হয়ে চলে যায়...তোমাদের মর্মর জীবন-স্বপ্ন শেওলা-ছাতার দলে ভরে আসে, পথ আমার তখনো ফুরোয় না...চলে...চলে...চলে...এগিয়েই চলে..অনির্বাণ তার বীণা শোনে শুধু অনন্ত কাল আর অনন্ত আকাশ...সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি।...চল এগিয়ে যাই।
>
> (বি. র. ১, ঐ, পৃ. ১৮০)

এ আহ্বান শুনছে কি কেবল একজন অপু? নাকি অগুন্তি এই 'অপু'-দের সংখ্যা—আর সেটাও ছড়ানো আছে অনন্ত মহাসময়ের পথে?

‘অপরাজিত’ : ব্যক্তিত্ব উন্মেষের উপন্যাস

বিপ্লব মাজী

বিভূতিভূষণের ‘অপরাজিত’ উপন্যাসে অপু এমন একটি শিশু, এমন এক সত্তা যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত ও উন্নত হয়েছে উপন্যাসের পাঠকৃতিতে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সহজাত চরিত্র, সুস্থমন, সামাজিক অবস্থা দিয়ে নির্ধারিত হয় না। নির্ভর করে শৈশব থেকে মানব জগৎ ও বস্তুজগৎ সম্পর্কে গড়ে ওঠা মনোভাব নিয়ে। প্রতিটি শিশু নিজের সম্পর্কে নিজস্ব একটা মত স্থির করে, অন্যের সম্পর্কেও স্থির করে। সে ঠিক করে কাকে অনুসরণ করবে, কাকে করবে না।

শিশুর ব্যক্তিত্ব জন্ম নেয় পৃথিবীর সঙ্গে তার ব্যবহারিক জীবনের সম্পর্কের ওপর। ধীরে ধীরে এই সম্পর্কের বিকাশ ঘটে। প্রথম পর্যায়ে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ায় ঘটে। যা চেতনার দ্বারা চালিত নয়। কিন্তু শিশুর আত্মসচেতনতা দ্বিতীয় জন্মের ভিত তৈরি করে। নানা প্রেষণা ও সমন্বয় ঘটতে থাকে। আর এভাবেই সচেতন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়। জীবন সম্পর্কে নিজের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। সক্রিয় ইচ্ছাশক্তি ও প্রাতিস্বিক ধ্যান-ধারণা গড়ে ওঠে। শিশু ক্রমশ নিজেকে ব্যক্তি হিসেবে আলাদা করে নিতে থাকে। নিজের ‘আমি’-কে চিনতে থাকে। তার মধ্যে স্বীকৃতির দাবি দেখা দেয়। ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটো প্রবণতাই থাকে। ছেলে ও মেয়ে বোধ গড়ে উঠতে থাকে। নিজের সম্পর্কে বোধের উন্মেষ ঘটে। এক সময় নিজের বিকাশের দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সে দেখে তার সামনে অনন্ত দিগন্ত। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অপরাজিত’ উপন্যাস এমন একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব উন্মেষের উপন্যাস। নিরন্তর ভালোবাসা পাওয়ার চাহিদা, স্বীকৃতি পাওয়ার চাহিদা, ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু’ধরনের প্রবণতা অপুর জীবনে বার বার এসেছে। জীবনের সহজ সরল পথ ছেড়ে সে বারবারই অজানা রহস্যময় জগতের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছ। মাতৃস্নেহের পিছুটানও একসময় সে কাটিয়ে ওঠে। মায়ের মৃত্যুকে তাই অপুর মনে হয় আশীর্বাদ। এ ধরনের চরিত্র আমরা আলব্যের কামুর ‘এ হ্যাপি ডেথ’ ও ‘আউট সাইডার’ উপন্যাসের মারসলের মধ্যে পেয়েছি। মায়ের মৃত্যু মারসলের কাছে মনে হয়েছিল আশীর্বাদ। যদিও অপু ও মারসল দুটি চরিত্রই পৃথিবীর

দুই ভৌগোলিক প্রান্তে দু'জন ঔপন্যাসিকের হাতে জন্ম নিয়েছিল। কিন্তু দু'টি উপন্যাসের-ই ঐতিহাসিক পটভূমি ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়। কামুর মারসল চরিত্র ও বিভূতিভূষণের অপু দু'জনেই প্রকৃতি প্রেমিক, শহুরে জীবনে অসম্পৃক্ত বোধ করে, প্রকৃতির মধ্যে শান্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত' রোমান্সধর্মী উপন্যাস হলেও এ উপন্যাসে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিভূতিভূষণ শিশুর আদি শৈশব ও অতিশৈশবের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলি অপুর মনোগত বিকাশের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন। অপু একটি মানবিক স্নায়ুতন্ত্রের এবং মস্তিষ্কের অধিকারী। যৌবনে যার মন জটিল মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। রোবটের মতো জীবন তার পছন্দ নয়। মানবিক স্নায়ুতন্ত্রের অধিকারী বলেই সে বন্ধুর কথায় অপর্ণাকে বিয়ে করে। অন্যদিকে, তার মগজ জটিল মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র হওয়ায়, মা সর্বজয়াকে অবজ্ঞা করার মতোই অপর্ণাকেও অবজ্ঞা করতে পারে। সন্তান কাজলের প্রতি প্রথমদিকে তার এমন অবজ্ঞা লক্ষণীয় এবং তার জীবনের ক্ষণিকের জন্য বা কিছুসময়ের জন্য যেসব নারীরা এসেছে, তাদের প্রতি ব্যবহারেও জটিল মানসিকতা দেখা যায়। বিভূতিভূষণ নর-নারীর জীবনের সহজ সরলরেখার পথ পরিত্যাগ করে অপু চরিত্রে হ্যাঁ-বাচক ও না-বাচক যেসব বৈশিষ্ট্য এনেছেন, তা আমাদের বিস্মিত করে। শিশু থেকে অপুর কিশোর, যুবক ও তারপর মানুষ হয়ে ওঠার পর্বগুলি এবং আধুনিক সভ্যতায় লালিত অপুর মনঃপ্রকৃতি 'অপরাজিত' উপন্যাসকে মহাকাব্যিক রূপদান করেছে।

১৯৩১-এ বিভূতিভূষণ 'অপরাজিত' উপন্যাস লিখেছিলেন। ১৯৩৮-এ লাঁকা তাঁর Mirror Phase তত্ত্বে শিশুর জন্ম ও তার বেড়ে ওঠার কথা বলেন। জন্মমাত্র শিশু (এখানে অপু) জানে না সে কে? নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতির আবরণে সে যখন নিজেকে দেখে, কিংবা দিদি দুর্গার চোখে যখন নিজেকে দেখে, তখন থেকে সে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ করতে থাকে। তার একটা ইমেজ বা প্রতিবিম্ব গড়ে উঠতে থাকে। অপু নিজেকে প্রকৃতির ইমেজের মধ্যে দিয়ে এই জগৎ সংসারের একজন ভাবতে থাকে। এই ইমেজ বা মায়া অপুকে শৈশবে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে বন্দি করে। একটি আফ্রিকান প্রবাদ আছে, আফ্রিকার কেউ যখন যেখানেই যাক বুকের মধ্যে তার গ্রামকে নিয়ে যায়। ভবিষ্যত জীবনে অপু যেখানেই গেছে—বেনারস, মনসাপোতা, কলকাতা ও অন্যত্র—নিজের গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরকে বুকের মধ্যে বহন করে নিয়ে গেছে।

প্রকৃতির আয়নায় অপু নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেই দেখে। এই বিচ্ছিন্নতা থেকে তার

মধ্যে জন্ম নেয় অ্যালিয়েশন। এই অ্যালিয়েশন এক সময় তার মনে ইগোর জন্ম দেয়। এই ইগো অনেক সময় প্রকৃত তথ্য প্রেরণ না করে, ভুল তথ্য প্রেরণ করতে থাকে। এর ফলে জগৎ সম্পর্কে ভুল ধারণা তার মনে তৈরি হতে থাকে। মনের ভেতরে যে অবচেতন মন, সেই অবচেতন মনের কামনা বাসনা তাকে বিভিন্ন নারীর কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু ইগো প্রতারণা করে। বলতে দ্বিধা নেই যে, আমরা সবাই কম-বেশি ইগোর শিকার। সমাজে প্রতিফলিত নিজের ইমেজকে আমরা সত্যি মনে করি। অপুও তাই মনে করেছে এবং প্রতারিত হয়েছে। আলব্যের কামুর 'আউট সাইডার' বা 'এ হ্যাপি ডেথ' উপন্যাসের নায়ক মারসলের মতো প্রকৃতির আশ্রয়েই সে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। ফিরে পেয়েছে তার নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম সম্পৃক্ত নিজস্ব জীবন।

২
অপরাজিত-র বিনির্মাণ

প্রথম অধ্যায়

রায়চৌধুরী বাড়িতে সর্বজয়া বড়োলোকের বাড়ির রাঁধুনি। তাঁর প্রচুর খাটুনি। অপু ব্রাহ্মণ। স্টেশনে পাঁজি বিক্রির চাকরি। পাঁচ টাকা মাইনে, সঙ্গে জলখাবার। সর্বজয়া চায় না অপু চাকরি করুক।

এরপর মুদি দোকানে অপুর চাকরি—মাইনে সাত টাকা।

অপুর কথায় স্বামীর সুর। সর্বজয়া এ সুর চেনে। নিজের গৃহ বলে কিছু নেই। নারীর অন্তর্নিহিত নীড় বাঁধার বাসনা। পুত্রের অনভিজ্ঞ মনের তরুণ কল্পনাকে শ্বাসরোধ করে মারতে মায়া হয় সর্বজয়ার।

বড়বাবু অসুস্থ। মেজ বৌরানি ও মেজবাবু আসবেন। অপুর মনে প্রশ্ন—লীলা কি আসবে?

কাশী থেকে চিঠি। ভবতারণ চক্রবর্তী। দূরসম্পর্কের জ্যাঠামশায়। দেশ আড়ংঘাটার কাছে মনসাপোতা। জ্যাঠামশায়ের কেউ নেই সংসারে।

অপু মা-র মুক্তি চায়।

অপুর গৃহ মিলবে। আশ্রয় মিলবে।

পুতুল নাচ। সময়ে না ফিরলে দারোয়ান গেট বন্ধ করে দেবে।

পান-লেমনেডের দোকানে ঘুম।

লীলা পরে আসবে।

মায়ের পাতে ভাত খাওয়া। লীলা দোরগোড়ায়। অপুকে দেখে লীলা অবাক

হয়। অপু দেখতে সুন্দর হয়েছে। লীলাও দেখতে সুন্দর হয়েছে। লীলাকে দেখে অপু অবাক।

নাইনের ক্লাসে অপু উঠবে। ক্লাসে ফার্স্ট প্রাইজ হিসেবে পেয়েছে বই। ছবির বই, লীলা ভালো ছবি আঁকে।

লীলাও অপুর মতো নাইনের সেকেন্ড ক্লাসে পড়ে। গিরীন্দ্রমোহিনী গার্লস স্কুল। অপু লীলাকে এখান থেকে চলে যাবার সংবাদ দেয়। এরপর দেখা যায় উলা স্টেশন। এই স্টেশন থেকে মনসাপোতা। গোরুর গাড়ি। দাদামশায়ের কাছে অপুর নিশ্চিন্দি-পুরের খোঁজ।

এরপর দেখা যায় মনসাপোতায় সংসার।

অপু পুরোহিত। সরকার বাড়ি। অপুকে পুজোয় যেতে হলো। আনাড়ি অপু।

নিশ্চিন্দিপুরের সঙ্গে মনসাপোতার তুলনা। মা ও ছেলের রঙিন ভবিষ্যত মনসাপোতার মাটিতে নেমে এসেছে।

অপুর স্কুলে পড়তে যাওয়া আড়বোয়ালোতে। চারক্রোশ পথ হেঁটে যাবে আসবে।

উভয়সংকট।

ছবির মতো চোখে পড়ে নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম। সামনে ইছামতী নদী।

সর্বজয়ার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। অপুর হয়নি। সে স্কুলে ভর্তি হলো। পথের প্রকৃতি বর্ণনা—অপু সবেমাত্র একা বের হয়েছে। পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে। গ্রামের ছবি।

স্কুলে ব্যস্ততা। হেডমাস্টার ফণীবাবু। স্কুল পরিদর্শক আসবেন।

ইনসপেক্টর অপুর ওপর খুশি। ফণীবাবু বললেন, বোর্ডের এগজামিন দেবে অপু। অপু বোর্ড এগজামিনে জেলার মধ্যে প্রথম। স্কলারশিপ পায়।

এরপর ধীরে ধীরে আখ্যান এগিয়ে চলে। অপু হাইস্কুলে পড়বে। মহকুমার বড়ো স্কুলে যেতে হবে। বোর্ডিং-এ থাকতে হবে। মায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। মায়ের করুণ মুখের ছবি।

সর্বজয়ার ভবিষ্যতের স্বপ্ন অনন্তে বিলীন। সর্বজয়ার গভীর সন্তান স্নেহ। অন্যদিকে সাবধানবাণী।

মনসার ভাসান শুনতে গেল অপু। বাবার হাতে লেখা গানের খাতা অপু সঙ্গে নিল।

বাইরের জগৎ থেকে অপুর ডাক এসেছে।

মাঘ মাস। বুনো আদার রঙিন ফুল যেন দূর ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নের মতো সকালের বুকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেওয়ানপুর গভর্নমেন্ট মডেল ইনস্টিটিউশন।

অপুর বোর্ডিং বাস।

১৪-১৫ বছরে এই প্রথম অপু মাকে ছাড়া একা থাকছে। তার জীবনের স্মরণীয় দিন।

হেডমাস্টার সত্যেনবাবু অপুকে নিজের বাড়ি দিয়ে গেলেন। অপুর বই তৃষ্ণা।

বোর্ডিং জীবন।

স্কুল বিভাগের বড়ো ইনসপেক্টরের মুখোমুখি। বোর্ডিং-এ নিশ্চিন্দিপুর প্রকৃতির আহ্বান।

তৃতীয় অধ্যায়

অপু তখন যুবক। দোলের মেলা, ম্যাজিক।

প্রকৃতির সঙ্গে অপুর একাত্মতাবোধ।

নিশ্চিন্দিপুরের বাল্যবন্ধু পটুর সঙ্গে দেখা। পটু গ্রাম ছাড়া। পড়াশোনার চেষ্টা আছে। রানিদি।

বুড়ো নরোত্তম বাবাজী। বোষ্টমদাদু।

গ্রেভস অব এ হাউসহোল্ড। দিদি ও বাবার স্মৃতি। নিশ্চিন্দিপুরের মতো অপুর আর কোনো জায়গা ভালো লাগে না। পটুর দিদি রানু, রানুর দোজবরে বিয়ে। স্বামী অর্জুন চক্রবর্তী। পটুকে রাখতে রাজি নয়।

সর্বজয়ার অপু সর্বস্ব মন। অপুর কথা ভেবে পাগলের মতো হয়ে ওঠে।

সর্বজয়ার স্মৃতিরোমন্থন। অপুর ঘরে ফেরা। সর্বজয়া ও অপুর সংলাপ।

চতুর্থ অধ্যায়

দু'বছর চলে গেল। বোর্ডিং-এ ছেলের দলের হালুয়া খাওয়া। ছায়াপথ। নতুন ডেপুটি বাবুর বাড়িতে ছাত্র পড়ানোর লোক চাই। হেডমাস্টার অপুকে ঠিক করে দিলেন।

বোর্ডিং থেকে অপু সেখানে উঠে গেল।

তেরো বছরের মেয়ে নির্মলা। সহজ সৌন্দর্যময় জীবনযাত্রা। নির্মলার বিলেত ফেরত মামা অমরবাবু। নির্মলাকে অপুর ভালো লাগে কিন্তু সে তা দেখাতে জানে না। অপুর উদাসীনতা নির্মলার বুকে বাজে। সে সমাজের যে স্তরের মধ্যে মানুষ সেখানে ময়ূরকণ্ঠী রঙের আকাশ।

সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অপুর প্রতি নির্মলার পূর্বরাগ। ফুটবল খেলতে গিয়ে অপুর হাঁটুতে চোট লাগে। অপুর পরিচর্যায় গভীর মনোনিবেশ করে নির্মলা।

ডেপুটি বাবুর স্ত্রীর বড়ো সাধ অপু তাঁকে মা বলে ডাকে। অপু তাকে মা বলতে চায়, কিন্তু পারে না। মুখে বাধে, রীতিমতো লজ্জা করে।

তিনমাস পরে অপু চলে যায়। নির্মলার হাসি মিলিয়ে যায়। কলকাতায় অপু পড়বে।

পটু চরিত্র। রানুদির শ্বশুরবাড়ি রানাঘাটের কাছে। পশ্চিমে থাকে। অপুর কথা বলতে রানুদি-র চোখে জল পড়ে।

হেডমাস্টার মি. দত্ত খ্রিস্টান। বাইবেল পড়ে শোনালেন অপুকে।

লে মিজারেবল পড়তে অপু ভালোবাসত। অপুর সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকের মনোভাব ভালো।

ছাত্রের কাছ থেকে প্রেরণা।

চার বছরের স্মৃতি জড়ানো দেওয়ানপুর থেকে বিদায় নিতে অপুর মন চাইছিল না।

রাইডার হ্যাগসার্ভের ক্লিওপেট্রা। নির্মলা—ক্লিওপেট্রা। মিশর। নীলনদ। সূর্যদেবতারা। অপুর বাক্স গোছানো চিঠিপত্র। কাগজ কাটিং। নির্মলা জানে অপু আর ফিরবে না।

সুতরাং এমন কথা শোনা যায়, 'আপনার শরীরে মায়া দয়া কম।'

অপুর বিদায়বেলায় নির্মলা দেখা করে না। নিশ্চিন্দিপুর বাল্যজীবনের স্নিগ্ধ স্পর্শ।

অপুর স্বপ্ন নীলনদের দেশে যাওয়া। ট্রেন থেকে প্রকৃতি দেখে অদ্ভুত এক মুগ্ধতা ও বিস্ময়।

পঞ্চম অধ্যায়

সর্বজয়া জীবনে কখনো কলকাতা দেখেনি।

সুতরাং কলকাতা যাওয়ার প্রস্তুতি। অপুর প্রথম ট্রামগাড়ি ও মোটর গাড়ি দেখা। অখিলবাবু। বায়োস্কোপ। মিউজিয়াম। গড়ের মাঠ। রিপন কলেজ। ইলেকট্রিক পাখা। অপুর টিউশনি। মাসে পনেরো টাকা। তিনটি ছেলের সঙ্গে অপু মেসে থাকে। সুরেশ্বর টিউশনি করে পায় ৪০ টাকা। জানকী ২০ টাকা। নির্মল ওদের কম।

মমসেনের রোমের হিস্ট্রি। ইতিহাসের অধ্যাপক মি. বসু। লজিকের ক্লাস অপুর ভালো লাগে না।

প্যাল গ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারি। সুরেশ্বরের মেসে গেস্ট চার্জ দিয়ে অপু খায়। বারান্দায় শুয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে মায়ের চিঠি। অন্যের হাতে লেখা। মা তিনটাকা চেয়েছেন।

ঢাকা জেলায় বাড়ি, প্রণব মুখার্জী। কলেজ লাইব্রেরিতে আলাপ। প্রণবের সঙ্গে বন্ধুত্ব। প্রণবও প্রচুর পড়ে।

অপু চায় এই বিশ্বের সব কথা জানতে।

টুর্গেনিভ চোখের সামনে নতুন জগৎ খুলে দিল।

পড়াশোনা অপুর কাছে রোমান্স। অজানার রোমান্স।

কলকাতায় লীলাদের বাড়ি আছে। কোথায় সে বাড়ি অপু জানে না।

রাত্রে ঠাকুরবাড়ি যাওয়া।

অপুর পেটে খিদে। ইতিহাসের ক্লাস পালানো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কলকাতা, অপু এ ধরনের কষ্ট করতে অভ্যস্ত নয়।

দেওয়ানপুরে স্কলারশিপের টাকায় ভালো চলেছে। কিন্তু কলকাতা তো দেওয়ানপুর নয়। এখানে কেউ কাউকে পোঁছে না।

ইতিমধ্যে ইউরোপে যুদ্ধ। কলকাতায় কাপড়ের দাম বেড়ে গেছে। কাপড় আর কেনা যায় না। অপুর থাকার কষ্ট। সুরেশ্বর যাওয়ার আগে একটা ওষুধ কারখানার উপরে ছোটো ঘরে তার থাকার স্থান করে দিয়ে গেছে। একজনের সঙ্গে অপুকে থাকতে হবে। ঘরের অর্ধেক ভর্তি ওষুধের প্যাকবাক্সে।

নীলমণি জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে সুরেশদা। শ্যামবাজারে বাড়ি।

অপু ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র।

অপুর পেটে খিদে। সুনীল বিস্ময়ের ভাব অপুর জন্মগত। অবশেষে সুরেশের মা-র সঙ্গে দেখা। খাবার কথা কেউ বলল না।

জগদ্ধাত্রী পুজো। কলকাতায়।

সপ্তম অধ্যায়

কলেজে প্রণবের প্রবন্ধ পাঠ 'আমাদের সামাজিক সম্পর্ক'। ইংরেজি জানা মন্মথ। সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র। সনাতন হিন্দু ধর্মের নিন্দা করে। অপু মনে মনে অনুভব করে তার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা খুব বড়ো, খুব সুন্দর।

অপুর সংকল্প। নবীন ও নতুনকে আহ্বানের প্রকাশ্য সভায় অপুর প্রথম বক্তৃতা।

অপু আত্মপক্ষ সমর্থনে এমার্সনের কবিতা পড়ল—

> I am the owner of the sphere
> of the seven stars and the solar year.

অনিল লাজুক, অপু মুখচোরা, অপুকে গুণমুগ্ধর চিঠি। অপু লাজুক কিন্তু আত্মপ্রচারের উন্মুখ।

হাজারিবাগ জেলায় অভ্রের খনি। চারধারে পাহাড়। অভ্রখনি মালিকের ছেলে অনিল।

অপুর প্রকৃতি শান্ত, উগ্রতা শূন্য ও উদার।

পরের তীব্র সমালোচনা ও আক্রমণের ধাত নয় তার। তরুণ বয়সের অনাবিল আত্মম্ভরিতা তার আছে। আত্মপ্রত্যয় তাকে অন্ধ করে রাখে। নিজের ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিজের ভালো-মন্দ লাগা, নিজের পড়াশোনা নিয়ে একটানা বলতে ভালোবাসে। নিজের কোনো দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে না। কোনো ব্যথা-বেদনার কথা তোলে না।

আনকোরা তাজা নবীন চোখের দৃষ্টি শুধুই সামনের দিকে। দূর দিকচক্রবালের রেখার উপরে আনন্দ ও আশায় ভরা এক অপূর্ব রাজ্যের দিকে। নার্সিসাশ প্রকৃতি।

অপুর স্বপ্ন অনিলের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে বেড়ানো।

অপু সমুদ্র বিষয়ে কলেজ লাইব্রেরির অনেক বই পড়ে ফেলে।

এরপর কলেজ পালিয়ে স্টিমার কোম্পানির অফিস। জাহাজে চাকরি খোঁজা।

অষ্টম অধ্যায়

কলেজ থেকে ফিরে দেখে পাশের বাড়ির জানালায় লেখা : 'হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে।' উড়ে ঠাকুরের হোটেল। সুন্দর ঠাকুরের মুখ ভার। অপুর দু'তিন মাসের টাকা বাকি।

হেমলতা ও অপুর সংলাপ।

খবরের কাগজে ছেলেপড়ানোর বিজ্ঞাপন খোঁজা : ডাক্তারের বাড়ির প্রাইভেট টিউটর দরকার।

ছাত্রী প্রীতিবালা। বেথুন স্কুলে পড়ে। প্রীতিবালা দেওয়ানপুরের নির্মলার মতো নয়।

কলকাতার চোরাবাজারে অপু।

অপুর ঘর সাজানো। অপুর ঘরে বন্ধুদের আড্ডা। প্রণব, জানকী, সতীশ, অনিল, মন্মথ...। দূরবীণের ওপর অপুর লোভ।

নবম অধ্যায়

অপু ছাত্রীর রুপো বাঁধানো পেন্সিল হারিয়ে ফেলেছে। দাদুর দেওয়া বার্থডে গিফট। ছাত্রীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না।

নির্মলাদের বাড়ির কথা মনে পড়ল।

প্রণব পড়াশোনা ছেড়ে দেশের কাজে গেল। এনর্কিস্টের দলে যোগ দিয়েছে।

কলেজে নোটিশবোর্ড। যাদের মাইনে বাকি পরীক্ষায় বসতে পারবে না। হোটেলে ধার বাকি।

কারখানার দারোয়ান শম্ভু দত্ত তেওয়ারী। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। সে কারখানার ঘরে থাকতে দেবে না।

অপু জিনিসপত্তর বেচা শুরু করল। ছাতু খাওয়া অভ্যেস করল।

অপুর জীবনের লাইব্রেরি বড়ো ভূমিকা নেয়।

অপুর প্রচণ্ড খিদে। ক্লাসে না খেয়ে আসায় মাথা ঘোরে। মাকে টাকা পাঠাতে পারেনি। মা-ও হয়তো না খেয়ে আছে। অপু টাকা ধারের কথা ভাবে। সুরেশদার বাড়ি গেল। সুরেশ বিয়েতে তাকে ডাকেনি। জ্যাঠাইমার কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে এল। নববর্ষের দিনেও যেতে বলল না।

সুন্দর ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। কাশীর কথক ঠাকুর।

কলকাতা শহর ক্রমশ হতাশ করছে অপুকে।

মারোয়াড়ি বাড়িতে বিয়ে। অপু মুখচোরা। স্বপ্নদর্শী প্রকৃতির মানুষ। ভাবল কলকাতা ছেড়ে মনসাপোতা ফিরবে।

অপু দিশেহারা।

নিশ্চিন্দিপুরের বিশালাক্ষ্মীদেবীর উপর তার অসীম শ্রদ্ধা।

অনিল খবর দিল গণিত ও বস্তুবিজ্ঞানে অপু প্রথম হয়েছে। অনিলের মনে সবসময় চাঞ্চল্য, অতৃপ্তি।

অপু উপন্যাস লিখছে।

অনিল বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে সারাজীবন থাকবে। হঠাৎ অনিলের মৃত্যু। হার্নিয়া। স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া।

কলেজ স্কোয়ারে সুরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিকের সঙ্গে আলাপ। বঙ্গবাসীতে বিলেত যাত্রীর চিঠি লিখতেন।

অপুর মনে হয় 'শুধু বাঁচিয়া থাকাই এক সম্পদ। তোমার বিনা চেষ্টাতেই এই অমৃতময়ী জীবনধারা প্রতি পলের রসপাত্র পূর্ণ করিয়া তোমার অন্যমনস্ক, অসতর্ক মনে অমৃত পরিবেশন করিবে...সে যে করিয়া হউক বাঁচিবে।'

অপুর মনসাপোতা ফেরা। সর্বজয়া আনন্দে আত্মহারা।

অপুর খিচুড়ি খাওয়া।

অপুর শৈশবে মা শতপ্রতারণার আচরণে নগ্ন দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর রূপকে তাদের শিশুচক্ষুর আড়াল করে রাখতেন, এখন আবার অপুর পালা।

মায়ের কাছে শৈশবে ফেরা। সর্বজয়ার স্মৃতিতে শৈশবের অপুর গানের গলা। সর্বজয়ার চোখে এখন অপু একজন মানুষের মতো মানুষ।

অপু আর ছেলেবেলার অপু নেই। অপু ছিল মূর্তিমান শৈশব। দেবশিশুর মতো।

বিভূতিভূষণ লিখেছেন—'সর্বজয়ার জীবনের পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া অপু যে অমৃত

শৈশব পরিবেশন করিয়াছে, তারই স্মৃতি তার দুঃখ ভরা জীবন পথের পাথেয়। আর কিছুই সে চায় না।'

সর্বজয়া চায় অপু বিয়ে করুক। অপু জানে মায়ের ইচ্ছে নিশ্চিন্দিপুর গিয়ে বসবাস করা। অপুর মনে হয়, মা বেশিদিন বাঁচবে না।

ছুটি ফুরোলে অপুর ট্রেন মিস। মায়ের তৃপ্তি।

অপু কলকাতায় ফিরল।

কলেজে প্রমোশন পাওয়া ছেলেদের তালিকা।

দিদির স্মৃতি (দুর্গা)। ছেলেবেলার সহজ নির্ভরতার ভার অপু কখনো হারায়নি।

শ্রাবণ মাস। বৃষ্টি। আম।

বন্ধুর মেসে আসে অপু।

খবরের কাগজ বিক্রেতা অপু। টাকা চাই। মাইনে মেটাতে হবে।

মন্মথ তার অবস্থার কথা শুনে বার লাইব্রেরিতে চাঁদা তুলে প্রায় পঞ্চাশ টাকা দেয়। কলেজে প্রফেসরদের কাছ থেকেও চাঁদা তুলে দিল।

১৮-১৯ বছর বয়সী তরুণী। লীলার সঙ্গে দেখা। ৭/৮ বছর পরে। লীলার বাড়িতে অপু। অপুর পরীক্ষার পাঁচদিন আগে তেলি বৌয়ের হাতে লেখা চিঠিতে জানাল মা-র অসুখ। সন্ধ্যায় অপু বাড়ি পৌঁছোল। শয্যাশায়ী সর্বজয়া। এমন সব কথা অপু মার সামনে বলে না, যা মা বুঝতে পারবে না।

মা-র কাছে এসে অপুর শৈশবে ফেরা।

চতুর্থদিন সকালে অপু চলে গেল কলকাতায় পরীক্ষা দিতে।

সর্বজয়ার অসহায় ভাব। মন উদাস। সর্বজয়ার স্মৃতিচারণা অপুকে নিয়ে। জীবনে এই প্রথম সর্বজয়ার একা থাকতে ভয় করল। মৃত্যুর ভয়। সারাজীবন শুধু দুঃখ ও অপমান। মৃত্যুর উপলব্ধি। মনে অপু। জ্বরের ঘোরে শৈশবের অপু ফিরে আসে সর্বজয়ার স্মৃতি ও মনে। ছেলের বেশে মৃত্যু আসছে। সর্বজয়ার মৃত্যু। সর্বজয়ার মৃত্যুর পর অপুর অনুভূতি। তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ।

নিরুপমা দিদি। অপুর জন্যে কাঁথা।

মায়ের জন্য অপুর আবেগ। মা-র টুকিটাকি জিনিস নিল। কলকাতা ফিরল।

অপু এবার-এ পৃথিবীতে একা। নির্জনতার পাথর বুকে। দশপিণ্ড দানের দিন অপুর তীব্র বেদনা। মায়ের মৃত্যুর পর অপুর জীবনে তিনমাস চলে গেল।

নিরবিচ্ছিন্ন দুঃখের জীবন।

যুদ্ধের জন্য লোক নেওয়া হচ্ছে। পার্কস্ট্রিটে অফিস। টেলিগ্রাফ। মোটর মিস্ত্রি নেওয়া হচ্ছে। অপুর চাকরি হলো না।

লীলার সঙ্গে দেখা। মা-র মৃত্যু সংবাদ দিল। এখন অপু আন্তরিকতার স্নেহস্পর্শের কাঙাল।

লীলার চিঠি। মেজ বৌরানি, লীলা।

মায়ের অভাবে এদের কারো প্রবেশাধিকার নেই।

পরীক্ষার ফল। প্রথম ১৭ জনের মধ্যে। বাংলাতে প্রথম। সোনার মেডেল পাবে।

দশম অধ্যায়

কলেজে পড়ার ইচ্ছে নেই। টাকা নেই।

অপুর অভাবী জীবন।

লোহার বাজারে দালালির কাজ নিল অপু। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে পড়তে যায়। ইতিহাস ও সাহিত্য।

মুসলমান দালাল আব্দুল অপুর কাছে টাকা ধার নিল। বায়নার খদ্দের। তিনশো টাকা। আট টাকা দিল। আব্দুল অপুকে ঠকাল।

ক্লাইভস্ট্রিট শেয়ার মার্কেট।

প্রণবের সঙ্গে দেখা। প্রণব রাজনৈতিক অপরাধে একবছর জেল খাটে, সদ্য জেল থেকে বেরিয়েছে।

খবরের কাগজের অফিসে চাকরি। ধর্ম প্রসঙ্গ।

অপুর মুখ আর চোখ look full of music and poetry।

গ্রামে বন ও নদীর ধারে দু'বন্ধুর বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা।

প্রণবের মামাতো বোনের বিয়েতে যাত্রা। অপু পাঁচ দিনের ছুটি নিল। খুলনা থেকে স্টিমারে যেতে হবে। প্রণবের মামাবাড়ির গ্রাম গঙ্গানন্দকাটি। নদীর ঘাট থেকে অল্প দূরে। সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ।

প্রণবের মামাবাড়িতে অভ্যর্থনা আপ্যায়ন। অপর্ণার সঙ্গে পরিচয়। প্রণবের মামার মেজ মেয়ে। প্রাচীন ধনীবংশ। অপু নদীতে স্নান করতে চায়। সবাই বারণ করল। নদীতে কুমির আছে। প্রণবের মামীমা যত্ন করে দুজনকে খাওয়ালেন।

একাদশ অধ্যায়

বিয়ের দিন। বরের বাড়ি দশ-বারো ক্রোশ দূরে।

নদীপথে বর আসবে। অপু ঘুমোতে চায়। প্রণব তাকে ওপরের চিলেকোঠায় ঘুমোনোর ব্যবস্থা করে দেয়। অপু ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙতে অপু দেখে গণ্ডগোল। প্রণব বলে, তাদের পরিবারের মান রক্ষার জন্য অপর্ণাকে এখুনি বিয়ে করতে হবে।

অপু আকাশ থেকে পড়ল।

অপুকে সবাই সন্ধ্যায় বর আসার পরের ঘটনার বর্ণনা দেয়। বর প্রকৃতিস্থ নয়, পাগল। সবাই বুঝতে পেরেছে। বর পালকি থেকে নেমে চিৎকার শুরু করে 'হুক্কা

বোলাও হুক্কা বোলাও!' বরপক্ষ নানাভাবে ব্যাপারটা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে। মেয়ের বাবা শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যে বর পক্ষের কথা শুনতে রাজি ছিলেন। তাঁর উপায় ছিল না। মেয়ের মা, প্রণবের বড়ো মামীমা মেয়ের হাত ধরে নিজের ঘরে ঢুকে খিল দিয়েছেন— জেনেশুনে সোনার প্রতিমা মেয়েকে তিনি পাগলের হাতে তুলে দেবেন না। প্রয়োজনে মেয়ের গলায় রামদা বসিয়ে নিজের গলাতেও বসিয়ে নেবেন।

অপু বিয়ে না করলে অপর্ণা লগ্নভ্রষ্ট হয়ে যাবে। সময় হাতে নেই। অপু সকল প্রকার বন্ধনকে ভয় করে। বিয়ের মতো বন্ধন। কদিন আগে মা তাকে মুক্তি দিয়ে গেছেন, আর বছর না ঘুরতেই আবার বন্ধনে জড়াবে।

অর্পণার মুখ অপুর মনে পড়ে। শান্ত ডাগর চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

শেষে অপু রাজী। সম্প্রদান সভার কুশাসনে পুরোহিত ঠায় বসে আছেন? অপুকে সবাই বরাসনে বসিয়ে দিল। অপুর মন তখন দিশেহারা, অপ্রকৃতিস্থ। রেশমী চেলী পরা সালংকারী কন্যাকে সভায় আনা হলো। শাঁখ বাজল উলুধ্বনি শোনা গেল। অপু কলের পুতুলের মতো মন্ত্র পাঠ করে গেল। কে একজন বলল, মেয়ের শিব পুজোর জোর ছিল, তাই এমন বর মিলল। বরকে দেখে সকলে একবাক্যে স্বীকার করলেন এইবার অপর্ণার উপযুক্ত বর হয়েছে।

প্রণবের মামীমার ওপর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অপুর মন মায়ের পরে কাউকে স্থান দিল। অবশ্য একজন আছেন প্রণবের মামীর ওপর। তিনি লীলার মা, মেজ বৌরানি। অপুর ঘোর তখনও কাটেনি। অপর্ণাকে সে তখনও নিজের স্ত্রী ভাবতে পারছে না।

অপুর ফুলশয্যাও হয়ে গেল। অপুর মনে অবাস্তবতার ভাব : 'এ মেয়েটি তাহারই স্ত্রী? স্ত্রী বলিতে যাহা বোঝায় অপুর ধারণা ছিল, তা যেন এ নয়...কিংবা হয়তো স্ত্রী বলিতে ইহাই বোঝায়, তাহার ধারণা ভুল ছিল।'

অপর্ণার সৌন্দর্য! এই প্রথম অপু অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় শোবে। মা ও দিদি দুর্গা ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় সে শোয়নি। ঘটনার অভিনবতায় তার শরীরের রক্ত টগবগ ফুটছিল।

রাঙা মুখ অপু। দীপ্তিময়।

অপুর রোমান্স।

অপুর উপলব্ধি।

মাকে বাদ দিয়ে জীবনের কোনো উৎসবে অপু। অপুর দু'চোখে জল। শুক্লা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না পরলোকগত দুঃখিনী মায়ের আশীর্বাদের মতো শুভ্র মহিমায় স্বর্গ থেকে ঝরে পড়ছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

কলকাতা ঘোরার সময় অপু অর্পণাকে প্রশ্ন করেছিল—'আমি এ বছর যদি আর না আসি অপর্ণা?'

অপর্ণা অপুর ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দেয়। ভালোবাসার চোখে সে এখনও অপর্ণাকে দেখেনি। যেখানে ভালোবাসা নেই, অভিমান নেই।

গোলদিঘির মোড়ে ফেরিওয়ালার চাঁপাফুল অপুকে অপর্ণার মাথার চুলের গন্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। অপর্ণার ভারি সুন্দর মুখ ক'দিনে তার কাছে অস্পষ্ট। অপর্ণার অপূর্ব হাসি তার চোখে ভাসে।

প্রণব কলকাতা এল। অপর্ণার মার মন্তব্য জানাল। অপু অপর্ণা কী বলেছে জানতে চায়। প্রণব মামার মতামত চেপে গেল। অপুর চালচুলো নেই বলে মামা অসন্তুষ্ট।

মুখুয্যে বাড়ির ছেলেটি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে। তাকে ঘরে তালা দিয়ে রাখা হয়েছে।

অপর্ণার কথা অপুর মনে আসে। সে বুঝতে পারে সোনার শেকল নাগপাশের মতো তাকে বেঁধে ফেলেছে। লাইব্রেরিতে অপু আজকাল বাংলা উপন্যাস পড়ে। তার মতো বিয়ে অনেক উপন্যাসে হয়েছে।

পুজোর সময় অপুর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া হলো না। অপর্ণার মা চিঠির পর চিঠি দিলেন। অপর্ণার বাবার কোনো তাগিদ ছিল না। বৈশাখমাসে অপু ছুটি পেল। অপর্ণার মা হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন। সেদিন বৃষ্টি। অপু নৌকো থেকে নেমে এল। মুষলধারায় বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে অপর্ণার মা জামাইকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে এলেন।

ফুলশয্যার সেই ঘরে অপু অপর্ণার প্রতীক্ষায় থাকল। একবৎসর চলে গেছে। বালিকা অর্পণা এখন পূর্ণ যুবতি। লীলার মতো চোখ, লীলার মতো চোখ ঝলসানো সৌন্দর্য না থাকলেও, অপর্ণার যা আছে অন্যদের নেই। অপুর মনে হলো প্রাচীন পটে আঁকা দেবীমূর্তি। অনুপম মহিমায় সৌন্দর্য। একটু প্রাচীন ধরনের সৌন্দর্য।

অপুর অপর্ণাকে মনসাপোতা নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি। অপু পুরাতন জীবন নিয়ে গর্ব ও বাহাদুরি করতে ভালোবাসে।

অপর্ণাকে নিয়ে অপুর যাত্রা। শ্বশুরের আপত্তি শাশুড়ির প্রতিবাদে ধোপে টিকল না। অপর্ণার সঙ্গে রেল ও স্টিমারে। স্টিমারে অপর্ণা মেয়েদের জায়গাতে। তিনঘণ্টা। এরপর রেল। অপুর সর্বপ্রথম গৃহস্থালি স্ত্রীর সঙ্গে। চার আনা ভাড়ায় খড়ের ঘর। অপু খাবার কিনতে যাচ্ছিল। অপর্ণা রাঁধবে।

অপু খুশি। স্নান সেরে আসা অর্পণাকে দেখে অপুর মনে হল যৌবন কি অপূর্ব সুষমায় আত্মপ্রকাশ করছে। অপর্ণা সম্পর্কে অপুর আন্তরিক উপলব্ধি।

অপুর মনে হয় দিদি, রানুদি, লীলা ও অপর্ণা সবার মধ্যে মা অল্পবিস্তর মিশে আছে। স্টেশনের দেখা দেওয়ানপুরের মাস্টার সত্যেনবাবুর সঙ্গে। পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে অপর্ণাকে কলকাতা দেখানোর জন্য অপু ফিটনগাড়ি ভাড়া নিল। অপর্ণা ধীর, স্থির, সংযত, বুদ্ধিমতী, চরিত্রগত দিক থেকে সহজ গাম্ভীর্য আছে।

তারা মনসাপোতা পৌঁছল সন্ধেবেলা। রাত্রিবাসের অনুপযুক্ত ঘর। অপু গরুরগাড়ি থেকে তোরঙ্গ, কাঠের হাতবাক্স নামাল। অপু কাউকে তাদের আসার কথা জানায়নি। কেননা, মা যখন তার বউকে বরণ করে নিতে পারল না, অন্য কেউ বরণ করুক সে চায় না। সে অধিকার কাউকে দেবে না।

অপর্ণা জানত অপু গরিব, এত গরিব জানত না। তাদের পাড়ার নাপিত বাড়ির মতো নিচু ছোটো চালাঘর। অপর্ণার মন দমে গেল। ভেবে পেল না, কী করে এখানে থাকবে। কান্না বুক ঠেলে আসছে। তার মনে হল এখানে থাকলে সে মারা যাবে। অপু বুঝতে পারলো সংসার পাততে অপর্ণাকে মনসাপোতায় আনা ঠিক হয়নি। অপুর আসার সংবাদ পেয়ে নিরুপমা ছুটে এলো। তেলিদের বাড়ির সবাই কলকাতায়। নিরুপমা গিনি দিয়ে বউয়ের মুখ দেখল।

অপুকে কলকাতা যেতে হবে। ঠিক হল অপর্ণা মায়ের ভিটেবাড়িতে সন্ধ্যের প্রদীপ দেওয়া পর্যন্ত থাকবে। রাত্রে নিরুপমার বাড়িতে শোবে। নিরুপমা অপুকে স্নেহ করে।

অপু নীড় বাঁধায় নিরুপমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। অপু কলকাতা এসে শনিবারের অপেক্ষায় থাকে। অপর্ণার গৃহিণীপনায় অবাক হয়। সাত-আট দিনে বাড়ির পর্ণকুটিরের চেহারা বদলে দিয়েছে। অপর্ণা ধনী বাড়ির মেয়ে, বাড়িতে কোনো কিছুই তাকে নিজের হাতে করতে হতো না।

সংসার খরচের সুরাহা করতে অপু ঘন ঘন বাড়ি আসা বন্ধ করে দিল। আমহার্স্ট স্ট্রিট পোস্ট অফিসের পিওন যে একদিন তার দুঃখ সুখের বিধাতা হবে অপু জানত না। অপুর কোনো চুলোয় কেউ নেই, কে দেবে চিঠি? অপুর কাছে দিনগুলো মাসের মতো দীর্ঘ।

অপু চিঠি না দিয়ে মনসাপোতা আসে। অপর্ণা বাড়ি ছিল না। নিজের ফেরার চিহ্ন বিলুপ্ত করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। ঠিক মা থাকলে যেমন করত। অপু নিঃশব্দে এসে অপর্ণাকে ভয় দেখায়। অপর্ণার মধ্যে অপু সর্বজয়াকে খুঁজে পায়।

অপর্ণার বাগান সজ্জা। যেখানে সে চাঁপাফুলের গাছ লাগিয়েছে। অপুর চাঁপা প্রীতি বেড়েছে। অপুর দাম্পত্য জীবনের ছবি—

> এই রাত্রিটা গভীর দাগ দিয়া গিয়াছিল অপুর মনে। মাটির ঘরের আনাচে কানাচে, গাছপালায় বাগানে ঝিম ঝিম নিশীথের একটানা বর্ষার ধারা। চারিধারই নিস্তব্ধ। পূর্বদিকের জানালা দিয়া বর্ষাজল বাদল রাতের দমকা হাওয়া মাঝে মাঝে আসে—মাটির প্রদীপের আলোতে, খড়ের ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছাইয়া সে ও অপর্ণা!

অপর্ণা সর্বজয়াকে স্বপ্নে দেখার বর্ণনা দেয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে স্বাস্থ্য প্রদর্শনী।

অপুর দৃঢ় বিশ্বাস যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবে।

জোয়ান অব্ আর্ককে রোমান ক্যাথলিক যাজক শক্তি তাঁহাদের ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুর তালিকাভুক্ত করেছেন। জোয়ানের প্রতি অপুর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল।

অপুর দর্শন : 'কাল, মহাকাল, সবারই মধ্যে পরিবর্তন আনিয়া দিবে...তোমার বিচারের অধিকার কি?'

দু'মাস পরে পুজোর সময় অপু দেশে গেল। সেদিন ষষ্ঠী। পাড়ার একদল মেয়ে ঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে অপর্ণার সঙ্গে গল্প করছে। কলার বড়া।

অপর্ণা মনসাপোতার কুঁড়ে ঘরকে নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে। অপুরও মনের মতো হয়েছে। অপর্ণার মধ্যে অপু আবার মা-কে খুঁজে পেল। পুজোর সময় অপর্ণা বাপের বাড়ি যাবে। অপু যাবে না। মুরারিকে অপুর খোঁচা দিয়ে কথা।

অপর্ণা বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার পর অপুর আর একদিনও মনসাপোতা ভালো লাগল না। শূন্য ঘর, শূন্য শয্যা, অপুর চোখে জল, সে কিন্তু একবারও ভেবে দেখল না, এই শূন্য বাড়িতে শূন্য শয্যায় অপর্ণা তার মুখ চেয়ে দিনের পর দিন অপেক্ষা করে।

অপু কলকাতায়। অপর্ণার পর পর চিঠি এল। কোনো উত্তর দিল না। একমাস পরে অপর্ণার আবার কাতর চিঠি এল। অপুর মনে পুলকের ভাব, অপর্ণার কষ্টে সে সমব্যথী না, বরং আনন্দ অনুভব করছে। এক সুন্দরী তরুণীর কাছে সে প্রয়োজনীয়। এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা অপুর কাছে।

অপর্ণার মিনতি বৃথা। অপু চিঠি দিল না।

অপুদের পত্রিকার অবস্থা খারাপ। উঠে যাবে।

অপু লীলাদের বাড়ি গেল। দু'বছর বাদে। লীলা আনন্দিত ও বিস্মিত। লীলাকে জানাল, পড়াশোনা ছেড়ে খবরের কাগজে চাকরি করে। পড়া ছাড়ার কথা শুনে লীলা ব্যথিত হতবাক। লীলা নিজের আঁকা ছবি অপুকে দেখাল। অতীত স্মৃতিচারণা।

অপুর মনে অপর্ণা ও লীলার তুলনা : অপর্ণা সুন্দরী কিন্তু লীলার সঙ্গে তুলনা হয় না। হওয়া অসম্ভব, কেননা লীলার রূপ মানুষের মতো নয় যেন, দেবীর মতো রূপ, মুখের অনুপম শ্রীতে, চোখের ও ভুরুর ভঙ্গিতে, গায়ের রং-এ, গলার সুরে, গতি ছন্দে। অপুর উপলব্ধি : সে লীলাকে ভালোবাসে গভীরভাবে ভালোবাসে, কিন্তু তা আবেগহীন শান্ত ধীর ভালোবাসা। মনে তৃপ্তি আনে, স্নিগ্ধ আনন্দ আনে। লীলা তার বাল্যের সাথি। লীলার প্রতি মমতা স্নেহ, অনুকম্পায় ও মাধুর্যভরা ভালোবাসা অনুভব করে সে।

লীলার প্রতি অপুর বাইরের ব্যবহার একরকম, আর ভেতরের টান অন্যরকম। 'অপরাজিত' উপন্যাসে লীলাই যেন অপু নামক নায়কের প্রকৃত প্রেমিকা বা উপন্যাসের নায়িকা।

লীলার চিঠি পেয়ে ভবানীপুরের বাড়িতে দেখা করল। এবারেও লীলার সৌন্দর্যে মুগ্ধ অপু। লীলার কাছে অপু আলো ও তারুণ্যের সজীব জীবনানন্দ সঙ্গে করে আনে। এমনকি মায়ের মৃত্যুর খবরও অপু তাকে দিয়েছিল লালদিঘির মোড়ে হাসিমুখে।

লীলা এবারেও অপুকে নিজের আঁকা ছবি দেখাল, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা শোনাল। বিদেশে যাবে, বড়ো বড়ো আর্ট গ্যালারির ছবি দেখবে। লীলার কাছে বতিচেল্লির প্রিন্সেস দেস্ত্ দেখে অপুর মনে হল লীলার অপূর্ব সুন্দর মুখ, যৌবন পুষ্পিত দেহলতা বতিচেল্লি দা ভিঞ্চির মতো কোনো প্রতিভা এড়াতে পারে। অপু লীলাকে বলে সে যদি ছবি আঁকতে পারত লীলাকে মডেল করত। অপুর জন্য লীলা চাকরির প্রস্তাব দিল। তার দাদামশায়ের অফিসে একজন সেক্রেটারির দরকার। মাইনে দেড়শো টাকা। লীলা দাদামশাইকে বললেই তার চাকরি হয়ে যাবে। কৃতজ্ঞতায় অপুর মন ভরে গেল। কিন্তু লীলা আগে থেকে দাদামশাইকে না বলে রাখায় অপুর চাকরিটা হল না। দু'দিন আগে লোক নেওয়া হয়ে গেছে।

লীলার প্রতি অপুর অনুরাগ। লীলাকে তার ছেলেমানুষ মনে হল, যে সংসারের রূঢ়তা ও নিষ্ঠুরতার কথা জানে না। আজ লীলার পায়ে একটা কাঁটা ফুটলে সে নিজের সুখ শান্তির উপেক্ষাও অগ্রাহ্য করে কাঁটাটা তুলে দিতে পারে। লীলার জন্য অপুর চোখে জল। এই জলই কি প্রেম?

বিয়ের পর এই প্রথম লীলার সঙ্গে অপুর দেখা। লীলা জানে না তার কীভাবে বিয়ে হয়েছে। বলি বলি করেও অপু বলতে পারেনি। অপর্ণাকে বিয়ে করে সে মানবিকবোধের পরিচয় দিয়েছে। অপর্ণা তার বিবাহিতা স্ত্রী হলেও দুজনের মনের দূরত্ব আছে। লীলা যেন অপুর মনের অনেক কাছের।

চতুর্দশ অধ্যায়

এক বছর চলে গেল। পুজো আসছে।

স্বদেশি দেশলাই কারখানার বিজ্ঞাপন।

ধনী ব্যবসায়ী নকুলেশ্বর শীলের প্রাসাদোপম বাড়ির নীচে অফিস।

অপু বাসা নিয়েছে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মধ্যে, গোলদিঘির কাছে। তেরো টাকা ভাড়ায় নিচু একতলা ঘর, ছোটো রান্না ঘর। সামান্য বেতন। দুজায়গায় সংসার চালানো অসম্ভব। অর্পণাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছে। অপুর শৈশবের স্বপ্ন, অনভিজ্ঞ তরুণ মনের উচ্ছ্বাস হারিয়ে গেছে। মাধুর্যভরা রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্নও মুছে গেছে। কত মানুষের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। শতকরা নিরানব্বই জন মানুষের জীবনই আজ অপুর জীবন।

নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভাড়াটে জীবন। জীবনের সকল সৌন্দর্য পবিত্রতা, মাধুর্য যেখানে পলে পলে সবকিছু বিষাক্ত করে। আনন্দকে গলা টিপে মারে। বারান্দার টবে দু'চারটে রজনীগন্ধা, বিদ্যাপাতার গাছ যেমন বিলাসিতা। শূকর পালের মতো যেখানে মানুষ খায়দায় আর কাদায় গড়াগড়ি দেয়। এক কুশ্রী বেষ্টনীর মধ্যে অপু ও অপর্ণা। দমবন্ধ জীবন।

এদিকে অপুর স্বপ্ন শীলাবাবুদের বাগানবাড়ির মতো একটা বাগানবাড়ি করা।

অপর্ণাও আজকাল স্বামীর দিবাস্বপ্নে যোগ দেয়। স্বপ্ন দেখার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। মন ভালো থাকে।

অফিসের কাজ করতে করতে অপুর মনে হয় তার জীবনের সব বিকাশগুলিকে পয়সা দিয়ে মালিকেরা কিনে নিয়েছে। কর্মব্যস্ত জীবনে কোন বৈচিত্র্য নেই। একমাত্র অপর্ণাই বর্তমানে তার জীবনের যা কিছু আনন্দ।

অফিসে নানা দেশের ভ্রমণ কাহিনি পড়ে। কল্পনায় অপু তার স্বপ্নকে পূর্ণ করে নেয়। অপু মনে করে যারা বড়োলোক, যাদের প্রচুর টাকা আছে, জগৎকে দেখার, জীবনকে বোঝার মতো তৃষ্ণা তাদের নেই।

অপু ভাবে নিষ্ঠুর জীবন তাকে এ-পর্যন্ত প্রতারণা করে এসেছে। ছেলেবেলায় মা যেমন নগ্ন দারিদ্র্যের রূপকে তার শৈশব থেকে আড়াল করে রাখতেন—সেভাবেই তার কাটছে জীবন।

অপর্ণা স্বামীকে ভালো রাখার চেষ্টা করে। বুদ্ধিমতী অপর্ণা স্বামীকে চিনে ফেলেছে। কিন্তু স্বামীর কথা যে সব বাঁধানো ও মিথ্যে তা অপুকে কোনোদিন বুঝতে দেয়নি। স্বামীর দুঃখময় জীবনের অংশীদার হওয়ার চেষ্টা সাধ্যমতো করে। অপুকে ভালো রাখার চেষ্টা করে। অপুর সঙ্গে অপর্ণার সম্পর্ক যেন স্নেহময়ী মা ও পুত্রের

সম্পর্ক। অপুরও মনে হয় অপর্ণা মায়ের মতো স্নেহশীলা, সেবাপরায়ণা, মায়ের মতোই অন্তর্যামিনী।

হেমন্তের স্নিগ্ধ ছায়া নদীর বুকে। স্টিমার ছেড়ে অপু ও অপর্ণা নৌকায় চড়ে। দীর্ঘদিন পরে তারা অপর্ণার বাপের বাড়ি ফিরছে। অপর্ণার বাড়িতে সেই ফুলশয্যার ঘরে তাদের থাকার ব্যবস্থা। অপুর মনে নানা পুরাতন স্মৃতি ফিরে আসে। জীবনকে মনে হয় অবাস্তব অস্পষ্ট। ধোঁয়া ধোঁয়া। হেমন্তের রাত্রির বাতাসের গন্ধ অপুর মনে হয় কুয়াশার গন্ধ।

অপুর প্রতি অপর্ণার মায়া হয়। তার মনে হয়, মায়ের কথাই সত্যি, পটে আঁকা ঠাকুর দেবতার মতো মুখ।

কলকাতায় ফিরে এল অপু। দেওয়ানপুরের বাল্যবন্ধু দেবব্রত আমেরিকা যাচ্ছে। তার আনন্দ হল, হিংসাও হল। বেলুড়মঠ বেড়িয়ে এসে অপর্ণাকে লম্বা চিঠি দিল। কোনো উত্তর না পেয়ে ভাবল অপর্ণা হয়তো নেই। মারা গেছে। রাত্রে স্বপ্ন দেখে। অপর্ণা তাকে ছলছল চোখে বলছে, তোমায় তো বলেছিলাম আমি বেশিদিন বাঁচব না।

শনিবার অফিস থেকে ফিরে অপু দেখে বড়ো শ্যালক মুরারি। মুরারি খামে আঁটা একটা চিঠি অপুর হাতে দিল। সন্তান প্রসব করতে গিয়ে অপর্ণার মৃত্যু হয়েছে।

অপু একা থাকতে চায় কিন্তু পড়শিরা সহানুভূতি জানাতে আসে।

অপর্ণার স্মৃতি তর্পণে অপু বিমূঢ়। অপুর অনন্ত জিজ্ঞাসা মরণের পর মানুষ কোথায় যায়? অপর্ণা কোথায় গেছে?

লীলার কথা মনে পড়ল অপুর। লীলাও তার মতো লেখাপড়া ছেড়ে বর্ধমানের বাড়িতে ফিরে গেছে। লীলার বাড়িতে গিয়ে অপু জানতে পারল লীলার বিয়ে হয়ে গেছে। নাগপুরে জামাইবাবু বড়ো ইঞ্জিনিয়ার, বিলেত ফেরত। বড়লোকের ছেলে, খাঁটি সাহেব।

অপুর জগৎটা মুহূর্তে নির্জন ও শূন্য হয়ে গেল। লীলার বিয়ে সে যেন মন থেকে মেনে নিতে পারছে না : 'লীলার বিবাহ হইয়াছে, খুবই আনন্দের কথা, ভালো কথা। ভালোই তো।'

পঞ্চদশ অধ্যায়

কলকাতা অপুর কাছে অসহ্য মনে হল।

লীলাদের অফিসের চাকরি ছেড়ে চাঁপদানির কাছে একটা গ্রামের স্কুলে চাকরি নিল। বড়দিনের ছুটিতে প্রণব ঢাকা থেকে ফিরে চাঁপদানিতে অপুর সঙ্গে দেখা করল।

এখানে অপুর নিকৃষ্ট জীবনযাত্রা দেখে সে অবাক হয়ে গেল। সে জানত অপুর রুচি চিরদিন মার্জিত। অপুর ওকালতি তাকে কষ্ট দিল। সবচেয়ে বুকে বাজল, যখন দেখল অপু নীচ-শ্রেণির তাসের আড্ডায় অতি ইতর ও স্থূল হাসিঠাট্টায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাচ্ছে।

প্রণব অপুকে চাঁপদানির নিকৃষ্ট জীবন থেকে কলকাতা নিয়ে যেতে চাইল। অপু রাজি হল না, বরং তর্ক করল। ব্যর্থ মনোরথ প্রণব কলকাতা ফিরে গেল। অপুকে তার মনে হল প্রাণহীন নিষ্প্রভ। প্রাণশক্তির প্রাচুর্য তার মধ্যে আর নেই।

স্কুল থেকে ফিরে সন্ধেবেলা অপু সঙ্গীহীন, একা। চাঁপদানির বেশিরভাগ মানুষ পাটকলের সর্দার, বাবু, বাজারের দোকানদার। অপুর অপরিচিত। বিশু স্যাকরার দোকানের সন্ধ্যার আড্ডা তার ভালো লাগে। অপুর ঘরের রোয়াকের সামনেই মার্টিন কোম্পানির ছোটো লাইন। কুলিবস্তি দেখা যায়। অপু এখানে নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্য গায়ে পড়ে লোকের সঙ্গে আত্মীয়তা করে, যা তার স্বভাববিরুদ্ধ। প্রতিদিন বিকেলে পোস্টমাস্টারের কাছে আড্ডা দিতে যায়।

এখানে পূর্ণ দীঘ্ড়ীর মেয়ে পটেশ্বরীকে জড়িয়ে অপুর নামে কুৎসা রটে। স্কুল শিক্ষক অপুকে সাবধান করে দেয়, শিক্ষক হিসেবে বদনাম রটলে স্কুলের চাকরি যাবে। বছর চৌদ্দো পনেরো উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ পটেশ্বরীকে দেখে অপুর কোনোদিন সুন্দরী মনে হয়নি। সে তাদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে অন্য একটি ঘটনার জেরে, কিন্তু তার সঙ্গে পটেশ্বরীকে জড়িয়ে যে কলঙ্ক রটছে, তা জেনে সে অবাক হয়।

অন্যদিকে, আজকাল অপুর মনে নৈরাশ্য ও সন্দেহবাদের ছায়া। অপুর মনে হয় সুদূরের পিপাসাও যেমন মিথ্যা অনন্ত জীবনের স্বপ্নও তেমনি মিথ্যা। অপুর মনে হয়, 'মৃত্যুপারে কিছুই নাই, সব শেষ। মা গিয়েছেন— অপর্ণা গিয়েছে— অনিল গিয়েছে— সব দাঁড়ি পড়িয়া গিয়েছে— পূর্ণচ্ছেদ।'

'মানুষ মরিয়া কোথায় যায়?' এ প্রশ্ন অপুকে কুরে কুরে খায়।

ষোড়শ অধ্যায়

স্কুলের সেক্রেটারি বিখ্যাত চাল ব্যবসায়ী রামচরণ গুঁই-এর বাড়িতে দুর্গাপুজো। চাকুরি বজায় রাখতে ছুটিতে শিক্ষকরা বাড়ি না গিয়ে, সেই পুজো নিয়ে ব্যস্ত। অপুর হাতে ছিল ভাঁড়ারের কাজ। দশমীর দিন প্রকৃত ছুটি পেয়ে সে কলকাতা এল। বিজয়া দশমী উৎসবের দিন পথ চলতে চলতে ছেলের কথা মনে হল তার। এখনো তাকে দেখেনি, জানে না কী রকম দেখতে হয়েছে। অপর্ণার মতো, না তার মতো? অপু লক্ষ্যহীন কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

অপু কবিরাজ বন্ধুর দোকানে গেল। তাদের দুরবস্থার কথা শুনল। অপুর এদের সাহায্য করতে চায়, কিন্তু তার সামর্থ্য নেই।

অজানা একটানা ট্রামে উঠে সে ভবানীপুরে লীলাদের বাড়িতে হাজির হল। রাত সাড়ে আটটা। লীলার দাদামশাইয়ের লাইব্রেরি ঘরে লোকজন কথাবার্তা বলছে। লীলা নেই শুনে, বিজয়া উৎসবের আনন্দ অপুর কাছে মাটি হয়ে গেল। যদিও তার ভাই বিমলেন্দু তাকে আপ্যায়ন করল। লীলার যে বিয়ে ভালো হয়নি সে সংবাদ অপু পেল। স্বামী রাগী, বদমেজাজী মাথা।

লীলার দিদি সুজাতার সঙ্গে অপুর দেখা হলো। যে সুজাতার সৌন্দর্য দেখে একদিন সে মুগ্ধ হয়েছিল। সুজাতার সে সৌন্দর্য আর নেই। সুজাতার প্রশ্ন সে আবার কেন বিয়ে করেনি? অপু অন্যমনস্ক। লীলাই তার প্রাণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

মাঘী পূর্ণিমার রাতে পটেশ্বরী এল অপুর সঙ্গে দেখা করতে। রিষড়া থেকে সে আসছে। সেখানে ফিরবে না। শ্বশুরবাড়িতে তাকে প্রচুর মারধর করছে। অপু তাকে অনেক রাতে বাড়ি পৌঁছে দিল। দীঘ্‌ড়ি মশাই অপুকে আইন দেখতে বলেন, জামাইয়ের কাছে খোরপোশ আদায়ের জন্য। কিন্তু পাঁচদিন পরে অপু শোনে জামাই এসে পটেশ্বরীকে নিয়ে গেছে। কিন্তু সে আরও বিস্মৃত হয়, যখন শোনে স্কুলের সেক্রেটারি চিঠিতে জানিয়েছেন স্কুলে তার চাকরি আর নেই। অপুর চরিত্র নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন।

অপু ঠিক করলো, সে উপন্যাস লিখে টাকা রোজগার করবে।

জীবনের এই দুঃসময়ে লীলার নয় পৃষ্ঠার চিঠি পেয়ে অপু উদ্বেলিত। লীলার চিঠিতে ধরা পড়ে শান্ত সহানুভূতি, স্নেহ প্রীতি, করুণা। লীলার চিঠি পেয়ে মুহূর্তে অপুর জগৎটা বদলে গেল। লীলার প্রাণের প্রেমময় উষ্ণ স্পর্শ অপুর প্রাণে লাগল। সে চাইল 'জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া এই স্পর্শটুকু অক্ষয় হয়ে বিরাজ করুক'।

স্কুল থেকে বিদায় নিয়ে অপু কলকাতা চলে এল। এবার মুক্তি। যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে।

ভারত দর্শনের আগে অপু একবার ছেলেকে দেখতে শ্বশুরবাড়ি গেল। এতদিনের অনুপস্থিতির জন্য সেখানে কেউ তাকে তিরস্কার করল না। বরং প্রচুর আদর যত্ন পেল। ছেলের বয়স তিন বছর। অপর্ণার মতো গায়ের রং, অপুর মতো ডাগর ডাগর চোখ। পুত্রস্নেহে অপু ডুবে গেল। কলকাতা ফেরার সময় অপর্ণার মা স্নেহবশত অপুকে আবার একটি বিয়ে করে নিতে বললেন।

অপু ভাবল আশ্চর্য! এরই মধ্যে অপর্ণা কত সুদূর হয়ে গেছে। অপুর মনে অপর্ণার স্মৃতি। সারাটা পথ অপর্ণা তার মনে।

কলকাতা ফিরে অপু আবার শৌখিন জীবনে ফিরল। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি, মিউজিয়াম, সভা-সমিতিতে ঘুরতে লাগল।

হাতের পয়সা শেষ হয়ে যাচ্ছে। অপু হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গয়া প্যাসেঞ্জারের টিকিট কাটল। সে তখনও জানে না এই গয়া প্যাসেঞ্জারে তার ভবিষ্যত কোথায় চলেছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

গয়ায় বিষ্ণুপদ মন্দিরে পিণ্ড দিয়ে অপু বিকেলে বৌদ্ধগয়া দেখতে গেল। বুদ্ধের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা থেকে ছেলের নাম রেখেছে অমিতাভ।

গয়া থেকে দিল্লি এক্সপ্রেসে দিল্লির পথে অপু। এক ভদ্র দম্পতির সঙ্গে আলাপ, মোগলসরাইয়ে তাঁরা ব্রেক জার্নি করবেন। ভদ্রলোক নাগপুরের কাছে গভর্নমেন্ট রিজার্ভ ফরেস্টে কাজ করেন। অপুকে ঠিকানা দিলেন। দিল্লি থেকে যাবার পথে অপুকে আমন্ত্রণ। অপুর চোখে ইতিহাসের দিল্লি ভেসে উঠল। গভীর রাতে অপু স্টেশনে নামল। দোতলায় ওয়েটিং রুমে রাত কাটল।

দিল্লি দেখে অপুর অপূর্ব অনুভূতি।

তিনদিন পরে কটনি লাইনের ছোটো একটা স্টেশনে এসে অপু নামল। সামনে একটা ছোটো পাহাড়। ত্রিশ মাইল দূরের গন্তব্যে সে যাবে। সারা পথ বন ও পাহাড়। যেখানে বাঘও আছে। অপু বেশ উচ্ছল। ঘোড়ায় যাত্রা অপুর, যদিও পথ বিপজ্জনক। তাছাড়া রাত্রি। সারারাত ঘোড়ায় চড়ে সকালে অপু উমেরিয়া পৌঁছোল। ফরেস্ট রেঞ্জার ভদ্রলোকের নাম অবনীমোহন বসু। অপুকে দেখে দম্পতি অবাক। অপুর বাংলোয় থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। এঁদের অপু কথকতা শোনাল। অবনীবাবুর বন্ধু মি. রায়চৌধুরির সঙ্গে পরিচয় হল। 'অপু ড্রিলিং তাঁবু তত্ত্বাবধানের কাজ পেল। মাসে বেতন পঞ্চাশ টাকা ও বাসস্থান। উমেরিয়া থেকে কুড়ি মাইল দূর ঘনজঙ্গলে স্থানটি। অ্যাডভেঞ্চারের নেশা অপুর আশৈশব।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অপুর সম্পূর্ণ নতুন জীবন শুরু হল।

অপু এরকম গভীর অরণ্য কখনো দেখেনি। পরিশ্রমের কাজ। তাঁবুর পেছনে পাহাড় শ্রেণি। সামনে অরণ্য। অরণ্যের নির্জনতার মধ্যে অপু হারিয়ে গেল। অপু প্রকৃতি প্রেমিক। প্রকৃতির মধ্যে সে। ঘোড়া চালাতে চালাতে অপুর মনে হল সে যেন জগতে সম্পূর্ণ একা। দুনিয়ার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। বিজন বন, চারিদিক গভীর নির্জনতা। অপুর ভারি পছন্দ হল এ জীবন। এ বিজন অরণ্যে আকাশ এবং নক্ষত্রেরও যেন অন্য রূপ। বিশাল নক্ষত্র জগতের এতো কাছাকাছি অপু কখনো আসেনি। এখানের সবকিছুই শাশ্বত কালের।

গহন অরণ্য পথে অমরকণ্টক যাওয়ার সময় অপুর সঙ্গে এক মৈথেলী ব্রাহ্মণের পরিচয় হল। এই ব্রাহ্মণ বিজন অরণ্যে সংস্কৃতে রামায়ণ পাঠ করেন। অপুর মনে হল এই মানুষটি বর্তমানের কোনো ধার ধারেন না। বনবাসে নিজের পুথির পাঠ করেই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। অপুর চোখের সামনে ভেসে উঠল সুপ্রাচীন জাতির অতীত সভ্যতা। অপু স্বপ্নে ভাবেনি চোখের সামনে তার শৈশবের কল্পনার জগৎ এভাবে বাস্তব হয়ে চলে আসবে। বক্ততোয়া নদীর ধারে বসে অপুর মনে ভেসে ওঠে অপর্ণার মুখ, দিদির মুখ, মায়ের মুখে শোনা মহাভারতের দিনগুলোর কথা। অপুর মনে হয় চোখের সামনে দেখা জীবনটা প্রকৃত জীবন নয়। এই অগভীর একঘেয়ে জীবনের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক সুন্দর, পরিপূর্ণ আনন্দভরা সৌম জীবন। শাশ্বত রহস্যভরা গহন-গভীর মন্দাকিনী জীবন, যার গতি কল্প থেকে কল্পান্তরে। যা দুঃখকে করেছে অমৃতের পাথেয়, অশ্রুকে করেছে অনন্ত জীবনের উৎসধারা।

অপুর প্রায়ই মনে হয়, জীবনকে খুব কম মানুষই চেনে। জন্মগত ভুল সংস্কারের চোখে সবাই জীবনকে বোঝার চেষ্টা করে। দেখার চেষ্টা করে। কোনোটাই শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ হয় না।

ঊনবিংশ অধ্যায়

অসহযোগ আন্দোলনের তিনবছর পরে প্রণব রাজশাহী জেলে থেকে ছাড়া পেল। প্রণব কলকাতায় অপুর খোঁজ করে পেল না। মন্মথর কাছে গেল। মন্মথ এখন অ্যাটর্নি। কলকাতা থেকে মামার বাড়ি এসে সে জানল মামা-মামী আর নেই। পাঁচ-ছ বছরের একটি শিশুকে দেখে বুঝল, এ অপুর ছেলে কাজল। প্রণব দেখল, অবহেলায় অনাদরে কাজল বড়ো হচ্ছে। কাজল তোতলাচ্ছে, বাবার খোঁজ করছে। অপুর ওপর প্রণবের রাগ হল।

কলকাতা ফিরে প্রণব দেবব্রতর সঙ্গে দেখা করল। সে যদি অপুর কোনো খোঁজ দিতে পারে।

বিংশ অধ্যায়

দীর্ঘ সাড়ে পাঁচবছর অপু বাংলার শান্ত কমনীয় মুখ দেখেনি। ট্রেনে ফেরার সময় ভাবছে কখন বাংলাদেশে ট্রেন ঢুকবে। বাংলার বাইরে গিয়ে বাংলার রূপ সে চিনেছে। বাংলার প্রকৃতির রূপে অপুর মুগ্ধতা।

কলকাতা ফিরে তার সবকিছুই নতুন মনে হচ্ছে। বোর্ডিং এ একা একটা ঘর নিল। সুরেশ্বরদার সঙ্গে দেখা। স্ত্রীর সঙ্গে অপুর পরিচয় করিয়ে দিল। সুরেশ্বরদার সঙ্গে রেস্তরাঁয় অপু বিগত পাঁচ বছরের গল্প।

পরের দিন বিকেলে অপু ভবানীপুরে লীলার মামাবাড়ি গেল। অপর্ণার মৃত্যুর আগে দেখা হয়েছিল। আট বছর পরে যাচ্ছে।

লীলার ভাই বিমলেন্দুর মুখে অপু লীলার বর্তমান অস্বাভাবিক জীবন কাহিনি শুনল। কুচরিত্র স্বামী বেনটিঙ্কস্ট্রিটের একটি ইহুদি মেয়েকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করায় লীলা ছোটো মেয়েকে নিয়ে পদ্মপুকুর চলে আসে। একদিন দাদাবাবু মেয়েকে সিনেমা দেখানোর ছুতো করে জব্বলপুরে চলে যায়। দিদির কাছে পাঠায় না। দিদিও একদিন পারিবারিক বন্ধু ব্যারিস্টার হীরক সেনের সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়। এক বছর পরে ফিরে আসে। কিন্তু হীরক সেনকে ছেড়েছে। বিমলেন্দু অপুকে বোঝায়, দিদি স্বামীর ওপর শোধ নিতে এই কাণ্ড করল।

বর্ধমানের বাড়িতে দিদির নাম কেউ করে না। রমেনদা বাড়ির মালিক। অন্যদিকে, দিদির যা কিছু টাকা হীরক সেন দেদার উড়িয়েছে। দিদিকে বিলেত নিয়ে যাবে বলেছিল। বিকেলে দিদি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বেড়াতে এলে দেখা করে। বিমলেন্দু চলে গেল। লীলার উপর অপুর রাগ বা অভিমান কিছুই হল না। অপুর অনুভব, লীলাকে সে এত ভালো কোনোদিন বাসেনি। বিগত আট বছরে লীলার মুখ তার কাছে ঝাপসা। লীলার দাদামশাইয়ের ওপর অপুর রাগ হল। সবাই মিলে লীলার জীবনটা নষ্ট করে দিল। অপু কিন্তু একবারও লীলার প্রতি নিজের ব্যবহারের কথা ভাবল না যাকে সে এত ভালোবাসে, তাকে সেও তো উপেক্ষা অবহেলা করেছে।

কিছুদিন কলকাতায় থাকার পর অপুর পুরোনো দুঃখের দিন আবার ফিরে এলো। কলকাতা তার পুরোনো রূপে ফিরে আসছে। মি. রায়চৌধুরী কলকাতা ফিরে জয়েন্ট কোম্পানি গড়ার চেষ্টা করছেন। সেখানে অপুর কাজ বাঁধা আছে কিন্তু সে আর একঘেয়ে কেরানি জীবনে ফিরতে চায় না। বিগত ছ'বছরে শিল্পের নতুন স্বপ্ন সে দেখেছে। জীবনের গভীর রহস্যময় সৌন্দর্য দেখেছে। কলকাতার মেসজীবনে সেই নক্ষত্রখচিত আকাশ ও নির্জন প্রান্তর নেই।

অপু সিদ্ধান্ত নিল দুঃখের নিশীথে প্রাণের আকাশে সত্যের যে উন্মেষ নক্ষত্ররাজি দেখেছে, তা সে লিপিবদ্ধ করে রেখে যাবে। অপুর এইসব ভাবনার সময় অপুর জীবনচরিতে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবেশ করেন। অপু নিজের বই-এর ভবিষ্যতের কথা ভাবে। অপু যেহেতু অজ্ঞাতনামা লেখক, তাই তার প্রথম বই কোনো প্রকাশক নিতে চাইল না। যদিও বা নিল জানাল পাঁচশ টাকা দিলে বইটি ছাপতে পারে। অত টাকা একসঙ্গে অপু জীবনে দেখেনি।

বিকেলে বিমলেন্দু এলো। একটা হলদে রঙের গাড়ি অপুকে দেখিয়ে বলল, ঐ দিদির গাড়ি আসছে। অপু দেখল লীলা আগের মতোই সুন্দরী আছে। একটু মোটা হয়েছে। শান্ত, বিপন্ন সংযত লীলার সৌন্দর্য। লালসা মাখা নয়। জীবনে এই প্রথম

অপু লীলার এত কাছে বসেছে। বিমলেন্দু মোটর নিয়ে লেক ঘুরতে গেল। অপু ও লীলাকে নিভৃত সংলাপের সুযোগ করে দিল। কতকাল পরে লীলাকে একা পেয়েও অপুর মুখচোরা রোগ যায় না। তার মুখে কোনো কথা নেই। লীলা তার নতুন বই দেখতে চায়। ভবিষ্যৎবাণী করে, তুমি একদিন বড়ো লেখক হবে। উপন্যাসে এখানে বিভূতিভূষণের নিজের জীবনের ছায়া পড়েছে। লীলা বইয়ের সমস্ত খরচ দিতে চায়। অপ্রত্যাশিত আনন্দে অপুর সারা শরীরে একটা বিদ্যুতের ঢেউ খেলে গেল। লীলারও একসময় স্বপ্ন ছিল ছবি আঁকবে, বড়ো আর্টিস্ট হবে আর আজ সে নতুন নতুন গাড়ি কেনার বিজ্ঞাপন দেখে। লীলার ভেতরে আগুন নিভে গেলেও পুরোনো দিনের মতো মনটি আছে। লীলার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসায় অপুর মনে হল সবাই লীলার কাছে সুযোগ নিচ্ছে। সে নেবে না। বই না ছাপা হয়, না হবে। এদিকে হাতের টাকা ফুরিয়ে আসছে। মি. রায়চৌধুরী তাকে চাকরি না দিয়ে বার বার ঘোরাতে লাগলেন। অপমানে অপুর চোখে জল এল।

অপুকে পশ্চিমের অরণ্য পাহাড় নির্জনতা আবার ডাকছে। মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। গাছপালাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। প্রকৃতি একদিন প্রতিশোধ নেবে। বলাবাহুল্য, যে ইউরোপে গ্রিনেদের আন্দোলনের অনেক আগেই বিভূতিভূষণ এসব কথা অপুর ভাবনার মধ্যে এনেছিলেন। আজ যে পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে আন্দোলন, বিভূতিভূষণ বিগত শতকের তিনের দশকে সে সম্পর্কে লিখে গেছেন।

জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে অপুর চাকরি হল না। চাকরি না হওয়ায় অপু ভাবল অপর্ণার গয়নাগুলো শ্বশুরবাড়িতে আছে সেগুলো বেচে সে বই বের করবে। লীলার কাছে কয়েকবার গেলেও বই-এর প্রসঙ্গ তুলল না। লীলাকে খাতাটা পড়ে শোনাল। লীলা উৎসাহ দিল কিন্তু লীলার টাকা অপু নিল না।

একবিংশ অধ্যায়

কাজল বড়ো হয়েছে। দাদামশাইয়ের তত্ত্বাবধানে তাকে থাকতে হয়। কড়া শাসন। পান থেকে চুন খসলেই বকুনি। কাজল দাদামশাইকে ভয় করে। আট বছর বয়সেই সে নভেল পড়তে চেয়েছিল। কাজলও ক্রমেই শৈশবের অপু হয়ে উঠতে চায়। বাড়িতে সীতানাথ পণ্ডিতমশাই পড়াতে আসেন। এরই মধ্যে পাড়ার দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রহ্মঠাকরুন মারা গেলেন। পাড়াময় নিস্তব্ধতা। মৃত্যুকে কাজল এই প্রথম চিনল। পাঁচ বছর আগে গভীর রাতে দিদিমা যখন মারা যান কাজল ঘুমিয়েছিল, কিছু দেখেনি। মৃত্যুর বিভীষিকা এই প্রথম তার শিশু মনে ছায়া ফেলল। কাজলের মনে হল সেও একদিন মারা যাবে। লুকিয়ে পাঁজি দেখে তার মনে হল ২৫ শে মাঘ

খারাপ দিন। সবার কাছে সে নিজের জন্মদিনের খোঁজ নেয়। কাজলের মৃত্যুভয়কে বাড়ির কেউ বুঝতে পারল না।

বাবার সঙ্গে দেখা হল। ঘাটের দিকে কাজলকে আসতে দেখে অপু চিনতে পারল। কাজল এখন সুদর্শন লাবণ্যভরা বালক। অপুর বুকের মধ্যে গভীর স্নেহ সমুদ্র দুলে উঠল। কাজল কলকাতা যেতে চায়। অপু জানে তা সম্ভব নয়। কলকাতায় সে নিজেই অচল। কাজলকে কাছে পেয়ে অপুর বাৎসল্যরসের এমন গভীর অনুভূতি জীবনে এই প্রথম।

অপর্ণার গয়না বেচে পুজোর আগেই অপু বই ছাপিয়ে ফেলল। শুধু হার ছড়াটা বেচল না। একটা ছোটো অফিসে চাকরি পেল। তার থেকে বই-এর বিজ্ঞাপনের টাকা। বইয়ের কাটতি নেই। বইওয়ালারা বলে এডিটর, বড়ো বড়ো সাহিত্যিকদের কাছে যান, ভালো সমালোচনা করুন, তা না হলে বই কাটবে না। কিন্তু অপু ওসব পারবে না, তাতে বই কাটে ভালো না কাটে তো তার কিছু করার নেই। উপন্যাসে এখানে বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া পড়েছে।

মেসে লেখালেখির অসুবিধে দেখে অপু আট টাকায় একতলার একটা ঘর ভাড়া নিয়ে উঠে যায়। সেখানে একা থাকলে লেখা হবে।

অপু কাটাকুটি, বানান ভুলে ভর্তি কাজলের চিঠি পেল। বাবার জন্য তার মন কেমন করে। একখানা 'আরব্য উপন্যাস' ও একটা লণ্ঠন নিয়ে যেতে লিখেছে।

অপু স্টিমারে শ্বশুরবাড়ি এলো। কাজল ঘাটে তার অপেক্ষায় ছিল। ছেলের বায়না এবার আর্শি।

অপর্ণার দিদি মনোরমার সঙ্গে দেখা হল। বেশ সুন্দরী, অপর্ণার মতো মুখ। এবারে ছেলের আবদারে অপু কাজলকে নিয়ে কলকাতা চলল। অপর্ণার তোরঙ্গ, হাতবাক্স মনোরমা সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে অপু প্রথমে মনসাপোতা এল। সকালে খবর পেল নিরুপমা আর নেই। তীর্থ করতে গিয়ে পথে কলেরায় মারা গেছে।

অপু কাজলকে উঠোনের চাঁপা গাছ দেখিয়ে বলে, এটা তোর মা পুঁতেছিল। মা কাজলের কাছে অবাস্তব। কাল্পনিক মা।

কাজলকে সে কলকাতায় নিয়ে এলো। এত আলো, বাড়ি-ঘর, গাড়ি-ঘোড়া দেখে নির্বাক কাজল। কাজলের দুঃস্বপ্ন কেটে গেল। এখানে দাদামশাই নেই। বাবার কাছে সে।

অপু তার বইয়ের এক পাঠকের চিঠি পেয়ে আনন্দিত। বন্ধু-বান্ধবদের সেই চিঠি দেখাতে লাগল।

কাজল চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ, মিউজিয়াম দেখল। গোলদিঘিতে মাছের ঝাঁক দেখে খুশি।

ইতিমধ্যে অপুর চাকরি চলেযায়। ভালো স্কুলে কাজলকে ভর্তি করার সামর্থ্য নেই। কর্পোরেশনের স্কুলে ভর্তি করে দিল। কাজলের মধ্যে অপু এক অন্য জগতের ছবি দেখে। কাজলও, সব বিষয়ে বাবাকে আনন্দের ভাগ দিতে না পারলে তার আনন্দ পূর্ণ হয় না।

অপু বিমলেন্দুর চিঠি পেল। লীলার আর্থিক অবস্থা ভালো না। নিজের যা ছিল সব গেছে। বাপের বাড়িতে তার নাম কেউ করে না। অপু দেখতে এলো। লীলা জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে। মুখ রাঙা। অপু নার্স ঠিক করল। দু-তিনদিনে লীলা সেরে উঠল। কাশী থেকে লীলার মা এলেন। থাইসিসের সূত্রপাত হয়েছে। লীলাকে স্বাস্থ্যকর স্থানে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। ডাক্তারের নির্দেশ।

লীলার প্রতি অপু গভীর ভালোবাসা অনুভব করল। লীলা অপুর মুখে 'আমি চঞ্চল হে' গানটা শুনতে চাইল। অপু গাইল। লীলা জীবনের প্রতি টান হারাচ্ছে। তার কথাবার্তায় অপু বুঝতে পারল। এই প্রথম লীলার প্রতি তার মনোভাব খোলাখুলি সহজভাবে বলল—'দ্যাখো লীলা, অন্য লোকের কথা জানিনে, তবে আমার কথা শুনবে?...আমি তোমাকে আমার চেয়ে অনেক বড়ো তো ভাবিই—অনেকের চেয়ে বড়ো ভাবি—তোমাকে কেউ চেনেনি, চিনলে না, এই কথা ভাবি।' লীলা নতুন অপুকে চিনল। অপু গভীর আবেগে লীলাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'তুমি আমার ছেলেবেলার সাথী, লীলা—আমরা কেউ কাউকে ভুলব না, কোনো অবস্থাতেই না। এতদিন ভুলিনিও কখনো লীলা।' লীলাও আজ বুঝতে পারল অপুকে সে চিরকাল ভালোবেসে এসেছে। অপুর বুকে মুখ লুকোনো লীলার চোখে জল। অপু বুঝল লীলার মতো সে কাউকে ভালোবাসে না। লীলাকে সে সুখী করবে।

অপু কাজলকে নিয়ে বেড়াতে বের হবে, দিন তিনেক পরে অপুর কাছে খবর এল লীলা বিষ খেয়েছে! কাজলকে কোনোমতে ভুলিয়ে বাড়িতে রেখে অপু ট্যাক্সি ধরে ছুটল লীলার কাছে। তিনদিন আগের সেই ঘরেই লীলা মৃত্যু-পথযাত্রী। অপু দেখল, 'কী অপূর্ব যে দেখাইতেছে লীলাকে...মরণাহত মৃত্যুপাণ্ডুর মুখের সৌন্দর্য যেন এ পৃথিবীর নয়— কিংবা হরিদ্রাভ হাতির দাঁত খোদাই মুখ যেন। দেবীর মতো সৌন্দর্য আরও অপার্থিব হইয়া উঠিয়াছে।'

লীলা মারা গেল সকাল দশটায়। অপু তখন খাটের পাশেই দাঁড়িয়ে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ক'মাসে কাজল ভালো লেখাপড়া শিখেছে বাড়িতেই পড়াশোনা করে।

অপু অসুস্থ। কাজলের ক্ষুদ্র জগতে সব ওলট পালট। বাবাকে এরকম অসুস্থ কখনো দেখেনি। ডাক্তারের ওষুধে কাজ হবে না। হাসপাতালে পাঠাতে হবে। কাজল নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। বাবা ছাড়া এ জগতে তার কেউ নেই।

মাস দেড়েক হল অপু সেরে উঠেছে। চাকরি জুটল না, লিখে কিছু আয় হয়। এক ইউনিভার্সিটির ছাত্র অপুর বই পড়ে মুগ্ধ, দেখা করতে এলো। অপুর দীনহীন ঘর দেখে অবাক। 'বিভাবরী' কাগজের এডিটর লেখকের ইন্টারভিউ নিতে আসবেন। 'বিভাবরী' কাগজে অপুকে নিয়ে নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বের হল। সেই সঙ্গে অপুর গল্প। পঁচিশটি টাকাও অপু পেল। 'বিভাবরী'তে প্রবন্ধ বের হবার পর অপুর বইয়ের কাটতি বেড়ে গেল। অজস্র প্রশংসা পেল।

কাজল বাবার কাছে 'আরব্য উপন্যাস' উপহার পেল। রঙিন ছবি ভর্তি।

কানাডার সাহেব এশবার্টন গ্রেটইস্টার্ন হোটেলে অপুর সঙ্গে দেখা করতে চান। অপু গেল। সাহেব তাকে নিয়ে কাশী যেতে চান। প্রথমে রাজি না হলেও শেষপর্যন্ত অপু কাশী যায়। সাহেবকে হোটেলে তুলে দিয়ে পার্বতী আশ্রমে উঠল। অপু তার শৈশবের স্কুল খুঁজল। যা আর নেই।

পিতার নশ্বর দেহের রেণু মেশানো মণিকর্ণিকা ঘাটে অপু গেল। কাশীতে অনেক আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পুরোনো প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করল। নিশ্চিন্দিপুরের স্মৃতি তার মনে জেগে উঠল।

অপু লীলার মেয়ে খুকিকে দেখল। অপুর মনে মনে বাসনা, কাজল যদি বড়ো হয়, লেখাপড়া শিখে মানুষ হয় লীলার মেয়ে খুকির সঙ্গে সে কাজলের বিয়ে দেবে। যা তাদের জীবনে ঘটেনি, সন্তানদের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করবে।

অপুর ঘর ছেড়ে বাইরে ঘোরার নেশা। আর্টিস্ট সাহেবের সঙ্গে জাভা, বালি, সুমাত্রা, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা যাবে। সে উপন্যাস লিখবে। সাহেবদের চোখে বিশ্বজগৎ দেখবে না, দেখবে নিজের চোখে। কিন্তু কাজল তাকে ঘরমুখো টানছে।

নিশ্চিন্দিপুর, ছেলেবেলার দিদি, মা, রাণুদি, মাঠ, বন, ইছামতী স্মৃতিতে অস্পষ্ট, ঝাপসা। কাল-সমুদ্রে সবকিছু ভেসে গেছে। ভেসে গেছে তার স্বপ্ন।

গ্রাম ছেড়ে আসার সময় অপু একরাশ কড়ি পেয়েছিল। বাবার শিষ্যবাড়ির দেওয়া। অপুর মনে পড়ল কুলুঙ্গিতে রাখা কড়িগুলোর কথা। কড়ির কৌটো। অপর্ণা মারা যাবার পর গঙ্গার ওপারে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে কড়ির কথা মনে পড়েছিল। কড়িগুলো যেন তার শৈশবের প্রতীক।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

অপু এখন নামকরা লেখক। বড়ো বড়ো পার্টিতে নেমন্তন্ন পায়। এসব পার্টিতে আসা ভাগ্যের কথা। খোকার জন্য চুপি চুপি দু'খানা কেক কাগজে মুড়ে পকেটে পুরে নেয়।

কাজল জানায় অপুর চিঠি এসেছে। সাহেব লিখেছেন, পত্রপাঠ এসো। ফিজিতে মিশনারিরা স্কুল খুলছে, হিন্দি জানা ভারতীয় শিক্ষক চায়। দিনকতক শিক্ষকতা করো। তারপর দেখা যাবে।

ছেলেকে ছেড়ে অপু কী করে যাবে? ছেলেকে কার কাছে রেখে যাবে। ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব। মনে মনে সে কিন্তু কল্পনার জগতে ভেসে যায়। বলাবাহুল্য কল্পনা ও প্রকৃতি-প্রেম অপুর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

বড়ো বড়ো পত্রিকা থেকে অপু উপন্যাসে লেখার অনুরোধ পাচ্ছে। প্রকাশক টাকার বিনিময়ে তার বই ছাপতে ইচ্ছুক। কনট্রাক্ট ফর্মে সই করাচ্ছে। প্রচুর টাকা পায় অপু। আগে হলে সে হয়ত বেহিসেবি টাকা উড়িয়ে দিত। এখন খোকার কথা ভাবে। লীলা বেঁচে থাকলে অপুর এই সুখ্যাতিতে কত আনন্দ পেত।

বাসায় ফিরে অপুর মনে হল বড়ো সাহিত্যের মূলে থাকে মানববেদনা।

কাজলকে কেন্দ্র করেই অপুর স্বপ্নের পৃথিবী বড়ো হতে থাকে। অপু তার ব্যক্তি জীবনের ইতিহাস দেখতে পায়, তার মনের আনন্দে মিশে থাকে প্রগতির ইতিহাস, তার ক্রমবর্ধমান চেতনার ইতিহাস। তার মনে হয় জীবনে সে যা পেয়েছে, তাতেই জীবন সার্থক।

অপু সিদ্ধান্ত নেয় কাজলকে তার পিতামহের নিশ্চিন্দিপুরের ভিটেটা দেখাবে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ট্রেনে উঠেও অপুর বিশ্বাস হচ্ছে না, সে নিশ্চিন্দিপুর চলেছে। নিশ্চিন্দিপুর, তার শৈশবের স্বপ্নালোকে। নিশ্চিন্দিপুর এখন তার সুখস্মৃতি মাত্র। তেইশ বছর আগের নিশ্চিন্দিপুর অনেক বদলে গেছে। ট্যাক্সি, মোটরকার আগে ছিল না। মালপত্র সমেত কাজলকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে অপু ঠিক করল বটের ঝুরি দোলানো স্নিগ্ধ ছায়াভরা প্রাচীন পথ দিয়ে সে যাবে। তার মতো এই দেশের সঙ্গে পেট্রলগ্যাসের গন্ধ মানায় না। আজ বিশ্বউষ্ণায়ন, পলিউশন নিয়ে সারা পৃথিবীতে আন্দোলন চলছে। বিভূতিভূষণ সেই কবে তাঁর নিজের মতো করে পলিউশন বিরোধী কথাবার্তা বলে মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন।

চৈত্রের দুপুরের রোদের সঙ্গে ঘেঁটুবনের সৌন্দর্য আর আকন্দফুলের গন্ধের সঙ্গে তার শৈশব মিশে আছে। পথে পড়ল স্বপ্নভরা নদী বেত্রবতী। একে একে দেখা গেল ধঞ্চেপলাশ গাছির কাঁচা রাস্তা। মধুখালির বিল, পদ্মবন। ঠাকুরঝি-পুকুরের ঠ্যাঙাড়ে বট গাছের ঝাঁকড়া মাথা। তারপরেই নিশ্চিন্দিপুর।

রানি কাজলকে দেখে অবাক। রানির মনে অপুর মুখ ও চেহারা আঁকা। কাজলের পরিচয় পেয়ে বিস্ময়ে ও আনন্দে রানি কি করবে ভেবে পেল না। কাজল জানাল, বাবাও এসেছে। বাইরের ঘরে বসে গল্প করছে।

অপু রানিদের বাড়িটার পরিবর্তন দেখে অবাক। ভাঙা ধ্বসা ছন্নছাড়া চেহারা। অপুর সব খবর রানি পেল। বিধবা হলেও সে এখনো সুন্দরী। আজ চড়ক। চব্বিশ বছর আগে চড়কের দিনই তারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতি অপুকে নেশার মতো টানছে। প্রকৃতির মধ্যেই অপু সবচেয়ে শান্তি পায়। শৈশবের ইচ্ছামতী নদী। অপু শৈশব ফিরে পায়।

রানির আদর যত্নে অপু মুগ্ধ হয়ে গেল। অপুর স্মৃতিতে ফিরে আসে শৈশবের নানা স্মৃতি। প্রতিদিন সন্ধেয় সতুদের রোয়াকে মাদুর পেতে রানি, লীলা, অপু, ছেলেপিলেরা আড্ডা দেয়। নিশ্চিন্দিপুরের বিকালগুলি অপুর মনে হয় অপূর্ব। অপুর এই নিশ্চিন্দিপুর ফেরাকে কেন্দ্র করে বিভূতিভূষণ চিত্রকরের দক্ষতায় একের পর এক প্রকৃতির দৃশ্যাবলী যেন তেলরঙের ক্যানভাসে এঁকেছেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ইতিমধ্যে একবার কলকাতা এসে অপু আবার নিশ্চিন্দিপুর ফিরে আসে। প্রণবকে অপু এক দীর্ঘ চিঠি লেখে। প্রণব যে আদালতে কমিউনিজম নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছে তা সে সংবাদপত্রে দেখেছে। চিঠিতে লেখে— অনুভূতি, আশা, কল্পনা, স্বপ্ন এসবই জীবন। অপুর জীবনদর্শন 'সুখ ও দুঃখ দুই-ই অপূর্ব। জীবন খুব বড়ো একটা রোমান্স—বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্স—অতি তুচ্ছতম, হীনতম একঘেয়ে জীবনও রোমান্স। অপুর মতে, 'যে মানুষ কোনো কিছু দেখে বিস্মিত হয় না। মুগ্ধ হয় না, সে তো প্রাণহীন।' প্রণবকে অপু নিশ্চিন্দিপুর নিয়ে জানায় : 'এখানে এসে বুঝেছি, জগতে কত সামান্য জিনিস থেকে কত গভীর আনন্দ আসতে পারে। তুচ্ছ টাকা, তুচ্ছ যশমান।'

অপুর এই জীবনদর্শন, অপুর স্রষ্টা বিভূতিভূষণেরও জীবনদর্শন। বর্তমান বিশ্বায়ন সম্পৃক্ত লোভের পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে পারি লোভ আর লোভ মানুষকে এক শূন্যতার জগতে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে নেই ডাঁশা খেজুরের ও আতাফুলের সুগন্ধ। যেখানে স্মৃতির আনন্দে হাজার হাজার বছর কাটিয়ে দিলেও, তা কখনো

পুরনো হবে না।

প্রণবকে অপু জানায়, খুব সম্ভব সে ফিজি ও সামোয় যাচ্ছে। কাজলকে রেখে যাওয়া নিয়ে সমস্যা ছিল। তার এক বাল্যসঙ্গিনী আছে। নিশ্চিন্দিপুরে তার কাছেই কাজলকে অপু রেখে যাবে। অপর্ণাও তার জীবনের একটা বড়ো দান। প্রণবই অপুর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিয়েছিল।

ষড়বিংশ অধ্যায়

অপু শৈশবে রাণুর খাতায় একটা আধখানা গল্প লিখেছিল। রাণু সেটা বের করে অপুকে বলল, শেষ লিখে দে এবার। রাণুদি সেই খাতা এতদিন রেখে দিয়েছে দেখে অপু অবাক হয়।

এই মঙ্গলরূপিণী স্নেহময়ী ও করুণারূপিণী নারীদের সঙ্গে অপুর পরিচয় ভাসা ভাসা। কোনো নারীকে গভীর করে বোঝার প্রয়াস তার কোনোদিন ছিল না। অপর্ণা, লীলা, পটেশ্বরী, রাণুদি, নির্মলা, নিরুদি, তেওয়ারি-বধূ সবার সঙ্গেই তার পরিচয় ভাসা ভাসা, সংসারের সুখ-দুঃখ, স্বার্থ-দ্বন্দ্বের মধ্যে নয়। তার ভবঘুরে জীবনে কম-বেশি এরা যে অমৃত বিতরণ করেছে তাতেই অপু ধন্য। নারী হৃদয়ের দুর্বলতাকে সে কোনোদিন অধিকার করতে চায়নি কিন্তু নারীদের কাছে সে চিরকৃতজ্ঞ।

ভারতীয় আর্য মিশনে নিজের ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে বাসায় এসে অপু দেখল, ঘরের সর্বত্রই কাজলের স্মৃতি। কিন্তু জীবন পথের পথিক অপু নতুন দেশের নতুন আকাশতলে জীবন শুরু করার স্বপ্নে উদ্বেল।

আজকাল অপু পিতৃহৃদয়ের কাহিনি বুঝতে পারে। কলকাতা থেকে নিশ্চিন্দিপুর ফিরে আসে অপু। অপুর সবসময়ই মনে হয় এই জগতের পেছনে অন্য একটা জগৎ আছে। অপূর্ব অচেনা জগৎ। অপু রাণুর আদর যত্ন নেয়। কিন্তু অপু যখনই নির্জনে একা, তার মনে হয় পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে। প্রকৃত রূপ চোখে পড়ে না। প্রকৃতির যেন নিজস্ব একটা ভাষা আছে। ছবির ভাষা।

প্রকৃতি ছবির ভাষায় কথা বলে। অপুর কাছে বহুযুগের ওপার থেকে ভেসে আসে প্রীতিভরা পুনর্জন্মের বাণী। ইচ্ছামতীর তীরের রক্তমেঘ স্তূপ ও নীল আকাশের দিকে চেয়ে এক অনন্ত বিশ্বের কথা তার মনে পড়ে। অপু দার্শনিক হয়ে ওঠে, তার মনে হয়, 'ওই অসীম শূন্য কত জীবলোকে ভরা কী তাদের অদ্ভুত ইতিহাস।' অপু জাতিস্মর হয়ে ওঠে। জন্ম-জন্মান্তরের কথা ভাবে। ভাবে 'জন্ম হইতে জন্মান্তরে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুর মধ্য দিয়া... বহুদূর অতীতে ও ভবিষ্যতে বিস্তৃত সে পথটা যেন বেশ দেখিতে পাইল...কত নিশ্চিন্দিপুর,অপর্ণা কত দুর্গা দিদি—জীবনের ও জন্মমৃত্যুর

বীথিপথ বাহিয়া ক্লান্ত ও আনন্দিত আত্মার সে কী অপরূপ অভিযান।'

অপু জন্ম-জন্মান্তরের পথিক আত্মা। দূর হইতে সুদূরের নিত্যনতুন পথহীন পথে তার গতি। বনদেবী বিশালাক্ষ্মীর কাছে অপুর প্রার্থনা, তিনি তার স্বপ্নময় দশবছরের শৈশবটি আর একবার তাকে ফিরিয়ে দিন।

কাজল নিশ্চিন্দিপুরে রাণুর কাছে মানুষ হচ্ছে। একদিন সে ঝোপঝাড়ে পূর্ণ ঠাকুরদার ভিটে দেখতে গেল। ভিটার মালিক ব্রজ চক্রবর্তী, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়, ঠাকুরদাদা হরিহর রায়, ঠাকুরমা সর্বজয়া, পিসিমা দুর্গা—জানা অজানা সমস্ত পূর্বপুরুষ যেন কাজলকে প্রসন্ন হাসিতে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'আমাদের আশীর্বাদ নাও। বংশের উপযুক্ত হও।'

রাণু কাজলের খোঁজে এসে দেখল কাজল এক গলা ঝোপের ভেতর। কোনো ভয়-ডর নেই। হঠাৎ রাণুর মনে হল অপু ঠিক এরকমই দুষ্টু ছিল ছেলেবেলায়। তার মনে হল চব্বিশ বছরের অনুপস্থিতির পর অবোধ বালক অপু আবার নিশ্চিন্দিপুর ফিরে এসেছে।

১৯৩১ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'অপরাজিত' উপন্যাসটি লিখছেন তখন কি তিনি জানতেন, এই উপন্যাসটি সুদূর ভবিষ্যতের পথযাত্রী? বিভূতিভূষণের সৃষ্টি অপু চরিত্রটিও নিশ্চিন্দিপুর গ্রামটি আর. কে. নারায়ণ বা গ্যাব্রিয়েলা গার্সিয়া মার্কেজের মালগুড়ি বা মাকোন্দো গ্রামের মতোই শাশ্বতকালের। রবীন্দ্রনাথ 'পরিচয়' পত্রিকা (বৈশাখ আষাঢ় ১৩৪০) 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে লিখেছেন, 'বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে।' কথাটা বিভূতিভূষণের অপরাজিত উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সত্য। আমাকে এক সাক্ষাৎকারে চেকোশ্লোভাক ভারততত্ত্ববিদ ও অনুবাদক ড. দুশান জ্যবিতেল ('দৈনিক কালান্তর', রবিবারের পাতায় প্রকাশিত) বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে যে তিনি-চারজনের নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল, তাঁদের অন্যতম ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' উপন্যাসের জন্যে বিভূতিভূষণ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। ভালো অনুবাদকের অভাবে তা হয়নি।

কথক বা ন্যারেটর

'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপুর জীবনদর্শনের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণের যে জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে, তা মানব সভ্যতার শাশ্বতকালের জীবনদর্শন। অপুর চরিত্র বিভূতিভূষণেরই জীবনচরিত্রের ছায়া। উপন্যাসের প্রয়োজনে বিভূতিভূষণ সেখানে কিছু অদল বদল ঘটিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার জগৎ নিয়েই অপু গড়ে উঠেছে। অন্যান্য যেসব চরিত্র 'অপরাজিত' উপন্যাসে উঠে এসেছে,

তারাও তাঁর আশে পাশে দেখা মানুষ। ফলে প্রতিটি চরিত্রই ইন্দিরঠাকরুন, সর্বজয়া, হরিহর রায়, দুর্গা, লীলা, পটেশ্বরী, রাণু, প্রণব, অনিল, মন্মথ এবং এই উপন্যাসের অন্যান্য নিম্নবর্গের চরিত্রগুলি স্ব স্ব মহিমায় জীবন্ত। এ-উপন্যাস রামায়ণ, মহাভারতের কালে লেখা হলে কবিতায় লেখা হতো ও বিশ শতকে লেখা হয়েছে বলে গদ্য ফর্মে লেখা একটি মহাকাব্যিক উপন্যাস। মহাকাব্যে যেমন অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্র থাকে, তেমন 'অপরাজিত' উপন্যাসেও আছে। মহাকাব্যের যেমন নানা চরিত্রের নানা জীবনদর্শন থাকে, এ উপন্যাসেও তেমন আছে; এক-এক জনের আকাঙ্ক্ষা তার জীবনকে ভিন্ন ভিন্ন পথে নিয়ে যায়। ফলে শৈশবেই অপু তার পরম প্রিয় দিদি দুর্গাকে হারায়, মা সর্বজয়ার মাতৃস্নেহের পথ থেকে সে ক্রমাগত নিজের অহংকে তৃপ্ত করতে গিয়ে দূরে সরে যায়, মায়ের মৃত্যু তার কাছে হয়ে ওঠে মুক্তি। বাল্যসাথী লীলার বদলে ঘটনাচক্রে অপর্ণা তার স্ত্রী হয়ে ওঠে এবং শেষপর্যন্ত কাজলের প্রতি পুত্রস্নেহ থাকলেও, সে অজানা জীবনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর পথে বেরিয়ে পড়ে। হোমারের 'ইলিয়াড', 'ওডিসি', বাল্মীকির 'রামায়ণ', বেদব্যাসের 'মহাভারত'-এর মতোই 'অপরাজিত'তে আছে মানবজীবনের নিয়তি নির্দিষ্ট অসংখ্য ঘটনা, অসংখ্য চরিত্রের পারস্পরিক সংঘাত। বিভূতিভূষণের অনাড়ম্বর লেখনশৈলীও মহাকাব্যিক ধারার ঐতিহ্য বহন করে।

অপুর স্বপ্ন, কল্পনা, অপুর প্রকৃতি-প্রেম, প্রকৃতির মধ্যে অপুর অলৌকিক জগৎ খোঁজা, শহুরে জীবনের সঙ্গে প্রতিপদে অপুর দ্বন্দ্ব, শহর, শহুরে বাবুদের সম্পর্কে তার অনীহা, জীবনের যাত্রাপথে বিচিত্র অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়েছে। কোনোটা সুখের কোনোটা দুঃখের, কোনোটা আনন্দের কোনোটা বিষাদের, জীবনের পথপ্রান্তে যা কিছু এসেছে অপু সেসব কিছুকে সাদরে বরণ করে নিয়েছে। বরণ করে নিতে পেরেছে তার অদম্য জীবন তৃষ্ণার কারণে। অপু পরমহংসের সেই রাজহাঁসটির মতো—জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই—তা সে ভালো হোক বা তিক্ত হোক, তাকে স্পর্শ করে না। জলের মতো ঝরে পড়ে।

'অপরাজিত' উপন্যাসে অপুর সঙ্গে কলকাতা শহরের সম্পর্ক বিচিত্র ও জটিল। কলকাতা শহরের ভিড়, গাড়ি-ঘোড়া, কর্মস্থল, মেস বা ভাড়াটে জীবন তাকে নিংড়ে নেয়, কিছুই দেয় না, একমাত্র ইমপেরিয়াল লাইব্রেরি, গঙ্গাতীরের শোভা আর মাঝে-মধ্যে লীলার সান্নিধ্য তাকে শান্তি ও স্বস্তি দেয়। তবু নিশ্চিন্দিপুর বা মনসাপোতা গ্রাম ছেড়ে, প্রকৃতির মায়াময় সান্নিধ্য ছেড়ে অপু কলকাতা চলে আসে, কিসের টানে? এ এক রহস্য। হয়তো সে ভেবেছিল, কসমোপলিটান শহরের জীবন-যুদ্ধ, লড়াই করতে না পারলে তার চরিত্রের দৃঢ়তা তৈরি হবে না। বা অপর্ণার চেয়ে বেশি কাঙ্ক্ষিত লীলার সান্নিধ্য সে পাবে না। তাছাড়া তার স্বপ্নের কল্পনার

বিদেশ-বিভুঁইয়ে যাত্রার পরিকল্পনা যদি সার্থক করতে হয়, কলকাতা থেকেই করতে হবে। দেশ-বিদেশের মানুষের দেখা নিশ্চিন্দিপুর বা মনসাপোতা গ্রামে পাওয়া যাবে না, কলকাতার মতো কসমোপলিটান শহরে পাওয়া যাবে।

অপুর জীবনে নিশ্চিন্দিপুর ও মনসাপোতা গ্রামের বিরাট প্রভাব আছে। তাই দেখা যায়, অপু যখনি কোনো স্থানের প্রকৃতিতে অবগাহন করেছে, তখনই নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিতুলনা টেনেছে। শুধু নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতিই না, তার শৈশব, নিশ্চিন্দিপুরের মানব-মানবীও তার স্মৃতিতে উঠে এসেছে। নতুন স্থানের নতুন প্রকৃতিকে অপু নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতির সঙ্গে মেলাতে চেয়েছে, শেষপর্যন্ত নিশ্চিন্দিপুরকেই সে জিতিয়ে দিয়েছে।

সহজ মানবিকতাই বিভূতিভূষণের উপন্যাসের চরিত্রগুলির প্রধান গুণ। 'অপরাজিত' উপন্যাসে নগর ও মফস্সলি জীবনই প্রধানত স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি ও মহাবিশ্বের যে একটা অদৃশ্য সম্পর্ক সজীব, সেসব দৃশ্য ও অনুভূতি এই উপন্যাসের এক এক দৃশ্যে জলছবির মতো উঠে এসেছে। ভাষা রূপান্তরিত হয়েছে চিত্রকলায়। অবর্ণনীয় বর্ণিল মিস্টিক চেতনায় সমৃদ্ধ তাঁর উপন্যাস। প্রকৃতি ও শিশুকে নিয়ে, শিশু মনের অপার রহস্য নিয়ে বিভূতিভূষণের আগে কোনো ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেননি।

একটি উপন্যাসের দেহ ও আত্মায় লুকানো থাকে অনেকগুলি গল্প বা কোনো গল্পকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করে বলাকেই বলে উপন্যাস । কিংবা অনেকগুলি গল্পকে যোগ করে যখন একটি কাহিনি নির্মিত হয়, তখন আমরা তাকে বলি উপন্যাস। 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপুকে কেন্দ্র করে আরো অনেকগুলি নর-নারীর জীবনের গল্প আছে। সেইসব গল্পে অপু পার্শ্বচরিত্র, কিন্তু মূল উপন্যাসে অপুই নায়ক।

যেকোনো উপন্যাসে ঔপন্যাসিক দু'ভাবে কথা বলেন—

১। তিনি উত্তম পুরুষে কথা বলেন, অর্থাৎ আমি এসব করেছিলাম, আমার জীবনে এই সব ঘটনা ঘটেছিল, এভাবেই পাঠকের কাছে উপন্যাসের পাঠকৃতিটি রাখেন।

২। অনেক সময় লেখক প্রথম পুরুষে কথা বলেন, অপু এইসব করেছিল, অপুর জীবনে এইসব ঘটেছিল ইত্যাদি বলে উপন্যাসের পাঠকৃতিটি তৈরি করেন।

দু'রকম পদ্ধতির দু'রকম পাঠ প্রতিক্রিয়া পাঠকের মনে ঘটে, আর সেই পাঠপ্রতিক্রিয়া অনুযায়ী পাঠক উপন্যাসটিকে বিনির্মাণ করে নেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও 'অপরাজিত' উপন্যাস মিলিয়ে পড়লে অপু চরিত্রের মধ্যে আমরা বিভূতিভূষণের জীবন অনেকটা দেখতে পাই। উপন্যাসের অপুই যেন বিভূতিভূষণ। অন্যদিকে সত্যজিৎ রায় যখন 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' উপন্যাস

নিয়ে চলচ্চিত্র করেন, পাঠক হিসেবে তিনি উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রের ভাষায় বিনির্মাণ করে নেন।

উত্তমপুরুষে যখন কোনো ঔপন্যাসিক উপন্যাস লেখেন, তখন তিনি সেখানে দর্শক বা অংশগ্রহণকারী দুই ভূমিকাই পালন করতে পারেন। অন্য চরিত্রগুলির ভূমিকা পালন করতে পারেন না। 'অপরাজিত' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ প্রথম পুরুষের ভূমিকা পালন করেছেন। অপুর চরিত্রের মাধ্যমে তিনি উপন্যাসে গতির সঞ্চার করেছেন। অন্যদিকে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলি নির্মাণেও তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ বা অংশগ্রহণ আছে। অপর্ণা, সর্বজয়া, দুর্গা বা লীলা কী ভাবছে তার বর্ণনা লেখক বিভূতিভূষণই দিচ্ছেন।

চরিত্র

অনেক সমালোচক মনে করেন, উপন্যাসে চরিত্র একটি বড়ো উপাদান। উপন্যাসের প্রধান ও সহকারী চরিত্রগুলির কার্যকলাপ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপরে নির্ভর করে উপন্যাসটির গুণগত বিন্যাস। 'অপরাজিত' উপন্যাসে প্রধান চরিত্রগুলি মানবিক গুণসমৃদ্ধ। তারা রক্তমাংসের মানুষ। তাদের জীবন কোনো নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা না। মানবজীবনে যেভাবে প্রবাহ আসে, গতিপথ পরিবর্তন করে, সেভাবেই অপু, সর্বজয়া, অপর্ণা, লীলা, পটেশ্বরী, কাশীর লীলা ও রাণু, কাজল তাদের ভূমিকা পালন করেছে। আমরা পাঠক হিসেবে বাইরে থেকে লক্ষ করি চরিত্রগুলির আচার-আচরণ, ব্যবহার ও তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া; যা অদৃশ্যে থেকে লেখক কাঙ্ক্ষিত নির্মাণের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। কেননা, চরিত্রগুলোর ওপর ভর করে উপন্যাস দাঁড়াবে, নতুবা ভেঙে পড়বে। 'অপরাজিত' উপন্যাসে কোনো টাইপ চরিত্র নেই, সাধারণ চরিত্রের মধ্যে কখনো মানবিক গুণের প্রকাশ দেখা যায়, কখনো যায় না।

ঘটনাপ্রবাহ বা অ্যাকসন

উপন্যাসে প্রেম, ভালোবাসা, জীবনসংগ্রাম ও নানা সংঘাতের কথা থাকবে এটা স্বাভাবিক। বর্তমানে চেতনাপ্রবাহ উপন্যাসের কথাও বলা হচ্ছে অর্থাৎ বাস্তব জীবনে চোখের সামনে হয়তো ঘটনাগুলো ঘটছে না, চরিত্রগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাদের অবচেতন মনে ঘটছে। দিদি দুর্গা, মা সর্বজয়া, অপর্ণা, লীলা—অপুর অবচেতন মনে বার বার ফিরে ফিরে এসেছে; অন্যদিকে, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে সর্বজয়ার অবচেতন মনে শৈশবের অপু তাঁর কাছে ফিরে এসেছে। অপুর অবচেতন মনে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের ভূমিকা অপরিসীম। 'অপরাজিত' উপন্যাসে চরিত্রগুলির পারস্পরিক ভালোবাসা, স্নেহ, প্রীতি, মমতা ও স্বার্থের মধ্যে যে সংঘাত, দ্বন্দ্ব—তা স্বাভাবিক জীবনেরই

পরিণতি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়, অর্থনৈতিক মন্দা, বাঙালি সমাজ-জীবনের গতিপ্রকৃতি 'অপরাজিত' উপন্যাসের ক্যানভাসে ছায়া ফেলেছে। উপন্যাসে প্রকৃতি বর্ণনার স্থানগুলি বাদ দিলে কোনো রঙিন ছবি উপন্যাসে নেই। অপুর জীবনের তন্ময় স্বপ্নের পাশাপাশি বিষাদ সর্বত্রই ছায়া ফেলেছে। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে মূল্যবোধের সংঘাত দেখা দিয়েছে। সারা উপন্যাস জুড়ে নানা দ্বান্দ্বিকতায় অপু যেন আলব্যের কামুর 'আউট সাইডার' উপন্যাসের মারসল। 'আউট সাইডার' উপন্যাসটিও প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ১৯৩৮-এ লেখা। শত বাধা-বিঘ্নের মধ্যে দিয়েও অপু কিন্তু তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। কাজলও বাবাকে নিশ্চিন্দিপুর আটকে রাখতে পারেনি। যুগে যুগে জীবন অপরাজিত ও রহস্যময় যেন— এই বার্তাই উপন্যাসের মহাকাব্যিক আয়তন জুড়ে বিভূতিভূষণ আমাদের দিতে চেয়েছেন। অপর্ণা ও লীলার প্রতি অপুর অবজ্ঞা, অবহেলা ও উদাসীনতা আমাদের ভালো লাগেনি। মা-র মৃত্যুতে সে যখন মুক্তির স্বাদ পাওয়ার কথা বলে আমরা শিউরে উঠি, কাজলের মতো অসহায় শিশুকে রাণুর কাছে রেখে সে যখন 'দেখব এবার জগৎটাকে' বলে বেরিয়ে পড়ে, তার অমানবিকতায় আমরা অবাক হই, আহত হই। কিন্তু এই অপুই যখন প্রকৃতির সান্নিধ্যে এই জগতের বাইরের এক অন্য জগৎ আবিষ্কার করে, আমরাও অপুর স্বপ্ন এবং কল্পনার স্রোতে গা ভাসাই, উপলব্ধি করি গতিই জীবন।

উপন্যাসের স্থান বা সেটিং

বাস্তবের ভৌগোলিক বারাকপুর গ্রামে বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' উপন্যাসের পটভূমি, কিন্তু নিশ্চিন্দিপুর গ্রামকে আমরা আর. কে. নারায়ণের মালগুড়ি বা মাকের্জের মাকোন্দো গ্রামের মতোই এক শাশ্বত কালের গ্রাম ধরে নিতে পারি। অপুর শৈশবের এই গ্রাম উপন্যাসের বিভিন্ন পর্বে অপুর কৈশোরে, যৌবন ও উত্তর-যৌবনে বার বার ফিরে ফিরে এসেছে, কখনো চেতনে কখনো অবচেতনে বা স্মৃতিতে। ভৌগোলিক দিক থেকে এই গ্রাম ভারতের প্রায় ছ'লক্ষ গ্রামের মধ্যে একটি প্রান্তিক গ্রাম। যে গ্রামে আধুনিক সভ্যতার প্রবেশ আমরা দেখব 'অপরাজিত' উপন্যাসের একেবারে শেষদিকে। আধুনিক সভ্যতার অভিঘাতে গ্রামজীবনের পরিবর্তন অপুর ভালো লাগেনি। ভারতীয় সমাজ-জীবন তখনো গ্রামকেন্দ্রিক (অবশ্য তখন কেন? আজও)। সমাজ-জীবনের ঔপনিবেশিক আবহাওয়ার পাশাপাশি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অশুভ প্রভাব পড়েছে। তবু গ্রামজীবন তার লোকায়ত সংস্কৃতি নিয়ে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। উপন্যাসে মাঝে মাঝে সেইসব উৎসব, পার্বণ, মেলার কথা এসেছে। অপুর চরিত্রে বাঙালি জীবনের উৎসব, পার্বণ, মেলার প্রভাব সামান্য হলেও

ছিল, তবে হিন্দুত্বের মূল্যবোধটি সযত্নে সে লালন করত। অথচ ধর্মের ব্যাপারে বিভূতিভূষণ ছিলেন প্রকৃতির মতোই উদার। নিম্নবর্গের প্রান্তিক জীবন তাঁকে যে প্রভাবিত করত, তা উপন্যাসে মাঝে মাঝেই উঠে এসেছে।

ভাষা

একটা উপন্যাস পাঠে আমরা সাধারণত তিনটি বিষয়ে জেনে বা না জেনে নজর দিই, যেমন বিষয়, ভাষা ও গঠনশৈলী বা স্ট্রাকচার। আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে ধরে নিই একটি উপন্যাস লেখকের নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতার ফসল। এই যে অবধারণ বা কমনসেন্স, এ গুলিকেই তত্ত্ব হিসেবে উপন্যাসের জন্মকাল থেকে আমরা মেনে এসেছি। যেখানে ভাষার গুরুত্ব তেমন একটা ছিল না। মানব অভিজ্ঞতার নিরিখে আমরা কোনো উপন্যাসের বিষয়, সত্যতা ও চরিত্রকে যাচাই করি। কিন্তু আমাদের ধারণা বা কমনসেন্স তো পূর্ব নির্ধারিত চিন্তার নির্মিতি (Ideological construct); যা ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও সেই সময়ের সমাজের অন্যান্য নিয়ামকের সাহায্যে কাজ করে। আমরা যেভাবে কথা বলি তা বাংলা ভাষারই চলন। ভাষার ভেতরে যেভাবে লেখা থাকে সেভাবেই আমরা কথা বলি। ভাষা একটা ফর্ম, যা ব্যক্তির জগতকে নির্মাণ করে। 'অপরাজিত' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ নিজস্ব কোনো ভাষা নির্মাণ করেননি। উপন্যাস রচনায় সংস্কৃতির যে গুরুত্ব আছে তা 'অপরাজিত' উপন্যাসের একটা সুর তৈরি করে দেয়। 'অপরাজিত' উপন্যাসে রোমান্সের সুর থাকলেও তা চিরায়ত মানব জীবনের সুর। এ উপন্যাসে বিভূতিভূষণ কথোপকথনের ক্ষেত্রে কোনো আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ করেননি। যে ভাষায় উপন্যাসের ন্যারেটিভ রচনা করেছেন, সেই ভাষাতেই সংলাপ নির্মাণ করেছেন।

গঠনপ্রণালী বা স্ট্রাকচার

কোনো উপন্যাসের গঠনপ্রণালী দুভাবে বোঝা যায়। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা দেখি একের পর এক অধ্যায়ে উপন্যাসটি কীভাবে রৈখিক গতিতে এগোচ্ছে। একের পর এক ঘটনা কীভাবে ঘটে চলেছে আর আমাদের উৎকণ্ঠা বা সাসপেন্স বাড়ছে। এরপর কি হয়, কি হয় একটা ভাবনা। সংঘাতটা কোন পর্যায়ে পৌঁছবে, চরিত্রগুলি কে, কী সিদ্ধান্ত নেবে? এইসব। প্লট, অ্যাকশন, ক্লাইম্যাক্স ও ফলাফল। 'অপরাজিত' উপন্যাসের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত অপু ও লীলার সম্পর্ক কী পরিণতি পাবে তা নিয়ে আমাদের উৎকণ্ঠা ছিল, এক্ষেত্রে উপন্যাস একরৈখিক গতিতে এগিয়েছে। অপর্ণার মৃত্যুর পর অপু ও শিশু কাজলের সম্পর্ক কোন্ পথে গড়ায় তা নিয়েও আমাদের চাপা উৎকণ্ঠা ছিল। সর্বজয়ার মৃত্যু অপুকে কোন্ পথে নিয়ে যাবে, তা

নিয়েও আমরা উদ্‌গ্রীব ছিলাম। একের পর এক ঘটনাগুলি এসেছে আর অপুর জীবনের মোড় ঘুরে গেছে। অনিলের সঙ্গে অপুর সম্পর্ক, প্রণবের সঙ্গে অপুর সম্পর্ক, হেমলতার সঙ্গে অপুর সম্পর্কগুলির মধ্যেও আকস্মিকতা ও রোমাঞ্চ ছিল। অন্যদিকে, উপন্যাসে যে অসংখ্য চরিত্র তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কার্যকলাপে অপুর জীবন জড়িয়ে যাওয়ায় আমরা বেশ কয়েকবার ভেবেছি অপুর অধঃপতন হচ্ছে, সে তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে, যে জীবন সে বেছে নিচ্ছে সে জীবনের তার প্রবেশ করার কথা নয়। আমরা যেকোনো উপন্যাসকে তার অংশবিশেষ দিয়ে বিচার করতে পারি না, তার সামগ্রিকতা দিয়ে বিচার করি। কিন্তু একটা নন-ফিকশন বা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী তার অংশবিশেষ তুলে নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারি। কোনো উপন্যাসের ক্ষেত্রে আবার সমগ্র পাঠকৃতিটিই পাঠ করতে হয়। বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' উপন্যাসের নতুনত্ব, প্রকৃতি ও মানুষ—এই দুটি বিষয়ের উপর তিনি ইকো মানবতাবাদ বা নিসর্গ-মানবতাবাদকে সামনে এনেছেন। 'অপরাজিত' উপন্যাসে শুধু শিশু ও কিশোর মনের অন্তর্জগৎ নয়, প্রকৃতির রহস্যময় অন্তর্জগৎ বা আমাদের অদেখা অলৌকিক জগৎ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এই উপন্যাস জীবনকে বেঁধেছে হাজার হাজার বছরের পরিধিতে। তাই ইতিহাস বা অবচেতন মনের জগতে আমরা মুহূর্তে পৌঁছে যেতে পারি বিভূতিভূষণের অপু চরিত্রে প্রবেশ করে।

বিভূতিভূষণের 'দৃষ্টি-প্রদীপ' : পাঠ প্রতিক্রিয়া

কিরণশঙ্কর মৈত্র

।। এক ।।

বিভূতিভূষণের (১৮৯৪-১৯৫০) 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯) ও 'অপরাজিত' (১৯৩২) একই সঙ্গে পরপর পঠিতব্য অপুর কল্পনাপ্রবণ, অধ্যাত্মদৃষ্টি-সম্পন্ন জীবনের ক্রমাভিব্যক্তিরূপে। অপুর মতো জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গরূপে চিত্রিত চরিত্র বাংলা কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা উপন্যাসের শ্রদ্ধেয় আলোচক বলেছেন—

> বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা 'দৃষ্টি-প্রদীপ' (১৯৩৫) ঠিক তাঁহার পূর্ব গ্রন্থের উৎকর্ষ রক্ষা করিতে পারে নাই। ইহার নায়ক জিতুর মধ্যে অপুর আকর্ষণী শক্তি ও প্রাণময়তা নাই। জিতুর বাল্যজীবনের মোহ এত নিবিড় নহে— দার্জিলিং এর শৈলশ্রেণী ও চা-বাগানের দৃশ্যে বিদেশের চোখ-ঝলসানো একটা তীব্র দ্যুতি আছে। নিশ্চিন্তপুরের চির পরিচিত শ্যামলতার স্নিগ্ধ সরস গভীর আবেদন নাই।[১]

অগ্রজ আলোচক অপুর সঙ্গে জিতুর বৈসাদৃশ্য, পটভূমির বৈচিত্র্য এবং চরিত্রায়ণের বিভিন্নতার কথা উল্লেখ করেছেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই যে প্রশ্নটি উদ্যত হয় সেটি হল—পাঠক কি দ্বিতীয় উপন্যাস 'দৃষ্টি-প্রদীপ'-এ জিতুর মধ্যে অপুর ন্যায় নিশ্চিন্দিপুরের অনুরূপ আরেকটি আখ্যান আশা করেছিলেন? স্বাভাবিকভাবেই শক্তিমান কথাসাহিত্যিক পটভূমিসহ চরিত্রগুলিতে বিভিন্নতা সৃষ্টি করেছেন।

গ্রন্থের সূচনাতেই জিতু খুব কম কথার মধ্যে তার, তার দাদা, ছোটোবোন সীতার, মা, বাবা এবং তাদের অবস্থার সামগ্রিক রূপটি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে—

> জ্যাঠামশায়দের রান্নাঘরে খেতে বসেছিলাম আমি আর দাদা। ছোটো কাকীমা ডাল দিয়ে গেলেন। একটু পরে কি একটা চচ্চড়িও নিয়ে এলেন। শুধু তাই দিয়ে খেয়ে আমরা দুজনে ভাত প্রায় শেষ করে এনেছি এমন সময় ছোটো কাকীমা আবার এলেন। দাদা হঠাৎ জিজ্ঞেসা করলে—কাকীমা, আজ মাছ ছিল যে, মাছ কই?
>
> আমি অবাক হয়ে দাদার মুখের দিকে চাইলাম, লজ্জা ও অশ্বস্তিতে আমার

> মুখ রাঙা হয়ে উঠল। দাদা যেন কি! এমন বোকা ছেলে যদি কখনো দেখে থাকি। আমার অনুমানই ঠিক হল, কাকীমা একটু অপ্রতিভের সুরে বললেন—মাছ যা ছিল, আগেই উঠে গেছে বাবা, ওই দিয়ে খেয়ে নাও। আর একটু ডাল নিয়ে আসবো?

জিতুর জবানিতে আমরা কাহিনিকে অনুসরণ করব, জেনে যাব তাদের পরিবারের কথা, তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও ঘটনার পরম্পরা।

ছোটোবোন 'সীতা এ-সব বিষয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।' 'সে রোগা, ফর্সা, ছিপছিপে। সে ও দাদা খুব ফর্সা, তবে অত ছিপছিপে আর কেউ নয়।'

মায়ের প্রসঙ্গে জিতু ভাবে—

> মায়ের দুঃখও এ বাড়িতে কম নয়। অত খাটুনির অভ্যেস মায়ের ছিল না কোনো কালে। এই শীতকালে মাকে গোছা গোছা বাসন নিয়ে ভোরে পুকুরের জলে নামতে হয়, মা'কে আর সীতাকে। খিড়কি পুকুরের জল সকালে থাকে ঠান্ডা বরফ, রোদ তো পড়ে না জলে কোনকালেই, চারিধারে বড়ো বড়ো আম আর সুপুরির বাগান। এতটুকু রোদ আসে না ঘাটে, সেই কনকনে হিমজলে বসে বাসন মাজা, যেমন তেমন করে মাজলে তো এ বাড়িতে চলবে না, কোথাও দাগ থাকবার জো নেই একটু, জ্যাঠাইমা দেখে নেবেন নিজে। সে যে কি কষ্ট হয় মায়ের, মা মুখ বুজে কাজ করে যান, বলেন না কিছু, আমি তো বুঝতে পারি। ও-সব কাজ কি মা করেছেন কখনো?

জিতুর বাবা সম্বন্ধে জ্যাঠাইমার মন্তব্য—'পয়সা রোজগার করেচে আর দু'হাতে উড়িয়েচে তোর বাবা—মদ খেয়ে—খিরিস্টানি কোরে—'

বাবা সম্বন্ধে জিতুর অভিজ্ঞতা—

> বাবা অত্যন্ত মদ খান—এবং যেদিন খুব বেশী ক'রে খেয়ে আসেন, সেদিন আমাদের বাংলো ছেড়ে পালাতে হয়। নইলে সবাইকে অত্যন্ত মারধোর করেন। সে সময়ে তাঁকে আমরা যমের মতো ভয় করি—এক সীতা ছাড়া। সীতা আমাদের মতো পালায় না—চা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে চায় না। সে বাংলোতে থাকে, বলে—মারবে বাবা?... না হয় মরে যাবো—তা কি হবে? রোজ এরকম ছুটোছুটি করার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। বাবার এই ব্যাপারের জন্যে আমাদের সংসারে শান্তি নেই—অথচ বাবা যখন প্রকৃতিস্থ থাকেন, তখন তাঁর মত মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার, এত শান্ত মেজাজ। যখন যা চাই এনে দেন, কাছে ডেকে আদর করেন, নিয়ে খেলা করেন, বেড়াতে যান, কিন্তু মদ খেলেই একেবারে বদলে গিয়ে অন্য মূর্তি ধরেন, তখন বাংলো থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর আমাদের অন্য উপায় থাকে না।

জিতুদের বাংলোর অনতিদূরে 'পচাং চা-বাগানের কেরানিবাবু ছিলেন বাঙালি।' তাঁর

স্ত্রীকে জিতুরা মাসীমা বলে ডাকত, একদিন তাদের কাছে গিয়ে পাকদণ্ডীর পাহাড়ী পথে ফিরতে জিতুদের অনেক দেরী হয়—

> রাত প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় বাগানে ফিরে এসে দেখি হৈ হৈ কাণ্ড। বাবা বাসায় নেই। তিনি সেদিন খুব মদ খেয়েছিলেন, ফেরেননি, তার ওপরে আমরাও ফিরিনি, মা পচাঙে লোক পাঠিয়েছিলেন, সে লোক ফিরে এসে বলেছে ছেলেমেয়েরা তো সন্ধ্যের আগেই সেখান থেকে রওনা হয়েছে! এদিকে নাকি খুব ঝড় হয়ে গিয়েছে, আমরা আরও উঁচুতে থাকবার জন্যে ঝড় পাইনি—নীচে নাকি অনেক গাছপালা ভেঙে পড়েছে। এই সব ব্যাপারে মা ব্যস্ত হয়ে সাহেবের বাংলোয় খবর পাঠান— ছোটো সাহেব চারিধারে আমাদের খুঁজতে লোক পাঠিয়েছে। মা এতক্ষণ কাঁদেননি, আমাদের দেখেই আমাদের জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন—সে এক ব্যাপার আর কি।
>
> কিন্তু পরদিন যে ঘটনা ঘটল তা আরও গুরুতর। পরদিন চা-বাগানে বাবার চাকরি গেল। কেন গেল তা জানি না। অনেক দিন থেকেই সাহেবরা নাকি বাবার ওপর সন্তুষ্ট ছিল না, সেল মাস্টার বাগান দেখতে এসে বাবার নামে কোম্পানির কাছে কয়েকবার রিপোর্টও করেছিল, বাবা মদ খেয়ে ইদানীং কাজকর্ম নাকি ভালো ক'রে করতে পারতেন না, এই সব জন্যে। আমরা যে-রাত্রে পথ হারিয়ে যাই, সে-রাত্রে বাবা মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে কুলী লাইনের কোথায় পড়েছিলেন—বড় সাহেব সেজন্যে ভারি বিরক্ত হয়।

মদ্যপ পিতার চাকরি-চ্যুতি, নতুন পরিবেশে গ্রাম্য জীবন-সূচনা ও যাপন—সব কিছুই জিতু সাধারণভাবে গ্রহণ করেছে। তার জীবনে বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু নেই বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ। জিতুর যৌবনে বা পরবর্তীকালেও এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এমনকি, কবি-প্রতিভাময়ী যুবতি মালতী ছিল তার প্রতি অনুরাগিনী, কিন্তু তরুণ বয়সেও তাকে নিজের জীবনে বরণ করবার জন্যে সে উদ্যোগী বা প্রয়াসী হয়নি—যা তার পক্ষে তখন স্বাভাবিক ছিল। অবশ্য মালতী-প্রেম ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালে সার্থকতা লাভ করেছে হিরন্ময়ীতে। যথাস্থানে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে।

।। দুই ।।

> আমাদের দেশের গ্রামে পৌঁছলাম পরদিন বেলা ন'টার সময়ে। বাবার মুখে শুনেছিলাম গ্রামের নাম আটঘরা, স্টেশন থেকে মাইল দুই আড়াই দূরে, জেলা চব্বিশ পরগনা। এত বাঙালী পরিবারের বাস একসঙ্গে দেখে মনে বড়ো আনন্দ হল। আমরা কখনো ফসলের ক্ষেত দেখিনি, বাবা চিনিয়ে দিলেন পাটের ক্ষেত কোন্‌টা, ধানের ক্ষেত কোন্‌টা। এ ধরণের সমতলভূমি আমরা দেখিনি কখনো—রেলে আসবার সময় মনের অভ্যাসে কেবলই ভাবছিলাম এই বড় মাঠটা ছাড়ালেই বুঝি পাহাড় আরম্ভ হবে। সেটা পার হয়ে গেলে মনে হচ্ছিল এইবার নিশ্চয়ই পাহাড়। কিন্তু পাহাড় তো কোথাও নেই, জমি উঁচু-নীচুও নয়, কি অদ্ভুত সমতল। যতদূর

> এলাম শিলিগুড়ি থেকে সবটা সমতল—ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, সবদিকে সমতল, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার।

তারপর জিতুদের 'বাড়িটা বেশ বড়ো, দোতলা, কিছু পুরনো ধরণের। বাড়ির পেছনে বাগান, ছোটো একটা পুকুর।' কিন্তু জিতু সবচেয়ে অবাক থাকবার ঘর দেখে—

> এত বড় বাড়িতে এ-ঘরটা ছাড়া তো আরো কত ঘর রয়েছে। নীচের একটা ঘর, ঘরের ছাদে মাটির নীচের কড়িকাঠ ঝুলে পড়েছে বলে খুঁটির ঠেকনো। কেন ওপরে দোতলায় তো কত ঘর, এত বড় বাড়ি তো। অন্য ঘরে জায়গা হবে না কেন? এই খারাপ ঘরটাতে আমরা থাকবো কেন?
>
> দেখলাম বাবা মা বিনা প্রতিবাদে সেই ঘরটাতেই আমাদের জিনিসপত্র তুললেন।

ঘটনাপ্রবাহের অগ্রগতিতে জিতু দেখেছে—বিনা প্রতিবাদে কতো সব অপ্রিয় বিষয় তাদের মেনে নিতে হয়েছে। কার্শিয়াং-এর পার্বত্যভূমির সংস্কার-মুক্ত পরিবেশ থেকে দেশের বাড়িতে এসে, চার মাসের মধ্যে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে জিতুরা তিন ভাই-বোন। দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাত তো ছিলই, তারা সত্যিই জানত না যে সংসারের মধ্যে এত সব খারাপ জিনিস আছে। মানুষ মানুষের প্রতি এত নিষ্ঠুর হতে পারে। যাদের কাছে জেঠিমা, কাকিমা, দিদি বলে হাসিমুখে ছুটে গিয়েছে, তারা সত্যিই এতটা হৃদয়হীন ব্যবহার করতে পারে। জিতুরা বুঝতেই পারত না কোথায়, কীভাবে তাদের অপরাধ ঘটে যাচ্ছে বা ঘটতে পারে—

> রাত্রে যে কাপড়খানা পরে শুয়ে থাকি, সেইখানা পরনে থাকলে সকালে যে আলনা ছুঁতে নেই, তার দরুন আলনাসুদ্ধ কাচা কাপড় সব নোংরা হয়ে যায় বা বাড়ির আশপাশের খানিকটা সুনির্দিষ্ট অংশ পবিত্র, কিন্তু সীমানা পেরিয়ে গেলেই হাত-পা না ধুয়ে বা গঙ্গাজল মাথায় না দিয়ে ঘরদোরে ঢুকতে নেই।

দিনে দিনে জিতুরা কঠোরতম দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছে—সংসারের কষ্ট, মেয়ের বিয়ের ভাবনা, পরের বাড়িতে থাকার অসহ্য যন্ত্রণা ও পীড়ন—এই সব দিনরাত ভেবে ভেবে তার বাবার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে এবং তাকে বাড়ির লোকেরাই পরামর্শ করে 'আড়াগাঁয়ে জলার ধারে' ছেড়ে দিয়ে এসেছে। কিন্তু তিন দিনের দিন কাদামাখা, ধুলোমাখা অতি বিকট চেহারায় আবার বাড়ি এসে হাজির। এর দিন পনেরো পরেই তার মৃত্যু হল। মৃত্যুর পরে দাহ করার লোক জোটেনি। ও পাড়ার যণ্ডা মতো কয়েকজন লোক এসে শেষের কাজ করেছে।

তিন বছর পরে জিতুর দাদা ষষ্ঠীতলায় বটগাছের নীচে মুদি দোকান করেছিল—সামান্য পুঁজি, আড়াই সের চিনি, পাঁচ সের ডাল, পাঁচ সের আটা, পাঁচ পোয়া

ঝাল-মশলা— এই নিয়ে দোকান, কিন্তু দোকান চলেনি। জিতুর দাদা ছেলেমানুষ, ঘোরপ্যাঁচ কিছু বোঝে না, একদিক থেকে সব ধারে বিক্রি করেছে, যে ধারে নিয়েছে সে আর ফিরে দোকানের পথ মাড়ায়নি। চতুর্থ অধ্যায়ের সূচনায় দেখি জিতু, সীতা এবং সেজ কাকার ছেলে পুলিন সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরঘরে আরতি দেখতে গেছে। এখানেই, আগেও মাঝে মাঝে যেমন ঘটেছে, জিতুর দৃষ্টিপ্রদীপে অলৌকিক দৃশ্যের উদ্ভাসন ঘটেছে, জিতুর মনে হয়েছে এ দালানে শুধু তারা ক'জন উপস্থিত নেই, আরও অনেক লোক উপস্থিত আছে। তাদের দেখা যাচ্ছে না, তারা সবাই অদৃশ্য, জিতুর গা ঘুরতে লাগল, আর কানের পেছনে মাথার মধ্যে একটা জায়গায় যেন কতকগুলো পিঁপড়ে বাসা ভেঙে বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেল। এটা জিতুর চেনা-জানা, বহু পরিচিত লক্ষণ, অদৃশ্য কিছু দেখবার আগেকার অবস্থা—চা-বাগানে এরকম কতোবার হয়েছে। তার শরীরের মধ্যে কেমন একটা অশান্তি—জ্বর আসবার আগে লোক বুঝতে পারে এইবার জ্বর আসবে, এও ঠিক তেমনি। জিতু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, ধীরে ধীরে পূজার দালানের তিনধারের দেওয়াল তার সামনে থেকে অনেক দূরে—অনেক দূরে সরে যেতে লাগল...কাঁসর ঘড়ির আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এলো...কতকগুলি বেগুনি ও রাঙা রঙের আলোর চাকা যেন একটা আর একটার পেছনে তাড়া করছে...সারি সারি বেগুনি ও রাঙা আলোর চাকার খুব লম্বা সারি তার চোখের সামনে দিয়ে খেলে যাচ্ছে—তারপর তার বাঁয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা বড়ো নদী, ওপারেও সুন্দর গাছপালা, নীল আকাশ—এপারেও অনেক ঝোপ বন—কিন্তু যেন মনে হল সব জিনিসটা সে ঝাড়লণ্ঠনের তেকোনা কাচ দিয়ে দেখছে—নানা রঙের গাছপালা ও নদীর জলের ঢেউয়ের নানা রং—ওপারটায় লোকজনে ভরা, মেয়েও আছে, পুরুষও আছে—গাছ-পালার মধ্যে দিয়ে একটা মন্দিরের সরু চূড়া ঠেলে আকাশে উঠেছে...আর ফুল যে কতো রঙের আর কতো চমৎকার তা মুখে বলতে পারা যায় না, গাছের সারা গুঁড়ি ভরে যেন রঙিন ও উজ্জ্বল থোকা থোকা ফুল...হঠাৎ সেই নদীর একপাশে জলের ওপর, ভাসমান অবস্থায় এই ঠাকুরঘরটা একটু একটু ফুটে উঠল; তার চারিদিকে নদী, কড়িকাঠের কাছে কাছে সে নদীর ধারের ডাল তার থোকা থোকা ফুলসুদ্ধ হাওয়ায় দুলছে...ওদের সেই দেশটা যেন এই ঠাকুরঘরের চারিপাশ ঘিরে, মধ্যে, ওপরে, নীচে, ডাইনে, বাঁয়ে—জিতুর মন আনন্দে ভরে গেল,...তার কান্না আসতে চাইল...সে যেন কোন্ ঠাকুরের ওপর ভক্তিতে।

কিন্তু জিতুর এই ঘোর কেটে গেল একটা চেঁচামেচির শব্দে, তাকে সবাই মিলে ঠেলছে। সীতা তার ডান হাত জোর করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে—কিন্তু পুরুত ঠাকুর ও পুলিন রেগে তাকে বকুনি লাগাচ্ছে। জিতু সচেতন হয়ে দেখে সে ভোগের

লুচির থালার খুব কাছে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কোঁচা লুটোচ্ছে উঁচু করে সাজানো ফুলকো লুচির ওপরে। পুরুতঠাকুর তার গালে চার-পাঁচটা চড় কষিয়ে দিলেন, মেজকাকা এসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বল্‌লেন। জ্যাঠাইমা এসে নরু-পুলিনদের ওপর আগুন হয়ে বলতে লাগলেন— সবাই জানে জিতু পাগল, তার মাথার রোগ আছে, তাকে তারা কেন ঠাকুরদালানে নিয়ে গিয়েছিল আরতির সময়ে।

মেজকাকার মারের ভয়ে বেচারা জিতু অন্ধকারে একা একা খিড়কি পুকুরের মাদারতলায় পালিয়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকল। ভয়ে তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। সে জানে না—কেন তার এমন হয়। সে তো ইচ্ছে করে ঠাকুরের ভোগ ছুঁয়ে দেয়নি। কিন্তু কেউ তা বুঝল না।

জিতু তো হিন্দু দেব-দেবীদের জানে না, সে-শিক্ষা আজন্ম কেউ তাদের দেয়নি। মিশনারি মেমদের কাছে জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত যা শিখেছে, সেই শিক্ষা অনুসারে, অন্ধকারে, মাদার গাছের গুঁড়ির কাছে মাটির উপরে হাঁটু গেড়ে, হাতজোড় করে মনে মনে বলল—'হে প্রভু যীশু, সে সদাপ্রভু, তুমি জান আমি নির্দোষ, আমি ইচ্ছে করে করিনি কিছু, তুমি আমার এই রোগ সারিয়ে দাও, আমার যেন এ-রকম আর কখনও না হয়। তোমার জয় হোক, তোমার রাজত্ব আসুক, আমেন্—'

উপন্যাসের এই অংশে 'দৃষ্টি-প্রদীপ'-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য—জিতুর অলৌকিক দৃশ্য অবলোকন, তার চরিত্রের সারল্য, যীশুর প্রতি আজন্ম লালিত ভক্তি, জিতুর প্রতিবাদহীন আত্মসমর্পন, সর্বোপরি অব্যাহত দারিদ্র্যের ক্রম-প্রসারণ এবং সেই সঙ্গে এর মধ্যে প্রতীয়মান নির্মম সাহিত্যের নিস্পৃহ-স্বভাবও।

॥ তিন ॥

জিতুর একটি গুণ—সে মুখে মুখে বানিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে। আপন মনে কখনও বাড়ির কর্তার মতো কথা বলে, কখনও চাকরের মতো। তখন তার কথা শুনে জেঠিমা, কাকিমা, দিদি—সব মেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

তার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য—আধ্যাত্মিকতার দিকে তার আত্মার আন্তরিক আকর্ষণ। জিতুর জীবনের বাঁকে বাঁকে তার পরিচয়। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের অনেক দৃশ্য আগাম তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার ছোটো কাকার মেয়ে পানী অসুখে পড়ল, সতেরো দিন ধরে জ্বর চলছে, ভালো হচ্ছে না, একদিন সন্ধ্যার সময়ে সে দেখে— পানীর শিয়রে এক মহিলা বসে আছেন, পরে সে জেনেছে—তিনি পানীর দিদিমা, পানীর মা নির্মলার জননী, যিনি মারা গেছেন, ইহ জগতে নেই। তিনি বসে আছেন, লাল শাড়ি পরনে, আধঘোমটা দেওয়া। তিনি মুখ তুলে জিতুর

দিকে তাকিয়ে বল্লেন—'জিতু, নির্মলাকে বোলো পানীকে আমি নিয়ে যাব, আমি ওকে ফেলে থাকতে পারবো না—ও আমার কাছে ভালো থাকবে, নির্মলা যেন দুঃখ না করে।'

অথচ জিতু জানতই না—ছোটো কাকিমার নাম নির্মলা। আর নির্মলা-জননীকে সে কোনোদিন দেখেইনি। তিনি বিছানায় বসেছিলেন, জিতুকে বললেন—'জিতু নির্মলাকে বলো এইবার আমি চলে যাচ্ছি।' কিছু না ভেবে জিতু কলের পুতুলের মতো বলল—'নির্মলা কে?' ছোটোকাকিমা তার দিকে কটমট করে চেয়ে বল্‌লে—'কেন, সে খোঁজে কি দরকার?'

এরপর জ্যাঠাইমা ঘরে এলেন, বললেন—'কি বলছিলি কাকীমার নাম করে?'

জবাব দেবার অবস্থায় সে ছিল না, মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ল সে। সবাই ভাবল তার মৃগীরোগ আছে, তার মাথার ঠিক নেই।

এরপরে, কলকাতায় মেজবাবুর সেরেস্তায় যখন সে কাজ করে, তখন অন্দরের দরজার কাছে একদিন সে দেখতে পায় কাদের একটি ছোট্ট খোকা, খুবই ছোটো। বছর দুই বয়স হবে, দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বাড়িতে কোনো শিশুই ছিল না। অথচ জিতু দেখল—অন্দরের দরজা খুলে মেজবাবুর স্ত্রী (তাকে অনেকবার মোটরে উঠতে নামতে দেখেছে জিতু) বার হয়ে এলেন এবং খোকাকে কোলে তুলে নিলেন। কিন্তু বাড়িতে কোনো শিশুই ছিল না। মেজবাবু তার এই অ-স্বাভাবিক দর্শনের কথা জেনে খুবই বিরক্ত হলেন। জিতু জানত না—মেজবাবুর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। সন্ধ্যার পর থেকে পাশ-করা ধাত্রী এসে বসে আছে। শেষরাতে তিনি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। এবং এই রকম ঘটনা জিতুর জীবনে আরো কয়েকবার ঘটেছে।

যে নির্মম-নিস্পৃহতার কথা একটু আগে উল্লেখ করেছি তা সীতার জীবনে মর্মন্তুদভাবে প্রতিভাসিত। সীতা দেখতে ভালো, শৌখিন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সর্বদা ঘষে মেজে, খোঁপাটি বেঁধে, টিপটি পরে বেড়ানো তার স্বভাব। তার খুব বুদ্ধি, বই পড়তে ভালোবাসে। সাবান তার প্রিয়। কার্শিয়াং-এর মিশনারি মেমেরা ওর খুব প্রশংসা করতো। খুব ভালোবাসতেন মিস নর্টন যার কাছে শিখেছিল উল বোনা।

সেই সীতার জন্যে পাত্র ঠিক করেছেন জিতুর জ্যাঠামশাই—পাত্রের বাপ তার কাছে এসেছিল, জমিজমা আছে, চাষা-গেরস্ত। খেতে-পরতে কষ্ট পাবে না। পাত্রটি চাষবাস দেখে, রং একটু কালো। লেখাপড়া ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েছে। পাত্রটির প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গেছে, সে-পক্ষের একটি ছেলেও আছে। এই দোজবরে, অশিক্ষিত, একদম গ্রাম্য পাত্রের সঙ্গে সীতার বিয়ে দিতে জিতু সায় দিতে পারেনি। কিন্তু জ্যাঠামশাই তার কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না—সীতার বিয়ে দিতে টাকাপয়সা চাই যা জিতুদের নেই। পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ে গ্রামে সমাজের মধ্যে বাস করতে গেলে তাকে আর ঘরে রাখা চলে না। তাছাড়া জ্যাঠামশাই কথা

দিয়ে ফেলেছেন, তার কথার মূল্য আছে।

রাত্রে বসে জিতু ও নবীন মহুরি হিসেব মেলাচ্ছে দেনা-পাওনার, জ্যোৎস্না রাত, বেশ শীত রাতে এমন সময় হঠাৎ কি হলো জিতুর—দেখতে দেখতে নবীন মুহুরি, মেলার আটচালা ঘর সব তার সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। সে যেন এক বিবাহ সভায় উপস্থিত হয়েছে। অবাক হয়ে চেয়ে দেখে—সীতার বিবাহসভা। জ্যাঠামশায় কন্যাসম্প্রদান করতে বসেছেন। বেশি লোকজন নেই। বরযাত্রীও বেশি নয়। জিতু তার দাদাকেও দেখতে পেল—বসে ময়দা ঠাসছে। আরও সব কি কি... ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে যেন সে সবটা দেখছে—খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট।

চমক ভাঙলে জিতু দেখে—নবীন মুহুরি তার মাথায় জল দিচ্ছে, জিজ্ঞেস করছে—'কি হয়েছে তোমার? মাঝে মাঝে ফিট হয় নাকি?'

সে নবীন মুহুরিকে বলে—'আমার শরীর ভালো নেই। ছুটি দাও আমাকে, একটু শোব।'

পরদিন বড়বাবুর চাকর কলকাতা থেকে এলো। জিতুর মায়ের একখানা চিঠি কলকাতার ঠিকানায় এসে পড়ে ছিল, তার মায়ের জবানি—আসলে জ্যাঠামশায়ের লেখা। ২রা অগ্রহায়ণ সীতার বিয়ে, সেই জ্যাঠামশাইয়ের ঠিক করা পত্রের সঙ্গেই। তিনি কথা দিয়েচেন, কথা খোয়াতে পারেন না। বিশেষ অত বড়ো মেয়ে ঘরে রেখে পাঁচজনের কথা সহ্য করতে প্রস্তুত নন।

বেচারি সীতা। জিতুর মনে পড়ে, ওর সাবান মাখা, চুল বাঁধা, বই পড়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস। তার মনে হয় সীতার ঘন কালো চুলের সিঁতিপাটি ব্যর্থ হয়ে গেল— ওর শুভ্র, নিষ্পাপ জীবন নিয়ে সবাই ছিনিমিনি খেললে।

॥ চার॥

মেজবাবুর কাছে জিতুর আর চাকরি করা হলো না, জিতুর অলৌকিক দর্শন-শক্তিকে তিনি কৌতুক ও বিদ্রূপ মিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখতেন—বললেন 'তোমার মাথা ভালো না।... এরকম লোক দিয়ে আমার কাজ চলবে না। স্টেটের কাজ তো ছেলেখেলা নয়।'

কয়েকদিন পরে জিতু তার দাদার চিঠি পেল। তার দাদা যেখানে কাজ করে, সেখানে এক গরীব ব্রাহ্মণের একটি মাত্র মেয়ে ছিল। ওখানকার সবাই মিলে ধরে পড়ে মেয়েটির সঙ্গে তার দাদার বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। দাদা তাকে যেতে লিখেছে।

জিতু চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার থাকা-খাওয়ার ঠিক নেই। এক গ্রাম্য ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সরি ঘরের বেঞ্চিতে শুয়ে সে বিশ্রাম করছিল। ডাক্তারবাবু ধর্মকথা শুনতে ও বলতে ভালোবাসতেন। বেঞ্চিতে শুয়ে জিতুর তন্দ্রামতো এলো। তন্দ্রাঘোরে তার মনে হলো—সে একটা ছোট্ট ঘরের কুলুঙ্গি থেকে বেদানা ভেঙে কার হাতে দিচ্ছে। যার হাতে দিচ্ছে সে তার রোগজীর্ণ হাতে অতিকষ্টে একটু করে

তুলে বেদানা নিচ্ছে। জিতু তাকে ভালো দেখতে পাচ্ছে না। ঘরটার মধ্যে ধোঁয়া ধোঁয়া কুয়াশা, বারকতক এই রকম বেদানা দেওয়া নেওয়ার পরে, তার মনে হলো রোগীর মুখ আর তার মায়ের মুখ এক। তন্দ্রা ভেঙে যাবার পরে তার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল এবং সেই দিনই সেখান থেকে আঠারো মাইল হেঁটে, পরদিন দশটায় কলকাতা পৌঁছাল। তার মনে হলো—তার মা অসুস্থ। তাকে তাদের গ্রাম আটঘরায় যেতেই হবে।

শেয়ালদা স্টেশনে আঙুর কিনবার সময়ে তার দেখা হয় শ্রীরামপুরের ছোটো বৌঠাকুরণের সঙ্গে। তিনি তার মেজদার সঙ্গে শ্রীরামপুরে যাচ্ছেন।

সন্ধ্যার সময়ে আটঘরা পৌঁছে জিতু দেখে—সত্যিই তার মায়ের অসুখ। তার অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হতে থাকে। রাত কেটে যাবার পরে সকালে তিনি আর জিতুকে চিনতে পারছেন না। ভুল বকতে থাকেন। সারাদিন কেটে যায়।

সন্ধ্যার সময় একটা মিটমিটে টেমি জ্বলছে ঘরের মেঝেতে, জিতু একা বসে আছে মায়ের শিয়রে। এমন সময় আলুথালু বেশে শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটোতে লুটোতে সীতা ঘরে ঢোকে। সে বলে—এখানকার হরি ডাক্তারকে দিয়ে হবে না, ভালো ডাক্তার নিয়ে এসো। আমার বালাজোড়াটা দিচ্ছি। জিতু বালা জোড়া নিতে আপত্তি করছিল। এমন সময়ে সীতার স্বামী ঘরে ঢোকে। জিতু যেমন চেহারা কল্পনা করেছিল—লোকটা তার চেয়েও খারাপ। কালো তো বটেই, পেট মোটা, বোধহয় পিলে আছে, কাঠখোট্টা গড়ন, চোয়ালের হাড় উঁচু, গায়ে একটা ছেলেমানুষের ছিটের জামা, গায়ে রাঙা আলোয়ান, পায়ে কেম্বিসের জুতো। জিতুকে হেসে বললে—'এই যে, ছোটোবাবু না?' তার কথার ভঙ্গিতে একটা চাষাড়ে ভাব মাখানো।

শৈল দি, ছোটোকাকীমা এলেন। রাতে জ্যাঠাইমা এসে খানিকটা বসে রইলেন। সকাল বেলা আটটা-নটার পর থেকে জিতুর মায়ের অবস্থা খুব খারাপ হলো। বেলা দশটার পরে তার দাদা এলো, সঙ্গে বৌদিদি ও দাদার খোকা। বৌদিদিকে তার মনে হলো যেন বনে ফোটা শুভ্র কাঠ মল্লিকা ফুল, তুলে এনে তোড়া বেঁধে ফুলের দোকানে সাজিয়ে রাখবার জিনিস নয়।

বেলা তিনটেয় জিতুর মা মারা গেলন। তারা মায়ের কথা তেমন ভাবেনি। তাদের কাজকর্মে। উদ্যমে, আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, উচ্চাভিলাষে মায়ের কোনো স্থান ছিল না, সবাই মিলে মাকে উপেক্ষা করেছে—তিনি চলে গেলেন।

কিন্তু জিতুদের দুর্ভোগ তখনও শেষ হয়নি। তাকে সেজকাকা ডেকে বললেন—

> তোমার মায়ের কাজটা এখানে না করে অন্য জায়গায় গিয়ে করো। মানে তোমার দাদার বৌয়ের এখানে তো পাকস্পর্শ হয়নি, বড় দাদাও নেই বাড়ি এ-অবস্থায় শ্রাদ্ধের সময় কেউ খেতে আসবে না। তোমার দাদার বৌকে আমরা সেভাবে ঘরে তো নিইনি। এই বুঝে যা হয় ব্যবস্থা করো। বলো তোমার দাদাকে।

শেষপর্যন্ত গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন হলো।

এরপরে মাস পাঁচ-ছয় পরে ঘুরতে ঘুরতে জিতু যায় দাদার বাড়িতে। বৌদিকে তার খুব ভালো লাগে। সে সহজে খুশি হয়; খাটতে পারে ভূতের মতো। ঝি নেই, চাকর নেই, একা হাতে কচি ছেলে মানুষ করা থেকে শুরু করে ধান সেদ্ধ। কাপড়-কাচা, বাসন-মাজা-জল—তোলা সব কাজ মুখ বুজে করে যায়।

সপ্তাহ দুই দাদার সংসারে থেকে জিতু শেষপর্যন্ত কলকাতায় আসে। মাস দুই মেসে থেকে চাকরির চেষ্টা করে, কিন্তু সুবিধা করতে পারে না। শুরু হয় তার ভবঘুরে জীবন।

পথের ধারে দরিদ্র, সরল মানুষদের সঙ্গে গাছতলায় রাত্রিযাপন করে সে, জিতুর মনে হয়—

> এই সব বিজন শেষ প্রহরের জ্যোৎস্নাভরা রাত্রে মুখ উঁচু করে, চেয়ে থাকলে অনন্ত পথের যাত্রীদের দেখা যায়...ওপর আকাশের জ্যেৎস্নাভরা বায়ুস্তর তাদের গমন পথে পথ দেহগন্ধে সুরভিত হয়—পরের দুঃখে কোনো দয়ালু আত্মা যে চোখের জল ফেলে, নদী সমুদ্রে ঝিনুকের মধ্যে পড়লে তা মুক্তা হয়, বিল-বাঁওড়ের পদ্মফুলে পড়লে পদ্মমধু সৃষ্টি করে... আমার নিবে-যাওয়া দৃষ্টি-প্রদীপে আলো জ্বেলে দিতে যদি কেউ পারে তো সে ওরাই পারবে।

এর মধ্যে প্রকৃতি-প্রেমিক, অতি-লৌকিক জীবনে বিশ্বাসী বিভূতিভূষণের অবারিত প্রকাশ।

।। পাঁচ।।

সকালে ঐ পথ-সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জিতু পশ্চিমমুখে হাঁটে রাঢ় দেশের বড় বড়ো মাঠের ওপর দিয়ে, রাঙা বালি, দিগন্তে তালবনের সারি। হয়ত মাঠের মাঝে প্রাচীন কালের প্রকাণ্ড দীঘি, তালবনে ঘেরা ফাঁকা জায়গা। তার মনে হয়—

> যেন সীমাহারা দিকসমুদ্রে ভেলা ভাসিয়ে চলেছি, কোন্ অজ্ঞাত দিগন্তের বননীল উপকূলে গিয়ে ভিড়বো, কোনখানে তমালতরুনিকরে বনভূমি শ্যামায়মান, সেখানে গন্ধ-ভরা অন্ধকার বীথিপথ বেয়ে অভিসারিকারা চিরদিন পা টিপেটিপে হাঁটে, বৃন্দাবনের দিন ফুরিয়ে গেল, মহাভারতের যুগ কেটে গেল, যমুনার তটে কেলিকদম্বের ছায়া কালের অন্ধকারে লুকিয়েছে, তবুও ওদের ও যাওয়ার শেষ হবে না, আমারও না।

পরের দিন সন্ধ্যার সামান্য আগে জিতু ক্রোশ-চারেক দূরে দ্বারবাসিনী গ্রামে প্রসিদ্ধ আখড়াবাড়িতে আশ্রয় নেয়, এ-অঞ্চলে এর নাম লোচনদাসের আখড়া। শুরু হয় তার জীবনের একটি মাধুর্যময় অধ্যায়। সন্ধ্যার পরে, একটি তালপাতার চাটাইয়ে জিতু যখন একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণবের একতারা বাজানো ও গান শুনছে তখন তার সামনে উঠোনে একটি তরুণী এসে জিজ্ঞেস করলে—আপনি রাত্তিরে কি খাবেন, রাত্তিরে

কি ভাত খান?

আখড়াবাড়ির পরিচয় এবং মেয়েটির নানা রূপের কথা জিতুর জবানীতেই আমরা জানতে পারি। তৃতীয় দিন বিকেলে এসে মেয়েটি জিতুকে নিয়ে পুকুরপাড়ের বাগান দেখাতে নিয়ে যায়, অনেক গাছ সে চিনিয়ে দেয়, কাঞ্চন ফুলের গাছ যা আগে সে দেখেনি। এক কোণে একটা বড়ো তমাল গাছের তলায় ইটের একটা তুলসী মঞ্চ ও বেদী—যেখানে বসে মেয়েটির বাবা জপ করতেন। তিনি চার বছর হলো মারা গেছেন। পুকুরটা তিনি কাটিয়েছিলেন। এই বকুলগাছের ওপাশে বিষ্ণু মন্দির তুলেছিলেন, শেষ করে যেতে পারেননি। তার বাবার নাম ছিল কাশীশ্বর মুখার্জি, মরার সময়ে আখড়ার ভার লোচনদাসের হাতে দিয়ে যান। আখড়ার নামে যত ধানের জমি তার বাবার। তারপর মেয়েটি যখন বলে—বিষ্ণুমন্দির দেখবেন না? জিতু ভাবে—বিষ্ণুমন্দির তুচ্ছ, সে তার সঙ্গে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত সঙ্গে যেতে পারে।

এবং সেই মেয়েটি চমৎকার এবং দেখতে সুশ্রী বটে, তবে সুন্দরী নয়। তার সারা দেহে যৌবনশ্রী। তার মধ্যে কোনো মিথ্যে সঙ্কোচ নেই। কাজে ও কথায় সহজ সিধে ব্যবহার; সজীব ও দীপ্তিময়ী, যেন সঞ্চরিনী দীপশিখা।

মালতীর বাবা ছিলেন একবারে আপনভোলা, সদানন্দ, মুক্তপুরুষ। মালতীও বাপের স্বভাব পেয়েছে, আখড়ায় যারা আশ্রয় নেয়, তাদের অক্লান্তভাবে সে সেবা করে। দেখতে দেখতে এখানে জিতুর ছ-সাত মাস কেটে যায়। মালতীর সংসর্গে এখানে তার সময় কোথা দিয়ে কেটে যায় সে বুঝতে পারে না। আস্তে আস্তে মালতীর অনেক গুণ তার কাছে প্রকাশ পায়। মালতী অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থ পড়েছে। তারপর সে আবিষ্কার করে— সে বই লেখে। 'পাষণ্ড দলন' গ্রন্থের অনুকরণে সে কিছু সংস্কৃত শ্লোক লিখেছে। সংস্কৃত ভাষায় তার জ্ঞান আছে, সে ভাষাটি শিক্ষা করেছে।

'মালতী উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, সুশ্রী। যখন সে অদ্ভুত ভঙ্গীতে মুখ উঁচু করে হাসে তখন যে বিজায়িনী। তখন সে পুরুষের সমস্ত দেহ, আত্মাকে সুন্দরী মৎস্য নারীর মতো মুগ্ধ করে কুলের কাছাকাছি অগভীর জল থেকে টেনে বহুদূরের অথৈ জলে নিয়ে যেতে পারে'। কখনও জিতুর মনে হয়—

> মালতী সত্যিই সুন্দরী, অপূর্ব সুন্দরী' "ছোট্ট কোনো কল্পনা গ্রাম্য নদীতীরে খড়ের ঘরে মালতীকে নিয়ে ছোট্ট সংসার পাতবো...বসে বসে কত কথা বলব, কত আলোচনা করব। ওকে রাঁধবে দেব না, কাজ করতে দেব না, আমার কাছ থেকে উঠতে দেব না—

কিন্তু মালতী ওর বাপের আখড়া ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না, জিতুও পারবে

না ওকে বিবাহ করে এই রাঢ়-অঞ্চলের এক গ্রাম্য আখড়ায় চিরকাল বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী সেজে কাটাতে। তাই বিচ্ছেদ অনিবার্য। খুব ভোরে, আখড়ার কেউ তখনও বিছানা থেকে ওঠেনি, কাউকে কিছু না জানিয়ে, দ্বার বাসিনীর লোচনদাসের আখড়া ছেড়ে, জিতু বেরিয়ে পড়ে। তার মনে হয়—

> কোথায় যেন একজন পথিক আছেন, ঐ নীল আকাশ, ঐ রঙীন মেঘমালা, এই কলরব পূর্ণ জীবনধারার পেছনে তিনি চলেছেন... চলেছেন... কোথায় চলেছেন নিজেই হয়ত জানেন না। তাঁর কোন সঙ্গী নেই, তাঁকে কেউ বোঝে না, তাঁকে কেউ ভালোবাসে না। অনাদি অনন্তকাল ধরে তিনি একা একা পথ চলেছেন। এই দৃশ্যমান বিশ্ব, এদের সমস্ত সৌন্দর্য—তিনি আছেন বলেই আছে।

—এই অনুভব চিন্তনের মধ্যেই জিতুর মনোভঙ্গী-দর্শনের পরিচয়, সে জানে '...আমি হয়ত এ জন্মে তাঁকে বুঝবো না, হয়ত বহু জন্মেও বুঝবো না—এতেই আনন্দ পাব আমি, যদি তিনি আমার মনের বেদীতে হোমের আগুন কখনও নিবে যেতে না দেন, শাশ্বত যুগসমূহের মধ্যে, সুদীর্ঘ অনাগত কাল ব্যেপে। আমি চাই ওই নীল আকাশ, ওই সবুজ চর, কলনাদিনী গঙ্গা, দূরের নীহারিকাপুঞ্জ, মানুষের মনোরাজ্য। ওই হলদে ডানা-প্রজাপতি, এই শোভা, ওই আনন্দের মধ্যে দিয়ে তাঁকে পেতে'।

॥ ছয় ॥

জিতুর অন্তরাত্মা তাকে পথে বার করে নিয়ে আসে, সে যায় কাটারিয়া, বটেশ্বর নাথ পাহাড়ের দিকে, যে-সাধুজী রোজ সন্ধ্যাবেলা ধর্মকথা পড়েন, তাঁকে তার প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়—আপনি জীবনে কখনও ভালোবেসেছেন, প্রাণ ঢেলে ভালোবেসেছেন?

সে মালতীকে ভালোবেসেছে। মালতী তাকে ভালোবেসেছে। মালতীকে সে ভুলতে পারে না। মালতীর সঙ্গে আবার কি তার দেখা হবে? মালতীর স্মৃতি তাকে দিনে রাতে আচ্ছন্ন করে রাখে—'মালতী একটা মধুর স্বপ্নের মত, বেদনার মত, কত দিন কানে-শোনা গানের সুরের মতো মনে উদয় হয়।'

এক বছর পরে তার দাদার অসুখের চিঠি পেয়ে জিতু কলকাতা যায়। হাসপাতালে দাদার খাটের কাছে রাতে শুয়ে থাকে। ভোর হওয়ার আগে ঘুম ভেঙে যায়, দাদার বেডের দিকে তাকিয়ে সে বিস্মিত হয়ে যায়, সে কি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে? 'খাটের চারিপাশে অনেক লোক দাঁড়িয়ে। অর্ধচন্দ্রাকারে ওরা দাদার খাটটাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। শিয়রের কাছে মা, ডান দিকে বাবা, বাবার পাশেই আটঘরার সেই হীরু রায়—স্যালাইনের টিনটা যেখানে ঝোলানো, সেখানে দাঁড়িয়ে, আমাদের চা-বাগানের নেপালী চাকর থাপা, ছেলেবেলায় দাদাকে যে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিল।

তারপরেই আমার চোখ পড়ল খাটের বাঁ-দিকে, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোটো কাকীমার মেয়ে পানী। এদের মূর্তি এত সুস্পষ্ট ও বাস্তব যে একবার আমার মনে হল ওদের সকলেই দেখছে বোধ হয়। জিতু জানে 'এসব কথা লোককে বিশ্বাস করানো শক্ত। মানুষ চোখে যা দেখে না, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যা পারে না—তা বিশ্বাস করতে সহজে রাজি হয় না।'

হাসপাতালে দাদার মৃত্যু হলে তার সংসারের ভার জিতুকেই নিতে হয়—না হলে এতগুলি প্রাণী না খেয়ে মরবে। বৌদিদির মা-বাবাও কেউ নেই।

যে-লেখাপড়া জানে তাতে জিতুর কোথাও কাজ পাওয়া শক্ত। অবশেষে এক কুণ্ডু মশায়ের স্ত্রীর সুপারিশে বাতাসার কারখানাতে খাতা লেখার কাজ পায়। কিন্তু কয়েকমাস পরে কুণ্ডুমশাই মারা গেলে সেখানেও তার কাজ চলে যায়।

এরপরে তার বৌদিদি অসুখে পড়ে। জিতু খুব বিপদে পড়ে, দাদার বড়ো মেয়ের বয়স আট, আরেকটি ছোটো মেয়ে কোলে। স্তন্যদুগ্ধ তো বাচ্চা মেয়েটা পায়নি। জিতু গরুর দুধ জোগাড় করতে ব্যর্থ হয়। দুধের অভাবে আঙুল চুষে কচি শিশু ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর একদিন মারা যায়।

বৌদিদি সুস্থ হলে জিতু জ্বরে পড়ে। একচল্লিশ দিন পরে জ্বর ছেড়ে যায়। জ্বরের ঘোরে সে 'মালতী'কে অনেকবার ডেকেছে। সে বৌদিদিদের কালীগঞ্জ আপাতত রেখে এসে কামালপুরে গিয়ে পাঠশালা খোলে। পাঠশালায় অনেক ছেলে জুটল। কতকগুলি ছোটো মেয়েও এলো। যা আয় হয়, জিতুর সংসার চলে যায়। সময় তার মনের দাগ মুছে দেয় আস্তে আস্তে।

॥ সাত ॥

তার পাঠশালায় হিরণ্ময়ী নামে বছর চৌদ্দ-বয়সের একটি মেয়েও ভর্তি হয়েছে, কোথাকার আবাদের নয়েব কালীনাথ গাঙ্গুলির মেয়ে। মেয়েটি সকলের চেয়ে সজীব, বুদ্ধিমতী, অত্যন্ত চঞ্চলা, একটু উদ্ধত স্বভাবেরও। সকলের চেয়ে সে বয়সে বড়ো এবং সভ্য ও শৌখীন। পাঠশালার সকলের ওপর সে হুকুম ও প্রভুত্ব চালায়। অনিবার্যভাবে আস্তে আস্তে জিতু তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। হিরণ্ময়ীকে নতুন চোখে দেখে সে—'অত্যন্ত লাবণ্যময়ী, ওর চোখ দুটি অত্যন্ত ডাগর, টানা টানা জোড়া ভুরু দুটি কালো সরু রেখার মতো, কপালের গড়ন ভারী সুন্দর, চাঁচা, ছোট, অর্ধচন্দ্রাকৃতি। মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল।' একটি সরল সত্য তার মনে উদ্ভাসিত হয়—'পুরুষ মানুষ প্রেমের ব্যাপারে আত্মরক্ষা করে চলতে পারে না যেটা অনেক সময়ে মেয়েরা পারে।'

ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে যায়— হিরণ্ময়ীর মা আর বিধবা দিদিকে থানায়

ধরে নিয়ে যায়, কিন্তু তারা অচিরে খালাস পেয়ে যায় প্রমাণাভাবে। জিতু কালীগঞ্জে গিয়ে কিছুদিন থাকে, আবার কামালপুরে আসে, হিরণ্ময়ীকে দেখবার ইচ্ছেয়। সে দেখে—'হিরণ্ময়ীর তনুলতায় প্রথম যৌবনের মঞ্জরী দেখা দিয়েছে। হঠাৎ যেন বেড়ে উঠেছে এই দুমাসের মধ্যে।'

কামালপুরে দু'দিন থেকে জিনিসপত্র নিয়ে জিতু কালীগঞ্জে ফিরে আসে। এর কিছুদিন পরে হিরণ্ময়ীর বাবা কালীনাথ গাঙ্গুলি তার কাছে এলেন—একবার তাদের ওখানে যেতে হবে, হিরণ্ময়ী বিশেষ করে বলে দিয়েছে। জরুরি বিষয়—মেয়ের বিয়ে নিয়ে তিনি বড়ো বিপদে পড়েছেন। তিনি গরীব, গ্রামের সমাজে নানা দুর্নামে একঘরে। দু'তিন জায়গা থেকে মেয়ের সম্বন্ধ এসেছিল, নানা কানাঘুষো শুনে তারা পেছিয়ে গিয়েছে। মেয়েও বেজায় একগুঁয়ে, তাকে দেখতে আসছে শুনলেই সে বাড়ি থেকে পালায়। এত বড়ো মেয়ে, এখনও জ্ঞান-কাণ্ড হল না। তিনি খুব বিপদে পড়েছেন। জিতু যদি ব্রাহ্মণের এ-দায় উদ্ধার না করে তবে তিনি সম্পূর্ণ নিরুপায়। জিতুর কি মত?

হিরণ্ময়ীর সঙ্গে বিয়ের সময়ে জিতু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তার অনুভবে ভেসে উঠেছিল—

> সপ্তসমুদ্র পারের কোন্ দেশে অনেক দূরে এই সব সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে একটি হাস্যমুখী তন্বী কিশোরী প্রদীপ হাতে ভাঙা বিষ্ণু মন্দিরে সন্ধ্যা দেখাতে যেত কত যুগ আগে... পুকুরপাড়ের তমালবনের আড়ালে তার সঙ্গে সেই যে কত সুখ-দুঃখের কাহিনি, কত ঠাকুর-দেবতার কথা, সে সব সত্যি ঘটেছিল, না স্বপ্ন? কোথায় গেল সে মেয়েটি? আর তাকে তেমন করে তো চাই না? যেন কত দূর-জন্মে তার সঙ্গে সে পরিচয়ের দিনগুলো কালের কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে—তাকে যেন চিনি, চিনি, চিনি না। কেন তার স্মৃতিতে মন আর নেচে ওঠে না? কোথায় গেল সে-সব দিন, সে-সব প্রদীপ দেখানো সন্ধ্যা?

বছর খানেক পরে রানাঘাট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দ্বারবাসিনীর আখড়ার নরহরি বৈরাগীর সঙ্গে জিতুর দেখা হয়, তার কাছে সে জানতে পারে বছর চারেক আগে মালতী মারা গিয়েছে। এবং জিতুর প্রতিক্রিয়া—

> ভালই হয়েছে মালতী, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। সুন্দর জ্যোৎস্নারাতে পল্লী প্রান্তের বনে খরাচলতায় ফুল ফোটে, সুবাসে পথচারীর মন আনন্দে ভরিয়ে তোলে কিন্তু কতদিন তার আয়ু? জ্যোৎস্না লুকিয়ে যখন আঁধার পক্ষ নামে, তখন বনফুল ঝরে যায়, পুষ্পসুরভি হিমের রাত্রির ঘন কুয়াশায় চাপা পড়ে নয়ত অকাল বর্ষার বারিধারায় মুছে যায়। মানুষের অনেক সেবা তুমি করেছিলে, মানুষের মনে তোমার রূপ ভগবান ম্লান হতে দিলেন না। ফুলের সুবাস চলে গেলে বনলতা

পাছে অনাদৃত হয়। তোমার বেলা ভগবান তা সহ্য করবেন না।

আদ্যন্ত 'দৃষ্টি-প্রদীপ' এর কাহিনি জিতুর জবানীতে অভিব্যক্ত। কাহিনি সমাপ্তিতে সে বলেছে—

> আমার সে অল্প বয়সের ভবঘুরে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ পলেছে অনেকদিন। তবু সে-সব দিনের ছন্নছাড়া মুহূর্তগুলোর জন্যে এখনও মাঝে মাঝে সব কেমন করে ওঠে, যদিও এখন বুঝেছি হারানো-বসন্তের জন্যে আক্ষেপ করে কোনো লাভ নেই। মহাকালের বীথিপথ অনাগত দিনের শত বসন্তের পাখির কাকলীতে মুখর, যা পেলুম তাই সত্য, আবার পাব, আবার ফুরিয়ে যাবে...তার চলমান রূপের মধ্যেই তার সার্থকতা।

সাবলীল ভঙ্গীতে কাহিনি এগিয়ে গেছে, মাঝে মাঝে কাব্য-ব্যঞ্জনাময় ভাষায় প্রকৃতিপ্রেমের অভিব্যক্তি ঘটেছে। স্বাভাবিক সহজ সরল ঘটনারাজির মধ্যে শুধু উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত জিতুর দৃষ্টি-প্রদীপে প্রতিভাত অলৌকিক দৃশ্যাবলী। আসন্ন অনাগত ঘটনার প্রতিভাস, জিতুর আধ্যাত্মিকতার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ। কোনো ঘটনার নাটকীয়তা বা অস্বাভাবিকতা নেই। সহসা কোনো শুভ ঘটনায় যে সানন্দ-বিস্ময় থাকে—জিতুর জীবন-প্রবাহে তা অনুপস্থিত। বরং তার জীবনে অব্যাহত দারিদ্র্যের যন্ত্রণাময় স্রোতধারা।

পরিশেষে, শ্রদ্ধেয় অগ্রজ আলোচক 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিতে'র তুলনায় 'হীনপ্রভ' বিবেচনা করলেও, 'দৃষ্টি-প্রদীপে'র জীবন ও প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে সরসতার' প্রশংসা করেছেন—

> দার্জিলিং-এ চা-বাগানের জীবন-যাত্রা, দশঘরার জ্যাঠাইমার উদ্ধত ধনগর্ব ও শুচিতার অহঙ্কার ও তাহার মায়ের দীন নম্রতা, বটতলার মেলার অশিক্ষিত নিমচাঁদের মূঢ় ভক্তি-বিহ্বলতা প্রভৃতি দৃশ্যের বর্ণনা-ভঙ্গী উপভোগ্য-প্রকৃতি। বর্ণনার মধ্যে পূর্বপরিচিত অসীমের সুর ও গভীর ঐকান্তিকতা ধ্বনিত হইয়াছে। রাঢ়ের তারকা খচিত নীলাকাশের তলে অতিবাহিত রাত্রি, দ্বারবাসিনীর মঠে প্রেমের বিহ্বলতা-ভরা বিনিদ্র জ্যোৎস্না রজনী, কহল গাঁয়ের পাহাড়ের স্মৃতি বিধুর বিভিন্ন দৃশ্য, গরুর গাড়িতে যাত্রাকালে অরুণোদয়ে ও সন্ধ্যায় ভগবানের চিরপথিক মূর্তির পরিকল্পনা—এ সমস্ত দৃশ্যবর্ণনাই শিল্প-চাতুর্য্যে ও গভীর ভাবসঞ্চারে প্রশংসনীয়। যেকোনো শক্তিশালী লেখকের নিজস্ব রীতি, ধরন থাকে, 'দৃষ্টি-প্রদীপে' ও রয়েছে, বিভূতিভূষণ তো বিভূতিভূষণের মতোই লিখবেন।[২]

<u>উৎসের সন্ধানে</u>

১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা।
২. তদেব

‘চাঁদের পাহাড়’ : পাঠকের ব্যক্তিগত অনুভূতি

নন্দিতা ভট্টাচার্য

বাংলা সাহিত্যে যে অল্প সংখ্যক অ্যাডভেঞ্চার গল্প রয়েছে তার মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘চাঁদের পাহাড়’-এর একটি বিশেষ স্থান রয়েছে।

শংকর অজ গ্রামের ছেলে, এস.এফ. পাশ করে সে কোলকাতা থেকে বাড়িতে ফিরে এসেছে। তার বাবা অত্যন্ত অসুস্থ। সুতরাং সংসারের অভাব তার পড়াশুনায় ইতি টানল। মায়ের কথায় শঙ্কর চাকরির খোঁজ করতে লাগল। তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে পাঁচ বছর বাকি—১৯০৯ সালের কথা চাকরির বাজারে তখন এত মাথা ফাটাফাটি ছিল না। গ্রামের এক ভদ্রলোক পাটকলে চাকরি করতো। শঙ্করের মা তার স্ত্রীর কাছে শঙ্করের চাকরির জন্য উমেদারি করলেন। বিভূতিভূষণ লিখছেন—‘ভদ্রলোক পরদিন বাড়ি বয়ে বলতে এলেন যে শঙ্করের চাকরির জন্যে তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করবেন।’ এখানে তৎকালীন গ্রাম্য সমাজের একটি ছবি উঠে আসছে। সেই সমাজে প্রতিযোগিতা কম; পরস্পরের সুখে- দুঃখে পাশে দাঁড়ানো ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। উপন্যাসের শুরুতে দেখা যাচ্ছে যে শংকর এফ. এ. পাশ দিয়ে এসে গ্রামে বসেছে। কাজের মধ্যে সকালে বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দেওয়া, দুপুরে আহারান্তে লম্বা ঘুম, বিকেলে পালঘাটের বাঁওড়ে মাছ ধরতে যাওয়া।

নিরুত্তাপ জীবন। ক্যরিয়ারের জন্য হাঁকপাঁক নেই। জীবনে অবসর মুহূর্ত অফুরন্ত। কৈশোরের নির্ভেজাল আনন্দের উপভোগ আছে। বিশ্রাম আছে। পরীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সিন্দবাদের বুড়োর মতো পিঠ আঁকড়ে থাকা বইয়ের ব্যাগ নিয়ে পরের ক্লাসের জন্য প্রাইভেট টিউটরের বাড়িতে হাঁফাতে হাঁফাতে ছোটাছুটি নেই। বরং দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর লম্বা ঘুম দিয়ে পালঘাটের বাঁওড়ে মাছ ধরতে যাওয়ার মজা আছে।

এরকম একটা কেয়ার ফ্রি জীবনে শঙ্করকে তার মা যখন বললেন, বাবার শরীর ভালো নয়, একটা কাজের চেষ্টা দেখ, তখন সে একটু থতমত খেয়ে গেল। কোথায় গেলে চাকরি পাওয়া যাবে কেই-বা তাকে চাকরি দেবে? শংকর তার বাড়ির অসুবিধের কথা খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারছিল। তার সত্যি একটা

চাকরির দরকার। তখনই পাড়ার এক ভদ্রলোক বাড়ি বয়ে এসে বলে গেলেন শঙ্করের চাকরির জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

লেখক বলেছেন, শঙ্কর সাধারণ ছেলে নয়..., বরাবর খেলাধূলাতে সে প্রথম হয়ে এসেছে, ...ফুটবলে অমন সেন্টার ফরওয়ার্ড ওই অঞ্চলে কেউ ছিল না। সাঁতারের তার জুড়ি মেলা ভার। গাছে উঠতে, ঘোড়ায় চড়তে, বক্সিং-এ সে অত্যন্ত নিপুণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরীক্ষাতে সে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

পরীক্ষাতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলেও লেখক বললেন, সে সাধারণ নয়। কিন্তু এখনকার মধ্যবিত্ত সমাজে বা মধ্যবিত্ত গ্রামীণ সমাজে পরীক্ষায় প্রথম হতে না পারলে, ক্রিকেট খেলতে না জানলে কেউ অসাধারণ হয় না।

শঙ্করের আর একটি নেশা ছিল, সে ভূগোলের বই পড়তে ভালোবাসত। যত রাজ্যের ম্যাপ ঘাঁটা ছিল তার নেশা। ভূগোলের অঙ্কে সে খুব মজবুত ছিল, আকাশের সমস্ত নক্ষত্র ও নক্ষত্রমণ্ডলী তার নখদর্পণে ছিল।

পরীক্ষার পর কোলকাতা থেকে আসার সময় সে একরাশ ম্যাপ বই কিনে এনেছিল পড়বে বলে। কিন্তু সংসারের অনটনে তাকে পাটকলে চাকরি করতে যেতে হবে, এ যেন রেসের ঘোড়ার ছ্যাকরা গাড়ি টানতে যাওয়া। অজানাকে যে জানতে চায়—অচেনাকে যে চিনতে চায়—জীবন-মৃত্যু যার পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন, যাকে কোনো বাঁধন বেঁধে রাখতে পারে না, সেই তো যৌবন। শংকরের মন উড়ে যেতে চায় পৃথিবীর দূর দেশে—শত দুঃসাহসিক কাজের মাঝখানে। তার রোলমডেল লিভিংস্টোন, স্ট্যানলি হ্যারিনেস্টন, মার্কোপোলো, রবিনসনক্রুশো।

বিভূতিভূষণ লিখছেন....

> অন্যদেশের ছেলেদের পক্ষে যা ঘটতে পারে, বাঙালির ছেলের পক্ষে তা ঘটা একরকম অসম্ভব। তারা তৈরি হয়েছে কেরাণি, স্কুলমাস্টার, ডাক্তার বা উকিল হবার জন্যে, অজ্ঞাত অঞ্চলের, অজ্ঞাত পথে পাড়ি দেওয়ার আশা তাদের পক্ষে নিতান্তই দুরাশা।

এখানে সাধারণ বাঙালি ছেলেদের সম্পর্কে লেখকের একটা লেজিটিমেশন আছে।

কিন্তু শঙ্কর আলাদা ধাতুতে গড়া, প্রদীপের মৃদু আলোয় সেদিন রাত্রে সে ওয়েস্ট মার্কের ভূগোলের বইখানা খুলে পড়তে বসল। এই বইখানার একটা জায়গা তাকে বড়ো মুগ্ধ করে।...জাপান ভূপর্যটক আন্টন্ হাউপ্টম্যান লিখিত আফ্রিকার একটা বড়ো পর্বত— 'মাউন্টেন অফ দি মুন' (চাঁদের পাহাড়) আরোহনের অদ্ভুত বিবরণী। কতবার সে এটা পড়েছে। পড়বার সময় কতবার ভেবেছে হের হাউপ্টম্যানের মতো সেও একদিন যাবে 'মাউনটেন্ আব দি মুন' জয় করতে...।

সেই রাত্রিবেলায় সে স্বপ্ন দেখল ঘন বাঁশের জঙ্গলে বুনো হাতির দল মড়মড় শব্দে বাঁশ ভাঙছে। সে একজনের সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা পর্বতে উঠছে। চতুর্দিক

হাউপ্টম্যানের লেখা 'মাউন্টেন্ অফ মুন'-এর মতো দৃশ্য...। চিরতুষারে ঢাকা পর্বতশিখরটি এক-একবার দেখা যাচ্ছে এক-একবার বনের আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছে। আমরা পাঠকরা ভুলে গেছি শঙ্করের সংসারের অভাব-অনটনের কথা। তার চাকরির প্রয়োজনীয়তার কথা। শংকরের সঙ্গে পায়ে পায়ে আমরাও চাঁদের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছি। শংকর দেখলো পরিষ্কার আকাশে দু-একটি তারা এখানে ওখানে। সে বুনো হাতির ভয়ঙ্কর গর্জন শুনতে পেল। গর্জনটা তার কাছে এমন সত্যি মনে হল যে তার ঘুমটাই ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসে শংকর দেখলো ভোর হয়ে গেছে। ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। সত্যি কি? পাঠকের মনে একটা আশা-নিরাশার দোলাচল তৈরি হচ্ছে, কৌতূহল তৈরি হচ্ছে, সাসপেন্স তৈরি হচ্ছে।

শংকরের মনে কিন্তু ভোরের স্বপ্নটা দাগকেটে বসে গিয়েছে। সকালবেলায় স্নান করে তাদের গ্রামের ভাঙা পুরোনো মন্দিরে গিয়ে, মন্দিরের গায়ে বটের একটা ঝুরিতে একটা ঢিল ঝুলিয়ে প্রার্থনা জানিয়ে এলো সে। সারাদিন চাঁদের পাহাড়ের স্বপ্ন তাকে হন্ট করে বেড়ালো। বিকেলে সে গিয়ে অনেকক্ষণ মন্দিরের সামনে দূর্বা ঘাসের বনে বসে রইল। সেখানে একটা পোড়ো বাড়ি আছে। সেই পোড়োবাড়িতে কেউ একজন খুন হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে এই বাড়িটি পরিত্যক্ত। ভূতের ভয়ে গ্রামের কেউ একটা এইদিকে আসে না। কিন্তু শংকরের এই জায়গাটা খুব প্রিয়। লেখক আস্তে আস্তে শংকর চরিত্রটিকে তৈরি করছেন। সে ডাকাবুকো, তার ভয়ডর কম, সে স্পোর্টস্‌ম্যান, তার রোলমডেল মার্কোপোলো, রবিনসনক্রুসো। সে আর দশটা বাঙালি ছেলের মতো কেরানী, স্কুলমাস্টার, ডাক্তার বা উকিল হতে চায় না। সে লিভিংস্টোন, স্ট্যানলির মতো দুঃসাহসিক অভিযাত্রী হতে চায়। আফ্রিকার চাঁদের পাহাড়ে আরোহন করাটা তার স্বপ্ন। মন্দিরের সামনে দূর্বাঘাসের বনে বসে বসে শংকরের স্বপ্নের কথা মনে পড়ল—সেই মড়মড় করে বাঁশঝাড় ভাঙছে বুনো হাতির দল, পাহাড়ের আধিত্যকার নিবিড়বনে, দাঁতাল। তার ফাঁকে ফাঁকে অনেক উঁচুতে পর্বতের জ্যোৎস্না-প্লাবিত তুষারাবৃত শিখরদেশটা যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যের সীমা নির্দেশ করেছে।

সব মানুষই অনেক স্বপ্ন দেখে, শংকরও কত স্বপ্ন দেখেছে কিন্তু এই স্বপ্নটি যেমনভাবে তার মনে রেখাপাত করল আর কোনো স্বপ্ন তার মনে তেমনভাবে রেখাপাত করেনি, কিন্তু স্বপ্ন তো স্বপ্নই, বাস্তব বড়ই কঠিন, স্বপ্নভঙ্গ করে শঙ্করকে হয়তো পাটকলে চাকরি করতে যেতে হবে। শঙ্করের মনের অস্থিরতা পাঠক এর মনেও দোলাচল তৈরি করছে, পাটকল কি শঙ্করের গন্তব্য হবে? বাঙালি ছেলে, গ্রামের ছেলে, ঘরে অসুস্থ বাবা, শঙ্করের পাটকলে চাকরি করতে যাওয়াই প্রত্যাশিত ঘটনা। কিন্তু শংকরের জীবনে অপ্রত্যাশিত একটি ঘটনা ঘটে গেল। শঙ্করের পাশের পাড়ায় রামেশ্বর মুখুজ্যের স্ত্রী এক টুকরো কাগজ নিয়ে এসে তার হাতে দিয়ে

বললেন...আমার জামাই-এর খোঁজ পাওয়া গেছে অনেকদিন পরে। ভদ্রেশ্বরে ওদের বাড়িতে চিঠি দিয়েছে—পড়তো বাবা, সে কাগজটা খুলল, লেখা আছে— প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউগান্ডা রেলওয়ে হেড অফিস, কনস্ট্রাক্‌শন্ ডিপার্টমেন্ট,

মোম্বাসা, পূর্ব আফ্রিকা।

শঙ্কর শিহরিত হলো পূর্ব আফ্রিকা, পালিয়ে মানুষ এতদূর যায়? সে জানে ননীবালা দিদির স্বামী অত্যন্ত একরোখা ডানপিটে ও ভবঘুরে ধরনের, উড়ে বেড়ানো তার স্বভাব। লেখাপড়াটা সে ভালোই জানে। তার প্রকৃতি উদার। কিন্তু পায়ে যেন তার শ্যাওলা। শঙ্কর প্রসাদ বাবুর ঠিকানা তার নোট বইয়ে লিখে রাখল। তারপর এক সপ্তাহের মধ্যে প্রসাদ বাবুকে চিঠিতে লিখল তিনি কি শংকরকে একটা চাকরি করে দিতে পারেন তাদের ইউগান্ডা রেলে। দেড়মাস অতিক্রান্ত কিন্তু চিঠির উত্তর এল না। শংকর প্রায় হতাশ। আমরা পাঠকরাও হতাশ চিঠি বোধ হয় আর আসবে না। শেষমেশ পাটকলে যাওয়াই বোধ হয় শংকরের ভবিতব্য। তখনি চিঠি এলো—

প্রিয়, শঙ্কর

তোমার পত্র পেয়েছি।

এখানে নতুন রেল তৈরি হচ্ছে... যত তাড়াতাড়ি পারো এসো। তোমার কাজ জুটিয়ে দেওয়ার ভার আমি নিচ্ছি।

তোমাদের প্রসাদদাস...

শঙ্করের বাবা চিঠি দেখে খুব খুশি তিনি নিজেও ডানপিটে ধরনের লোক ছিলেন, ছেলে পাটকলে চাকরি করতে যাক মন থেকে তিনি তা কোনোদিন চাননি। কিন্তু অভাব বড়ো বালাই—তাই বাধ্য হয়ে সায় দিয়েছিলেন। এর মাসখানেকের মধ্যেই প্রসাদবাবুর টেলিগ্রাফ এল ভদ্রেশ্বর থেকে। তিনি শঙ্করকে দেখা করতে বলেছেন কুড়িদিন বাদে। তিনি মোম্বাসা ফিরবেন, শঙ্করকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন।

ড. রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তার 'ন্যারেটোলজি' এবং সোমনাথ ভট্টাচার্যর 'গল্প ক্লোজ রিডিং' গ্রন্থে (প্রকাশক : আন্ডার গ্রাউন্ড লিটেরেচার) এগারো পাতায় লিখেছেন... হ্যাঁ, সব গল্পই অনেক সময় একই গল্প, সব গল্পেরই অবয়ব নিম্নপ্রকাশ—

ক। কোনো অভাববোধ থেকে গল্পের শুরু হয়।

খ। নায়ক নায়িকা সেই অভাবকে অতিক্রম করতে চায়।

গ। তারা বাধা পেতে পারে আবার লাভ পেতে পারে।

ঘ। ঐ বাধা উত্তরণ করার জন্যে তারা সাহায্য চাইতে পারে, আবার নাও চাইতে পারে।

ঙ। এই সাহায্য তারা পেতে পারে আবার নাও পেতে পারে।

চ। নায়ক তার অভাবকে অতিক্রম করতে পারে আবার নাও পারে।

শংকর অ্যাডভেঞ্চারাম; স্ট্যানলি, মার্কোপোলো, রবিনসনক্রুশো তার রোল

মডেল। আন্টন হাউপ্টম্যানের ভূগোলের বই তার সবচেয়ে প্রিয়। সে চাঁদের পাহাড়ে উঠতে চায়। কিন্তু বাবার অসুস্থতা, সংসারের অভাবে তাকে পাটকলে চাকরি করতে যেতে হবে। শংকরের মনে অভাব তৈরি হলো।

শঙ্কর তার এই অভাববোধ দূর করার আশায় প্রসাদবাবুকে চিঠি লিখেছে। দেড়মাস কেটে গেছে, সে কোনো উত্তর পায়নি। তারপর হঠাৎ উত্তর এলো। শংকর তার অভাবকে অতিক্রম করার একটা পথ পেল। তারপরে গল্প আবার শুরু হচ্ছে চার মাস বাদে। সময়ের ঘড়ি চারমাস ঘুরে গেছে। বাংলাদেশের গ্রাম থেকে পাঠক পৌঁছে গেছে মোম্বাসায়, না মোম্বাসা নয় মোম্বাসা— সাড়ে তিনশো মাইল পশ্চিম। সেখানে রেলের একটা শাখা লাইন তৈরি হচ্ছে। সেই কনস্ট্রাকসন ক্যাম্পে কেরানি ও সহকারী স্টোরকিপার হয়ে শঙ্কর এসেছে। রেলওয়ের কাজে নিযুক্ত সকলের মতো শঙ্কর তাঁবুতে থাকে, বাড়ি ঘর নেই। তাঁবুগুলো খোলা একটা জায়গায় চক্রাকারে সাজানো, তাদের চারধার ঘিরে বহুদূর ব্যাপি মুক্ত প্রান্তর। দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসে ভরা, মাঝে গাছ। ইউগান্ডার মাঠে ও বনে শঙ্করের দুঃসাহসিক মন নিজের স্বপ্নের সার্থকতা যেন খুঁজে পেল। কাজ শেষ হলেই সে তাঁবু থেকে রোজ বেরিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে বেড়াতে যেত। লম্বা লম্বা মানুষের মাথা পেরিয়ে ঘাসের জঙ্গল, সেখানে সিংহ লুকিয়ে থাকে—ইউগান্ডা সিংহের দেশ। যেকোনো সময় সিংহ যে কাউকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। কনস্ট্রাকসন ক্যাম্পের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব শঙ্করকে সাবধান করে দিল—লম্বা ঘাসের জঙ্গলে যেকোনো সময় যেকেউ হারিয়ে যেতে পারে। অনেক লোক এরকম পথ হারিয়ে জঙ্গলেই মারা গেছে জলের অভাবে। এই ক্যাম্পে যাবার সময় শঙ্কর চাক্ষুষ করলো ভয়ানক সিংহ, তার ক্রূরতা এবং শক্তি, ভয়ানক ধূর্ততা। ইউগান্ডার বাইরে আগুনের পাশ থেকে টেনে নিয়ে ঘাসের জঙ্গলে বেশ কিছু কুলিকে ভয়ানকভাবে মেরে ফেলল এই সিংহ। শংকরের নিজের এক ভয়ানক অভিজ্ঞতা হলো। একদিন রাত্রিবেলা সবাই শুয়ে পড়েছে। তাঁবুর চক্রাকার সীমানার মধ্যে নিবু নিবু দু-একটা অগ্নিকুণ্ড। দূরে শেয়াল ডাকছে। শেয়ালের ডাক শুনলেই শংকরের মনে হয় সে বাংলাদেশের গ্রামে আছে। চোখ বুজে সে নিজের গ্রামের কথা মনে করছিল। তাদের ঘরের কোণে বিলেতি আমড়া গাছটার কথা সে ভাবছিল। হঠাৎ অন্ধকারে সে দেখে একটা প্রকাণ্ড সিংহ সামনের একটা তাঁবুর ঘরের চালে থাবা দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত করার চেষ্টা করছে। আর মাঝে মাঝে গর্তের কাছে কিসের যেন গন্ধ শুঁকছে। শঙ্করের কাছ থেকে চালাটার দূরত্ব বড়জোর বিশ হাত। শঙ্কর বুঝতে পারল ওই গর্ত দিয়ে ঢুকে সিংহটা মানুষ নেবে। শংকরের সঙ্গে একগাছা লাঠিও নেই। শংকর বুঝল সে খুবই বিপদগ্রস্ত। শংকর সিংহের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে পিছু হটতে লাগল। সে ইঞ্জিনিয়ারের তাঁবুর দিকে এগুতে লাগল। নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর উপরে শংকরের যে এত কর্তৃত্ব তা সে নিজেই জানত

না। তার মুখ দিয়ে একটা ভয়ের শব্দ পর্যন্ত বার হলো না। এই ঘটনা প্রমাণ করে—শঙ্কর খুব দুঃসাহসিক নয়, বিপদে তার মাথা খুব ঠান্ডা থাকে। নিজের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর তার কর্তৃত্ব রয়েছে। চোখের সামনে ইউগান্ডার ধূর্ত ভয়ানক সিংহ কিন্তু শংকর তার নার্ভ হারায়নি। আস্তে আস্তে ইঞ্জিনিয়ারের তাঁবুতে ঢুকে বলল—'সাহেব সিংহ' কিন্তু সিংহ তখন উধাও। তাঁবুতে শোরগোল পড়ে গেল। আবার আগুন জ্বালা হলো। সাহেব আর শংকর দুটো বন্ধুক হাতে এদিকে ওদিকে দেখল। শেষ রাতের দিকে কুলিরা চিৎকার করল সিম্বা সিম্বা। শেষ রাতে তাঁবুর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে সিম্বা (সিংহ) এসে ভারবাহী অশ্বতর জখম করে গেছে। আরেকদিন শংকর বন্দুক হাতে অশ্বতরচড়ে সাঁতিদার এদিক-ওদিক দেখল। পাশের ঝোঁপে কি যেন একটা নড়ে উঠল। কিন্তু সে কিছু দেখতে পেল না। শংকরের হঠাৎ মনে হলো, ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত নিঃশব্দে তারা শিকারের অনুসরণ করে। তারপর নির্জন স্থানে সুবিধে বুঝে তার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অজ পাড়াগ্রামের ভেতো বাঙালি ছেলে শংকরকে তার অভিজ্ঞতা সিংহর চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেছে। সে আর ঝুঁকি না নিয়ে তাঁবুতে ফিরে যাওয়াই স্থির করল। যেই সে অশ্বতরের মুখ ঘুরিয়েছে অমনি একটি সিংহ লাফ দিয়ে অশ্বতরের ঘাড়ে এসে পড়ল। শংকর হাত চারেক দূরে ছিল তখন। সে তখুনি বন্দুক উঁচিয়ে দুবার গুলি ছুঁড়ল। ধুসর বর্ণের সিংহ পলাতক। অশ্বতর যন্ত্রণায় ছটপট করছে, রক্তে মাটি ভেসে যাচ্ছে। শংকর গুলি করে তার যন্ত্রণার অবসান ঘটাল।

ডাকাবুকো শংকর এরকম জীবনেরই মুখোমুখি হতে চেয়েছিল। শংকর এমন এক জায়গায় কাজ করছে যেখানে পায়ে পায়ে বিপদ ওৎ পেতে থাকে। প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে এখানে চলাফেরা করতে হয়। একটু এদিক থেকে ওদিক হলে মৃত্যু লাফিয়ে পড়তে পারে। সুতরাং, শংকরের মনের অভাব যেন সত্যি সত্যি সে অতিক্রম করতে পেরেছে। আর এই বাধা অতিক্রমে তাকে সাহায্য করেছে প্রথমে প্রসাদবাবু, তারপর এই রেলপথ তৈরির চাকরি। এই চাকরি করার সময় শঙ্কর জানল আফ্রিকা অদ্ভুত সুন্দর। বিপদ-সংকুল ভয়ঙ্কর প্রকৃতি, যার আনাচে-কানাচে বিপদ ওৎ পেতে থাকে, তার সঙ্গে পরিচয় হলো।

এরপর বর্ষণ শুরু হলে খানিক সিংহের উপদ্রবের জন্য আর খানিকটা জলাভূমির অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য তাদের তাঁবু উঠে গেল। শংকর স্টেশন মাস্টারের কাজ নিয়ে একটা ছোট্ট স্টেশনে চলে গেল। এই স্টেশনটি খিসরু থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে। স্টেশনের ঘরটিও খুব ছোটো। স্টেশন-ঘরের চারপাশ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মাটির প্ল্যাটফর্ম। এই স্টেশনে একজনই কর্মচারী, কোনো কুলি পর্যন্ত নেই। স্টেশন মাস্টারই কুলি, সে-ই পয়েন্টস্ ম্যান। এই স্টেশনগুলিতে আসলে কোনো আয় নেই তাই এরকমই সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা। সারাদিনে একটাই ট্রেন যায়। শংকর

যার কাছ থেকে স্টেশনের চার্জ নিল সে ভদ্রলোক গুজরাটি। স্টেশন-ঘরের চারদিকে এরকম কাঁটাতারের বেড়া কেন জিজ্ঞেস করতে গুজরাটি ভদ্রলোক কেমন যেন একটু এড়িয়ে গেলেন। শংকরের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-মনে একটা জিজ্ঞাসা তৈরি হলো। সত্যি তো এ জনমানবশূন্য জায়গায় এতো কাঁটাতারের বেড়ার ঘটা কেন? এই স্টেশনে জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। এখানকার জল বেজায় তেতো আর খাওয়ার অযোগ্য। প্রত্যেক দিন ট্রেন যাওয়ার সময় জল নামিয়ে দিয়ে যায়। এ এক অদ্ভুত জায়গা, জল নেই, মানুষ নেই। একটা ট্রেন পেরিয়ে গেলে শংকরের অখণ্ড অবসর। শংকর একা নিজের কাজ করে, রান্না করে খায়। ট্রেন এলে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ায়। দুপুরে বই পড়ে। নইলে বড়ো টেবিলটায় শুয়ে ঘুমোয়। বিকেলের দিকে ছায়া পড়লে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করে। স্টেশনের চারধার ঘিরে ধূ ধূ সীমাহীন প্রান্তর। দীর্ঘ ঘাসের বন। মাঝে ইয়কা, বাবলা গাছ, দূরে চক্রবাল জুড়ে পাহাড়ের সারি। শংকর মোহিত হয়ে যায়। গুজরাটি ভদ্রলোক শংকরকে একা একা ওই সব মাঠে বেড়াতে যেতে বারণ করেছিলেন। শংকর তখন বুঝতে পারেনি তার কথার এই অর্থ। সে গুজরাটি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিল কেন সে মাঠে যাবে না? ভদ্রলোক তাকে কোনো উত্তর দেননি, গুজরাটি ভদ্রলোকের আচরণ পাঠকের মনে প্রবল উদ্বেগ তৈরি করেছে। কেন কাঁটাতারের বেড়া? কেন এত সুন্দর জায়গায় শংকর বেড়াতে যাবে না?

কয়েকদিনের মধ্যেই শংকর তার কেন-র উত্তর পেল, শঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাঠকরা হাড় হিম করা সেই দৃশ্য নিঃশ্বাস বন্ধ করে যেন দেখলাম। সেদিন রাত হতে না হতেই শঙ্কর খাওয়া-দাওয়া সেরে স্টেশনঘরে বাতি জ্বালিয়ে ডায়রি লিখছে। স্টেশনঘরে সে শোবে। স্টেশন-ঘরের সামনের কাঁচের দরজাটি বন্ধ আছে কিন্তু তাতে আগল দেওয়া ছিল না। হঠাৎ একটা আওয়াজে শংকর কাঁচের দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে প্রকাণ্ড একটা সিংহ দরজার কাঁচে নাক লাগিয়ে ঘরের ভেতর তাকিয়ে শংকর আর টেবিলে কেরোসিনের বাতিটার দিকে তাকিয়ে আছে। দরজার আগল নেই। সিংহটি একটা ঠেলা মারলেই দরজাটা খুলে যাবে। শংকর সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। যা হোক মিনিট দুই বাদে সিংহ চলে গেল। শংকরের মনে হচ্ছিল কতকাল যেন সিংহ আর সে পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শংকরের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাঠকরাও স্টেশন ঘরের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া কেন, তার একটা উত্তর পেলাম। কিন্তু আরো যে সারপ্রাইজ অপেক্ষা করে আছে তা কে জানত।

ড. মুখোপাধ্যায় 'ন্যারেটোলজি' ও সোমনাথ ভট্টাচার্য 'গল্প ক্লোজ রিডিং' গ্রন্থের দশ পাতায় লিখছেন উদ্বেগ না থাকলে কোনো গল্পই রসতীর্ণ হয় না...সাসপেন্সের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি জড়িয়ে থাকে সারপ্রাইজ।

> পাঠক যখন কোনো গল্প পড়ে তার প্রতিটি ঘটনা কি হবে সে সম্পর্কে পাঠক সর্বদাই শুধু কৌতুহলী হয় না, সে নিজেও একটা প্রত্যাশা নিজের মধ্যে পালন করে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো পাঠকের প্রত্যাশা মতো কোনো গল্প যদি এগোয় তাহলে পাঠক মোটেই খুশি হয় না। যেকোনো ঘটনার পরে একাধিক সম্ভাব্য অঘটন ঘটতে পারে। তার মধ্যে যেটি সর্বাধিক সম্ভাব্য সেটি পাঠকের প্রত্যাশি...

পাঠক-মনে বিপদ বলতে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সিংহ হতে পারে। যখন বেড়া কেন? এই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল তখন সিংহের কথাই সবার মনে হয়তো উঁকি-ঝুঁকি দিয়েছিলো। কিন্তু আফ্রিকা যে কী ভয়ানক বিপদ-সংকুল তা শ্যামলা বাংলার অজ গাঁয়ের শংকরের বুঝতে বাকি ছিল।

পরের দিন সকালে ট্রেন এলে ট্রেনের গার্ডকে সিংহের ঘটনা বলতে গার্ড বলল—'এসব অঞ্চলে সর্বত্রই এমন অবস্থা। এখানে তো যে ক্লান্ত—' কথা অসম্পূর্ণ রেখে সে ট্রেনে উঠে পড়ল। চলন্ত ট্রেন থেকে বলল—'সাবধানে থেকো সর্বদা।' শংকর একটু চিন্তিত হলো। এরা কিছু একটা চাপা দিতে চায়। তাহলে সিংহ ছাড়া আরো কিছু আছে নাকি এখানে? খুব শিগ্রি একদিন রান্নাঘরে ঢুকে খুঁটির গায়ে কি একটা দেখে সে লাফিয়ে পেছনে এলো। একটা হলদে খরিশ খুঁটি থেকে এক হাত বাইরে ফণা উদ্ধত করে মুখ বাড়িয়েছে। ভাগ্যিস শংকর সাপটাকে দেখেছিল। যা হোক সাপটাকে সে মারতে পারল না, সাপটা পালিয়ে গেল। পাঠক ভাবছে তাহলে হয়তো এই বিষাক্ত গোখরো সাপের কথা সবাই চেপে গিয়েছিলো। সিংহ আর খরিশ সাপ—পাঠকের উদ্বেগের পারদ খানিকটা নামল।

উপায়হীন শংকর সাপ চলে যাওয়ার পর ওই রান্নাঘরে কোনোমতে রান্না সেরে ফেলল। পরের দিন ট্রেন এলে একটা নতুন কুলি তার রেশন নামিয়ে দিল। কুলিটি ইন্ডিয়ান। গুজরাট অঞ্চলে তার বাড়ি। স্টেশনে নেমে শংকরের দিকে কী অদ্ভুতভাবে তাকাল সে। তারপর হুড়মুড় করে ট্রেনে উঠে পড়ল পাছে শংকর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে। শংকর পরিষ্কার বুঝতে পারল এরা সবাই কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছে। পাঠকের উদ্বেগ আবার বাড়ল। সিংহ, সাপ আবার কি? এরপর আবার একদিন খরিশ সাপের গায়ে পা দিতে দিতে শংকর বেঁচে গেল। এরপর বিপদের মধ্যে বিস্তৃত প্রান্তরে ঘন অন্ধকার যখন নামে, প্ল্যাটফর্মের ইউকা গাছটার ডালপালার মধ্য দিয়ে রাত্রির বাতাস বেধে কেমন একটা শব্দ হয়। মাঠের মধ্যে প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকে, একদিন গভীর রাতে দূরে কোথায় সিংহের গর্জন শুনতে পাওয়া যায়—এই সমস্ত তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। শংকর তো এরকম জীবনই চেয়েছিল। তার কাছে এই জনহীন প্রান্তর, এই রহস্যময়ী রাত্রি, অচেনা নক্ষত্রে ভরা আকাশ, পায়ে পায়ে বিপদের আশঙ্কাই জীবন। শান্ত নিরাপদ জীবন দেখে তার মনে হয় নিরীহ কেরানির জীবন হতে পারে সেটা, তার নয়। দুবার খরিশ সাপ দেখার পর

সে স্টেশনঘর, নিজের কোয়ার্টার, চারধারের জমি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলো। সারা জায়গায় মাটিতে বড়ো বড়ো গর্ত, ফাটল, আর ইঁদুরের মাটি। তবু সে কিছু বুঝতে পারল না। একদিন সে স্টেশনের ঘরে ঘুমোচ্ছে, রাত গভীর। ঘর-অন্ধকার, শংকরের ঘুম ভেঙে গেল। তার ইন্দ্রিয় জানান দিল বিপদ আসছে। শংকরের শরীর শিউরে উঠল, টর্চটি খুঁজে পাচ্ছে না। অন্ধকারে একটা অস্পষ্ট শব্দ সে শুনতে পেল। টর্চটা জ্বালাতেই সে ভয়ে বিস্ময়ে বিছানার উপর বসে রইল। তার খাট আর অফিস ঘরের দেওয়ালের মাঝখানে আড়াই হাত উঁচুতে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আফ্রিকার ক্রূর হিংস্রতম সাপ কালো মাম্বা। ব্ল্যাক মাম্বারা সাধারণত মানুষকে তাড়া করে তার ঘাড়ে ছোবল মারে। ব্ল্যাক মাম্বার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এক প্রকার পুনর্জন্ম— একথাও শংকর শুনেছে। আমরা আগেই দেখেছি শংকরের নার্ভ খুব শক্ত। প্রচণ্ড বিপদে সে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে। তার হাতের টর্চের আলোয় সাপটি 'থতমত' খেয়ে গেছে। শংকর বুঝল কোনোভাবে সাপের চোখ থেকে যদি আলো সরে যায় তাহলে বিপদ। শংকর অবিচল সাপের চোখ লক্ষ করে টর্চটা জ্বালিয়ে বসে রইল। সাপের দু'চোখ জ্বলছে ঠিক যেন দুটো আলোর দানা। কী ভীষণ শক্তি আর রাগ প্রকাশ পাচ্ছে তার চাবুকের মতো খাড়া উদ্যত কালো মিশমিশে দেহটাতে! শংকর চারপাশ ভুলে গেল। ভুলে গেল আফ্রিকা দেশটা, ভুলে গেল তার রেলের চাকরি, তার দেশ, তার মা, বাবা—সমস্ত জগৎটা শূন্য হয়ে গিয়ে সামনের দুটো জ্বলজ্বলে আলোর দানায় পরিণত হয়েছে, তার বাইরে সব শূন্য অন্ধকার। মৃত্যুর মতো শূন্য। প্রলয়ের পরে বিশ্বের মতো অন্ধকার। সত্য কেবল ওই মহা হিংস্র উদ্যত ফনা সর্প। যেটা প্রত্যেক ছোবলে পনেরোশো মিলিগ্রাম তীব্র বিষ ক্ষতস্থানে ঢুকিয়ে দিতে পারে— অসাধারণ ভয়ঙ্কর হাড়হিম করা একটা দৃশ্য। পাঠকরাও যেন শংকরের মতো ব্ল্যাক মাম্বার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রয়েছে শংকরের সঙ্গে।

শঙ্করের হাত ঝিমঝিম করছে। এবার অবশ হয়ে আসছে আঙুল, কনুই থেকে বগল পর্যন্ত। হাতের যেন সাড় নেই। টর্চ এবার মনে হচ্ছে হাত থেকে খসে পড়বে। তার মনে হলো সামনের আলোর দানা দুটো সাপের চোখ নয়, জোনাকি পোকা কিংবা নক্ষত্র। টর্চের আলো কমে আসছে, শংকর আর পারছে না। কিন্তু পারতে তো তাকে হবেই। ঘড়িতে টং টং করে তিনটে বাজল। শঙ্করের হাত কেঁপে উঠল। সামনের আলোর দানা নিভে গেল। শংকর বিদ্যুৎ-এর চেয়ে দ্রুত দরজার আগল খুলে ঘরের বাইরে চলে এলো। ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল। সারারাত প্ল্যাটফর্মে কাটিয়ে পরের দিন ট্রেনের গার্ডকে সব কথা বললে গার্ড এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলো। সাপের কোনো চিহ্ন নেই। এবার গার্ড তাকে আসল ঘটনা বলল, আগের দুজন স্টেশন মাস্টার সাপের কামড়ে মারা গিয়েছে। ব্ল্যাক মাম্বা

যেখানে থাকে তার ত্রিসীমানায় লোক আসে না। গার্ড তাকে ট্রান্সফারের জন্য দরখাস্ত করতে বলল।

এই স্টেশনটায় জলের বড়ো কষ্ট, কুয়োয় জল নেই। ট্রেন থেকে যে জল দেয় তাতে রান্না খাবার কোনোমতে হয়। সে চান করতে পারে না। একদিন সে খবর পেল স্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা জলাশয় আছে। স্নান ও মাছ ধরার আকর্ষণে সে সকালের ট্রেন রওনা করিয়ে দিয়ে একটা সোমালি কুলি সঙ্গে নিয়ে জলাশয়ের সামনে উপস্থিত হলো। সেখানে স্নান করে খানিকক্ষণ মাছ ধরল। তারপর তাড়াতাড়ি ফিরে এলো। এরপর সে মাঝে মধ্যেই মাছ ধরতে চলে যেত সেখানে।

আস্তে আস্তে গ্রীষ্মকাল প্রখর হয়ে উঠল। আফ্রিকার গ্রীষ্ম ভয়ানক দিক-বিদিক মনে হয় দাউ দাউ করে জ্বলছে। এমন সময় একদিন শংকর মাছ ধরতে গেছে ফেরার সময় সে একটা অস্ফুট আর্তস্বর শুনতে পেল। স্বর লক্ষ করে এগিয়ে গিয়ে দেখল একটা ইউকা গাছে বলিষ্ঠ কিন্তু বর্তমানে রোগে-কষ্টে-অনাহারে ক্ষীণ একটা লোক ঠেস দিয়ে বসে আছে। লোকটাকে দেখে তার ইউরোপিয়ান মনে হলো। শংকরের কাছে লোকটা জল খেতে চাইল।

শংকর বলল সঙ্গে তো জল নেই। আমার কাঁধে ভর দিয়ে স্টেশন পর্যন্ত চলুন। একরকম শংকরের কাঁধে চেপে লোকটা প্লাটফর্মে পৌঁছালো। ইতিমধ্যে বিকেলের ট্রেন চলে গিয়েছে। শংকর লোকটিকে ভালো করে জল আর খাবার খাইয়ে বিছানা করে শুইয়ে দিল। খেয়ে দেয়ে লোকটার শরীরে বল হলো যেন। কিন্তু লোকটার বেজায় জ্বর এল। অনেকদিনের অনিয়মে অনাহারে তার শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। সে যে দু-চারদিনে সুস্থ হবে না সেকথা শংকর বুঝল, শংকর লোকটার পরিচয় জানল। লোকটার নাম— ডিয়েগো আলভারেজ। পর্তুগীজ। তবে আফ্রিকার সূর্য তার বর্ণ তামাটে করে দিয়েছে। লোকটা একটু সুস্থ হলে শংকরকে এক অবিশ্বাস্য আশ্চর্য কাহিনি শোনালো।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আলভারেজের কাহিনি 'ডিয়েগো আলভারেজের কথা' সেই কাহিনি পাঠকের কাছে রেখেছে।

ডিয়েগো আলভারেজ চাঁদের পাহাড়ের আর একজন গুরুত্বপূর্ণ ন্যারেটার। ড. মুখোপাধ্যায় 'ন্যারেটোলজি' ও সোমনাথ ভট্টাচার্যের 'গল্প ক্লোজরিডিং' গ্রন্থে ৩০ পাতায় লিখেছেন যে, কোনো গল্পে সাধারণত গল্পকার কোন ন্যারেটিভে বলছেন, তার বিশ্বাসযোগ্যতা কতটা তার উপর গল্পের ভাগ্য অনেকটা নির্ভর করে।... যিনি গল্পটা লেখেন তিনি গল্পকার। গল্পটিকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য তিনি অনেক সময় অন্য কারোর মুখ দিয়ে বলান। যার মুখ দিয়ে বলছেন তিনি ন্যারেটার। গল্পকারও ন্যারেটার হতে পারেন যদি তিনি গল্পটাই তার নিজের মুখে ন্যারেট করেন।

ড. মুখোপাধ্যায় লিখছেন, লেখক পাতি কেরানি হতে পারেন। কিন্তু লেখক যে কাহিনিটি লিখছেন তার ন্যারেটার একজন নাবিক হতে পারেন। যেমন, বিভূতিভূষণ তার 'চাঁদের পাহাড়' গল্পে ডিয়েগো আলভারেজের মুখ দিয়ে চাঁদের পাহাড়ের কাহিনি বলিয়েছেন। সুতরাং, আলভারেজ এই গল্পের একজন ন্যারেটার।

আলভারেজের কাছে শঙ্কর চাঁদের পাহাড়ের কথা শুনলো। আলভারেজ শুরু করছেন—

> ইয়াং ম্যান, তোমার বয়েস কত হবে? তুমি যখন মায়ের কোলে শিশু আজ বিশ বছর আগের কথা ১৮৮৮/৮৯ সালের দিকে আমি কেপ কলোনির উত্তরে পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে সোনার খনির সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলাম। তখন বয়েস ছিল কম, দুনিয়ার কোনো বিপদই বিপদ বলে গ্রাহ্য করতাম না।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ডিয়েগো একজন অভিযাত্রী। সোনার খোঁজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় অনেক ঘোরাঘুরি করেছেন। অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। সেই আলভারেজ তার জীবনের এক অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা শংকরকে শোনাচ্ছেন, যে শৈশব থেকে মনের গহীন গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ হেঁটেছেন মনে মনে। দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্গম পাহাড়ের দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সে কতবার বুনো হাতির গর্জন শুনেছে। তার স্বপ্ন মাউন্টেন অফ মুনকে জয় করা। কোনো গল্পে পড়া কাহিনি নয়, তার সামনে জলজ্যান্ত এক মানুষ ডিয়েগো আলভারেজ তাকে তার অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছে। আলভারেজের জবানিতেই শোনা যাক— ককককক

> সেদিন একটা হরিণ শিকার করেছি সকালের দিকে। তাঁবু খাটিয়ে মাংস রান্না করে শুয়ে পড়লুম দুপুর বেলা, কারণ দুপুরের রোদে পথ চলা সে সব জায়গায় এরকম অসম্ভব—১৫৫ ডিগ্রি থেকে ১৩০ ডিগ্রি পর্যন্ত উত্তাপ হয় গ্রীষ্মকালে। বিশ্রামের পরে বন্দুক পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি বন্দুকের নলের মাছিটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। মাছি না থাকলে রাইফেলের তাগ ঠিক হয় না। কত এদিক ওদিক খুঁজেও মাছিটা পাওয়া গেল না। কাছেই একটা পাথরের ঢিবি, তার গায়ে সাদা সাদা কি একটা কঠিন পদার্থ চোখে পড়ল। ঢিবিটার গায়ে সেই জিনিসটা নানা স্থানে আছে। বেছে বেছে তারই একটা দানা সংগ্রহ করে রাইফেলের নলের আগায় বসিয়ে নিলাম। তারপর বৈকালে এখান থেকে আবার উত্তর মুখে রওনা হয়েছি। কোথায় তাঁবু ফেলেছিলাম, সেকথা ক্রমেই ভুলেই গিয়েছি।
>
> দিন পনেরো পরে একজন ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, সেও আমার মতো সোনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার নাম জিম্ কার্টার। জিম্ একদিন আমার বন্দুকটা নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ কি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। আমায় বললে— বন্দুকের মাছি তোমার এরকম কেন? তারপর আমার গল্প শুনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে তুমি বুঝতে পারোনি এ জিনিসটা খাঁটি রুপো, খনিজ রুপো। এ যেখানে পাওয়া

যায় সাধারণত সেখানে রুপোর খনি থাকে। এক্ষুনি চল আমরা যাই এবার আমরা লক্ষপতি হয়ে যাবো।

কিন্তু সে জায়গা তারা আর খুঁজে পায়নি। আলভারেজের মুখ থেকে আমরা শুনলাম— অফ্রিকার ভেল্ডে কোনো চিহ্ন বড়ো একটা থাকে না। যার সাহায্যে পুরানো জায়গা খুঁজে না পেয়েও তাদের অভিযান চলতে লাগল। চলতে চলতে জিম কার্টার আর আলভারেজ ওরেঞ্জ নদী পার হয়ে পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা কাফির বস্তিতে উপস্থিত হল। বস্তির মোড়লের মেয়ে পেট ব্যথায় ছটফট করছে। কাফিরদের বিশ্বাস মেয়েটার ঘাড়ে দানো চেপেছে। মেয়েটি বনের ধারে গিয়েছিলো তারপর থেকেই তাকে ভূতে পেয়েছে।

আমরা যারা একটু লেখাপড়া করেছি তারা তথাকথিত সভ্য। তারা হয়তো ভাববো কাফিরগুলো কত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভূত-প্রেত আছে নাকি? প্রত্যেক জনসমষ্টির একটা ভাষা এবং সংস্কৃতি থাকে। তার সংস্কৃতি অনুযায়ী সে তার সুযোগ-সুবিধে সমস্যাগুলোকে বোঝে। তার নিজস্ব ভাষা দিয়ে সেগুলোকে সে ব্যাখ্যা করে। প্রত্যেকেই তার নিজের পরিবেশে এবং নিজের জ্ঞান অনুযায়ী সমস্যাগুলিকে সমাধান করার চেষ্টা করে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাফির উপজাতির সমাজে পেট ব্যথা হয় ভূত বা দানো থেকে। তথাকথিত সভ্য সমাজে একে বলা হয় অসুখ। এই পেট ব্যথার ভূত বা দানোকে কী করে মারতে হয় সেটা হয়তো এই কাফিররা জানে না (তথাকথিত সভ্য সমাজে এমন দুরারোগ্য ব্যাধি আছে আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনো সারাতে পারে না)। কিন্তু আলভারেজ তার হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স থেকে দু'ফোঁটা ওষুধ মেয়েটির মুখে দিয়ে পেট ব্যথার দানোকে মেরে ফেলল। কাফির সর্দার খুশি হলো। আলভারেজ আর জিম কয়েকদিন ওই কাফিরদের গ্রামে থেকে গেল। একদিন মোড়ল আলভারেজদের একটি বড়ো সাদা পাথর দিয়ে বলল 'তোমরা সাদা পথের খুব ভালোবাসো না? বেশ খেলবার জিনিস।' জিম্ আর আলভারেজ সাদা পাথরটি দেখে চমকে দেখল হীরে। পালিশ না করা হীরক খণ্ড।

তথাকথিত সভ্য সমাজে একটা হীরক খণ্ডের লোভে কত যুদ্ধ হয়— কত রক্তগঙ্গা বয়ে যায় কত ষড়যন্ত্র হয়। কিন্তু এই কাফির মানুষগুলোর কাছে সেগুলো খেলার জিনিস।

কাফির সর্দার আলভারেজদের বলল, 'এটা তোমরা নিয়ে যাও। ঐ যে দূরের বড়ো পাহাড় দেখছো, ধোঁয়া ধোঁয়া, এখান থেকে হেঁটে গেলে একটা চাঁদের মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবে। ঐ পাহাড়ের মধ্যে এরকম সাদা পাথর অনেক আছে বলে শুনেছি। আমরা কখনো যাইনি। জায়গা ভালো নয়, ওখানে বুনিপ্ বলে উপদেবতা থাকে। অনেককাল আগেকার কথা— আমাদের গ্রামের তিনজন সাহসী লোক কারোর বারণ না শুনে ওই পাহাড়ে গিয়েছিল আর ফেরেনি। আরেকবার একজন তোমাদের

মতো সাদা মানুষ এসেছিল সেও অনেককাল আগে, আমরা দেখিনি, আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদাদের আমলের কথা। সে গিয়েও আর ফেরেনি।'

আলভারেজরা ম্যাপ মিলিয়ে বুঝল দূরের ধোঁয়া অস্পষ্ট পাহাড়টা হচ্ছে রিখটার্স ভেল্ড পর্বতশ্রেণি। দক্ষিণ আফ্রিকার সবচেয়ে বন্য, অজ্ঞাত বিশাল ও বিপদ সংকুল অঞ্চল। জিম কার্টার আর আলভারেজের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, তারা রওনা দিল। তাদের একটাই খোঁজ। প্রকৃতি যে ধন সম্পদের ভাণ্ডার সামনে থেকে লুকিয়ে রেখেছে তাকে খুঁজে বার করা। পাহাড়ের পাদদেশে জঙ্গলের মধ্যে ঢোকার পর জনাকয়েক কাফিরদের সঙ্গে তাদের দেখা হল। আলভারেজরা তাদের তামাকের লোভ দেখিয়ে কুলি হিসেবে নিতে চাইলে তারা রাজি হলো না। উল্টে তারা আলভারেজ আর জিম্‌কে বললে ওখানে বুনিপ থাকে। বুনিপের হাতে পড়লে আর ফিরে আসতে হবে না। ওখানে কেউ যায় না। আমরা তামাকের লোভে ওখানে যাবো মরতে? ভালো চাও তো তোমরাও যেও না। বুনিপ আসলে কী, কাফির ওই মানুষগুলোও ভালো করে জানে না। শুধু জানে বুনিপ অনিষ্ট করতে পারে।

এই মানুষগুলো হয়তো লেখাপড়া জানে না। তাদের হয়তো এন্টিবায়োটিক নেই। তাদের সমাজের বদ্যিগুলো পেটব্যথা বললেই টাকার লোভে অপ্রয়োজনে পেট কেটে ফেলে না, কিন্তু এরা জানে কোথায় থাকতে হয়, কোথায় লাগাম টানতে হয়। তামাকের লোভকে তুচ্ছ করে কোনো সাদা পাথরের রাজ্যে তারা যেতে চায় না যেখানে বুনিপ থাকে। আলভারেজ আর জিম কার্টার এই সভ্য জগতের মানুষ হলেও সভ্য জগতে মূল্যবোধগুলো তাদের বিশেষ নেই। তারা অভিযাত্রী। অ্যাডভেঞ্চার নেশা তাদের কাছে অনেক বড়ো। সেকথা আলভারেজের বর্ণনায় পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়—

> ভয় আমাদের ধাতে ছিল না। জিম্ কার্টারের তো একেবারেই না। সে আরও বিশেষ করে জেদ ধরে বসল। এই বুনিপের রহস্য তাকে ভেদ করতে হবে হীরা পাই বা না পাই।

অসুস্থ আলভারেজ, শংকর লক্ষ করল তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়েছে। অসুস্থ আলভারেজের জীর্ণ মলিন পোশাক আর শিরাবহুল হাতের দিকে চেয়ে তার পাকা ভুরুজোড়ার নীচে নীল উজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে চেয়ে শংকরের মন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় ভরে উঠল। আল্‌ভারেজের অভিজ্ঞতা শংকরকে কৌতুহলী করে তুলল। তার মনে হলো, এই একজন সত্যিকারের মানুষ। শংকর মার্কপোলো, রবিনসন ক্রুসো, লিভিংস্টোনের মতো অভিযাত্রীদের কথা বইয়ে পড়েছে। আজ তার চোখের সামনে একজন সত্যিকারের অভিযাত্রী বসে।

আলভারেজ এক গ্লাস জল খেয়ে আবার বলতে শুরু করলেন ঘোর বনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করলাম, কতো বড়ো বড়ো গাছ। বড়ো বড়ো ফার্ন, কতো বিচিত্র

বর্ণের অর্কিড, বড়ঁশির মতো কাঁটা গাছের গায়ে, মাথার উপরকার পাতা এমন জড়াজড়ি যে সূর্যের আলো কোনো জন্মে সে জঙ্গালে প্রবেশ কিনা সন্দেহ। আকাশ দেখা যায় না। বেবুনের উৎপাত জঙ্গালের সর্বত্র, দলে দলে শিশু, বালক, বৃদ্ধ, যুবা নানা রকমের বেবুন বসে আছে দাঁত খিঁচিয়ে ভূত দেখায়... দু-একটা বুড়ো সর্দার বেবুন সত্যিই হিংস্র প্রকৃতির।

এই বেবুন মেরে গভীর জঙ্গালে তারা তাদের খিদে নিবৃত্তি করতো। আর জঙ্গালের ঝরণা জল তাদের তৃষ্ণা মেটাতো। কিন্তু এই জঙ্গলে পায়ে পায়ে বিপদ। একটু অসতর্ক হলেই মুশকিল। একদিন বেবুনের দাপনা ঝলসে খেয়ে জিম্ ঝরনার জল খেতেই পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। সঙ্গে বমি। হোমিওপাথি ওষুধ সে যাত্রায় জিম্‌কে সুস্থ করলো। আলভারেজ ঝরনার জল পরীক্ষা করে বুঝল ঝরনার জলে আর্সেনিক আছে। অভিযাত্রী হতে গেলে শুধু সাহস থাকলেই হয় না সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্কিল থাকাও জরুরি। যেমন—বন্দুক চালানো ম্যাপ দেখতে জানা, অল্পস্বল্প ডাক্তারি ইত্যাদি প্রভৃতি। কারণ গভীর জঙ্গলে কখন কোনটার প্রয়োজন হয় বলা মুস্কিল।

বিভূতিভূষণ আফ্রিকার প্রকৃতির এক অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন। গল্পের পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে আমরা পাঠকরাও যেন সেই প্রকৃতির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করছি। জিম্ আর আলভারেজ জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় হতাশ। বেবুনের মাংস ক্রমশ অসহ্য অরুচিকর হয়ে যাচ্ছে। আলভারেজ গ্রামে ফিরে যেতে চাইলে জিম্ বললো এই পর্বত শ্রেণির নানা শাখা আছে সবগুলো না দেখে যাব না। এরকম ছোটো ছোটো ডায়ালগের সাহায্যে লেখক তাঁর চরিত্রগুলোকে গড়ে তুলেছেন। ছোট্ট ছোট্ট কথার মাধ্যমে এই চরিত্রগুলো যে সাধারণ মানুষদের থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র সেটা বুঝিয়ে দেয়।

একদিন একটা পাহাড়ি নদীর ধারে বালি চালতে চালতে একটা হলদে রঙের ছোটো পাথর তাদের দুজনের-ই চোখে পড়ে। নদী স্রোতে ভেসে আসা এই জিনিসটি দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত হলদে হীরে। কিন্তু এই হীরের খনি বিশাল রিখটার্স ভেল্ট পর্বতের কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে। সে খনি খুঁজে বার করা 'অমানসিক পরিশ্রম ধৈর্য সাহস সাপেক্ষ।' সে পরিশ্রম সাহস ধৈর্যের অভাব এই দুই অভিযাত্রীর ছিল। কিন্তু অমূল্য হীরক খনির প্রহরী রহস্যময় সেই দৈত্য তাদের বাধা দিল। একদিন তারা জঙ্গলের সন্ধ্যের সময় বিশ্রাম নিচ্ছিল। হঠাৎ তারা লক্ষ করল সামনের একটা তালগাছের শুকনো ডালপালাগুলো নড়ছে। ঝড়ে এরকম গাছ নড়ে। আশ্চর্য চারিদিকে বাতাস নেই কিন্তু গাছ নড়ছে। তাদের মনে হলো—গাছের গুঁড়িটা ধরে কেউ যেন ঝাঁকাচ্ছে। তালগাছের তলায় ঘন ঝোপে জিম্ ঢুকে পড়ল রহস্যভেদের জন্য। একটু বাদেই আলভারেজ একটা আর্তনাদ শুনতে পেয়ে রাইফেল হাতে

ঝোপের মধ্যে ছুটে গেল। দেখল জিম্ রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে। মুখের সামনে থেকে বুক পর্যন্ত ধারালো নখ দিয়ে কোনো বলবান জন্তু তাকে চিরে ফেঁড়ে ফেলেছে—যেমন পুরনো বালিশ ফেঁড়ে তুলো বার করে তেমনি, জিম তখনও বেঁচে। আলভারেজকে বলল শয়তান, মূর্তিমান শয়তান, পালাও পালাও। তারপরে জিম মারা গেল। আলভারেজ দেখল তালগাছের গায়ে মোটা ও শক্ত চোঁচ লেগে আছে। তার মনে হলো কোনো বলবান জানোয়ার তালগাছের গায়ে গা ঘসছিল তাই গাছটা নড়ছিল। ঝোপের বাইরে গিয়ে দেখে মাটির উপরে অজ্ঞাত জন্তুর পায়ের চিহ্ন—তার মোটে তিনটি আঙ্গুল পায়ে। পায়ের চিহ্ন কিছু দূরে গিয়ে একটা গুহার মুখে বালির উপর থেমে গেছে। এরপরে জিমের দেহ সমাধিস্থ করে আলভারেজ কাফিরদের সেই গ্রামে পৌঁছলেন। গ্রামের লোকেরা জিমের মৃত্যুর কথা শুনে ভয়ে কেউ ওখানে যায় না। এরপর আলভারেজ দেশে ফিরে বুয়র যুদ্ধে গেলেন। তারপর আহত হয়ে হাসপাতালে রইলেন, সুস্থ হয়ে একটা কমলালেবু বাগানে কাজ করলেন। তারপর আবার বেরিয়েছিলেন কিন্তু বয়স হয়েছে আল্ভারেজের। আল্ভারেজ বলল 'ইয়াং ম্যান, এবার আমার চলা বোধ হয় ফুরবে'। শংকরের হাতে একটা ম্যাপ দিয়ে বলল—

> এতে রিখটারস্ভেল্ড পর্বত ও যে নদীতে আমরা হীরা পেয়েছিলাম মোটামুটিভাবে আঁকা আছে। সাহস থাকে, সেখানে যেও, বড়ো মানুষ হবে। বুয়র যুদ্ধের পর ওই অঞ্চলে ওয়াই নদীর ধারে দু-একটা ছোটো বড়ো হীরার খনি বেরিয়েছে। কিন্তু আমরা যে হীরা পেয়েছিলুম তার সন্ধান কেউ জানে না। যেও তুমি।

ডিয়েগো আল্ভারেজের গল্প এখানে শেষ। শংকরের জীবনের আরেকটি অধ্যায়ের প্রস্তুতি পর্ব শুরু হলো— শংকরের সেবায় আলভারেজ দিন পনেরোর মধ্যে সেরে উঠল। সে চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। শংকরও মন স্থির করে ফেলেছে। আলভারেজকে সে বলল—

> তোমার অসুখের সময় যেসব কথা বলেছিলে মনে আছে? সেই হলদে হীরের খনি? শংকরের কথার উত্তরে বৃদ্ধ বলল, আমিও কথাটা যে না ভেবে বলেছি, তা মনে করো না। কিন্তু আলেয়ার পিছনে ছুটবার সাহস আছে তোমার? শংকর বলল আজই বলতো মাভো স্টেশনে তার করে আমার বদলে অন্য লোক পাঠাতে বলি। আলভারেজ কিছুক্ষণ ভেবে বলল : কর তার। কিন্তু আগে বুঝে দেখ। যারা সোনা বা হীরা খুঁজে বেড়ায় তারা সব সময় তা পায় না। আমি আশি বছরের এক বুড়ো লোককে জানতাম, সে কখনো কিছু পায়নি—তার প্রতিবারেই বলতো, এইবার ঠিক সন্ধান পেয়েছি। এই বার পাবো; আজীবন অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে আর আফ্রিকার ভেল্ডে প্রসপেকটিং করে বেড়িয়েছে।

শংকরের মনে নতুন অভাব তৈরি হয়েছে। সেই অভাববোধের আংশিক পূরণ তাদের গ্রামের জামাই প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় রেলওয়েতে

কাজ করতে এসে হয়েছিল। ন্যারেটোলজির পরিভাষায় একটি ছকের সাহায্যে আমরা বিষয়টিকে এভাবে দেখানোর চেষ্টা করব—

উপন্যাসের নাম	গল্পের অবয়ব	উপন্যাসের ঘটনা
চাঁদের পাহাড়	অভাববোধ	শংকর নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। অজ গ্রামে তার বাড়ি। সে চাঁদের পাহাড়ে যেতে চায়। কিন্তু সংসারের অনটনে তাকে পাটকলে চাকরি নিতে হবে। সুতরাং, তার মনে অভাববোধ তৈরি হচ্ছে।
	নায়ক নায়িকা সেই অভাবকে অতিক্রম করতে চায়।	শংকর তাদের গ্রামের জামাই প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখছে।
	তারা বাধা পেতে পারে, নাও পারে।	শংকর কোন বাধা পেল না। প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছয় মাস দেরি করে হলেও চিঠির উত্তর দিলেন। শংকর দক্ষিণ আফ্রিকায় চাকরি নিয়ে এলো।

শংকরের চাকরি তাকে বহু ভয়ংকর ঘটনার মুখোমুখি করিয়েছে। আফ্রিকার দুর্ধর্ষ ধূর্ত সিংহ রেলের ক্যাম্পের খুব কাছ থেকে দেখেছে। তার বিছানা থেকে কয়েক হাত দূরে ব্ল্যাক মাম্বার চোখে চোখ রেখে সে থেকেছে—যেকোনো সময় মরে যেতে পারতো, তবুও হের হাউপ্ট ম্যানের বইয়ে পড়া মাউনটেন অফ দি মুন—চাঁদের পাহাড় সে জয় করতে চায়। আল্‌ভারেজের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবার হয়তো তার সত্যিকারের অভিযাত্রী হওয়ার স্বপ্ন বা অভাবকে পূরণ করবে।

আল্‌ভারেজের কথা শেষ হওয়ার দিন দশের মধ্যে শংকর আর আলভারেজ ভিক্টোরিয়া নায়াগ্রা হ্রদে স্টীমার চড়ে দক্ষিণ মুখে মোয়ান্‌জার দিকে যাবে ঠিক করলে। পথে এক জায়গায় বিস্তীর্ণ এক প্রান্তরে হাজার হাজার জেব্রা, জিরাফ, হরিণ চরতে দেখে শংকর তো অবাক। এমন দৃশ্য সে কখনো দেখেনি। জিরাফগুলো মানুষকে ভয় করে না।

পঞ্চাশ গজ তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। আলভারেজ বলল—

> আফ্রিকার জিরাফ মারবার জন্যে গবর্নমেন্টের কাছ থেকে বিশেষ লাইসেন্স নিতে হয়। যে সে মারতে পারে না। সেজন্যে মানুষকে ওদের এত ভয় নেই। দলে দু-তিন শো হরিণ চরছে, ওদের দেখে ঘাস খাওয়া ফেলে মুখ তুলে একবার চাইলে। তার পরক্ষণেই মাঠের দূর প্রান্তের দিকে সবাই চার পা তুলে দৌড়।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রকৃতির সঙ্গে শংকরের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পরিচিত হচ্ছি। আলভারেজ সরকারের পরিবেশ সংক্রান্ত আইন কানুন বিষয়েও বেশ সচেতন। জিরাফ মারতে গেলে গভর্নমেন্টের অনুমতি নিতে হয় এর কোনো কিছু তার অজানা নয়।

কিসুম থেকে তারা এক ব্রিটিশ স্টীমারের দিকে যাচ্ছে। যাদের পকেটে রেস্তো কম। তারা ডেকে যায়। ডেকে নিগ্রো মেয়েরা পিঠে ছেলে-মেয়ে বেঁধে মুরগি নিয়ে ডেকে যাচ্ছে। মাসাই কুলিরা ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্ছে— সঙ্গে নাইরোগি শহর থেকে কাঁচের পুথি, কম দামের খেলো আয়না, ছুরি প্রভৃতি নানা জিনিস। দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষ-জন সমাজের একাংশের সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি। মোওয়ানজা থেকে ট্যাবোরার পথে সিংহের খুব ভয় রয়েছে। এই অঞ্চলটিকে সিংহের রাজা বলা চলে। এই সিংহ মানুষ খেকোও বটে। শংকরের অবশ্য রেলে কাজ করার সুবাদে অল্পবিস্তর সিংহদের পরিচয় হয়ে গেছে। তারা ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে সাবধানে চলতে লাগল।

এই ঘাস বনগুলোই সিংহদের আস্তানা। আল্ভারেজের যদিও ক্র্যাকশট অর্থাৎ তার গুলি কখনো ফসকায় না। কিন্তু তবুও শংকর বিশেষ ভরসা পেল না। কারণ ইউগান্ডার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে সিংহ অতর্কিতে হানা দেয়। রাইফেল ওঠানোর সময়টুকুও দেয় না। খুব শিগগিরি শংকরদের একটি ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হলো। একটা বড়ো বাওবাব গাছের তলায় তাদের ছোট্ট তাঁবু খাটিয়ে যখন তারা ঘুমোচ্ছিল হঠাৎ অনেক রাত্রে শংকর শুনতে পেল আলভারেজ তাকে ডাকছে 'শংকর ওঠো'। শংকর ধড়মড় করে উঠে বসল। আলভারেজ বলল, 'বন্দুক বাগিয়ে রাখো, তাঁবুর চারপাশে কি একটা বড়ো জন্তু ঘোরাফেরা করছে। শংকর শুনল তাঁবুর পাতলা ক্যাম্বিসের পর্দার বাইরে অজ্ঞাত বৃহৎ জন্তুর নিশ্বাসের শব্দ। তাঁবুর বাইরে বাওবার গাছটা দৈত্যের মতো দেখাচ্ছে। শংকর তড়িঘড়ি করে বন্দুক হাতে বিছানা থেকে নামতে উদ্যত হলে আলভারেজ তাকে বারণ করলো। পরক্ষণেই জানোয়ারটা হুড়মুড় করে তাঁবু ঠেলে ঢোকার চেষ্টা করলো। সঙ্গে সঙ্গে আলভারেজ দুটো গুলি ছুঁড়লো। শংকর গুলি চালাতে গেলেই আলভারেজ তার তৃতীয় গুলিটি ছুঁড়ে দিল। সব শব্দ থেমে গেল। পর্দার বাইরে এসে তারা দেখলো প্রকাণ্ড একটা সিংহ। তখনো মরেনি কিন্তু সাংঘাতিক আহত। আরও দুটি গুলি খেয়ে সেটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। আলভারেজ আকাশের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে বলল 'রাত এখনো অনেক বাকি, চলো ঘুমিয়ে, পড়ি।' শংকর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করল আল্ভারেজের নাসিকা গর্জন শোনা যাচ্ছে। শংকরের চোখে ঘুম নেই। আধঘণ্টা পরে শংকরের মনে হলো টাঙ্গানিয়াকা অঞ্চলে সমস্ত সিংহ আল্ভারেজের নাসিকা গর্জনের সঙ্গো পাল্লা দেওয়ার জন্যে একযোগে ডেকে উঠল। আলভারেজ হঠাৎ জেগে উঠে বলল,

রাত্রে দেখছি একটু ঘুমোতে দিলে না। আগের সিংহটার জোড়া। সাবধানে থেকো। বড়ো পাজি জানোয়ার। শংকর সিংহের গর্জন অনেকবার শুনেছে কিন্তু এই রাত্রে সেই বিরাট গর্জন তার চিরকাল মনে থাকবে। তাঁবু থেকে দূরে সরে যায় কখনো বা তাঁবুকে প্রদক্ষিণ করে।

এই ঘটনাটিকে আলভারেজ যে এখন বৃদ্ধ হলেও তার অভিযাত্রী সুলভ ইনস্টিংক্ট কিন্তু এখনো প্রখর। শংকর যখন তাঁবুতে ঘুমোচ্ছে তাঁবুর বাইরে সিংহের নড়াচড়ার শব্দেই আলভারেজ কিন্তু জেগে ওঠে বন্দুক হাতে প্রস্তুত। শংকরকে ডেকে তুলছে শংকর বন্দুক হাতে বিছানা থেকে নামতে গেলে আলভারেজ তাকে বাধা দিচ্ছে। শংকরের বন্দুক ছোঁড়ার আগেই সে গুলি ছুঁড়ছে। আলভারেজ নক্ষত্র দেখে সময় বুঝতে পারে। তারপর নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে পাতলা ক্যাম্বিসের ক্যাম্পের তাঁবুর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ছে। সিংহের ভয়ানক গর্জনে ঘুম থেকে উঠে বলছে রাত্রে দেখছি একটু ঘুমোতে দিলে না। আল্‌ভারেজের সাহস, আল্‌ভারেজের সেন্স অফ হিউমার প্রকাশ পায়। সঙ্গে সঙ্গে তরুণ এক অভিযাত্রীর যেন ট্রেনিং চলছে। আলভারেজকে দেখে তরুণ শংকরও যেন প্রস্তুত হচ্ছে। মানুষ হিসেবেও অভিযাত্রী আলভারেজ খুব ভালো। টাঙ্গানিয়াকার এক ইউরোপিয়ান শিকারী যখন শংকরকে দেখে আলভারেজকে জিজ্ঞেস করছে— এতো হিন্দু; তোমার কুলি? আলভারেজ উত্তরে বলল, আমার ছেলে। তারপর আলভারেজ শংকরের সেবার কথা সাহেবকে শোনাল। আল্‌ভারেজের মনের মধ্যে যে একটি কৃতজ্ঞ মানুষ আছে এই ঘটনা তারই খোঁজ দেয়।

শংকরকে যে সে কত ভালোবাসে কাবালো শহরের আরেকটি ঘটনায় তার প্রমাণ মিলল। শংকরদের গন্তব্য ছিল কাবালো শহর হয়ে মানকিং। কাবালো রেলস্টেশনের কাছে কতগুলো গুণ্ডা প্রকৃতির পোর্তুগিজ শংকরকে পোকার জুয়া খেলার জন্য জোরাজুরি শুরু করে। আলভারেজ তখন স্টেশনের ভেতরে ছিল। শংকর খুব ভালো বুঝতে পারে পোকার খেলার নাম করে তারা শংকরের সর্বস্ব হাতানোর ফন্দি করছে। স্বভাবতই সে পোকার খেলতে রাজি হয়নি। প্রত্যাখ্যাত পোর্তুগিজ আলবুকার্ক যার নাম, তাকে নোংরা গালি গালাজ করে বলে— 'পাকার খেল নয়তো রিভলভারের দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর।' শংকর বুঝতে পারে এই বদমাসটার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করলে মৃত্যু অনিবার্য। গুণ্ডাটা ক্র্যাক্ শট গুণ্ডা। আর সে নিজে কিছুকাল আগে পর্যন্ত রেসে কেরানিগিরি করতো। উত্তর দিতে তার হয়তো আধ মিনিট দেরি হয়েছে তার মধ্যে গুণ্ডাটা নিজের কোমরের চামড়ার হোলস্টার থেকে নিমিষের মধ্যে রিভালভার বার করে শংকরের কাছে উঁচিয়ে বলল— যুদ্ধ না পোকার। শংকরও ডাকাবুকো ছেলে, তার মধ্যে সাহসের অভাব নেই। মাথায় রক্ত উঠে গেল। সে ভাবলো পাশবিক শক্তির কাছে মাথা নীচু করবে না, বরং তার থেকে মৃত্যু ভালো। শংকর বলতে যাচ্ছে এমন

সময় পেছন থেকে ভয়ানক সাংঘাই সুরে কে যেন বলল— এই, সামলাও। গুলিতে মাথার চাঁদি উড়লো। পেছনে আলভারেজ বদমাস পোর্তুগিজটার মাথা লক্ষ্য করে বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়িয়ে। বদমাইসটা থতমত, আল্‌বুকার্ক সারেন্ডার করলো। হেসে বলল— 'আচ্ছা মেট কিছু মনে করো না আমারই হার।' তারপর দুজনকে বিয়ার খাওয়ার নেমতন্ন করলো। শংকর বিয়ার খায় না শুনে তাকে ফাঁকি দিল। প্রাণ খোলা হাসি হেসে কত গল্প করলো। শংকর বাস্তবিকই লোকটার দিকে আকৃষ্ট হল। কিছুক্ষণ আগের অপমান ও শত্রুতা সে এখন বেমালুম ভুলে গিয়ে, যাদের হাতে অপমান হয়েছে, তাদেরই সঙ্গে এমনিধারা দিলখোলা হেসে খোশ গল্প করতে পারে, পৃথিবীতে সে ধরনের লোক বেশি নেই।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে অপূর্ব মুন্সিয়ানায় চিত্রিত করেছে। আলভারেজ্, জিম্ কার্টার, আলবুকার্ক, প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর শুধু বেপরোয়া সাহসী নয় উদার এবং দিলখোলাও। আলবুকার্ককে পাঠক খুব অল্প সময়ের জন্য দেখছে অথবা বলা যেতে পারে, এই উপন্যাসে আলবুকার্কের উপস্থিতি একটুখানির জন্য, তবু তার এই স্বল্প সময়ের উপস্থিতি পাঠকমনে একটা ছাপ রাখে। একটা গুণ্ডার ভেতর একটা ভালোমানুষ আছে যাদের কোনো ভান নেই। আমাদের চারপাশে অনেক মানুষ আছে যারা উচ্চপদস্থ সমাজে প্রতিষ্ঠিত টাকাওয়ালা তাদের মধ্যে অনেকেই ভালো মানুষের ভান করে থাকে তাদের এই ভালোমানুষির আড়ালে আলবুকার্কের থেকেও সাংঘাতিক গুণ্ডা গুণ্ডামীর ফণা চুপিসারে রেখে ঘুরে বেড়ায়। আলবুকার্কদের চেনা যায় কিন্তু এদের চেনা যায় না।

প্রসাদদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আরও একটি চরিত্র, যার এই উপন্যাসে প্রত্যক্ষ কোনো উপস্থিতি নেই। কিন্তু তার পরোক্ষ উপস্থিতি আমাদের মনে বিশেষ ছাপ ফেলে। এই চরিত্রগুলো দক্ষিণ আফ্রিকার প্রকৃতির মতোই রহস্যময়। দক্ষিণ আফ্রিকার এই রহস্যময় প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখার জন্য বিশেষ মনের প্রয়োজন।

আলবুকার্কের বন্ধুত্বকে পেছনে রেখে আবার আলভারেজ আর শংকর কাবালে থেকে রওনা দিল কঙ্গো নদী বেয়ে দক্ষিণ মুখে। কঙ্গো নদীর দুপারে প্রকৃত দক্ষিণ আফ্রিকায় শংকর আজ পর্যন্ত যে প্রকৃতি দেখেছে তার থেকে এ প্রকৃতি আলাদা। এতদিন সে দেখছে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ঘাসের বন, মাঝে মাঝে বাবলা ও ইউকা গাছ। কিন্তু কঙ্গো নদীর দুধারে নিবিড় বনানী, কত ধরনের মোটা মোটা লতা বনের ফুল; বন্য প্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী, আপনার সৌন্দর্যে ও নিবিড় প্রাচুর্যে আপনি মুগ্ধ।

শংকরের মধ্যে যে সৌন্দর্যপ্রিয় ভাবুক মনটি ছিল হাজার হোক সে বাংলার মাটির ছেলে, ডিয়েগো আল্‌ভারেজের মতো শুধু কঠিন-প্রাণ স্বর্ণান্বেষী প্রস্‌পেক্টর নয়। এই রূপের মেলায় সে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে রাঙা অপরাহ্নে ও দুপুর রোদে আপন মনে কত কী স্বপ্নজাল রচনা করে।

এখানে বিভূতিভূষণ শংকরের সঙ্গে আর আল্‌ভারেজের চরিত্রের একটা তুলনা টেনেছেন। আলভারেজ কঠিন প্রাণ, স্বার্থান্বেষী প্রসপেক্টর; আর শংকর নির্ভীক, সাহসী হলেও নরম-সরম বাঙালি। প্রকৃতির রূপের মেলায় সে মুগ্ধ হয়, বিস্মিত হয়, সে এখনও স্বপ্ন দেখে। আল্‌ভারেজের সঙ্গে শংকরের একটা বড়ো তফাৎ হল অভিযাত্রী হতে গেলে যে যে দক্ষতাগুলো দরকার যেমন— বন্দুক চালনার দক্ষতা, ম্যাপ পড়তে পারার অভিজ্ঞতা শংকরের মধ্যে তখনো আমরা দেখিনি। কিন্তু শংকরের মধ্যে একটা কবি মন আছে যেটা আল্‌ভারেজের নেই। বিভূতিভূষণ যদিও আলভারেজকে কঠিন প্রাণ বলেছেন কিন্তু আলভারেজ-এর মধ্যে ভালোবাসার কৃতজ্ঞতার স্নেহের ফল ও ধারা প্রবাহিত। জিম কার্টার আল্‌ভারেজের কয়েকমাসের সঙ্গীমাত্র। তবু সে মারা গেলে ঐ বিপদের মধ্যেও আলভারেজ সারারাত তার মৃতদেহ নিয়ে জেগে বসে পরের দিন তার সৎকার করেছে। আবার শংকরের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত তাকে ছেলে বলে পরিচয় দিয়েছে। শংকরের মনে হয় অনেক রাত্রে, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে রহস্যময় বন্য প্রকৃতি তারা ভরা আকাশের তলায় তখন যেন হেসে ওঠে। আর বন্য রহস্যময় প্রকৃতির সে সৌন্দর্য দেখার জন্য শংকর মধ্য-আফ্রিকার নৈশ শীতলতাকে তুচ্ছ করেও জেগে বসে থাকে। সে ভাবে সে কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছে, কোথায় যাবে, কী এর পরিণতি কে জানে?

বেশিরভাগ মানুষের মনে কখনো না কখনো যৌবনে চলার পথে এই ধরনের দার্শনিক প্রশ্ন উঁকি মারে—কেন এলাম? কী করছি? জীবনের পরিণতি কি? শংকরের অভিযাত্রী মনের পাশে পাশে একটা ভাবুক দার্শনিক মন ও লুকিয়ে আছে। তাই বোধ হয় আফ্রিকার ব্লাক্ মাম্বা সাপের চোখের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে তার মনে হয়েছিল যুগা-যুগান্ত ধরে সে ওই জ্বলজ্বলে—বিন্দুসম চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। দুটি চোখ, দুটি আলোক বিন্দু যেন তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এরকম আলোক বিন্দুর কল্পনা করেই মনকে স্থির করতে হয়। মুনি ঋষিরা তো এই আলোক বিন্দুকেই কল্পনা করেন।

'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ তার চরিত্র-চিত্রায়ণে, প্রকৃতির বর্ণনায়, ছোটো ছোটো ঘটনাবলির বর্ণনার মধ্যে একটা দার্শনিক ডাইমেনশান রেখেছেন। আল্‌ভারেজ আর শংকর তাদের গন্তব্য সানকিনিতে বোটে করে পৌঁছালো। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হল। এখানে জঙ্গল কম বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এখানে অধিকাংশ পাহাড় রুক্ষ বৃক্ষ শূন্য নেড়া। শংকর ওখানকার প্রকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। সূর্যাস্তের রঙ, জ্যোৎস্নারাত্রির মায়া, এদেশকে রাত্রের অপরাহ্নে রূপকথার গরিব রাজ্য করে তোলে। আলভারেজ শংকরকে সাবধান করে দিয়ে বলল— 'এই ভেল্ড অঞ্চলে সব জায়গা দেখতে একরকম বলে পথ হারাবার সম্ভাবনা কিন্তু খুব বেশী।' দু-একদিনের মধ্যেই শংকর সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা অর্জন করল জল আনতে গিয়ে

আধ ঘণ্টা এদিক-ওদিক ঘুরে শংকর বুঝতে পারল যে সে পথ হারিয়েছে। কিন্তু অনভিজ্ঞতার দরুণ যে বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারল না। যখন কিছুতে সে আর তার তাঁবুর সামনের আগুনটা দেখতে পেল না তখন তার খুব ভয় হল। সঙ্গে তার আল্‌ভারেজের বন্দুক আর দুটি মাত্র টোটা। এই জন-মানব শূন্য সিংহ-সংকুল অজানা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সে বুঝতে পারল অনাহারে এবং কনকনে শীতে বিনা কম্বলে তাকে রাত কাটাতে হবে। তার সঙ্গে একটা দেশলাই পর্যন্ত নেই— শংকর অভিযাত্রী হিসেবে খুবই অসাবধানী নয় কি?

আলভারেজ পরের দিন অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা পর ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তাদের তাঁবু থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে একটা ইউফোর্বিয়া গাছের তলা থেকে শংকরকে উদ্ধার করে নিয়ে এল। আলভারেজ বলল—

> তুমি যে পথ ধরেছিলে শংকর। তোমাকে আজ খুঁজে বার করতে না পারলে, তুমি গভীর থেকে গভীরতর মরু প্রান্তরের মধ্যে গিয়ে পড়তে। কাল দুপুর নাগাদ তৃষ্ণায় প্রাণ হারাতে। এর আগে তোমার মতো অনেকেই রোভেসিয়ারে ভেল্ডে এভাবে মারা গিয়েছে। এ-সব ভয়ানক জায়গা। তুমি আর কখনো তাঁবু থেকে ওরকম বেরিও না। কারণ তুমি আনাড়ি। মরুভূমিতে ভ্রমণের কৌশল তোমার জানা নেই ডাহা মারা পড়বে।

বোঝা যাচ্ছে শংকরের মধ্যে অভিযাত্রী সুলভ দক্ষতা কম, সে সত্যি সত্যি অভিযাত্রী হিসেবে আনাড়ি।

মাস দুই ধরে রোডেশিয়া এঙ্গোলার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ ভেল্ড অতিক্রম করে অবশেষে তারা দূরে মেঘের মতো পর্বত শ্রেণি দেখলো। আলভারেজ ম্যাপ মিলিয়ে বলল ওই পর্বত শ্রেণি তাদের গন্তব্য রিখ্‌টাস ভেল্ড। রিখটাস ভেল্ড পৌঁছতে তাদের আরো চল্লিশ মাইল যেতে হবে। আফ্রিকার এইসব খোলা জায়গায় অনেক দূর থেকে জিনিস দেখা যায়। এখানে শংকর তার পছন্দের বভিবার গাছ দেখতে পেল। বভিবার গাছ বট-অশ্বত্থ গাছের মতো, কিন্তু বট-অশ্বত্থের মতো ছায়া বিশাল এই গাছে নেই। আঁকা বাঁকা সারা গায়ে বড়ো বড়ো আঁচিল বা আর মনে হয় আরব্য উপন্যাসের একটা বেঁটে কুবু দৈত্য। একদিন সন্ধ্যেবেলায় বনে শীতে তাঁবুর সামনে আলভারেজ শংকরকে বলল, এখানে সর্বত্র হীরে ছড়ানো আছে, —এটা হীরের খনির দেশ। কথা শেষ করতে না করতে আলভারেজ বলে উঠল— 'ওরা কারা? শংকর সামনে বসে বসে ওর কথা শুনছিল;' বলল— 'কোথায় কে?' কিন্তু আলভারেজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার হাতের গুলির মতোই অব্যর্থ। শংকর একটু দূরে কতগুলি অস্পষ্ট মূর্তি দেখতে পেল। আলভারেজ বলল— 'শংকর বন্দুক নিয়ে এসো, চট করে যাও।' শংকর বন্দুক হাতে বাইরে এসে দেখে আলভারেজ নিশ্চিন্ত মনে ধূমপান করছে। কিছু দূরে অজানা মূর্তি কয়টি অন্ধকার দিয়ে আসছে। একটু পরে তারা তাঁবু

অগ্নিকুণ্ডের বাইরে দাঁড়াল—অগন্তব্য কয়েকটি কৃষ্ণবর্ণ পরনে লেংটি, গলায় সিংহের লোম, মাথায় পালক—সুগঠিত চেহারা। তাঁবুর আলোয় মনে হচ্ছিল যেন কয়েকটি ব্রোঞ্জের মূর্তি। আলভারেজ জুলু ভাষায় বলল— 'কি চাও তোমরা? ওদের মধ্যে খানিকক্ষণ কীসব কথাবার্তা হলো তারপর ওরা সবাই মাটিতে বসে পড়ল।' আলভারেজ শংকরকে বলল— 'শংকর ওদের খেতে দাও।' আলভারেজ শংকরকে সাবধান করে দিয়ে বলল, বড়ো বিপদ, হুশিয়ার শংকর। যদিও তাদের রাতের খাবার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তবুও আলভারেজ ওদের সঙ্গে খেতে বসল। কারণ এদেশের রীতি অতিথিদের সঙ্গে খেতে হয়। আলভারেজ খেতে খেতে জুলু ভাষায় আগন্তুকদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করল। অনেকক্ষণ পরে ওদের যাওয়ার সময় আলভারেজ ওদেরকে একটি করে সিগারেট দিল।

ওরা চলে গেলে আলভারেজ শংকরকে বলল—

> এরা মাটাবেল জাতির লোক ভয়ানক দুর্দান্ত। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে অনেকবার লড়েছে। শয়তানকেও ভয় করে না। ওরা সন্দেহ করেছে আমরা ওদের দেশে হীরের খনির সন্ধানে এসেছি। এ জায়গাটা ওদের সর্দারের। এখানে গভর্নমেন্টের কোনো আইন খাটবে না। ধরবে আর নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে মারবে। তাই এখান থেকে চলে যাওয়া ভালো। শংকর জিজ্ঞেস করল তাকে তুমি বন্দুক আনতে বললে কেন? আলভারেজ হেসে বলল— ভেবেছিলুম যদি ওরা খেয়েও না ভোলে কিংবা... বুঝতে পারি যে ওদের মতলব খারাপ ভোজনরত অবস্থাতেই গুলি করবো... রিভলবার পেছনে রেখে তবে খেতে বসেছিলাম। এই কটাকে সাবাড় করে দিতাম। আমার নাম আলভারেজ। আমিও এক সময় শয়তানকে ভয় করতুম না, এখনো করিনে। ওদের হাতেই মাছ মুখে পৌঁছনোর আগেই আমার পিস্তলের গুলি ওদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিত।

আলভারেজ চরিত্রটি আমাদেরকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। একটা মানুষের এত প্রাচুর্য। যেমন বড়ো মন তেমনি তার দক্ষতা, একটা অভিযাত্রীর যা যা গুণ থাকা প্রয়োজন তার থেকেও বেশি গুণ আল্‌ভারেজের মধ্যে আছে। এই সব এলাকা তার নখদর্পণে এমনকি এইসব অঞ্চলের অনেক জনগোষ্ঠীর ভাষা ইতিহাসও তার অজানা নয়। আর তার সাহস, প্রখর ইংস্টিংট তা প্রতি মুহূর্তে পাঠক বুঝতে পারছে। শংকরকে পিতার মতো আগলে আগলে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু অভিযাত্রী নয়, মানুষ হিসেবে আলভারেজ পাঠকদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা আদায় করে নিয়েছে।

আরো পাঁচ-ছ দিন পথ চলার পর তারা একটা বড়ো পর্বতের পাদদেশে ঘন ট্রপিক্যাল অরণ্যাদির মধ্যে প্রবেশ করল। শংকরের মনে হলো এই বনের মধ্যে যদি পথ হারায় সারাজীবন ঘুরলেও এই বন থেকে বার হয়ে আসার সাধ্য তার হবে না। আলভারেজও তাকে সাবধান করে দিয়ে বলল—

> এখানে সবই এক রকম এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাকে পৃথক করে চিনে নেওয়ার কোন চিহ্ন নেই। ভালো বুশম্যান না হলে পদে পদে বিপদে পড়তে পারে। বন্দুক না নিয়ে আফ্রিকার বন শৌখিন ভ্রমণের পাট নয়।

শংকর অবশ্য জঙ্গলের চেহারা দেখে সেটি বিলক্ষণ বুঝেছে। সে আলভারেজকে বলেছে, তোমার সেই হলদে হীরের খনি কতদূর? এটাই তো রিখ্‌টাস ভেল্ড পর্বতমালা। আলভারেজ হেসে বলল—

> তোমার ধারণা নেই আসল রিখটার্স ভেল্ডের এটি বাইরের থাক। আট নয় হাজার বর্গ মাইল সমস্ত রিখটার্স ভেল্ড পার্বত্য অঞ্চল ও অরণ্য। এই বিশাল অজানা অঞ্চলের কোন খানটাতে এসেছিলুম আজ সাত আট বছর আগে ঠিক সে জায়গাটি খুঁজে বার করা কি ছেলে খেলা, ইয়াংম্যান। আল্‌ভারেজের মতো অভিযাত্রী ও বুশম্যান ও প্রকৃতির সামনে অজ্ঞ।

শংকর আলভারেজকে জানায় তাদের খাবার ফুরিয়েছে। সুতরাং, শিকারের ব্যবস্থা দেখতে হবে, না হলে পরের দিন থেকে হাওয়া খাওয়া ছাড়া গতি থাকবে না। আলভারেজ উত্তর দিল— গাছে গাছে মেলা বেবুন আছে। সুতরাং, বেবুনের দাপনা ভাজা খাওয়া যাবে।

একটা বড়ো গাছের নীচে তাঁবু খাটিয়ে ওরা আগুন জ্বালল, খাওয়া দাওয়ার পর তারা যখন আগুনের সামনে বসল, তখনো বেলা আছে। আলভারেজ বড়ো তামাকের পাইপ টানতে টানতে বলল—

> জানো শংকর আফ্রিকার এই সব অজানা অরণ্যে এখনো কত জানোয়ার আছে যার খবর বিজ্ঞানশাস্ত্র রাখে না। খুব কম সভ্য মানুষ এখানে এসেছে।

সত্যি তো এই বিশাল প্রকৃতির কতটুকু আমরা জানি বুঝি। যেটুকু জানি বা বুঝি বলে আমরা দাবি করি সেটুকুও কি আমরা সঠিকভাবে জানি, বুঝি? আফ্রিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, সংস্কৃতি জিম্‌ কার্টারের মৃত্যু। প্রকৃতির রাজ্যের গোলকধাঁধা এইসব বুঝিয়ে দেয় প্রকৃতি অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়।

আলভারেজের মুখ থেকে শংকর শুনল ওকাপি বলে জানোয়ারের কথা— ১৯০০ সালের আগে মানুষ যার সম্বন্ধে জানত না। সাধারণ বুনো শুয়োরের থেকে প্রায় তিনগুণ বড়ো আকারের কঙ্গোর লুয়া লাবু অরণ্যের মধ্যে যার সন্ধান পাওয়া যায়। মাথাটা কুমিরের মতো। মাথায় গণ্ডারের মতো শিং আছে। গলাটা অজগর সাপের মতো লম্বা ও আঁশওয়ালা দেহটা জলহস্তীর মতো। এই বিরাট দেহ হিংস্র জানোয়ারের নাম রোডেসিয়ান মনস্টার। ১৮৮০ সালে জেমস্‌ মার্টিন বলে একজন প্রসপেক্টর তার ডাইরিতে এর কথা উল্লেখ করেছেন। জুলু ভাষায় এর নাম ডিঙ্গোনেক। মিস্টার মার্টিন অবশ্য দূর থেকে এই জন্তুটি দেখেছিলেন।

শংকর জিজ্ঞেস করে তুমি কোনো অদ্ভুত জানোয়ার দেখনি কখনো? শংকরের মনে হলো দুর্ধর্ষ ও নির্ভীক অল্ভারেজ, দুঁদে অব্যর্থ লক্ষ্য অল্ভারেজ এই প্রশ্ন শুনে যেন শিউরে উঠল। অলভারেজ ভয় পেয়েছে। আলভারেজের ভয় যেন শংকরের মনেও চেপে বসল। এই সম্পূর্ণ অজানা বিচিত্র রহস্যময়ী বনানী, এই বিরাট পর্বত প্রাচীর যেন এক গভীর রহস্যকে যুগ যুগ ধরে গোপন করে আসছে—যে বীর হও, যে নির্ভীক হও, এগিয়ে এসো সে, কিন্তু মৃত্যুপণে ক্রয় করতে হবে সে গহন রহস্যের সন্ধান। রিখ্‌টারস্‌ ভেল্ড পর্বতমালা ভারতবর্ষের দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় নয়, এদেশের মাসাই। জুজুল মার্টাবেল প্রভৃতি আদিম জাতির মতোই ওর আত্মা নিষ্ঠুর বর্বর নরমাংস লোলুপ। সে কাউকে রেহাই দেবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রকৃতির একটা মনোমুগ্ধকর রূপ আছে। শংকর যে রূপ মাধুরীতে বিস্ময়াবিষ্ট সেই প্রকৃতির ভয়াল রূপই তাকে ভীত করে তুলল।

দিন কাটে তারা ক্রমশ গভীরতর জঙ্গলে প্রবেশ করছে। সভ্য জগৎ বহুদূরে। পথ কোথাও সমতল নয় শুধু চড়াই আর উৎরাই। মাঝে মধ্যে কর্কশ এবং দীর্ঘ টুক্‌স ঘাসের বন। এই গভীর জঙ্গলে খাবার জল দুষ্প্রাপ্য। এক-একটা ঝরনা যদিবা দেখা যায় অল্ভারেজের মানা সেই জল খেতে, ঠান্ডা চায়ে তৃষ্ণা মেটাতে হয়, জলের তেষ্টা কি চা মেটাতে পারে? এমনি করে তারা পৌঁছে গেল রিখ্‌টার্স ভেল্ডের আসল রেঞ্জে। কিন্তু রিখটার্স ভেল্ডের যেদিকে তারা পৌঁছেছে সেদিক থেকে পর্বত আরোহন খুবই দুরূহ ব্যাপার। পর্বতের উপরে চড়া শুরু হলো যতই তারা ওপরের দিকে উঠছে অরণ্য তত নিবিড় হচ্ছে। আলো নেই বললেই চলে। জঙ্গলের মধ্যে সূর্যের আলো ঢোকে না বললেই চলে। পায়ের নীচে শিলাখণ্ড কোথাও বা সেই শিলাখণ্ড এত তীক্ষ্ণ যে পায়ে ঢুকে যেতে পারে।

বাংলার সমতলভূমিতে আজন্ম শংকরের কষ্ট আরো বেশি। সে আর চলতে পারে না তবু মুখ ফুটে সে কথা আলভারেজকে বলতে পারে না, এই কুণ্ঠায় যদি অলভারেজ ভাবে ইস্টইন্ডিজের মানুষগুলি অপদার্থ। এই মহাদুর্গম পর্বত অরণ্যে সে ভারতের প্রতিনিধি। এমন কোনো কাজ সে করতে পারে না যাতে তার মাতৃভূমির মুখ ছোটো হয়ে যায়।

শংকরের মধ্যে একটা জাতীয়তাবোধ আছে। বিভূতিভূষণ যে সময় লিখছেন সেই সময় জাতীয়তাবাদের একটা মূল্যবোধ ছিল।

শংকর পাহাড়ের এই জঙ্গলের সৌন্দর্যে আবার বিস্ময়াবিষ্ট। বড়ো চমৎকার বন, যেন পরীর রাজ্য, মাঝে মাঝে ছোটোখাটো ঝরনা বনের মধ্যে দিয়ে খুব ওপর থেকে নীচে নেমে যাচ্ছে। গাছের ডালে ডালে নানা রঙের টিয়াপাখি চোখ ঝলসে দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বড়ো বড়ো ঘাসের মাথায় সাদা সাদা ফুল, অর্কিডের ফুল গাছের গায়ে, গুড়ির গায়ে। এখানেই শংকর লম্বা দাড়ি গোঁফওয়ালা কলবাস বাঁদর

দেখল। হাত খানিক লম্বা দাড়ি নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। এদের দেখলে বালখিল্য মুনিদের কথা মনে পড়ে। মুনি মানে যিনি মৌন থাকেন। এই বাঁদরগুলি চুপচাপ মুনিসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে বসে আছে। এই জঙ্গলে পায়ের তলায় মাটি নেই শুধু পচা পাতা। আলভারেজ তাকে শেখালো এইসব জায়গায় খুব সাবধানে পা ফেলতে হয় নয়তো হঠাৎ ভুস করে ওই ঝরা পাতার মধ্যে মানুষ ডুবে যেতে পারে। মাঝে-মধ্যে জঙ্গল এত ঘন হয়ে উঠছে মনে হচ্ছে গাছ না কাটলে আর এগোনো যাবে না। কোথাওবা খুরের মতো ধারালো চওড়া এলিফ্যান্ট ঘাসের বন। ঠিক যেন রোমান যুগের দু-ধার তলোয়ার। এখানে কোনো পদক্ষেপই নিরাপদ নয়। দু-হাত তফাতে কি আছে দেখা যায় না। বাঘ থাকতে পারে। সিংহ থাকতে পারে। থাকতে পারে বিষাক্ত সাপ। শংকর মাঝে মধ্যেই একটা ঢোল বা ডুগডুগি বাজানোর শব্দ শুনতে পেল। আলভারেজ বলল বেবুন কিংবা বনমানুষ বুক চাপড়ালে ওরকম শব্দ হয়। এই জঙ্গলে রাত্রি বেলায় এত সর্ব বিচিত্র ধরনের শব্দ হয়, ভয়ে শংকর সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারে না। শুধু ভয় নয় ভয়মিশ্রিত বিস্ময়। প্রকৃতির এই বিরাট নিজস্ব পশুশালায় রাত্রিবেলায় কেউ ঘুমোয় না।

সমস্ত অরণ্য গভীর রাত্রে যেন ক্ষেপে ওঠে। কত রকমের শব্দ—হায়নার হাসি, কলবাস বানরের কর্কশ চিৎকার, বনমানুষের বুক চাপড়ানোর আওয়াজ, বাঘের ডাক। তারা পাঁচ হাজার ফুট ওপরে পৌঁছে গেছে। এখানে বন্য পুষ্পের মেলা—টকটকে লাল ইরিত্রিনা প্রকাণ্ড গাছে ফুটেছে। পুষ্পিত ইপোমিয়া লতার ফুল দেখতে বাংলাদেশের বনকলমির ফুলের কথা মনে পড়ে গেল। সাদা ভেরোনিকা ঘন সুগন্ধে বাতাসকে ভরিয়ে রেখেছে। বন্য কফির ফুল, রঙিন বেঙ্গোঁনিয়া ফুটে রয়েছে যত্রতত্র। সাদা বেলুনের মতো মেঘপুঞ্জ গাছ-পালার মধ্যে আটকাচ্ছে আর কখনো নীচে নেমে এসে ভেরোনিকার বন ভিজিয়ে দিচ্ছে। অভূতপূর্ব সেসব দৃশ্য।

কিন্তু সাড়ে সাত হাজার ফুটের পর থেকে বনের প্রকৃতি একেবারে বদলে গেল। গাছের গুঁড়িগুলো ঘন শ্যাওলায় আবৃত। এই শ্যাওলা কোথাও কোথাও এত লম্বা যে গাছ থেকে মাটিতে ঠেকবার অবস্থা। এখানে সূর্যের আলো নেই; সবসময় যেন গোধূলি। এখানে বাতাস বইছে কিন্তু সে বাতাসে কোনো শব্দ নেই। পাখির ডাক নেই, কোনো জানোয়ারের ডাক নেই, যেন অন্ধকার নরকে প্রেতের দলের মধ্যে এসে পড়া। প্রকৃতির এই ভয়াল ভয়ঙ্কর রূপ আমাদের পাঠক-মনে একটা উদ্বেগ তৈরি করছে, কি হয় কি হয়?

এই সাড়ে সাত হাজার ফুট উঠেও তারা পর্বতের সেই খাঁজটা পেল না যেখান দিয়ে তারা রেঞ্জটা পার হয়ে ওপারে যাবে। আলভারেজ চিন্তিত। তার হাতের ম্যাপেও আলভারেজের আস্থা নেই। শংকররা তাঁবু ফেলে একটা জায়গায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসল। হঠাৎ তাঁবুর বাইরে এক অস্পষ্ট কষ্টকর কাশির আওয়াজ পাওয়া

গেল যেন কোনো থাইসিস রোগী খুব কস্ট করে কাশছে। এ যেন ঠিক মানুষের গলার স্বর না। শংকর বন্দুক নিয়ে তাঁবুর বাইরে যেতে গেল আলভারেজ তাকে হাত ধরে থামিয়ে দিল। শংকর দেখল আলভারেজের মুখ ভয়ে বিবর্ণ। বাইরে নিবিড় অন্ধকারে একটা ভারী অথচ লঘুপদ প্রাণী যেন বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে গেল। তারা দুজনেই চুপচাপ। এই নৈঃশব্দ পাঠক-মনের উদ্বেগকে আরো গাঢ় করে তুলল। কেন আলভারেজের মুখ বিবর্ণ? তাঁবুর বাইরে কিসের আওয়াজ ছিল?

পরেরদিন সকালবেলায় ভিজে মাটিতে শংকর দেখলো এগারো ইঞ্চি লম্বা তো হবেই এরকম একটা পায়ের দাগ, কিন্তু পায়ে তিনটি মাত্র আঙুল। শংকরের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও মনে পড়ল—জিম কার্টারের মৃত্যু কাহিনি, তিন আঙুলওয়ালা অজ্ঞাত হিংস্র জানোয়ার– বুনিপ। আলভারেজের বিবর্ণ মুখের কারণ বোঝা গেল। শংকর আলভারেজকে ইচ্ছে করে অজ্ঞাত জানোয়ারের পায়ের দাগটা দেখালো না। কি জানি যদি আলভারেজ নেমে যেতে চায়। চারপাশে এত নৈঃশব্দের কারণ কি এই বুনিপ? সাড়ে সাত-আট হাজার ফুট ওপরের বনে অসভ্য মানুষ কেন বন্য জন্তুও কি এর ভয়েই আসে না?

সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে ঝমঝম করে পর্বতের ঢালু বেয়ে হাজার ঝরনার ধারায় বৃষ্টির জল নীচে নামছে। এই বন ও পাহাড় চোখে কেমন যেন ধাঁধা ধরিয়ে দেয়। এত উঁচুতে উঠে এসেছে এরা তবু নীচের অরণ্যে গাছের মাথা দেখে সেগুলিকে সমতল ভূমির অরণ্য বলে ভ্রম হয়।

এই ঝমঝম বৃষ্টি মুখর দিনে শংকরের একদমই বৃষ্টি মাথায় পথ চলার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আলভারেজের ইচ্ছায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্য দিয়ে অরণ্যানি ভেদ করে তারা উপরে উঠতে লাগল। সারাদিন ধরে তারা পথ চলল, কাপড়-চোপড় সব ভিজে একসা শংকর কেমন যেন একটা অবসাদ অনুভব করল। এই প্রথম তার মনে হলো এই অজানা দেশে অজানা পর্বতের মাথায় ভয়ানক হিংস্র জন্তু সংকুল বনের মধ্যে দিয়ে বৃষ্টি মুখর সন্ধ্যায় কোনো অনির্দেশ্য হীরক খনি বা তার চেয়েও আজানা মৃত্যুর অভিমুখে সে চলেছে কোথায়। আলভারেজ কে? তার পরামর্শে কেন সে এখানে এল? হীরের খনিতে তার দরকার নেই। বাংলাদেশের খড়ে ছাওয়া ঘর, ছায়া ভরা শান্ত গ্রাম্যপথ, ক্ষুদ্র নদী, পরিচিত পাখিদের কাকলি—সেসব যেন কত দূরের কোন অবাস্তব স্বপ্নরাজ্যের জিনিস। আফ্রিকার কোনো হীরক খনি তার কাছে মূল্যবান না।

শংকর গ্রামে বসে চাঁদের পাহাড় যাওয়ার স্বপ্ন দেখতো, চাঁদের পাহাড় একটা স্বপ্ন—একটা প্রতীক। শংকর তার চেনা জগতের বাইরে অজানা অচেনা দেশে যেতে চাইতো। যা মানুষ দেখতে পায় না, জানতে পারে না—তার জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা

দুর্বার। যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই। যাহা পাই তাহা চাই না। রিখ্‌টার্স ভেল্ড পর্বতে এসে শংকরের মনে হচ্ছে গ্রামের চেনা শান্ত রাস্তা, খড়ে ছাওয়া ঘর, ছোট্ট নদী, পরিচিত পাখির কুজন আফ্রিকার হীরক খনির থেকে কম মূল্যবান নয়।

কিন্তু অনেক রাত্রে যখন নির্মেঘ আকাশে চাঁদ উঠল সেই অপার্থিব জ্যোৎস্নাময়ী রজনী অবর্ণনীয়। শংকরের মনে হলো সে আর পৃথিবীতে নেই। বাংলা বলে কোনো দেশ নেই। সব স্বপ্ন হয়ে গেছে। তার সব অবসাদ কেটে গেল। শংকর আর কোথাও ফিরতে চায় না। হীরা চায় না, সে এখন পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বহু উর্ধ্বে এক দেবলোকের অধিবাসী। এর চারধারের সৌন্দর্য কোনো মানুষ আগে চোখে দেখেনি। এই গহন নৈঃশব্দ্য আগে কোনো মানুষ অনুভব করেনি। জনমানবহীন বিশাল পর্বত ও অরণ্য এই গভীর নিশীথে মেঘলোকে আসন পেতে আপনাতে আপনি আত্মস্থ। ধ্যানগম্ভীর অনির্দেশ্য সেই নৈঃশব্দ্যকে অনুভব করা যায়। মুনিরা মৌন থেকে কোলাহলমুখর গভীর জগৎ থেকে মুখ তুলে সেই রকম মৌন আত্মস্থ হওয়ার চেষ্টা করেন। এরকম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাস জুড়ে ছড়িয়ে আছে।

সেদিন রাত্রে তাদের তাঁবুর কাছে অজ্ঞাত তিন আঙ্গুলের সেই জন্তুটি আবার এল। আলভারেজ শংকরকে বলল, 'তুমি ঘুমোও আমি জেগে আছি।' শংকর আলভারেজকে ঘুমতে বললে আলভারেজ ক্ষীণ হেসে বলল, 'পাগল তুমি জেগে কিছু করতে পারবে না শংকর ঘুমিয়ে পড়। ওই মেঘ দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।'

দূরের ওই বিদ্যুৎ-এর মধ্যে আলভারেজ কি কোনো অশনি সংকেত দেখেছিল। রাত ভোর হওয়ার সময় মুশলধারে বৃষ্টি এলো, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ, তেমনি মেঘের গর্জন, মনে হচ্ছিল এ যেন প্রলয়ের বৃষ্টি। বৃষ্টির বহর দেখে আলভারেজ পর্যন্ত দমে গেল। বৃষ্টি থামলে ওরা আবার চলা শুরু করলো। ভাগ্য তাদের সুপ্রসন্ন, তারা পাহাড়ে খাঁজ বা সাডেলটা দেখতে পেল। আরো দুদিন বাদে তারা রিখ্‌টার্স ভেল্ড পর্বতের আসল রেঞ্জের ওপরের উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছলো। কিন্তু একমাস ধরে খুঁজেও তারা আলভারেজের সেই নদী আর উপত্যকা খুঁজে পেল না। নিরুপায় হয়ে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে ইতিমধ্যে চর্তুদিক ভাসিয়ে ভয়ানক বর্ষা নামল। একদিন তো অতিবর্ষণের ফলে তাদের তাঁবুর সামনে একটি ক্ষীণকায় ঝরনা ভীম মূর্তি ধারণ করে তাদের তাঁবু ভাসানোর উপক্রম করেছিল। আলভারেজের সজাগ ঘুমের জন্য তারা সে যাত্রায় বেঁচে গেল। একদিন তো শংকর শিকার করতে গিয়ে মারাত্মক বিষলতার তলায় বসে বিশ্রাম নিতে গিয়ে মরতে বসেছিল। আলভারেজ সময়মতো না পৌঁছালো শংকর সেদিন মারাই যেতো। একদিন তারা ঝরনার পাশে বালিতে সোনার খোঁজ পেল। এক টন বালি ধুলে আউন্স তিনেক সোনা পাওয়া যেত, আলভারেজের মন উঠল না। জঙ্গলের নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালো কিন্তু সেই নদী আর উপত্যকা কোথাও নেই। শংকর আলভারেজকে বলল, 'চল ফিরে যাই'।

শংকরের সঙ্গে আলভারেজের একটা বেসিক তফাৎ আছে। আলভারেজ যেমন সোনা বা হীরে প্রসপেক্টার শংকরের কিন্তু সেরকম কোনো উদ্দেশ্য নেই। সে আড্ভেনঞ্চারের জন্য এসেছে। তার মনে সোনার জন্য খুব একটা আকাঙ্ক্ষা নেই। যদিও আলভারেজ শংকরকে অসুস্থ অবস্থায় বলেছিল, সাহস থাকে সেখানে (রিখ্টার্স ভেল্ড পর্বতের কথা আলভারেজ বোঝাতে চেয়েছে) যেও বড়ো মানুষ হবে। আলভারেজ বড়ো মানুষ হবার কথা ভাবতো। বড়ো মানুষ মানে বড়োলোক।

রিখ্টার্স ভেল্ড পর্বত বড়ো ভয়ংকর। আলভারেজ এবং শংকর পাঁচ-ছমাস ধরে একই জায়গায় চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অরণ্য বা মরুভূমিতে এরকম 'ডেড সারকেল' থাকে। আসলে তাদের কম্পাস খারাপ হয়ে গেছে ভয়ানক ঝড় ও বিদ্যুতে। এখন তাদের অবস্থা খুব সংকটজনক। ম্যাপ গণ্ডগোল, কম্পাস খারাপ। শংকরের তো এই ঘূর্ণিপাকের কথা শুনে দিক্-জ্ঞান লোপ পেয়েছে। কিন্তু আলভারেজকে কোনো কিছু থামাতে পারেনি। আলভারেজ বলল এখান থেকে গুলাওয়েও এবং সলসভেরি পাঁচশো মাইলের মধ্যে। অবশ্য মাঝে শ-দু মাইল মরুভূমি আছে, তারপরে দুর্গম জঙ্গল। আলভারেজ বলল ওখানে গিয়ে শংকর বা সে নিজে বন্দুকের টোটা, খাবার কিনে আনবে। আল্ভারেজের কাছে ঘন দুর্গম জঙ্গল, মরুভূমি, চারশো পাঁচশো মাইল কিছুই না।

বিভূতিভূষণ লিখেছেন—

> আলভারেজের মুখের এই কথাটা বলো শুভক্ষণে শংকর শুনেছিল। দৈব মানুষের জীবন যে কত কাজ করে তা মানুষে কি সব সময়ে বোঝে? দৈবক্রমে বুলাওয়েও ও সলসবেরী দুটো শহরের নাম তাদের অবস্থানের দিক ও এই জায়গাটা থেকে তাদের আনুমানিক দূরত্ব শংকরের কানে গেল। এরপর যে কতবার মনে মনে আলভারেজকে ধন্যবাদ দিয়েছিল এই নাম দুটো বলবার জন্যে।

পাঠকের মনে জিজ্ঞাসা তৈরি হচ্ছে কেন শংকর আলভারেজকে মনে মনে ধন্যবাদ দিচ্ছে?

খুব শিগগির শংকরদের আর এক অভিজ্ঞতা হলো।একদিন মাঝরাতে তাদের ঘুম ভেঙে গেল। তাঁবুর পাশ দিয়ে বন্য জন্তুর দল উর্ধ্বশ্বাসে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে। দূরে কোথাও অদ্ভুত চাপা মেঘের গর্জনের মতো শব্দ হচ্ছে মনে হচ্ছে। হাজার জয়ঢাক যেন একসঙ্গে বাজছে। হঠাৎ মনে হলো প্রলয় ঘটল সারা পৃথিবী যেন দুলে উঠল। তারা দু'জনেই মাটিতে টলে পড়ে গেল। মনে হলো সঙ্গে সঙ্গে হাজারটা বাজ যেন কাছে কোথায় পড়ল। মাটি যেন চিরে ফেঁড়ে গেল, আকাশটাও যেন সেই সঙ্গে ফাটল। আলভারেজ বলল ভূমিকম্প, পরক্ষণেই তারা দেখলো রাত্রির ঘুটঘুটে অন্ধকার দূর হয়ে পঞ্চাশ হাজার বাতি জ্বলে উঠল। এবার তাদের নজর পড়ল দূরে পাহাড়ের দিকে। সেখানে পাহাড়ের চূড়ায় প্রকাণ্ড অগ্নিলীলা শুরু

হয়েছে। কি ভয়ংকর সুন্দর দৃশ্য। ওরা চোখ ফেরাতে পারল না। মনে হলো লক্ষটা তুবড়ি, লক্ষটা রং মশাল এক সঙ্গে জ্বলছে আর সেই সঙ্গে হাজারটা বোমা ফাটছে। চারদিকে গন্ধকের উৎকট নিঃশ্বাস বন্ধকরা গন্ধ। তারা তাঁবুর মধ্যে ঢুকলো টলতে টলতে। শংকরের বিছানায় একটা নেকড়ের বাচ্চা গুটিশুটি হয়ে বসে আছে। আলভারেজ বলল— 'রেখে দাও, আমাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে যখন প্রাণভয়ে'। এরপরে আগ্নেয়গিরির আগুন পাথর এসে পড়তে শুরু করল, সামনের জঙ্গলে আগুন লেগে গেল। তারা কোনোরকমে জিনিসপত্র টেনে হিঁচড়ে ছুট লাগালো। আল্‌ভারেজের কাছে শংকর জানলো ওই জুলুভাষায় এই আগ্নেয়গিরির নাম ওল্‌ডোনিওরলেঙ্গাই—এর মানে অগ্নিদেবের শয্যা। নাম দেখে বোঝা যায় এই অঞ্চলের প্রাচীন লোকদের কাছে আগ্নেয় প্রকৃতি অজ্ঞাত ছিল না। একশো-দুশো বছর নীরব থাকার পর এই আগ্নেয়গিরি আবার ফাটল।

বিপদও কাটে না। আগ্নেয়গিরির বিপদ মিটলো তো তারা দেখলো (ডেড সার্কেল) থেকে তারা বেরোতে পারেনি। তারা যে গাছগুলিতে চিহ্ন দিয়েছিল ডি.এ. লিখে সে রকম একটি গাছ আবার তাদের চোখে পড়ল। আলভারেজ একটি বড়ো গাছের উপর চড়ে দিক্ নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগল। শংকর তখন তাঁবুতে বসে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ পড়ছে। হঠাৎ সেই পায়ের শব্দটি শোনা গেল আর সঙ্গে ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ। আমরা পাঠকরাও টানটান হয়ে বসলাম, কিসের শব্দ?

শংকর সংযম হারিয়ে ভয়ে বন্দুকের গুলি চালালো সঙ্গে প্রত্যুত্তরে আল্‌ভারেজের রিভলবারের আওয়াজ পাওয়া গেল। আর কোনো আওয়াজ পাওয়া গেল না।

শংকর ভাবলো জানোয়ারটা বোধহয় পালিয়ে গেছে। শংকর তাঁবুর বাইরে এসে বন্দুকের গুলি ছুঁড়ে আলভারেজকে সংকেত দিতে চাইল কিন্তু তার মধ্যে অঘটন ঘটে গেল। দুটো গুলির আওয়াজ শোনা গেল আর একটা অস্পষ্ট চিৎকার। শংকর ছুটে গেল, দেখলো একটা বড়ো গাছের তলায় আলভারেজ শুয়ে আছে, সারা শরীরে রক্ত মাখা, গায়ের কোটটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। গলার নীচে কাঁধের দিক থেকে খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে কোনো অসাধারণ বলশালী জন্তু। তার তীক্ষ্ণ ধার নখ বা দাঁত দিয়ে পিঠখানা ফালা ফালা করে ছিঁড়ে দিয়েছে। পাশের নরম মাটিতে শংকর দেখলো পায়ের দাগ, তিনটে মাত্র আঙ্গুল। আলভারেজকে তুলে শংকর তাঁবুতে নিয়ে এল। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনা ফিরে এলো। দুপুরের পর থেকে সে ভুল বকতে শুরু করলো। নিজের মাতৃভাষায়। বিকেলের দিকে শংকরকে যেন চিনতে পেরেছে। ইংরেজিতে বলল, 'শংকর, এখনও বসে আছ? তাঁবু ওঠাও—চল যাই।' তারপর অপ্রকৃতিস্থের মতো নির্দেশহীন ভঙ্গিতে হাত তুলে বললে রাজার ঐশ্বর্য লুকোনো রয়েছে এই পাহাড়ের গুহার মধ্যে তুমি দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখতে পাচ্ছি। চল আমরা যাই, তাঁবু ওঠাও—দেরি কোরো না।'

মরার সময় আলভারেজ সেই পাহাড়ের গুহার মধ্যে লুকানো ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে মরল। গুহা আলভারেজের সাবকনসাস বা অবচেতন। বুঝিবা, অবচেতন মনে মানুষের লোভ মাৎসর্য লোকানো থাকে। আলভারেজ তাঁবু ওঠালো এই পৃথিবী থেকে। আলভারেজ আর শংকরের যে যাত্রা সেটিকে যদি মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তাহলে এ যাত্রা সচেতন মন থেকে অবচেতন মনের যাত্রা। রিখ্‌টার্স ভেল্ড পর্বতের ভয়াল ভয়ংকর সুন্দর মারণঘূর্ণিপাক জঙ্গল যেন অবচেতন মনের প্রতীক। পাহাড়ের জঙ্গলে যেমন হিংস্র জন্তু রয়েছে, বুনিপ আছে, ভয়ংকর আগ্নেয়গিরি আছে—এগুলি অবচেতনের অবদমিত কামনা বাসনার প্রতীক হতে পারে। আলভারেজের গভীরে ছিল অবদমিত হীরের আকাঙ্ক্ষা— আর রিখ্‌টারস ভেল্ড পর্বতের জঙ্গল তার বুকের গভীর গহনে লুকিয়ে থাকা সেই হীরের খনি। আলভারেজ তাকে খুঁজে পেল না। এই অবচেতন মনে ডুব দিয়ে কখনো অবচেতন মন পার হয়ে অরূপ মনেও যায়। যে মন নির্মেঘ আকাশে চাঁদের আলোর মতো আলোকিত সেখানে কোনো পৃথিবী নেই দেশ নেই। সেখানে কেউ হীরে চায় না সোনা চায় না। যার সৌন্দর্য সবসময় ইউনিক। সেখানে সব সময় গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করে। শংকর রিখটার্স ভেল্ড পর্বতে সেই সৌন্দর্য অবলোকন করেছে। সে নৈঃশব্দ্য অনুভব করেছে। অরূপ সেই মনের অভিজ্ঞতা তার হয়েছে।

ভয় আর বিপদ মানুষকে সাহসী করে তোলে। শংকর সারারাত আলভারেজের মৃত দেহের পাশে সজাগ ছিল। পরের দিন সকালে আলভারেজকে একটা বড়ো গাছের তলার সমাধিস্থ করল। দুটো গাছ ক্রুসের মতো করে লতা দিয়ে বেঁধে সমাধির উপর পুঁতে দিল। আলভারেজের কাগজ-পত্রের মধ্যে শংকর দেখলো ওপর্টো খনি বিদ্যালয়ের একটা ডিপ্লোমা। আলভারেজ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিভূতিভূষণ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে, আর সবার মতো বিভূতিভূষণও মনে করতেন শিক্ষিত মানুষদের কথাবার্তা মূর্খ ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরেদের মতো হয় না। শংকরের সন্দেহ হতো যে সে (আলভারেজের) নিতান্ত মূর্খ ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে নয়। চাঁদের পাহাড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে অসভ্য বলা হয়েছে। তার কারণ প্রচলিত শিক্ষায় তারা শিক্ষিত নয়। তারা প্যাগান, তারা হীরের রক্ষাকর্তা উপদেবতা বুনিপকে বিশ্বাস করে। তাদের গ্রামের সীমানায় জঙ্গলে অপদেবতারা থাকে বলে বিশ্বাস করে, তাদের মেয়ের পেটে ব্যথা হলে তার জন্য কোনো অপদেবতাকে দায়ি মনে করে। তাদের কাছে প্রকৃতি রহস্যময় একটা শক্তি। প্রকৃতির শাসন তারা মান্য করে বলে তাদের লোভ লাগাম ছাড়া নয়। যে সাদা পাথরের (হীরে) খোঁজে সভ্য জগতের মানুষরা বারবার এই ভয়াল প্রকৃতির ভ্রূকুটিকেও তুচ্ছ করে ছুটে আসে, সেই সাদা পাথরের কিন্তু তাদের কাছে কোনো মূল্য নেই। আর এটাই সত্যি যে এই সাদা পাথরের জন্য যখন তার প্রাণটাই চলে যায় তখনই

কি এই পাথরটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে, নাকি এই পাথরটার কোনো মূল্য থাকে? সভ্য জগতের লোভ সত্ত্বেও তারা সভ্য আর তথাকথিত অসভ্য লোকগুলো অল্পে সন্তুষ্ট। যে শিক্ষা মানুষের মধ্যে অভাববোধ পূরণ করার জন্য ছুটিয়ে বেড়ায় সেই শিক্ষা ভালো না মন্দ পাঠকই বিচার করবেন। অনেকেই বলবেন, এই সব অভিযাত্রীরা কলম্বাস থেকে ভাস্কো-দা-গামা সবাই বিপদ তুচ্ছ করে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলো ধনরত্ন আহরণ করতে। আলভারেজকে তাদের উত্তরসূরী যদি বলা হয় তাহলে খুব একটা ভুল হবে না। পাশ্চাত্যের লোভের প্রতীক আলভারেজরা।

কিন্তু শংকরের মুখ দিয়ে বিভূতিভূষণ আলভারেজ সম্পর্কে বলছেন, দুঃসাহসিক ভবঘুরের উপযুক্ত সমাধি বটে। অরণ্যের বনস্পতিদল ছায়া দেবে সমাধির ওপর। সিংহ, গরিলা, হায়না, সজাগ রাত্রি যাপন করবে, আর সবারই ওপরে সবাইকে ছাপিয়ে বিশাল রিখ্‌টার্স ভেল্ড পবর্তমালা অদূরে দাঁড়িয়ে মেঘলোকে মাথা তুলে খাড়া পাহারা রাখবে চিরযুগ।

কিন্তু তথাকথিত সভ্য মানুষ প্রকৃতিকে জানবার নাম করে, প্রকৃতিকে আবিষ্কার করার নাম করে, তাকে সবসময় ছিন্ন ভিন্ন করে তাকে উৎপীড়ন করে। কখনো কখনো সেখানে থাকে প্রকৃতির বুকে লুকিয়ে থাকা সম্পদের জন্য লোভ, কখনোবা থাকে প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনের ঔদ্ধত্য। এই যে বেবুন, হরিণ, সিংহ প্রকৃতিতে ছিল তাদের গুলি করে নিজেদের ক্ষিদে মেটানো, গাছপালা ছিন্ন-ভিন্ন করে নিজেদের চলার পথ করে নেওয়া পায়ের নীচের দীর্ঘকাল ধরে নিশ্চিতে জমে ওঠা পুরু শ্যাওলার বুক বিদীর্ণ করে হেঁটে যাওয়াকে কি বলা যেতে পারে? আলভারেজ, জিম্‌কার্টার শংকর কটা বেবুন মেরেছে কটা হরিন মেরেছে তার হিসেব আছে? প্রকৃতির বাঘ সিংহ যদি লোকালয়ের প্রবেশ নিষেধ বোধ অগ্রাহ্য করে আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করে নিহত হয়, তাহলে প্রকৃতির রাজ্যে প্রবেশ করে তার নিয়ম-শৃঙ্খলা নষ্ট করলে তার অবস্থাও একই হবে। আলভারেজের ছোট্ট নেকড়েটার জন্য সহমর্মিতার কথা মাথায় রেখেও এই মন্তব্য করা হল।

আলভারেজ মারা গেছে, শংকর একা। এই বিশাল পর্বতমালায় সে নিঃসঙ্গ। তাঁবুতে বসে সে মনস্থির করে ভাবতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল আলভারেজের সেই কথাটা— 'সলসভেরি।' এখানে থেকে পূর্ব-দক্ষিণ কোনো আন্দাজ পাঁচ-ছয়শো মাইল। সলসভেরি দক্ষিণ রোডেশিয়ার রাজধানী। শংকর ভাবল তার জন্মকোষ্ঠীতে লেখা আছে সে অনেক দিন বাঁচবে। শংকরের মনে নতুন এক অভাববোধ সৃষ্টি হয়েছে। যে দুঃসাহসিক জীবনের স্বপ্ন সে দেখতো আজ তার কোলের মধ্যে থেকেও সে ভাবছে তাকে বাঁচতে হলে এখান থেকে চলে যেতে হবে। যে গ্রাম থেকে, যে সভ্য জগৎ থেকে, সে একদিন চাঁদের পাহাড়ে যেতে চাইছিল সেই চাঁদের পাহাড়

থেকে সে আজ ফিরতে চাইছে। সে ফিরতে চাইছে দুঃসাহসিক এই জীবন থেকে ছোট্ট গ্রামের শ্যামল শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে।

একটা বই যখন পাঠক হাতে নেয় তখন বইটির মলাট এবং টাইটেল পাঠকের মনে বইটি সম্পর্কে একটা ইম্প্রেশান সৃষ্টি করে। 'চাঁদের পাহাড়' নামটার মধ্যে একটা রূপকথার অনুষঙ্গ আছে। চাঁদের পাহাড় মানে চাঁদ যে পাহাড়ে থাকে হতে পারে। চাঁদের আলো দিয়ে তৈরি পাহাড় হতে পারে। বিভূতিভূষণ নিজে লিখেছেন...স্বপ্ন। সত্যিকার চাঁদের পাহাড়ের মতোই দূরের জিনিস হয়ে থাকবে চিরকাল।...চাঁদের পাহাড় আমাদের অবচেতনে লুকিয়ে থাকা সেই স্বপ্ন রাজ্য, যেখানে আমরা প্রতিটি মুহূর্তে যেতে চাই। শংকরের মনে গভীরতর প্রদেশে লুকিয়ে থাকা সেই অপূর্ব সুন্দর চন্দ্রালোকিত রাজ্য সে রিখ্‌টার্স ভেল্ড পর্বতে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু আজ শংকর ভাবছে আজ তাকে যেতে হবে পাঁচশো-ছয়শো মাইল দূরে সলস্‌ভেরিতে, যে করেই হোক পৌঁছাতে হবে। এইবার চাঁদের পাহাড়ের বুকে চিরে তার গন্তব্য তার মা-বাবা, তার গ্রাম—সেই চাঁদের পাহাড়ে (যেটার জন্য আমরা আকাঙ্ক্ষা করি সেটাইতো চাঁদের পাহাড়?) সে পৌঁছতে চায়। তার এই অভাববোধে তাকে সাহায্য করতে পারে আলভারেজের ম্যাপগুলো। এই ম্যাপগুলোর সাহায্যেই সে তার অভাবকে অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু অনেক দেখবার পরে সে বুঝতে পারলো এই অরণ্য পর্বতমালার সম্বন্ধে কোনো ম্যাপেই বিশেষ কিছু দেওয়া নেই। এক আলভারেজের ও জিম কার্টারের খসড়া ম্যাপখানা ছাড়া—তাও এত সংক্ষিপ্ত এবং তাতে এত সাংকেতিক ও গুপ্তচিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে যে, শংকরের পক্ষে তা প্রায় দুর্বোধ্য। কারণ এদের সবসময়েই ভয় ছিল যে ম্যাপ অপরের হাতে পড়লে পাছে আর কেউ ওদের বনে ভাগ বসায়। সুতরাং এই ম্যাপগুলো শংকরকে তার অভাব অতিক্রমে খুব একটা সহায়তা করতে পারবে না বলেই মনে হচ্ছে। দেখা যাক। শংকর আলভারেজের মৃত্যুর চতুর্থদিনে পূর্বদিকে আন্দাজে রওনা দিল।

শংকর পথ চলতে লাগল ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয় তাহলে সে প্রাণে বাঁচবে নচেৎ মৃত্যু অবধারিত। আলভারেজের সঙ্গে থাকার সুবাদে শংকর 'বুশক্র্যাফট' বা গভীর বনে চলার দক্ষতা, খানিকটা শিখেছে। আর ছিল তার প্রবল মনের জোর—আফ্রিকার ব্ল্যাক মাম্বা সাপের মুখোমুখি সেটা পাঠক প্রত্যক্ষ করেছে।

দু-তিনটে ছোটো পাহাড় পার হয়ে কখনো গভীর কখনো পাতলা জঙ্গল পার হয়ে শংকর এগোতে লাগল। জানত দীর্ঘ এলিফ্যান্ট ঘাসের জঙ্গল এলে বুঝতে হবে যে তারা বনের প্রান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। কারণ গভীর জঙ্গলে এলিফ্যান্ট ঘাস জন্মায় না। কিন্তু এলিফ্যান্ট ঘাসের চিহ্ন তো দূরের কথা শংকর দেখে শুধুই বনস্পতি আর নীচু বন-ঝোপ। শংকরের সঙ্গে এখন আলভারেজের ম্যান কিলার

রাইফেল, জলের বোতল, টর্চ, ম্যাপগুলো, কম্পাস, ঘড়ি, একটা কম্বল সামান্য কিছু ওষুধ আর বন্দুকের টোটা। রাত্রিবেলায় দুটো গাছের ডালে মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে দড়ির দোলনা খাটিয়ে তার তলায় আগুন জ্বালিয়ে রাত কাটায় কারণ তাঁবুটা যদিও হাল্কা তবুও সে সঙ্গে আনেনি। সারারাত বন্য জন্তুর আনাগোনা, বেবুনের হাসি, চিতা বাঘের ভাঁটার মতো চোখ, এইসবের মধ্যে সে আধোঘুমে রাত কাটায়। দিনের বেলায় 'ফ্লাইং ব্লাইন্ড' পথ চলে, ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। সে পরিষ্কার বুঝতে পারে সে দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম জ্ঞান তার নেই। পঞ্চম দিনে সে একটা পাহাড়ের তলায় বিশ্রামের জন্য দাঁড়াল। কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে গুহার বাইরে জিনিসপত্র রেখে টর্চ জ্বালিয়ে গুহার ভেতরে ঢুকলো। এদিক, ওদিক, সেদিক ব্যাস শংকর হারিয়ে গেল। আর সে গুহার বাইরে বেরতে পারল না। পাঠকের উদ্বেগ—আলভারেজের মৃত্যুর পর থেকেই শংকরের কি হবে? শংকর গুহার ভিতরে হারিয়ে গিয়েও প্রথমদিকে মাথাটা ঠান্ডা রাখল। পায়ের তলায় শীতল জলের স্রোত অনুভব করে টর্চ জ্বালিয়ে স্রোতের উজান দিক বুঝে (উজান দিকে গুহার মুখ সাধারণত হয় না) সে পথ চলতে লাগল। পথে তার পায়ে ঠেকল ঠান্ডা পাইথন। টর্চের আলোয় পাইথনের চোখকে দিশেহারা করে শংকর এগিয়ে চলল। এঁকে বেঁকে জলের স্রোতের নানা ফেঁকড়ি ধরে কখনো কুঁজো হয়ে, কখনো মাজা দুমড়ে চলতে চলতে হঠাৎ দেখলো অন্ধকারের ফ্রেমে আঁটা কয়েকটি নক্ষত্র। মুক্তি। শংকর গুহার বাইরে বেরোনোর পথ খুঁজে পেয়েছে।

গুহার গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাওয়ার সময় তার পথের দিশা রাখতে শংকর ঝরনার ভিতর থেকে অজস্র সাদা নুড়ি পাথর পকেটে নিয়েছিল, যা দিয়ে তার চলার পথে এস লিখে লিখে চিহ্ন রেখেছিল। সেগুলো আসলে আলভারেজ জিম্ কার্টার এবং বহু অভিযাত্রীর কাঙ্ক্ষিত সেই হীরে।

শংকর যখন গুহার বাইরে এল তার পকেটে একটি মাত্র সাদা পাথর। শংকর তখনো জানেনা তার পকেটে যে পাথরটি আছে সেটি হীরে, না জেনেই শুধুমাত্র স্মারক হিসেবে সেটিকে সে পকেটে রেখে দিল।

পরের দিনই এলিফ্যান্ট ঘাস দেখা গেল বনের মধ্যে। সন্ধ্যের আগে অরণ্য শেষ হয়ে খোলা জায়গা দেখা দিলে পাঠক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু তারা জানে না এই খোলা জায়গার পরে শংকরের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে?

ন্যারেটোলজির পরিভাষায় বলতে গেলে সাস্‌পেন্স এন্ড সারপ্রাইস, উদ্বেগ এবং বিস্ময় (যা অপ্রত্যাশিত) যে কোনো গল্প বা উপন্যাসকে মনোগ্রাহী করে তোলে। গল্প বা উপন্যাস মাত্রই সংঘাত থাকে। আর আমরা পাঠকরা সেই সংঘাতের শেষ খুঁজি। সাসপেন্স সেই 'শেষ'কে শুধু পিছিয়ে দেয়। পাঠক-মনের প্রত্যাশিত ঘটনা

যদি না ঘটে তাহলে পাঠক টানটান হয়ে বসে। চাঁদের পাহাড়ে এরকম অনেক সাসপেন্স সারপ্রাইজ আছে।

শংকর যখন খোলা প্রান্তরে উপস্থিত হলো তখন কে জানত সামনে অতি ভীষণ জনমানবহীন, জলহীন, পথহীন মরুভূমি। আলভারেজের ম্যাপে এর নাম তৃষ্ণার দেশ। একটি বিশেষ পথ ধরে না গেলে এ মরুভূমিতে মৃত্যু অবধারিত। শংকর গুহার গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে এলে পাঠক স্বস্তি পেয়েছিল কিন্তু সামনে 'তৃষ্ণার দেশ'। অর্থাৎ পাঠকের প্রত্যাশা ধাক্কা খেল।

আবার ভাগ্য বা অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে শংকর এগিয়ে চলল। শংকরের সাহস এবং নির্ভীকতায় কোনো সন্দেহ করা যায় না। কিন্তু সাহস এবং নির্ভীকতা এক জিনিস আর প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে, গভীর অরণ্য অথবা মরুভূমির মধ্যদিয়ে পথ চলার জন্য একটা বিশেষ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন। ম্যাপ দেখে গন্তব্যস্থানের দিক নির্ণয় করার ক্ষমতা শংকরের ছিল না। যেটা জিম্ কার্টার বা আলভারেজের ছিল। মরুভূমিতে কূপের অবস্থান বোঝাবার জন্য আলভারেজ কি একটা অংক কষতো। শংকর সেটা দেখেছে কিন্তু লিখে নেয়নি। সুতরাং শংকরের অদৃষ্টের ওপর ভর করা ছাড়া উপায় নেই। সুদূর প্রান্তর, পাহাড়, ক্যাকটাস ও ইউকোরিয়ার বন। মাঝে মাঝে গ্রানাইট পাথরের মধ্যে দিয়ে ভয়ংকর কষ্টের পথ চলা। খাবার নেই, জল নেই, পথের দিশা নেই, মানুষের মুখ দেখা নেই, দিনের পর দিন শূন্য দিগ্বলয় লক্ষ্য করে পথ চলা—এ এক হতাশ পথযাত্রা—মাথার ওপরে আগুন সূর্য, পায়ের নীচেও জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো বালি-পাথর, সূর্য উঠছে, অস্ত যাচ্ছে, নক্ষত্র উঠছে। চাঁদ উঠছে, অস্ত যাচ্ছে, মরুভূমির গিরগিটি ডাকছে, মাইল ফলক নেই, কত মাইল অতিক্রম হলো তার হিসেব নেই, এ কোন অনির্দিষ্টের দিকে যাত্রা; খাদ্য বলতে দু-একটা পাখি বা মরুভূমির বুর্জাড শকুনির বিস্বাদ মাংস, জল পাওয়া তো সৌভাগ্য। পোকা ভর্তি লাল জল পাশে একটা মরে ঢোল হাওয়া পচা জন্তু, সেই জলই শংকরকে আকণ্ঠ পান করতে হয়েছিল। অথবা আগুনের মতো কাদা গোলা জলে তাকে তৃষ্ণা মেটাতে হয়েছে। মরুভূমি যে কি ভয়ংকর শংকর ক্রমশ বুঝতে পারল।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় জলের জন্য শংকর পাগল প্রায়। তারপর মরুভূমিতে দিনে যেমন ভীষণ উত্তাপ তেমনি রাত্রে বেলায় প্রচণ্ড ঠান্ডা। শংকরের ফেরার কোনো পথ নেই। এই মরুভূমিতে ছোটো ছোটো গ্রানাইটের ঢিপি আছে। শংকর এই পাহাড়ের একটি ছোট্ট গুহায় সেই রাতে আশ্রয় নিল।

গুহার ভেতরে শংকর একটা পিপে দেখতে পেল। পিপের কাছে গিয়ে দেখে পিপের পাশে একটা নর কংকাল। পিপেটার পাশে একটা ছিপি আঁটা বোতল। কাগজটায় ইংরেজিতে কী লেখা আছে। কৌতুহলবশত, শংকর সেই পিপেটা

নাড়িয়েছে অমনি পিপের তলা থেকে একটা প্রকান্ড সাপ হাত তিনেক উঁচুতে লাফিয়ে উঠল। সাপটা বোধহয় ছোবল দিতে এক সেকেন্ড দেরি করেছিল। সেই এক সেকেন্ডে শংকরের রাইফেল থেকে গুলি ছুটল, স্যান্ড ভাইপারের মাথাটা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। মরুভূমিতে স্যান্ড ভাইপার একটা মারাত্মক সাপ। শংকর বারবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসছে। ভাগ্য তার সাথ দিচ্ছে। রেলওয়েতে চাকুরি করার সময় থেকে সিংহ, বিষাক্ত গোখরো, ভয়ংকর ব্ল্যাক মাম্বা, বিষাক্ত গাছ, গুহার ভিতরে পাইথন এবং গুহার ভিতরে পথ হারানো সব কিছু থেকে সবসময় তার অদ্ভুত পরিত্রাণ হয়েছে। তার ভাগ্য তাকে গভীর জঙ্গলের বাইরেও বার করে এনেছে। ভাগ্যদেবতা সবসময় তাকে সঙ্গ দিচ্ছে। পিপেতে দুর্গন্ধময় কালো জল পেল, সেটাই সে আকণ্ঠ পান করল। এবার সে বোতলের ভেতর থেকে পাওয়া কাগজটা পড়ার চেষ্টা করল। সে কাগজ থেকে জানল ওই নরকংকালটি ছাব্বিশ বছর বয়সের আত্তিলিও গাত্তির। আত্তিলিও তার নিজের কথা ওই কাগজটিতে লিখে গেছে। আত্তিলিও হীরের খোঁজে রওনা দিয়েছিল এবং হীরের সন্ধানও সে পেয়েছিল। আত্তিলিও লিখেছে এই অরণ্য ও পর্বতের সে উপদেবতাকে আমি এই গুহার মধ্যে দেখেছি—ধুনোর কাঠের মশালের আলোয় দূর থেকে আবছায়াভাবে। সত্যিই ভীষণ তার চেহারা; জ্বলন্ত মশাল হাতে ছিল বলেই সেদিন আমার কাছে সে ঘেঁষেনি। এই গুহাতেই সে সম্ভবত বাস করে। হীরের খনির সে রক্ষক, এই প্রবাদের সৃষ্টি সেই জন্যেই বোধ হয় হয়েছে।

আত্তিলিও বুনিপকে দেখেছিল আর খোঁজ পেয়েছিল সেই সাদা পাথর হীরের। কিন্তু দ্বিতীয়বার সঙ্গীদের নিয়ে গুহার মধ্যে হীরের সেই জায়গা আর খুঁজে পায়নি। সেই নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি মারপিট। এই মারামারিতে দুজন সঙ্গী মারা গেল। আত্তিলিও আর তার দুজন সঙ্গী মারাত্মক আহত হলো। সেদিনই রাতে দু-সঙ্গী মারা গেল আর আত্তিলিও মারা যাওয়ার আগে ওই কাগজে সব কথা লিখে গেছিল। এই চিঠিতে আত্তিলিও লিখে গিয়েছিল যে তার জুতোর মধ্যে পাঁচখানা হীরে লুকানো আছে এবং সেটা সে যিনি তাকে কবর দিচ্ছেন তাকে দান করে গেলেন। আত্তিলিওর সাদা পাথরগুলো দেখে এবং তার গুহার বর্ণনা পড়ে শংকর বুঝতে পারল যে গুহাতে সে পথ হারিয়েছিল সেই গুহা জিম কার্টার, আলভারেজ, আত্তিলিওর স্বপ্ন-গুহা, হীরের গুহা—যে গুহার জন্য এরা সবাই মৃত্যুবরণ করেছে।

আত্তিলিওর মৃতদেহের সদ্‌গতি করে শংকর আবার পথ চলতে শুরু করল। তার মনে হলো ও অভিশপ্ত হীরার খনির সন্ধানে যে গিয়েছে সে আর ফেরেনি। আত্তিলিও গত্তি ও তার সঙ্গীরা মরেছে, জিম্ কার্টার মরেছে। এরা সবাই বা কতলোক মরেছে তার ঠিক কি? এইবার তার পালা। এই মরুভূমিতেই তার মৃত্যু এই বীর ইটালিয়ান যুবকের মতো।

পাঠকমনে আবার উদ্বেগের সঞ্চার হলো সত্যি কি শংকরের আলভারেজ বা জিম কার্টারের মতো দশা হবে? দুপুর রোদে পথ চলতে চলতে মরুভূমির প্রখর উত্তাপে সে মরীচিকা দেখতে শুরু করল। কোনোক্রমে মরুভূমির করাল গ্রাস পার হয়ে সন্ধেবেলায় সে হঠাৎ দূরে মেঘমালার মতো পর্বতমালা দেখতে পেল। শংকরের মনে হল, সে কি মরীচিকা দেখছে? কিন্তু রাত দশটা পর্যন্ত পথ চলেও জ্যোৎস্নার আলোয় সে ওই একই দৃশ্য দেখলো। জ্যোৎস্না রাতে মরীচিকা দেখা যায় না। ওই পর্বতমালা রোডেশিয়ান প্রান্তবর্তী চিমনিমানি পর্বতমালা।

চিমনিমানি পর্বতমালা দেখে শংকরের মনে আশার সঞ্চার হলো। পাঠকরাও একটু রিলাক্স ফিল করলো। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় এক। শংকর মরুভূমি এড়াতে পাহাড় টপকানো স্থির করলো। সে ভাবল না সাড়ে বারো হাজার উচ্চ চিমনিমানি পর্বতমালা পেরনো রিখ্‌টার্স ভেল্ড পেরনোর মতো শক্ত। একদিন, দুদিন, তিনদিন, চলেও সে বুঝতে পারলো না সাত আট মাইল পাহাড় পেরোতো এতদিন লাগছে কেন? পাহাড়ে ওঠার সময় পাথরে চোট খেয়ে তার পা ফুলে একাকার। একে তো দীর্ঘ দিন তার খাওয়া-দাওয়ার কোনো ঠিক নেই, তার ওপর পায়ের এই আঘাত শংকরকে বিপর্যস্ত করে দিলো। অবসন্ন দেহে সে একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিলো। খাবার নেই জলও প্রায় শেষ। পঞ্চম দিন থেকে তার মাথায় শকুন উড়তে শুরু করলো। শংকর ভাবলো তার দিন কি সত্যি শেষ হলো এবার? এতদিন এত বিপদের মধ্যেও শংকরের কোনোদিন এরকম কথা মনে হয়নি। শংকর সত্যি সত্যি ভয় পেতে শুরু করল। সন্ধেবেলা সে পাথরের আড়ালে একটা নেকড়েকে দেখতে পেল তার জিভ লক্‌লক্‌ করছে। শংকরকে দেখতে পেয়ে সে পাথরের আড়ালে সরে গেল। পশুরা নাকি আগে থেকে অনেক কথা জানতে পারে। সত্যি কি শংকরের দিন শেষ?

মনে জোর করে শংকর হাড়ভাঙা শীতরাত্রিতে কাঠকুঠো জোগাড় করে আগুন জ্বালাল। অগ্নিকুণ্ডের আগুনের বাইরে ঘন অন্ধকারে একটা জন্তু দেহ মিশিয়ে বসল। শংকর দেখল কোয়েট বা বন্য কুকুর জাতীয় জন্তু। রাত বাড়তে থাকলে দশ পনেরোটা কোয়েট এসে জুটে অন্ধকারে অসীম ধৈর্য নিয়ে বসে রইল। নেকড়েটাও মাঝে মধ্যে এসে দেখে যেতে লাগল, সঙ্গে জুটল দুটো হায়না।

শংকরের গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। তার মনে হলো সেও রিখ্‌টার্স ভেল্ড থেকে হীরে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে না। আত্তিলিও গাত্তি, জিম্‌ কার্টার, আলভারেজ তারা সবাই অদৃষ্টের এক অদৃশ্য তারে গাঁথা।

বিভূতিভূষণ কি অদৃষ্টবাদী? আলভারেজ মারা যাওয়ার পর শংকর বলেছিল তার কুষ্ঠিতে আছে সে অনেকদিন বাঁচবে। আর এই বিশ্বাস নিয়েই সে অজানা-অচেনা বিপদ-সংকুল রিখ্‌টার্স ভেল্ডের পথে হাঁটা শুরু করেছিল।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সে মাঝে মাঝে আগুন থেকে জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে অপেক্ষমান পশুগুলিকে তার কাছ থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করতে থাকে। ক্লান্ত দেহ নিয়ে সে চোখ খুলে বসে রইল কারণ ঘুমিয়ে পড়লে ওই কোয়েটগুলো তাকে জ্যান্তই ছিঁড়ে খাবে। মৃত্যুর মুখোমুখি শংকরের এই অসাধারণ মনের জোর তাকে মৃত্যুর থেকেও বড়ো করে তুলল। শংকর ভাবতে লাগল, যদি সে মরে সে মৃত্যু তার বীরের মৃত্যু হবে। তার কাছে জীবন-মৃত্যু অদৃষ্টের খেলা। দু-দিন এই ভয়াবহ রাত্রি কাটানোর পর শংকর জঙ্গলে বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেল। শংকরের একটা মাত্র টোটা অবশিষ্ট, অদৃষ্টের ওপর ভরসা করে সেই গুলি খরচ করে শংকর আওয়াজ দিল। উত্তরে দু'বার বন্দুকের আওয়াজ হলো। ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক জরীপ করবার দল কিম্বালি থেকে কেপটাউন যাবার পথে চিমনিমানি পর্বতের নীচে কালাহারি মরুভূমির উত্তর-পূর্ব কোণে তাঁবু ফেলেছিল। সঙ্গে সাতখানা বেল টায়ার ক্যাটারপিলার ঢাকা বসানো মোটর গাড়ি। এদের দলে নিগ্রো কুলি ও চাকরবাকর বাদে ন'জন ইউরোপীয়।

ওরাই শংকরকে উদ্ধার করলো। উপন্যাসের শেষে শংকর সলসবেরিতে এসে খবরের কাগজে তার অভিজ্ঞতার কথা বলল। সলসবেরিতে সে বিখ্যাত লোক হয়ে গেল। ইটালিয়ান বানসাল্ট জেনারেল অফিসে আত্তিলিও গাত্তির কথা জানালো। তার চারখানা পাথর বিক্রি করে শংকর বোম্বেগামী জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আলভারেজকে বিদায় জানাল।

আবার তাকে আফ্রিকায় ফিরতে হবে। এখন জন্মভূমির টান। জন্মভূমির কোলে এখন সে কিছুদিন কাটাবে। তারপর দেশেই সে কোম্পানি গঠন করার চেষ্টা করবে। আবার সুদূর রিখটার্স ভেল্ড পর্বতে ফিরবে রত্নখনির পুনর্বার অনুসন্ধানে—খুঁজে সে বার করবেই।

ততদিন বিদায়।

শংকর অবশেষে তার অভাববোধ দূর করলো অদৃষ্টের সহায়তায়।

‘চাঁদের পাহাড়’ : ঔপনিবেশিক আধিপত্যের সাংস্কৃতিক বিরোধ

তাপস পাল

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর কালজয়ী সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য। চোদ্দোটির বেশি উপন্যাস, উনিশটি গল্প-সংকলনে দুশোটির বেশি গল্প, সাতটি দিনলিপি-ভ্রমণকাহিনি, ‘বিচিত্র জগৎ’ নামক কল্পভ্রমণের বই নিয়ে তাঁর সাহিত্যজগৎ সমৃদ্ধ। কিন্তু উপন্যাস, ছোটোগল্প ও ডায়রিধর্মী রচনাগুলির মধ্যদিয়ে তিনি যে সাহিত্যভুবন নির্মাণ করেছিলেন তার আওতা থেকে যাতে কিশোর-কিশোরীরাও বাদ না যায়, সে দিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাই ‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯), ‘অপরাজিত’ (১৯৩২) কিংবা ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’ (১৯৩৫)-এর মতো উপন্যাসের পর তিনি অ্যাডভেঞ্চারধর্মী উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় ‘চাঁদের পাহাড়’। ঔপনিবেশিক কালপর্বে রচিত এই উপন্যাসে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি ঔপন্যাসিকের পক্ষপাতিত্বও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। তাই নিছক অ্যাডভেঞ্চারধর্মী উপন্যাসের অন্তরাল থেকে ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদী ধারণার বিরুদ্ধে কিছু সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের ছবিও খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয় ‘চাঁদের পাহাড়’ উপন্যাসটির এক অন্য পাঠ।

১

বাংলা তথা ভারতের আঞ্চলিক প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘চাঁদের পাহাড়’ উপন্যাসে তাঁর কিশোর কল্পনাপ্রবণ মনের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার পল্লিপ্রকৃতি থেকে পৌঁছে গেছেন আফ্রিকার শ্বাপদ-সংকুল পরিবেশে। দেশান্তরের ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশকে মূর্ত করে তুলেছেন অসাধারণ বাচনিক দক্ষতায়। উপন্যাসের শুরুতেই তিনি জানিয়েছেন—

> চাঁদের পাহাড় কোনও ইংরিজি উপন্যাসের অনুবাদ নয়, বা ঐ শ্রেণির কোনো বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত নয়। এই বই-এর গল্প ও চরিত্রগুলি আমার কল্পনাপ্রসূত।[১]

তবে কল্পনার বিশ্ব গড়লেও বাস্তবের মাটি থেকে তিনি বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি। আর তাই সাহায্য নিয়েছেন বেশকিছু বিদেশি ভ্রমণমূলক পুস্তকের।

উপন্যাসটির কাহিনি ও বর্ণনার দিকে নজর দিলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, তাঁর অ্যাডভেঞ্চার ধর্মী লেখাগুলির মধ্যে 'চাঁদের পাহাড়' নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। বিপদসংকুল আফ্রিকার প্রাকৃতিক পরিবেশে ভারতীয় তথা বাঙালি যুবক শংকরের অভিযান ও পদে পদে বিপদের সম্মুখিন হওয়া পাঠককে শিহরিত করে। ঘুমন্ত অবস্থায় পাশ থেকে বন্ধু তিরুমলকে সিংহের টেনে নিয়ে যাওয়া, বিষধর সাপ ব্ল্যাকমাম্বার সাথে জীবন-মৃত্যুর মাঝে টর্চ হাতে প্রতীক্ষা কিংবা আগলহীন ভেজানো দরজায় সিংহের উপস্থিতি—এসবই বাংলা সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে হাজির হয়। শংকরের সঙ্গে যেন আমরাও পৌঁছে যাই সেই পরিবেশে। অংশীদার হই চূড়ান্ত শিহরণ জাগানো পরিস্থিতির। হীরের খনির রক্ষক বুনিপ, রোডেশিয়ান মনস্টার কিংবা অজানা গুহায় শংকরের পথ হারিয়ে ফেলা যেমন আমাদের মনে ভয়ের শিহরণ জাগায়, তেমনি বিপদের মধ্যেও আফ্রিকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে শংকরের মতো আমরাও মোহিত হয়ে পড়ি সময়ে সময়ে। আত্তালিও গাত্তির কাহিনি, আফ্রিকার আদিম উপজাতিগোষ্ঠী কিংবা জিমকার্টারের কাহিনি আমাদেরে মুগ্ধ করে। ক্ষণিকের জন্য হলেও আমরা যেন ভুলে যাই বাংলার আপাত নিরাপদ গৃহস্থ জীবনের অস্তিত্ব। শংকরের বোহেমিয়ান জীবনই আমাদের কাছে চূড়ান্ত সত্য হয়ে উপস্থিত হয়। সম্ভব-অসম্ভবের বেড়াজাল আর গুরুত্ব পায় না আমাদের যুক্তিবাদী মনে। এইভাবে যে রহস্যময়তা ও অনির্দেশ্য জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ উপন্যাসটির ছত্রে ছত্রে বর্তমান তা যথার্থ অ্যাডভেঞ্চারধর্মী উপন্যাস হিসেবে 'চাঁদের পাহাড়'-কে চিনিয়ে দেয়।

২

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ রচনায় প্রকৃতি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। 'পথের পাঁচালী' থেকে যার সূত্রপাত তার চূড়ান্ত রূপ 'আরণ্যক' এবং অবশ্যই 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাস। স্বয়ং ক্ষেত্র গুপ্ত তাই লিখেছেন—

> বাংলা উপন্যাসে প্রকৃতির এত বড়ো ভূমিকা সমকালীন অন্য লেখকদের মধ্যে দেখি না।[২]

আসলে বিভূতিভূষণ ছিলেন পূর্ণতায় আস্থাশীল ও প্রকৃতিঘনিষ্ঠ লেখক। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আত্মিক অভিজ্ঞতার ছাপ খুব স্পষ্টভাবেই তাঁর উপন্যাস ও সৃষ্ট চরিত্রগুলিকেও প্রভাবিত করেছে। ক্ষেত্র গুপ্তের মতামত এখানে প্রণিধান যোগ্য—

> বিভূতিবাবুর একহাতে ধরা নিশ্চিন্দিপুর—মনসাপোতা, অন্যহাত স্পর্শ করে গেল মধ্যপ্রদেশের বন-পাহাড়-প্রান্তর, আর দুচোখের স্বপ্ন ফিজি দ্বীপের আমাজনের। অপুর কাহিনী আর ছোটোদের জন্য লেখা অ্যাডভেঞ্চার-গোয়েন্দা গল্প বিভূতিবাবুর মনের সৃষ্টিউৎসে জন্মেছে দুই সহোদর।[৩]

ফলে 'চাঁদের পাহাড়'-এর শংকর ঔপন্যাসিকের মতোই প্রকৃতিমুগ্ধ। আসলে শংকরের মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিকের প্রকৃতিমুগ্ধতাই যেন প্রকাশিত হয়েছে। সে হীরের খনি নয় সন্ধান করতে গেছে আফ্রিকার অজানা প্রকৃতিকে। তাই বিপদের মধ্যে পড়েও—

> শঙ্করের চোখে ঘুম নেই, এই সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে, মধ্য আফ্রিকার নৈশ শীতলতাকে তুচ্ছ করেও জেগে বসে থাকে।[৪]

বারবার তাই তার মুখে শোনা যায় আফ্রিকায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গুণগান। গভীর বনের মধ্যে তার সঙ্গী আলভারেজ যখন পথ হারিয়ে ফেলা বিষয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ম্যাপের মধ্যে মনোনিবেশ করেছে, তখনও শংকর সেই প্রকৃতির শোভায় মুগ্ধ হয়ে থাকতে পারে। যেন তার কোনো চিন্তাই নেই এ বিষয়ে। অভিভাবক রূপী আলভারেজের উপর সমস্ত চিন্তা অর্পণ করে সে এক উদাস শিশুর মতোই প্রকৃতিকে উপভোগ করতে ব্যস্ত। এই নিশ্চিন্ততার জন্যই বারবার চূড়ান্ত বিপদের সামনে দাঁড়িয়েও শংকর প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করবার সুযোগ পেয়েছে। স্টেশন মাস্টারের চাকরি পেয়ে সিংহের মুখোমুখি হয়েও সে একা স্টেশনঘরে থাকতে রোমাঞ্চ অনুভব করেছে। ভয়ংকর আগ্নেয়গিরির সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছে—'আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হলো।' চরম দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেও তার মনে হয়েছে—'এই তো জীবন, এইভাবেই তো জীবনকে ভোগ করতে চেয়েছিল সে।'

৩

একটু সচেতন ভাবে উপন্যাসটি পাঠ করলে পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই অনুভব করতে পারবেন যে 'চাঁদের পাহাড়'-এর মধ্যে ঔপন্যাসিক এমন এক ভাবধারারকে গুরুত্ব দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যা প্রচলিত ধারণার বিপরীত মেরুবাসী। তিনি শংকরকে বাঙালি হিসেবে গড়লেও তার মধ্যে গতানুগতিক বাঙালি গুণাবলী দেখাননি। আবার 'প্রস্‌পেক্টর' হিসেবে শংকরকে দেখালেও স্বর্ণান্বেষণ নয়, তার মধ্যে প্রধান ভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে এক ভাবুক, প্রকৃতিমুগ্ধ, নির্লিপ্ত মানবিক সত্তাকে। আসলে ঔপনিবেশিক সময়পর্বে দাঁড়িয়ে সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শংকর চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। যা এক কথায় কালচারাল হেজিমনির বিপরীত অবস্থান অর্থাৎ অ্যান্টি হেজিমনি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শক্তি যে দেশেই তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল সেই দেশেই তারা নিজেদের সংস্কার, ঐতিহ্যকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়েছিল। আর সেই উপনিবেশিত দেশের সমস্ত ঐতিহ্যকে হীন, বর্বর বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল। আসলে তারা এইভাবে সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মাধ্যমে উপনিবেশিত

জনতার মনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে চেয়েছিল নিজেদের প্রতি তাদের সম্মতি আদায় করতে। যে প্রচেষ্টা 'হেজিমনি' তত্ত্বের জন্ম দেয়। ইতালির চিন্তাবিদ তথা বামপন্থি নেতা আন্তোনিও গ্রামশ্‌চি তাঁর 'প্রিজনস নোটবুক' ('কারাগারের পাণ্ডুলিপি') নামক গ্রন্থে এই হেজিমনি বা আধিপত্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক সম্মতি আদায়ের মধ্য দিয়ে টিকে থাকে। আধিপত্যকামী ঔপনিবেশিক শক্তি সবসময় পরাধীন জনতাকে শাস্তি বা শাসনের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করে না; সে তার চারিদিকে গড়ে তোলে এক সাংস্কৃতিক বলয়। যার মাধ্যমে সে পরাধীন জনতার সম্মতি আদায় করে। প্রাবন্ধিক অজিত চৌধুরী লিখেছেন—

> প্রভুর ভাষা বুঝতে ভৃত্য অক্ষম। প্রভু তখন ভৃত্যের ভাষা (রীতিনীতি, টোটেম) শেখে, বিকৃত করে এবং নিজের সম্মতি আদায়ের নিয়ম বোঝাবার জন্য তা থেকে নির্মাণ করে নতুন রীতিনীতি। ভৃত্য নতুন এক ভাষা বলতে শুরু করে—তার প্রভুর ভাষা—না জেনেই, মাতৃভাষায় কথা বলছে ভেবে। নিজের মাতৃভূমিতে ভৃত্য উদ্বাস্তু হয়ে যায়।[৫]

এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাই প্রতিমুহূর্তে চাই প্রভু বা আধিপত্যকামী শক্তির শেখানো আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার বিরোধ। বাইরের বিপ্লবের আগে প্রয়োজন চেতনার স্তরে বিপ্লব। প্রতিমুহূর্তে নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন থেকে ঔপনিবেশিক শক্তির চাপিয়ে দেওয়া আদর্শকে বিচার করা ও ভেঙে ফেলা। যা লক্ষ করা যায় 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসটির মধ্যে।

উপন্যাসটির প্রথম থেকেই ঔপন্যাসিক উপন্যাসের প্রধান তথা কেন্দ্রীয় চরিত্র শংকরকে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন তা ব্যতিক্রমী। শংকর আর পাঁচটা সাধারণ বাঙালি যুবকের মতো নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জীবন চায়নি। পাটের কলে কাজ করতে যাওয়া তার মোটেও পছন্দ ছিল না। বাঙালিরা যে ভালো কেরানি বা চাকুরে হতে পারে এই ধারণা যখন ঔপনিবেশিক শাসক আমাদের মনে প্রায় বদ্ধমূল করে দিয়েছিল, তখন তিনি শংকরকে গড়লেন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে। যেমন—

ক. শংকর খেলাধূলাতে বরাবর প্রথম হয়ে এসেছে।

খ. ফুটবলের সেন্টার ফরওয়ার্ডে সে তাদের অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ।

গ. সাঁতারে তার জুড়িমেলা ভার।

ঘ. গাছে উঠতে, ঘোড়ায় চড়তে কিংবা বক্সিং-এ সে অত্যন্ত নিপুণ।

ঙ. আবার ম্যাপ দেখা, নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় এবং ভূগোলের অংকতেও সুদক্ষ।

চ. তবে এই শংকর পরীক্ষায় ভালো করতে পারেনি। দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

—এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য গতানুগতিক ‘ভালো ছেলে’র ধারণাকে চূর্ণ করে দেয়।

শংকরের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক প্রধান ভাবে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো ইউরোপীয় আদর্শের সঙ্গে ভারতীয় আদর্শের তফাত বা পার্থক্য দেখানো। ইউরোপীয় সভ্যতা শিল্প বিপ্লবের পর তাদের শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য যেমন বিভিন্ন দেশে পৌঁছে গিয়েছিল তেমনি তাদের অপর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সেই সব দেশের ধন সম্পদকে নিজেদের আয়ত্বে আনা। আর সেই উদ্দেশ্যে কোনো দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গুরুত্ব না দিয়ে তারা সেই দেশের বস্তুগত সম্পদকে প্রধান ভাবে গুরুত্ব দিয়েছিল। মনে করেছিল উপনিবেশিত জনতার সেই সম্পদে কোনো অধিকার নেই। তাদের মতো বীরদেরই অধিকার আছে তা দখল করবার। কারণ ‘বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা’। লোভের বশবর্তী হয়ে তারা দুর্গমকে, বিপদকে উপেক্ষা করে ছুটে গিয়েছিল প্রত্যন্ত অঞ্চলে। জীবনের ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করেনি। এটাই যেন প্রকৃত বীরের বৈশিষ্ট্য। কোমলপ্রাণ প্রকৃতিমুগ্ধতা যেন ভীরুতা, দুর্বলতা ও কাপুরুষতা।

ঠিক এই জায়গা থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘চাঁদের পাহাড়’ উপন্যাসে বিরোধিতা করলেন। শংকরকে তিনি গড়লেন প্রকৃতিমুগ্ধ নায়ক হিসেবে। সে ভারতের প্রতিনিধি। কঠিন স্বর্ণান্বেষণ নয়, প্রকৃতিমুগ্ধতার মধ্য দিয়েও যে বীর, সাহসী হিসেবে পরিচিত হওয়া যায় তা দেখানো হলো শংকরের মধ্য দিয়ে। ঔপন্যাসিক যখন বলেন—‘হাজার হোক সে বাংলার মাটির ছেলে, ডিয়েগো আলভারেজের মতো শুধু কঠিনপ্রাণ স্বর্ণান্বেষী প্রসপেক্টর নয়’—তখন বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়।

উপন্যাসের পরিণতিতে দেখা যায় যে বহু প্রত্যাশিত হীরের খনির সন্ধান পেয়ে হীরে নিয়ে সেখান থেকে জীবন্ত অবস্থায় সভ্যসমাজে ফিরতে পেরেছিল একমাত্র শংকর। জিম কার্টার, ডিয়েগো আলভারেজ কিংবা আত্তালিও গাত্তির মতো মানুষদের পক্ষে যা সম্ভব হয়নি তা করে দেখিয়েছে শংকর। যদিও তাদের কারোরই সাহসের অভাব ছিল না; অভাব ছিল না বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়াই করবার মতো মানসিকতার। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই সুন্দরের নয় সম্পদের প্রত্যাশী ছিল। অন্যদিকে, শংকর ধনসম্পদ নয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সন্ধানী ছিল। ফলে কিছুটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই সে পেয়ে গিয়েছে হীরের খনির সন্ধান। জীবন্ত অবস্থায় ফিরতে পেরেছে সভ্য সমাজে। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের প্রসঙ্গে শংকরের মধ্যে দেখানো হলো ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ। যাকে মনে করা হতো ভারতীয় ‘নেটিভ’-দের দুর্বল মনের চিহ্ন, তাকেই গুরুত্ব দিয়ে ঔপন্যাসিক লিখলেন—

> ভারতবর্ষের ছেলে শঙ্করের দুই হাত আপনা-আপনি প্রণামের ভঙ্গিতে ললাট স্পর্শ করলে। প্রণাম, হে রুদ্র দেব প্রণাম! আপনার তাণ্ডব দেখার সুযোগ

> দিয়েছেন, এজন্যে প্রণাম গ্রহণ করুন, হে দেবতা আপনার এরূপের কাছে শত হীরক খনি তুচ্ছ হয়ে যায়। আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হলো।[৬]

হীরের খনির সন্ধানে পেয়ে ছয়টি হীরে সঙ্গে করে এনেও শংকরের মানসিকতায় পরিবর্তন খুব বেশি ঘটেনি। তাই অর্থের জন্য বেশি দাম হলেও সব হীরে সে বিক্রি করেনি। মাকে দেখানোর জন্য নিয়ে আসতে চেয়েছে। পুনরায় শংকরের হীরের খনির সন্ধানে যাওয়ার ইঙ্গিত উপন্যাসের শেষে পাওয়া গেলেও তার কাছে মাতৃভূমির আকর্ষণ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। ঐশ্বর্য নয়, মানবিক সম্পর্ক, দেশাত্মবোধ ও প্রাকৃতিক মাধুর্য যে অনেক বেশি মূল্যবান আর সেই ঐশ্বর্যে যারা সমৃদ্ধ তারাই যে প্রকৃত ধনী তা উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। এইভাবে 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসটি প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ অ্যাডভেঞ্চারধর্মী উপন্যাস হয়েও ভারতীয় চিরাচরিত ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিয়ে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে যে সাংস্কৃতিক বিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে তা বলবার অপেক্ষা রাখে না।

উৎসের সন্ধানে

১. 'চাঁদের পাহাড়', শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

২. 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস', ৩য় খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা-৯, ২য় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৭৬

৩. 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস', ৩য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৭১

৪. বিভূতিভূষণ উপন্যাস সমগ্র, ২য় খণ্ড, সম্পা. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভম্ প্রকাশন, কলকাতা-৭৩, ২য় পরিমার্জিত সংস্করণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

৫. অবভাস, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৪, 'ঔপনিবেশিক হেজিমনি : বাদামি প্রাচ্যবাদের সমালোচনার দিকে', পৃ. ৫

৬. বিভূতিভূষণ উপন্যাস সমগ্র, ২য় খণ্ড, সম্পা. তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভম্ প্রকাশন, কলকাতা-৭৩, ২য় পরিমার্জিত সংস্করণ, অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১০০১

‘আরণ্যক’ : চলমান সময়ের কথকতা

অর্জুনদেব সেনশর্মা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’ উপন্যাসটি শুধু তাঁর লেখক জীবনের-ই নয়, বরং বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম সম্পদ। বাংলা সাহিত্যের সচেতন পাঠক মাত্রেই জানি যে, রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য। বিভূতিভূষণ যে সময় পর্বে ‘আরণ্যক’ রচনা করেছেন, ওই সময়পর্বের বিস্তীর্ণ পরিসর জুড়ে পৃথিবীব্যাপী ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাবলির অভিঘাত বাঙালির মননবিশ্বকেও নানাভাবে বদলে দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের সেই সময়পর্বকে আমরা যদি ইতিহাসের সন্ধানী চোখে দেখার চেষ্টা করি তবে বুঝতে পারবো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাঙালির দৈনন্দিন যাপিত জীবন জুড়েও ভাঙা-গড়ার দোলাচলতায় মুহুর্মুহু বদলে যাচ্ছিল বাঙালির সংস্কার—মূল্যবোধও।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘পথের পাঁচালী’ যখন লিখতে শুরু করলেন, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় মুহূর্তের অবসান হয়েছে সবে মাত্র। ফলত ঐ সময়ে লেখা ‘পথের পাঁচালি’র আখ্যানে শুধু লেখক বিভূতির পারিবারিক জীবনের আঁকাড়া বাস্তবটুকুই শুধু নয়, আখ্যান জুড়ে চিত্রিত হয়েছে নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ জীবনের আঁকাড়া বাস্তবের শিল্পভাষ্য। জীবনের চলমান স্রোতে গা না ভাসিয়ে ‘খাপে খাপ’ থাকা জীবনের কক্ষপথ থেকে সরে আসতে চেয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। বলা ভালো বিভূতিভূষণ সেই আটপৌরে পথ ত্যাগ করতে পেরেছিলেন বলেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বোহেমিয়ান জীবনের দিনলিপিকেই ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে। তা না হলে গভীর নৈরাশ্য, লক্ষ্যহীন-পরিণামহীন সুতীব্র বাউণ্ডুলে মেজাজের বিভূতিভূষণ কলকাতার নাগরিক জীবন থেকে দূরে বিহার মুলুকের ভাগলপুর শহরের ‘রঘুনন্দন’ সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অচেনা দেহাতি কিশোরীর চেহারার মধ্যে নিজের অকালমৃতা বোন সরস্বতীর মুখ খুঁজে পেতেন না। একদিকে সেই দেহাতি কিশোরী আর অন্যদিকে, হৃদয়ের গোপন অ্যালবামে চিরভাস্বর সরস্বতীর শিল্পিত রূপটিই ‘পথের পাঁচালী’-র দুর্গার মধ্যে প্রতিভাত হয়েছে।

ব্যক্তিজীবনের প্রত্যাশা-প্রাপ্তি কিংবা প্রতিষ্ঠার তুল্য-মূল্য বিচারকে কানাকড়ির সমানও গুরুত্ব দেননি বিভূতিভূষণ। অর্থ-কীর্তির ত্রি-সীমানার ছায়া না মাড়িয়ে লেখক বিভূতিভূষণ বিশ্ব-প্রকৃতির স্বাধীন পথেই হেঁটেছেন। নাগরিক কোলাহল আর বৈভবকে তুড়ি মেরে বিভূতিভূষণ বারবার আশ্রয় নিয়েছেন প্রকৃতির কাছে। কিন্তু এত সবকিছুর বাইরেও লেখকের মনন জুড়ে ছিল স্বাধীনতার আস্বাদন আর অন্যদিকে নাগরিক জীবনচর্যার প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ। লেখক জীবনের দ্বন্দ্বমুখর এই বিচিত্র অভিব্যক্তিই 'আরণ্যক' উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। 'আরণ্যক' হয়ে উঠেছে চেনা ভারতের ভেতরে লুকিয়ে থাকা এক অজানা ভারতের প্রতিবিম্ব।

পেশাগত কারণেই কলকাতার নাগরিক জীবনের মায়া ত্যাগ করে বেশ কয়েক বছর বিদেশ-বিভুঁই-এ কাটাতে হয়েছিল বিভূতিভূষণকে। পাথুরেঘাটার জমিদার বাড়ির খেলাতচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের জমিদারি তদারকির দায়িত্ব নিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বিহারের ভাগলপুর, পূর্ণিয়ায় কর্মরত ছিলেন। সেই সময়ের দীর্ঘ অরণ্য প্রবাস জীবনের অরণ্য প্রকৃতির বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন নিজের সাহিত্যিক প্রতিবেদনে। অরণ্য জীবনের সেই সব অনুপুঙ্খ উঠে এসেছে 'আরণ্যক' উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে। 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রস্তাবনায় লেখক সেই আদিম প্রকৃতির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

> কলিকাতা শহরের হৈ-চৈ কর্মকোলাহলের মধ্যে অহরহ ডুবিয়া থাকিয়া এখন যখন লবটুলিয়া বইহার কি আজমাবাদের সে অরণ্য-ভূভাগ, সে জ্যোৎস্না, সে তিমিরময়ী স্তব্ধ রাত্রি, ধূ-ধূ ঝাউবন আর কাশবনের চর, দিগ্বলয়লীন ধূসর শৈলশ্রেণি, গভীর রাত্রে বন্য নীল-গাইয়ের দলের দ্রুত পদধ্বনি, খররৌদ্র মধ্যাহ্নে সরস্বতী কুণ্ডীর জলের ধারে পিপাসার্ত বন্য মহিষ, সে অপূর্ব মুক্ত শিলাস্তৃত প্রান্তরে রঙিন বনফুলের শোভা, ফুটন্ত রক্তপলাশের ঘন অরণ্যের কথা ভাবি, তখন মনে হয় বুঝি কোনো অবসর দিনের শেষে সন্ধ্যায় ঘুমের ঘোরে এক সৌন্দর্যভরা জগতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীতে তেমন দেশ যেন কোথাও নেই।

এই বিশাল অরণ্যভূমির হিরণ্ময় সৌন্দর্য পরখ করেই লেখকের মন শুধু তৃপ্ত হয়নি, বরং অরণ্যভূমির বাসিন্দাদের বিচিত্র জীবনদর্শন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

> শুধু বনপ্রান্তর নয়, কত ধরনের মানুষ দেখিয়াছিলাম।...জগতের যে পথে সভ্য মানুষের চলাচল কম, কত অদ্ভুত জীবনধারার স্রোত আপনমনে উপলবিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে সে পথে তাহাদের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি আজও ভুলিতে পারি নাই।

প্রতিটি মানবিক সত্তাই আসলে সহযোগী সত্তা। তাই লেখক বিভূতিভূষণ তথা 'আরণ্যক' উপন্যাসের অন্যতম কথক চরিত্র সত্যচরণের জবানিতে যেভাবে অরণ্য

জীবনের অনালোকিত দিকটি উদ্ভাসিত হয়েছে, তা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শিল্প সৌধ হিসেবেই চিহ্নিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর নাগরিক সমাজ জীবনের বদলের পাশাপাশি দ্রুত বদলে যেতে লাগলো মানবিক মূল্যবোধ। এই বদলের প্রভাব এসে পড়লো লবটুলিয়া-আজমাবাদ তথা মহালিখারূপের পাহাড়ের ঢালু পাদদেশ জুড়ে বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমিতেও। ফলে বদলে যেতে শুরু করলো গহীন বনাঞ্চলের রূপ ও চরিত্র। অরণ্যভূমির বাসিন্দা প্রাচীন অভিজাত সূর্য বংশের প্রতিনিধি সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা বীর দোবরু পান্না, রাজকন্যা ভানুমতীদের জীবনেও সেই পরিবর্তন একটু একটু করে দাগ কাটতে লাগলো।

'আরণ্যক' উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্ববহ চরিত্র দোবরু পান্না বীরবর্দী। এক আদিম পাহাড়ী দেশের রাজা দোবরু পান্না চরিত্রটি অনন্যও বটে। প্রায় নিঃস্ব এই রাজার বিপুল সম্পদের বৈভব না থাকলেও তাঁর দেহে প্রবাহিত হচ্ছে সূর্য বংশের রক্ত। হিমালয়ের পাদদেশ থেকে ছোটনাগপুর সীমান্ত আর মুঙ্গের থেকে কুশী নদীর তটরেখা পর্যন্ত বিশাল রাজ্যের মালিকানা ছিল দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের। বর্শা হাতে শিকার আর গোচারণই এই রাজবংশের উপজীবিকা। চাষবাস সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে এই বীর রাজা গর্বের সঙ্গে জানান—

> ওসব আমাদের বংশে নিয়ম নেই। শিকার করার মান সকলের চেয়ে বড়ো, তাও এক সময়ে ছিল বর্শা নিয়ে শিকার সবচেয়ে গৌরবের।

কিন্তু এই রাজ পরিবারের গৌরব যে বদলে যাওয়া সময়ের সিঁড়ি ভেঙে ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। যে রাজ পরিবারে একমাত্র বর্শা নিয়ে শিকারকেই এতকাল গৌরবের প্রতীক হিসেবে মান্যতা দেওয়া হতো, সেই রাজবাড়ির অন্দরেও এসে ঢুকেছে মুঙ্গেরি বন্দুক। একদিকে বিস্তীর্ণ জঙ্গল মহাল জুড়ে প্রজা পত্তনের নামে অরণ্য প্রকৃতির ধ্বংসলীলা আর অন্যদিকে রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দীর প্রয়াণের সঙ্গে যেন একটা ইতিহাসেরও অবসান হলো।

<u>তথ্য নির্দেশ</u>

'আরণ্যক', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি-২০১৬।

সহজিয়া জীবন পাঁচালি : 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'

সহেলী বিশ্বাস

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০ খ্রি.) শরৎ-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র। বস্তুত, শরৎ-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গনে প্রতিনিধি স্থানীয় নামের উল্লেখ করতে হলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারণ করতে হয়। কল্লোল পরবর্তী নবীন লেখক-লেখিকাদের রচনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংকট, অস্থিরতা, নাগরিকতা, নেতিবাদ, নাস্তিক্যবাদিতা ও দেশীয় সংস্কৃতির অবক্ষয়িত মনোভাব প্রাধান্য পেয়েছে—এরই ফলশ্রুতিতে অমোঘ নিয়মে উপস্থিত হয়েছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎ-পরবর্তী সময়ে বাঙালি জনমানস পুনর্বার প্রবলভাবে আন্দোলিত হলো—আবেগে, স্নেহে, ভালোবাসায়, জীবনের সারল্যে; আর তা সম্ভব হলো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়।

শরৎচন্দ্রের মতোই বিভূতিভূষণের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমনই বিস্ময়কর। অত্যন্ত সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করে, সারাজীবন স্কুলমাস্টারি করে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসে যেরূপ সিদ্ধিলাভ করেছেন তা ভাবলেই অবাক হতে হয়।

> আজ বিশ বৎসরের পার হ'তে আমি আমার সে পাখিডাকা তেলকূচা-ফুল-ফোটা, ছায়াভরা মাটির ভিটাকে অভিনন্দন করে এই কথাটি জানাতে চাই—ভুলিনি! ভুলিনি! যেখানেই থাকি, ভুলিনি!—তোমার কথাই লিখে রেখে যাবো—[১]

দীর্ঘ একশো বছর পেরিয়ে এসেও চিরকিশোর বিভূতির গ্রামের উদ্দেশ্যে লেখা দিনলিপির কথা আজও আমাদের ভীষণভাবে স্মরণীয়। আর এভাবেই বোধহয় প্রকৃতির শিল্পীরূপে পাঠক হৃদয়ে এক ও অদ্বিতীয় স্থানটি দখল করে নিয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'পথের পাঁচালী'র (১৯২৯ খ্রি.) হাত ধরে পাঠক সমাজে ও হৃদয়ে বিভূতিভূষণের পথচলা শুরু। যে পথচলায় আজও একইভাবে একটুও ছেদ পড়েনি। তবে 'পথের পাঁচালী'র লেখক পাঠকের কাছে সমাদৃত তাঁর নিজ স্বাতন্ত্র্যের জোরে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আপন শিল্পী মানসের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

> যে জগৎকে আমরা প্রতিদিন কাজকর্মে হাটে-ঘাটে হাতের কাজে পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ আনন্দ ভরা সৌম্য জীবন লুকানো আছে—সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন—মন্দাকিনী, যাহার গতি-কল্প হইতে কল্পান্তরে; দুঃখকে তাহা করিয়াছে অমৃততত্ত্বের পাথেয়, অশ্রুকে করিয়াছে অনন্ত জীবনের উৎসধারা।[২]

এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বলেছেন—

> মাঝে মাঝে একটা কথা শোনা যায় যে, আমাদের মত পরাধীন দরিদ্রদেশের সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে কথাসাহিত্যের উপাদান তেমন মেলে না।...এই ধরনের উক্তির সত্যকার বিচার করতে বসলে দেখা যায়—এসব কথা মাত্র আংশিকভাবে সত্য। বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী। তাদের দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক—বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যা-সকাল, আকাশ-বাতাস, ফল-ফুল,—বাঁশবনের আমবাগানের নিভৃত ছায়ার ঝরা সজনে ফুল-বিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে। তাদের সে গোপন সুখ-দুঃখকে রূপ দিতে হবে।[৩]

মানুষ, প্রকৃতি, ঈশ্বর—এই তিনে মিলে গড়ে উঠেছে বিভূতিভূষণের সাহিত্যলোক।

বিভূতিভূষণ গ্রামীণ, মানবধর্মে বিশ্বাসী, তাই তার কথাসাহিত্যের উপাদান ও বিষয়বস্তুও খুবই সাধারণ। মোটেই চমকপ্রদ নয়। পল্লিগ্রামের সাধারণ জীবন ও মানুষ নিয়ে তাঁর কারবার। একান্ত পরিচিত বিষয় ও চরিত্র, প্রকৃতির সংস্পর্শ বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যকে অসামান্যতা দান করেছে। এখানেই তিনি আধুনিক। সাধারণের অন্তরালে খুঁজে ফিরেছেন অসাধারণকে, শাশ্বত পরিপূর্ণ জীবনকে।

ব্যক্তিগত জীবনেও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ ও বৈচিত্র্যহীন। দারিদ্র্য, অভাবের সঙ্গে সহবাস করেছেন বলেই বোধহয় তার সাহিত্যে সাধারণ জীবন এত অন্তরঙ্গতায় প্রতিভাসিত।

লেখক সাহিত্য, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় আগ্রহী ছিলেন। বনগ্রাম মহাকুমার বারাকপুর গ্রামে বাস। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রমণের নেশা, ভবঘুরে জীবন, ভাবুক মন—এই মিশ্রিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পুত্র বিভূতির মধ্যেও এসে জুটেছিল। শেষ নেই তার চলার, শেষ নেই তার এ জীবনে।

গ্রামজীবনের শিল্পী বিভূতি, গ্রামের নাড়ির সাথে তাঁর শিল্পীজীবনের যোগসূত্র কখনোই ছিন্ন হয়নি। তাই এর সহজতা, সাধারণ জীবন প্রসঙ্গ উপন্যাসগুলিতে

ভীষণভাবে প্রকটিত। এ প্রসঙ্গে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০), 'বিপিনের সংসার' (১৯৪১ খ্রি.), 'ইছামতী' (১৯৫০)র কথা এসেই পড়ে।

কথায় বলে 'বড়ো লেখকের ছোটোকাজ'—minor works of major writers—ছোটো নয়। তার মধ্যেও বড়োর সাক্ষর অভ্রান্ত। সে সাক্ষর হয়তো স্পষ্ট কিন্তু প্রচ্ছন্ন—অদৃশ্য কালিতে লেখা। কিন্তু পাঠক মনে কোথাও তার ছোঁয়া লাগে। আর সেই স্পর্শ পেতেই তার আভাস সমগ্র হৃদয়জুড়ে শিহরণ জাগায়। তখনই মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি যোগসাজস তৈরি করে হৃদয়ে। মন স্বীকার করে 'তুমিই, সাধারণের মধ্যেও তোমার অসাধারণতা হারিয়ে যায়নি।' এসব লেখায় লেখকের পরিচয় প্রসারিত হয়ে যেতে যেতে তার শক্তির সীমা হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ, তেমনি তার অপরাজেয়তাও হয় অনস্বীকার্য। এমনই একটি উপন্যাস 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৯৪০)।

সহজিয়া জীবন বলতে আমরা বুঝি অত্যন্ত সাধারণ সরল জীবনকে। যার সাবলীলতার প্রবাহ আমাদের হৃদয়কে অতি সহজেই স্পর্শ করে। আর পাঁচালি—আমাদের এক পুরাতন লেখ্য পদ্ধতি, যার মাধ্যমে গার্হস্থ্যরীতি অনুযায়ী ব্রত উপস্থাপন করে পাঠ করা হয়।

উপন্যাসটির কাহিনিবৃত্ত গড়ে উঠেছে— বিপুল সাধারণ চরিত্র নিয়ে ; অত্যন্ত সাধারণ, সহজ, সরলতায় পূর্ণ অনাড়ম্বর তাদের জীবনযাত্রা। রানাঘাটের রেলবাজারে বেচু চক্কত্তির হিন্দু হোটেলকে কেন্দ্র করে সমগ্র রানাঘাট বাজারের চিত্র, কিছু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের এক বৃত্তীয় পরিবেশ গড়ে উঠেছে। বেচু চক্কত্তির হিন্দু হোটেলের বয়স প্রায় দশ বছর। কোথাও বোধহয় এই হোটেলকে বড়ো করে গড়ার আশা বেচু চক্কত্তির মনে উঁকি দিয়েছিল। আর তাই পদ্মঝি ও বেচু চক্কত্তির সন্তানস্নেহে লালিত হিন্দু হোটেলের পাকা বাড়ি হয়েছে। রসুই-এ চারজন রান্নার বামুন হয়েছে। ভিড় বেড়েছে খদ্দেরের। ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার সূত্র ধরেই এসে পড়েছে মতি চাকরের খদ্দের ধরে আনার চিত্র। অত্যন্ত সহজ এই চিত্ররূপ অথচ অনবদ্য। রেলবাজারের আরেক হোটেল-মালিক যদু বাঁড়ুয্যে, তাই ব্যবসায়িক রেষারেষি এসেই পড়ে। কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ তাঁর অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন—

> বেচু চক্কত্তির হোটেলের চাকর মতি রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া হাঁকিতেছে —এই দিকে আসুন বাবু, গরম ভাত তৈরি, মাছের ঝোল, ডাল, তরকারি ভাত— হিন্দু-হোটেল বাবু।[৪]

হোটেলেও লক্ষ করা যায় এক আধুনিক System, সহজ অথচ বেশ Intelegent টিকিট ব্যবস্থা—যাতে হিসেবের সুবিধা হয় এবং সমস্ত কিছুর শেষে টিকিটগুলো জমা দেওয়া হয় গদিতে।

এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র পদ্মঝি, যে সাধারণের মতোই অন্যের ভালোতে কিছুটা ঈর্ষান্বিত। বেচু চক্কত্তির হোটেল, হোটেলের কর্মচারী, এমনকি মালিকটির উপরেও তার পূর্ণ অধিকার। সমস্ত ব্যাপারে তার হস্তক্ষেপ, আর তাই অলিখিতভাবে সকলের চোখে সে হয়ে উঠেছে এ হোটেলের মালকিন। বেচু চক্কত্তি কর্তা আর পদ্মঝি গিন্নী। কথাকার বোধহয় এরই রূপকে এক অবৈধ পরকীয়া সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা পরিবার-বিচ্ছিন্ন বিদেশে থাকা পুরুষের ক্ষেত্রে বড়োই সম্ভাব্য। কথাকার উল্লেখ করেছেন—

> ...কিন্তু পদ্মঝিয়ের সম্বন্ধে অন্য কথা। পদ্মঝি এ হোটেলে যা বলে তাই হয়। তাহার উপর কথা বলিবার কেহ নাই। সেজন্য দুষ্টলোকে নানারকম মন্দকথা বলে।[৫]

এসবের মধ্যে দেখা যায় চাকরি টিকিয়ে রাখা, মাইনে বাড়ানোর পদ্ধতি প্রক্রিয়া অর্থাৎ চাকরি কিছুটা হলেও Performance এর উপর নির্ভর করে। মতির উদ্দেশ্যে বেচু চক্কত্তিকে বলতে শুনি—সে যদি বেশি খরিদ্দার আনতে না পারে তাহলে তাকে তিনি আর কাজে রাখবেন না। কেননা, ব্যবসায় লাভ-লোকসানের হিসেব অত্যন্ত জরুরি, মতিকে মাইনে দিয়ে রেখে যদি তার খরচের দাঁড়িপাল্লা লাভের অপেক্ষা ভারী হয়, তবে তা তিনি করবেন না। এখানে বেচু চক্কত্তির পাকা ব্যবসায়িক মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

এই হোটেলের সূত্র ধরে এসে উপস্থিত হয় হাজারি ঠাকুর চরিত্রটি। অত্যন্ত সহজ, সরল, সৎ একটি চরিত্র। জীবিকার সন্ধানে পরিবার-পরিজনদের ছেড়ে এসেছে এই রানাঘাটে। ঠিকানা বেচু চক্কত্তির হোটেল, 'বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছে'চল্লিশ, একহারা চেহারা, রং কালো', কিন্তু তার মনের উদ্যম বয়সকে যেন দশ বছর কমিয়ে দিয়েছে। কাজপাগল মানুষটি হোটেলের কাজ নিয়ে বেশ মেতে থাকে। সাত টাকা মাস মাইনা, দু'বেলা খাবার, সেই সঙ্গে Free-তে পদ্মঝির মুখঝামটা, অকথ্য ভাষায় গালমন্দ শুনে শুনে তার দিন কেটে যায়। কিন্তু কাজে কোথাও একটুও গলদ নেই। রান্না বিষয়ে বিশারদ এই মানুষটি ভালো রান্না করতে জানে ও বোঝে, সঙ্গে মানুষের মনও বোঝে। তার মতে ভালো জিনিস পেলে মানুষ দু'পয়সা বেশি দিতেও রাজি। হোটেলের খরিদ্দারও হাজারির রান্নার বেশ প্রশংসা করে। বিশেষত, তার হাতের নিরামিষ রান্না ও মাংসের। আর এখানেই পদ্মঝির ঈর্ষা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—

হাজারি রান্নার ব্যাপারে অত্যন্ত সৎ। তাই ব্যবসা করতে গিয়ে হোটেল মালিকরা পাবলিকের সঙ্গে যে অসৎ ব্যবহার করে, তা সে মানতে পারে না। তবু হোটেল মালিকের নির্দেশে অনিচ্ছাতেও সেই কাজই করতে হয়। তখনই তার মন গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে। এখান থেকেই তার স্বপ্নের হোটেলের ভিত্তিপ্রস্তর রচিত হয়।

সততার সঙ্গে কাজ করেও পদ্মঝির অভিযোগ সে খদ্দেরদের কাছ থেকে বকশিশ পাওয়ার লোভে তাদেরকে বেশি বেশি খাবার দেয়—

> তোমার হাড়ে হাড়ে বদমাইশি ঠাকুর। ...তুমি ওই খদ্দের বাবুদের মুখে রান্নার সুখ্যাতি শুনে তাদের পাতে উড়কি উড়কি মুড়িঘণ্ট ঢালছো। পয়সা কড়িও দিয়েছে বোধ হয় বকশিস—[৭]

এরূপ অভিযোগে হাজারির চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায়। পক্ষান্তরে তার হোটেল গড়ার স্বপ্ন বুকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়।

হোটেলে কাজ করার সূত্রে খাবার ব্যঞ্জনও হোটেল যুগিয়ে থাকে। সবারবেলা একতত্ত্ব খাবার জোটে শুধু হাজারি বাদে। তার জন্য পড়ে থাকে 'বড়ো ডেকচিতে দুটি খানি মাত্র ভাত ও কড়ায় একটুখানি ঘাঁটা তরকারি'। তবু হাজারি নির্বিবাদ। কারো সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই। অল্পতেই তার উদর তুষ্ট হলেও মন ভরে না। তার মন চায় ভালো রান্না, ভালো একটি হোটেল—সেখানে খদ্দেররা সমস্ত সুবিধা পাবে। তবে পদ্মঝির প্রতি মনটা তার ঝাঁঝিয়ে ওঠে। মনে মনে খানিকটা গালাগাল দিয়ে সে বুকের জ্বালা মেটায় কিন্তু পদ্মঝির মুখের সামনে শামুকের মতন গুটিয়ে থাকে।

এই মানুষটি একটু ভাবুক প্রকৃতির। দুপুরে পাওয়া সময়টুকু সে ঘুমিয়ে মাটি করতে চায়না, বরং এই সময়টুকু হলো তার মনের বিচরণক্ষেত্র। শান্ত চূর্ণীর ধারের ঠাকুর বাড়িতে বসে, বা রাধাবল্লভ তলায় নাট মন্দিরের মনোরম পরিবেশ থেকে তার মনকে যেন একটু শান্তি নীড়ের সন্ধান দেয়। সারাদিন রসুই-এর তাপে তেতেপুড়ে এই সময়টুকুই সে একটু শান্তি পায়। আত্মস্মৃতি রোমন্থন চলে। আসলে স্মৃতি সততই সুখের হয়, তাই বোধহয় হাজারি তার মধ্যে শান্তি খুঁজে ফেরে। আর চূর্ণী নদীই বোধহয় হাজারির মনের দুঃখকে নীল জলে ধুয়ে দিয়ে ভাবতে সাহায্য করে।

হোটেল চালাতে গেলে যে পরিমাণ অভিজ্ঞতা-দক্ষতার প্রয়োজন, আজ পাঁচ বছর হোটেলে কাজ করে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার সবটাই হাজারি ঠাকুর অর্জন করেছে। সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে উঠে গরিব হাজারির মনে যখন মূলধনের প্রশ্ন জাগে তখনই তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা গভীর সমুদ্রে তলিয়ে যায়, তল পায় না সে—

> সারাজীবন কিছু করিতে পারে নাই সাত টাকা মাহিনার চাকুরি আজও ঘুচিল না—কি করিয়া কি হইবে, তাহা সে ভাবিয়া পায় না।[৮]

তবুও অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরে হাজারি ঠাকুর এগিয়ে চলে।

হাজারির রন্ধন প্রতিভা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। যে দরিদ্র হতে পারে, তার অভাব থাকতে পারে কিন্তু সে নৈতিকতাকে বিসর্জন দেয়নি। যদু বাঁড়ুয্যে তাকে

মাসিক দশটাকা আর প্রতিদিনের খাওয়া, বছরে তিনখানা কাপড়, ধোপা-নাপিত, তেল-তামাক দেওয়ার প্রস্তাব দেয়, তার হোটেলে কাজের বিনিময়ে। তখন কিন্তু পাঁচ বছরের অন্নদাতাকে সে পরিত্যাগ করেনি, বরং সে প্রলোভনকে জয় করেছে। একই সঙ্গে সংকল্প করেছে হোটেল গড়তেই হবে। আর মনে মনে ভেবেছে—

> সে নিজে হোটেল খুলিবে, এই তো তাহার লক্ষ্য। রাধুনি বৃত্তি যতদিন করিতে হয়, এই হোটেলেই করিবে। অন্য কোথাও যাইবে না। তাহার পর রাধাবল্লভ দয়া করেন...[৯]

হাজারির জীবনবৃত্তে, তার কঠোর জীবন সংগ্রামে সাথি হয় আরেক দীনদরিদ্র, সহায় সম্বলহীন পোড়াকপালী—নাম কুসুম। কুসুম হাজারির গাঁয়ের রসিকলাল ঘোষের মেয়ে। রানাঘাটে বিয়ে হয়েছে। দারিদ্র্যের সংসারে তার শাঁখা-সিঁদুর খুইয়ে বসেছে এই কাঁচা বয়সেই। দুই সন্তান শাশুড়িকে নিয়ে দুধ, দই বেচে সংসার চালায়। হাজারির মেয়ের বয়সিই হয়তো হবে কুসুম। বিদেশ-বিভুঁয়ে একজন পরিচিতা কন্যার বয়সী কাউকে পেয়ে হাজারির পিতৃহৃদয় স্নেহে আপ্লুত হয়। তাই হোটেলে ভালোটা মন্দটা হলে নিজে না খেয়ে হাজারির হৃদয় কুসুমকে দেওয়ার জন্য কেঁদে ওঠে। তা সে মাঝে মাঝে করেও বটে। তবে পদ্মঝিকে তার খুব ভয়। তার চোখে একবার পড়লে রক্ষা নেই। আরো কতো কিছু যে শুনতে হবে কে জানে। সুযোগ পেলে পদ্মঝি হাজারিকে অপমান করে, এমনকি কুসুমকে নিয়ে কু-ইঙ্গিত করতেও পিছপা হয় না। পিতৃ-হৃদয়ের স্নেহ এখানে লাঞ্ছিত, অপমানিত। তাই পদ্মঝির কটূক্তির সামনে দাঁড়িয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে ও কুসুমের রক্ষার্থে সে মুখ খুলেছে—

> ছি ছি, কি যে বলো পদ্মদিদি তার ঠিক নেই— কুসুমের বাপের বাড়ি আমাদের গাঁয়ে, আমায় জ্যাটা ব'লে ডাকে, আমি তাকে মেয়ে বলি—তার নামে অমন কথা বল্লে তোমার পাপ হবে না?[১০]

সরল মানুষের জীবনের পাপ-পুণ্যের মানদণ্ড কেমন হয় হাজারির কথাতে তা স্পষ্ট।

কুসুম গ্রামের মেয়ে, নগরজীবনের কলুষতা, আত্মপরায়ণতা, দারিদ্র্যের সঙ্গে সহবাস করা মেয়েটির সারল্য, অতিথি পরায়ণতাকে গ্রাস করতে পারেনি। গাঁয়ের মানুষকে পেয়ে কুসুম কিছুটা সহমর্মিতা অনুভব করে, সুখ-দুঃখের কথা বলে, হাজারিও বোধহয় কুসুমের কাছে শান্তির নীড় খুঁজে পায়। কুসুম হাজারিকে কন্যার দাবিবশত একখানি কাঁথা দেয়। খুবই সাধারণ কিন্তু কোথাও যেন অসাধারণ—

> একখানা কাঁথা বাহির করিয়া হাজারির সামনে মেলিয়া ধরিয়া বলিল— কেমন হয়েছে কাঁথাখানা?...আপনি এখানা রাত্রে পেতে শোবেন। আপনি শুধু মাদুরের উপর শুয়ে থাকেন হোটেলে—আমার অনেক দিনের ইচ্ছা একখানা কাঁথা আপনাকে সেলাই করে দেব।[১১]

পিতার মন তো, তাই হোটেলের বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত মাংস কুসুমকে দেবে বলে তুলে রাখে। কিন্তু পদ্মঝির চোখ এড়িয়ে তা হয়ে ওঠে না। মেয়ের জন্য তুলে রাখা মাংস অনিচ্ছাতে অপছন্দের কাউকে খাওয়াতে হচ্ছে, এ হাজারির কাছে বড়ো দুঃখের।

হাজারি কুসুমকে তার যোগ্য সহমর্মী ভেবে হোটেল খোলার কথা প্রথম তাকেই বলে। একহাতে কুসুম তাকে উৎসাহ যোগায় এবং মূলধনের কিছু টাকা অর্থাৎ ষাট-সত্তর টাকা দেবে বলে জানায়। সরল গ্রাম্য বালিকা নিজের সর্বস্ব পিতৃতুল্য একজন মানুষের স্বপ্নপূরণের উদ্দেশ্যে দান করতে আকুলিত প্রাণ।

পদ্মঝি ইচ্ছা করে হাজারির উপর বেশি বেশি কাজের বোঝা চাপিয়ে দেয়। সবকিছু জেনে বুঝেও হাজারি নীরবে কাজ করে যায়। কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ঠিক পোষায় না। তেমনি খরিদ্দারকে ফাঁকি দিয়ে তাদের জিনিসের কিয়দংশ ভোগ করাতেও তার সরলচিত্ত বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। পদ্মঝির কারসাজিতে যখন হাজারিকে পাঁচসের ময়দা ও ঘি-এর দাম দিতে হয়, তখন নিজের ছেলেমেয়ে এবং কুসুমকে সেই লুচি খাওয়ানোর জন্য পিতৃহৃদয় ব্যাকুলিত হয়। হাজারি চাকরকে ঘুম থেকে তুলে বলে—

> আমি রাত তিনটের গাড়িতে বাড়ি যাচ্ছি। এত লুচি কি হবে,...এখানে থাকলে কাল সকালে বারোভূতে খাবে তো। আমার জিনিস নিজের বাড়ি দিয়ে আসি। আমার বাড়িতে ছেলেমেয়ে আছে, তারা খেতে পায় না, তাদের দিয়ে আসি![১২]

নিজের মেয়ের মুখের একটুখানি হাসি যে কতটা আনন্দের তা একমাত্র একজন পিতাই বোঝেন।

গ্রামে ফিরে আমরা গ্রাম্য হাজারিকে দেখতে পাই। তার সেই পাড়াবেড়ানি স্বভাব, যা তাকে অত্যন্ত জীবন্ত করে তুলেছে। হোটেল খোলার স্বপ্ন তার মন থেকে মুছে যায়নি। সে গ্রামের লোকের কাছে সবজি, আলু ইত্যাদির দামের খোঁজ নেয়। হাজারির কন্যা টেঁপি—পিতা-অন্ত প্রাণ। গ্রাম্য মেয়ে টেঁপি। অত্যন্ত সরল, পিতার প্রতি তার যেমন অকৃত্রিম ভালোবাসা, তেমনি কলের গান শুনতে, আধুনিক চাল-চলন রপ্ত করতেও তার মন বিশেষ আগ্রহী। টেঁপি তার বাবাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যায় কলের গান শোনাতে।

এরপর আমরা হরিচরণবাবুর সঙ্গে পরিচিত হই। হরিচরণবাবুর পুত্রকে হারিয়ে জীবনের সমস্ত কিছুর উপর যেন বিতৃষ্ণা জন্মেছে। হরিচরণবাবুকে বলতে শুনি—

> দেখ হাজারি, তোমার কথা শুনে তোমার ওপর আমার হিংসে হয়। তোমার বয়স হোলে কি হবে, তোমার জীবনে মস্ত বড় আশা রয়েছে একটা কিছু গড়ে তুলবো! এই আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, আমার ছেলেটা মারা যাওয়ার পর আমার জীবনে যেন সবকিছু ফুরিয়ে গিয়েছে মনে হয়।[১৩]

খোকা বেঁচে থাকলে তার মুখ চেয়ে হরিচরণবাবু যা করতেন তার মধ্য দিয়ে একজন সাধারণ সহজ সরল মানুষের কথাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

হাজারি পুনরায় বেচু চক্কত্তির হোটেলে কাজে লেগে যায়। কিন্তু এরপরই হাজারির জীবনের মোড় অন্য পথে বাঁক নেয়। চুরির অপবাদ, সেই সঙ্গে পদ্মঝির উস্কানিতে কুসুমকেও চুরির সহকারী রূপে চিহ্নিত করা হয়। এ যে কতবড়ো যন্ত্রণা হাজারির কাছে! নিজের থেকেও নিরপরাধিনী কুসুমকে নিয়ে তার বেশি চিন্তা—

> হয়তো কুসুমের বাড়িখানা তল্লাস করিতে চাহিবে। নিরপরাধিনী কুসুম! লজ্জায় ঘৃণায় তাহা হইলে যে হয়তো গলায় দড়ি দিবে। আরও কত কি লোকে রটাইবে এই সূত্র ধরিয়া। তাহাদের গ্রামে একথা তো গেলে তাহার নিজেরও আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না।[১৪]

লোকলজ্জার সহজাত ভয় হাজারিরও ছিল। মনে রাখতে হবে যে, হাজারির ভবঘুরে জীবন, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাকে হোটেল গড়তে পরবর্তীতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল। চুরির দায়ে চাকরিটি তো গেল। ছা-পোষা মানুষ চাকরি খুইয়ে কী করবে, কোথায় যাবে। তার উপর পরিবারের চিন্তাও আছে। হাজারি যে চুরি করতে পারে একথা কুসুম কিছুতেই বিশ্বাস করেনি। এই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন হাজারির জীবনের এত দুঃখের মধ্যেও পরম পাওয়া।

আর কুসুম, সে তো আজন্ম স্নেহদাত্রী মাতার স্বরূপিনী। হাজারও অভাব, তবুও হাজারির প্রতি আচরণে তার এতটুকুও প্রকাশ নেই। সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ যেরূপে বর্ষিত হয়, হাজারির প্রতি কুসুমের স্নেহ ভালোবাসা তেমনই। এ জীবন চিরন্তন।

সহজ জীবনের সহজাবর্তে একে একে ভিড় করে সতীশ ভট্টাচার্য, বংশীর ভাগ্নে নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ ধর (কালীগঞ্জের মেলায় মনোহারির দোকান দিয়েছিল), নতুনপাড়ার শ্রীচরণ ঘোষ, শ্রীচরণ ঘোষের বাড়ির বৌমা। এই মেয়েটিকে হাজারি কন্যার আসন দান করে। এ মেয়েটিও কুসুমের মতো তাকে অর্থসাহায্য করতে চায়। যদিও তার মধ্যে একটু হলেও লোভের আভাস রয়েছে। তবু সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে একজন অপরিচিতকে বিশ্বাস করার সারল্য। এই সরলতা, লোভহীনতা চরিত্রটিকে জীবন্ত করেছে। হাজারির দৃষ্টিতে—

> মেয়েটি খুব আশ্চর্য ধরনের বটে। নির্ব্বোধ নয়তো—কুসুমের মত বুদ্ধিমতী নয় ঠিকই তবুও বড় ভাল মেয়ে।[১৫]

অতঃপর চাকদার রেলবাজারের একজন দোকানির আতিথেয়তা। ভবঘুরে হাজারি এবার হাজির হয় শ্রীনগর সিমলের বিহারীলাল বাঁড়ুয্যের বাড়িতে। তারপর গোপালনগরের এক ধনী কাপড় ব্যবসায়ীর বাড়িতে রাঁধুনী বামুন রূপে। এখানেই হাজারির ভবঘুরে জীবনের প্রথমপর্ব সমাপ্ত।

অতঃপর গাংনাপুর এঁড়োশোলে নিজগৃহে যাত্রা। সেখানেই হরিচরণবাবুর কন্যা অতসীর সঙ্গে পুনরায় দেখা। এই সরলহৃদয়া বালিকাও হাজারির দুঃখে সমব্যথী হয়, তাকে হোটেলের স্বপ্ন পূরণের জন্য অর্থসাহায্য করতে চায়। যদিও প্রথম দর্শনে সরলমতি বালিকা হাজারির কাছে নিরামিষ রান্না শিক্ষার আর্জি নিয়ে উপস্থিত হয়। হাজারিও তাকে প্রতিশ্রুতি দেয়। তারপর এক মাহেন্দ্রক্ষণে অতসী হাজারিকে বলে—

> কাকাবাবু, আপনি যদি কাউকে না বলেন, তবে বলি—আপনি হোটেল খুলবেন বলে বাবার কাছে টাকা ধার চেয়েছিলেন?...আমি আপনাকে টাকা দেবো। আপনি হোটেল খুলুন—দুশো টাকা দিতে পারি—আমি জমিয়ে জমিয়ে করেছি। লুকিয়ে দেবো, কিন্তু বাবা যেন জানতে না পারেন।[১৬]

হাজারির জীবনে তিনটি মেয়ে (কুসুম, অতসী, গোয়ালাবাড়ির বৌ) এসে উপস্থিত হয়। যারা সরল বিশ্বাস, নিঃস্বার্থভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাজারিকে কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে দিয়েছে। হাজারি তাদের টাকা নিতে নিমরাজি হয়। অবশেষে অতসীর মনের জোরের কাছে হাজারিকে পরাজিত হতে হয়। হাজারি অতসীর পরিচয়ে মুগ্ধ হয়। বলে—

> তুমি দিও টাকা আমি নেবো। হোটেল এই মাসেই আমি খুলবো—তোমার মুখ দিয়ে ভগবান একথা বলেছেন মা, তোমরা নিষ্পাপ ছেলেমানুষ, তোমাদের মুখেই ভগবান কথা কন।[১৭]

এরপর হাজারি রানাঘাট রেলবাজারে এসে এক অদৃশ্য টানে বেচু চক্কত্তির হোটেলে হাজির হলো এবং হোটেলের কাজে বহাল হলো। পুনরায় বংশী, পদ্মঝি এদের সঙ্গে সাক্ষাত এবং হোটেল খোলার একটা পরিকল্পনা ঘুরেফিরে মাথার মধ্যে কাজ করে। কুসুমের সঙ্গে পরামর্শ করে জানালো ঘরভাড়া নেওয়ার কথা। অতঃপর অতসীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ এবং কুসুম অতসীর টাকা এক করে গোপাল ঘোষের তামাকের দোকানের পাশে ঘর ভাড়া নেওয়া। তবে আজ-কাল করেও হোটেল খোলার কাজটি ঢিলে পড়েছিল। কিন্তু সত্যনারায়ণের সিন্নি যতীন মজুমদারকে দেওয়ার জন্য পদ্মঝি হাজারিকে যে চরম অপমান করে তা 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' খোলার কাজকে তরান্বিত করেছিল।

পরের মাসের পয়লা তারিখে রেলবাজারে টিনের সাইন বোর্ড লিখে হাজারি হোটেল খুলল—

আদর্শ হিন্দু হোটেল
হাজারি ঠাকুর নিজের হাতে রান্না করিয়া থাকেন।
ভাত, ডাল মাছ মাংস সব রকম প্রস্তুত থাকে।
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সস্তা।
আসুন! দেখুন!! পরীক্ষা করুন!!![১৮]

একজন মানুষের সদিচ্ছা, তার ভালোবাসা, সততা, সরলতা তাকে কতটা উঁচুতে নিয়ে যেতে পারে হাজারির এ হোটেল তার পরিচায়ক। দিনে দিনে পরিবর্ধমান চন্দ্রকলার ন্যায় আদর্শ হিন্দু হোটেল বেড়ে উঠতে লাগল। হাজারির বহুদিনের স্বপ্ন কুসুমকে ভালোটা-মন্দটা রেঁধে খাওয়াবে, কিন্তু আড়-নজরে তাকাবার বা কু-কথা বলার কেউ থাকবে না—আজ তা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। কুসুমকে এ হোটেলের অংশীদার রূপেই সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় হাজারি।

বৎসরান্তে স্ত্রী-কন্যাকে রানাঘাটের বাসায় এনেছে হাজারি। আসার পথে স্ত্রী-কন্যার বিস্ময় মাখা আনন্দমুখর মুখগুলি হাজারিকে বড়ো তৃপ্তি দান করেছে। টেঁপির মার তো বিস্ময়ের শেষ নেই—

> তাদের নিজেদের চাকর, সে আবার হাজারিকে 'বাবু' সম্বোধন করিতেছে— মাছ কুটিয়াও দিতে চায় যে![১৯]

এ যেন স্বপ্ন। সত্যিই তো, একজন দীন-দরিদ্রের ঘরের কন্যা, দীন-দরিদ্রের ঘরের বৌ-এর কাছে এ স্বপ্ন ছাড়া আর কি!

ইতিমধ্যে বংশীর ভাগ্নে নরেনের উপস্থিতি হাজারির বাড়িতে, সর্বাঙ্গসুন্দর এই ছেলেকে হাজারির স্ত্রীরও পছন্দ হয়। কোথাও অদৃষ্টের খেলায় টেঁপি ও নরেন পরস্পরকে পছন্দ করে। তবে এদের অজ্ঞাতে চার হাত এক করার ব্যবস্থা হয়েই ছিল।

এদিকে ব্যবসায়িক রেষারেষিতে বেচু চক্কত্তির লোকের সঙ্গে হাজারির লোকের বিরোধ শুরু হয়। তবে হাজারি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ এবং এখনও পূর্বের অন্নদাতাকে সে সমীহ করে। তাই বলে—

> আসুন, আমরা গাড়ী ভাগ করে নিই। আপনি যে গাড়ীর সময় ইস্টিশানে চাকর পাটাবে, আমার হোটেলের চাকর সে সময় যাবে না।[২০]

তারপরও একদিকে চলতে থাকে ব্যবসায়িক কূট-কচালি, অপরদিকে হাজারির সাংসারিক জীবন। একদিকে বেচু চক্কত্তির হোটেলের পড়ন্ত অবস্থা অপরদিকে হাজারির হোটেল রমরমিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে হাজারির নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রেলকোম্পানি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হিন্দু ভাতের হোটেল খোলার জন্য টেন্ডার দিতে চায়। সেক্ষেত্রে সকলের ঈর্ষাকে টপকে হাজারি টেন্ডার পেল। রেলের আপ প্লাটফর্মে নতুন হিন্দু হোটেল খোলা হলো। অপরদিকে, বেচু চক্কত্তির হোটেল নিলাম হওয়ার জোগাড়। পদ্মঝির এখন আর সেই অবস্থা নেই। এখন সে অনেক শান্ত-নীরব। দুই হোটেলের মালিক হাজারিকে সে সমীহ করে চলে। দেখা হলে বলে—'তুমি ভাল আছ ঠাকুর? ...এস না ঠাকুর, আমার বাড়িতে একবার এলেই না হয়।' আসলে পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মঝির অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। একদিন যে মানুষটি হাজারিকে উঠতে বসতে কথা শোনাত,হোটেল থেকে তাড়াতে পারলে শান্তি

পেত সেই পদ্মঝিই হাজারিকে তাদের হোটেলে আসতে অনুরোধ জানাচ্ছে। এই স্বীকৃতিটুকুই হাজারির কাছে অনেক বড়ো পাওয়া, লেখকের জবানীতে তা স্পষ্ট—

> অন্য লোকে হাজার ভাল বলুক, পদ্মদিদির ভাল বলা তাদের চেয়ে অনেক উঁচু, অনেক বেশী মূল্যবান।[২১]

পদ্মঝির আরেক পর্দাবৃত অংশ হাজারির কাছে উন্মোচিত হয়ে পড়ে, সে জানতে পারে বেচু চক্কত্তির হোটেল চলত পদ্মঝির টাকাতে। তবে তার এক আনা লভ্যাংশও পদ্ম পায়নি, শুধু পেটে খেয়েছে পদ্ম, তার বোনঝি এবং দেওরপো।

এক সময় বেচু চক্কত্তির হোটেল সিল হলো। হাজারির রেলবাজারের হোটেলে বেচু চক্কত্তির আশ্রয় পেল। নরেনের সঙ্গে টেঁপির বিয়েও প্রায় ঠিকঠাক। এরপর হাজারি হাতে পেল আরেক বৃহতের হাতছানি। এক গুজরাটি ব্যবসাদার খাড্ডে কোম্পানির বড়ো অংশীদার। জি.আই.পি রেলের সব হিন্দু রেস্টোরেন্টের কন্ট্রাক্টর হলো খাড্ডে কোম্পানি। সেই কোম্পানি মাসিক ১৫০ টাকা মাইনাতে তাদের হোটেল তদারকির কাজে হাজারিকে নিয়োগ করছে।

ইতিমধ্যে সকলের তদারকিতে নরেন ও আশার বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলো। হাজারির স্বপ্ন সফল হলো—

> টেঁপি লাল চেলি পরিয়া নরেনের পাশে দাঁড়াইয়া, মুখে লজ্জা, চোখে চাপা আনন্দের হাসি।[২২]

জীবন বড়ো বিচিত্র। যে পদ্মঝি হরিচরণকে নেহাত কাজের লোক বলে ভাবত, সে-ই একদিন বলে— 'দাঁড়ান ঠাকুরমশাই, পায়ের ধুলোটা দেন একটু।' এও কি সত্যি! হাজারি বিস্ময়াপন্ন; এসব স্মৃতি বুকে করে, আত্মীয় পরিজনদের ছেড়ে চলন্ত ট্রেনে চেপে হাজারি চলেছে বোম্বাই-এর পথে।

দৈনন্দিন ছোটোখাটো সুখ-দুঃখ, ভালোলাগা-মন্দলাগা, ভালোবাসা-ঘৃণার মধ্য দিয়ে যে জীবনধারা ক্ষীণ তটিনীর মতো বয়ে চলেছে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কথাসাহিত্যে সেই কাহিনিকেই অপরূপ রূপময়তা দান করেছেন। পরিবেশন করছেন অতি-পরিচিত রূপের মধ্যে—অপরিচিতের বিস্ময়মাধুরী মিশিয়ে। কখন যেন উপন্যাসের কুশীলবরাও হয়ে উঠেছে আমি বা আমার চারপাশের মানুষজন। এ জীবন অত্যন্ত সহজ, সরল, অনাড়ম্বর— এ আমারই বা আমাদেরই। কৃত্রিম প্লট সাজিয়ে, প্যাঁচ কষে, কৃত্রিম সিচুয়েশন তৈরি করে কাহিনি পরিবেশনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। আর তাই বিভূতির উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণের প্রসঙ্গ এলে আমাদের ভাবনার জগতকে আকাশ-পাতাল প্রসারিত না করলেও চলে। চরিত্রগুলির সারল্য, বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের ক্ষমতা, ঈর্ষাপরায়ণতা, লোভ, হিংসা, ভালোবাসা, পাওয়া-না পাওয়ার বেদনা—এতো আমার পাশের বাড়ির অখ্যাত জনেরও।

আসলে বিভূতিভূষণের অধিকতর সানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার গুণে মানবমনের অতিক্ষুদ্র, তুচ্ছ অনুভূতির রহস্যসাধনও সম্ভবপর হয়েছে। তিনি যা কিছু বাস্তব, যা কিছু অকৃত্রিম তারই পূজা করেছেন, তারই মালা গেঁথেছেন আজীবন কথাসাহিত্যের আসরে।

উৎসের সন্ধানে

১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তৃণাঙ্কুর', মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, তৃতীয় সং., পৃ. ৮
২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অপরাজিত', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, পৃ. ২১০
৩. বিভূতিভূষণ, 'পরিশিষ্ট : সাহিত্যের কথা', 'স্মৃতিরেখা', প্রথম প্রাইমা সংস্করণ ১৯৭৭, পৃ. ১০৭-৮
৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিভূতি রচনাবলী' ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., পৃ. ৩
৫. তদেব, পৃ. ৮
৬. তদেব, পৃ. ৪
৭. তদেব, পৃ. ৫
৮. তদেব, পৃ. ৮
৯. তদেব, পৃ. ১২
১০. তদেব, পৃ. ১৩
১১. তদেব, পৃ. ১৫
১২. তদেব, পৃ. ২৮
১৩. তদেব, পৃ. ৩৫
১৪. তদেব, পৃ. ৫৯
১৫. তদেব, পৃ. ৭৭
১৬. তদেব, পৃ. ৮৬
১৭. তদেব, পৃ. ৮৯
১৮. তদেব, পৃ. ১০৯
১৯. তদেব, পৃ. ১১২
২০. তদেব, পৃ. ১১৭
২১. তদেব, পৃ. ১৩৩
২২. তদেব, পৃ. ১৬০

নীল দিগন্তে ভালোবাসা : 'বিপিনের সংসার'

নিলয় বক্‌সী

এক

কতগুলো রং আর রেখা দিয়ে কী জীবনের ছবি আঁকা যায়! বিশেষত, জীবন যেখানে মহৎ অথবা পতিত, শান্ত নিস্তরঙ্গ জলাভূমির কবিতা কিংবা ভালোবাসার বর্ণময় কোলাহল। বিপন্ন বা বিষণ্ণ; দীর্ঘ জীবনের বাঁকে বাঁকে যে অন্তহীন বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে, তাকে কী ফুটিয়ে তোলা যায় রং কিংবা রেখার সমবায়ে! দারিদ্র্যের করুণ প্রচ্ছদে যার আপাদমস্তক ঢাকা। বিবর্ণ, বিক্ষুব্ধ, অসহায়, অভিমানী, নষ্ট জীবন। ভ্রষ্টাচার আর বিনষ্টির অন্ধকূপে যে তলিয়ে গেছে, কিন্তু হারিয়ে যায়নি। উত্তরণের আপ্রাণ চেষ্টায় যে ব্যাকুল...তার রূপরেখা!

আঁকা যায় কী...

কথাশিল্পীর পুঁজি বলতে তো শব্দ, বর্ণমালা। তারই আভাসে বিচিত্র জীবনের রং-রূপ-রেখাকে অঙ্কন করা তাঁর স্বভাব। এও হয়তো সম্ভব একজন মহৎ শিল্পীর পক্ষে। জাগতিক কত তুচ্ছ ঘটনার অন্তরালে লুকিয়ে থাকা বৈভব আর বিস্ময়ের হিরণ্ময় পাঁপড়ি খুঁজে ফেরা তাঁর মানসধর্ম। নষ্ট জীবনকে দু'হাতে কুড়িয়ে নিয়ে শিল্পের বাতায়ন থেকে তাকে দু'চোখ ভরে দেখেন তিনি। তার গভীরে নিহিত কোনো মহতী বিনষ্টি অথবা মৃতপ্রায় সম্ভাবনার মুকুলকে প্রত্যক্ষ করেন। ভালোবাসার বারিধারায় মৃত্যুকে এড়ানো, হয়তো ওই মুকুলের পক্ষে সম্ভব হয়। সে ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে। জীবনের সম্ভবনাগুলো সদর্থক রূপ পায়। প্রেম এসে জীর্ণতার বল্কল খসিয়ে পতনের খাদ থেকে তাকে উদ্ধার করে পৌঁছে দেয় সার্থকতার চূড়ায়। এই পরিণতিই হয়তো প্রাপ্য ছিল! অথচ মানুষ তা বোঝেনি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন মহৎ কথাশিল্পী, মর্ত্যপৃথিবীর দেবদূত, 'কল্লোলে'র কোলাহলে মানস সরোবরের তীর থেকে উঠে আসা এক বিবাগী পথিক—নীল অকূলের ওপারে যাঁর আস্তানা। ভালোবেসে জীবনকে বুকে আগলে রাখাতেই তাঁর আগ্রহ। 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে ভালোবাসার এক নিষিদ্ধ (?) জগৎকে নির্মাণ করেছেন তিনি। দাম্পত্যের বিপ্রতীপে তার অবস্থান। একাধিক পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক সেখানে তৈরি হতে দেখা গেছে। অথচ তারা দাম্পত্যের

বন্ধনকে কোনোভাবেই শিথিল করে না। ঘর ভেঙে যায় না কোথাও। দাম্পত্য বহির্ভূত ভালোবাসা বেঁচে থাকে তার অমোঘ প্রাণশক্তি নিয়ে, রাতের নির্জন আকাশে উজ্জ্বল ধ্রুবতারার মতো। অহরহ আলো ছড়ায় শুধু। সে আলো প্রেরণার আলো, যা সহিষ্ণুতা শক্তির জোগান দিয়ে যায়।

লক্ষণীয় যে, জীবনের দুঃসহ দিনগুলোতে অসহায় একাকী প্রেমাস্পদের পাশে রইল নিঃশব্দে—চুপিসারে, অনেকটা আপনজনের ভূমিকায়। তার প্রাপ্যটুকু দাবি করল না কোথাও। আদায় করা তো দূরের কথা। প্রয়োজনে সে নিজেকে সরিয়েও নিল। চলে গেল বহুদূরে। প্রেমিককে একাকী ফিরতে হল তার সামাজিক দূরত্বের জগতে। 'বিপিনের সংসার' পড়ে কোথাও আমিষগন্ধী যৌনতার স্বাদ পাওয়া গেল না। উপরন্তু, বিভূতিভূষণের রচনার এমন প্রসাদগুণ এবং দৈবী মহিমা, যে পাঠকের মনে তার জন্য এতটুকুও লালসা জাগল না। জাগলেই বরং অবাক হওয়া যেত। এখানে পরকীয়া প্রেমে যুক্ত থাকা নায়িকার সংখ্যা তো একাধিক—কামিনী, সুলতা (মানী), শান্তি, বীণা। দাম্পত্যের বিপরীত প্রান্তে পরকীয়া সম্পর্কের নিষিদ্ধ হাতছানি দেখা গেল। তারই একটি সংক্ষিপ্ত চিত্ররূপ নিচে তুলে ধরা হল—

দাম্পত্য সম্পর্ক		পরকীয়া সম্পর্কগুলি
১. বিনোদ চাটুজ্জে + বিপিনের মা	১.	বিনোদ চাটুজ্জে + কামিনী
২. বিপিন + মনোরমা	২.	বিপিন + সুলতা (মানী)
৩. বীণা + তার স্বর্গীয় স্বামী	৩.	বিপিন + শান্তি
৪. সুলতা (মানী) + তার স্বামী	৪.	বীণা + পটল
৫. শান্তি + গোপাল	৫.	বিশ্বেশ্বর + মতি
৬. পটল + পটলের স্ত্রী		
৭. মতি + তার স্বর্গীয় স্বামী		

দুই

আশ্বিন ১৩৪৫ থেকে ভাদ্র ১৩৪৬। এই সময়ের মধ্যে সজনীকান্ত দাস এবং পরিমল গোস্বামীর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত 'অলকা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরোয় 'বিপিনের সংসার'। ইংরেজি ১৯৩৮-৩৯ সালের মধ্যে বিভূতিভূষণের উপন্যাসে নায়কদের জীবনে প্রেম এসেছে বারে বারে। প্রেমিকাকে বধূ হিসেবে পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। 'অপরাজিত'-তে অপুর সঙ্গে কাকতালীয়ভাবে বিয়ে হয়েছে অপর্ণার। একে নিয়তির পরিহাস ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়! কিন্তু তার জীবনে যে লীলাও আছে। হয়তো সে অতীত। তবু সে আছে অপুর স্বপ্নে ও কল্পনায়।

অপর্ণা জানে না তার অস্তিত্ব। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসের জিতেন ও হিরণ্ময়ীর সংসার জীবনের মাঝখানে দ্বারবাসিনী আখড়ার মালতীর যেটুকু জায়গা, তার পুরোটাই তো জিতেনের স্বপ্নের ভিতর। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মালতী সে জায়গা অর্জন করে নিতে পেরেছে। হিরণ্ময়ীর কাছে সে কিন্তু অপরিচিত। একইভাবে বিপিনের স্ত্রী মনোরমার কাছেও অপরিচিত সুলতা ও শান্তি। স্বামীর যে অন্য কোনো নারীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে, মনোরমার পক্ষে তা স্বপ্নেও কল্পনা করা সম্ভব নয়। অন্যভাবে বলা যায়, সারাক্ষণ সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকা মনোরমার মধ্যে এসব নিয়ে ভাবনার অবকাশই বা কোথায়!

বিপিনের নয়, এ আসলে মনোরমার সংসার। দু'বেলা তাকে ভাতের চিন্তা করতে হয়। স্বামী, ছেলে-মেয়ে, অসুস্থ দেওর, বিধবা ননদ, বৃদ্ধা শাশুড়ি—সকলের ভালো-মন্দ এবং সুবিধা-অসুবিধা—এসব কিছুই গৃহিণী মনোরমার মস্তিষ্কের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরপাক খায়। সংসারে স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য নষ্ট হলেই তার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। অসুস্থ দেওর বলাই ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেছে। বুকে আগলে রেখে দিনরাত তার সেবাযত্ন করেছে মনোরমা। বৃদ্ধা ও অসহায় শাশুড়ির শেষ জীবনের সহায় বলতে তার এই সতীলক্ষ্মী বউটি। তার খাওয়া-পরার কখনো কোনো অযত্ন হতে দেয়নি মনোরমা। ভালোবাসার ছদ্মবেশে বিধবা ননদ বীণার জীবনে দুর্ভাগ্যের কালোমেঘ ঘনিয়ে এলে মেয়েটির ভবিষ্যৎ চিন্তায় কাতর হয়েছে সে। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ঘর করা, সংসারী যুবক পটলের মতিগতি ভালো লাগেনি মনোরমার। তার পাতা প্রেমের ফাঁদ থেকে ঠাকুরঝি বীণাকে বাঁচাতে স্বামীর শরণাপন্ন হয়েছে সে। এমনকি প্রয়োজনে কৌশলী বুদ্ধির প্রয়োগ করতেও পিছপা হয়নি। নিত্যদিন অভাব-অনটন আর দারিদ্র্যের ছোবলে জর্জরিত সংসারের গতিকে সচল রেখেছে মনোরমা। অথচ, তার জ্যাঠামশায়রা ছিলেন অবস্থাপন্ন বড়োলোক।

মনোরমার জ্যেঠা একজন অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ, জ্যাঠতুতো ভাইদের মধ্যে কেউ উকিল, কেউ বা ডাক্তার। তিনি যখন বারাসতের মুন্সেফ ছিলেন, সেইসময় বিপিনের সঙ্গে তাঁর আদরের ভাইঝির বিয়ে দেন, সে শুধু বিনোদ চাটুজ্জের নামডাকের জোরে। সেখান থেকে স্বামীর সংসারে এসে, শুরুর থেকে আজ পর্যন্ত কম দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি বেচারী মনোরমাকে। মুখ ফুটে তাকে কখনো কোনো অভিযোগ জানাতে দেখা যায় না। সংসারে অভাব থাকায় স্বামীর সঙ্গে সে মিষ্টভাষায় রসালাপ করতে পারেনি কখনো। সর্বদা ঝাঁঝের সুরে কথা বলেছে। মনোরমার বিরুদ্ধে বিপিনের এটাই ছিল প্রধান অভিযোগ। ভালোবাসার কথা বানিয়েও সে বলতে পারেনি স্বামীকে। ফলে, পুরুষের মন ক্রমশ সংসার থেকে সরে গেছে। বিপিনের মনের ওই সরণ হয়তো অনিবার্য ছিল। তারজন্য মনোরমাকে দায়ী করা যায় না। সে সাধ্যের বাইরে গিয়ে সংসারের জন্য যথেষ্ট করেছে। আর কী-ই বা করবে! কতো করবে!

মনোরমার মুখে সংসারের শুধু এটা নেই, ওটা নেই শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়েছে বিপিন। স্ত্রীর সারাজীবনের ভাত-কাপড়ের অভাব, মনের সাধ-আহ্লাদ, কোনোকিছুই সে সঠিকভাবে মেটাতে পারেনি—এরজন্য বিপিনকেই দোষ দেওয়া উচিত। সাপের কামড়ে অচৈতন্য মনোরমা মৃত্যুর ঘর থেকে ফিরে এলে বিপিনের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে এক বিস্ময়কর বাঁক লক্ষ করা যায়। বিপিনের মনে ভালোবাসা আর সহানুভূতির মধ্যে তার যেন জন্মান্তর ঘটে। স্ত্রীকে সারাজীবন কিছুই দিতে পারেনি, এই অনুতাপের জ্বালায় সে কাতর হয়। মনোরমার সংসারে, নিজের বিপথগামী মনকে সঠিক পথে চালিত করে, শেষবারের মতো ফেরে সে। ফলে, তা হয়ে ওঠে বিপিনেরও সংসার। যার সক্রিয় সহযোগিতায় এই যুবকের মনের শুশ্রূষা কার্য সম্পন্ন হয়, সে জমিদার অনাদিবাবুর একমাত্র মেয়ে মানী। উপন্যাসের শেষে বিপিনকে তার সতীলক্ষ্মী বউটির কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে মানী, আবার সে নিজেও মনেপ্রাণে ভালোবেসেছে তার বিপিনদাকে।

অথচ প্রেমের স্বপ্নমাধুর্য আর জাগতিক বাস্তব এসে থেমে যায় পারস্পরিক ব্যবধানের দুইপ্রান্তে। মানীর মতো অভিজ্ঞ মেয়েরা সংসারে কখনো কর্তব্যবোধকে বিসর্জন দেয় না। নারীহৃদয়ের গোপনতম কোণে ভালোবাসার বীজ উপ্ত হলেও, তারা সংসারের স্বার্থে নিজেদের দমন করতে জানে। মিলনের অমরাবতী ছেড়ে বিরহের অলকাপুরীতে নিজেদের স্বেচ্ছায় নির্বাসিত করলেও, বাহ্যিক স্বাভাবিকত্ব সৌজন্য এবং সামাজিক লোকাচারকে তারা বজায় রাখতে পারে। শেষ বিদায় নেওয়ার আগে বিপিন প্রশ্ন করেছিল, কবে আবার দেখা হবে দু'জনের! সংক্ষিপ্ত উত্তরে মানী জানায়—'আর জন্মে। এ জন্মে যাদের ওপর যা কর্তব্য আছে, করে যাই বিপিনদা।'

বিপিনের মনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে মানী। তার যত্নের সঙ্গে মনোরমার যত্নের কোনো তুলনাই চলে না। মানীর মতো অন্তর্যামী নয় মনোরমা। বিপিনের মুখ দেখলে তার মনের গতিপ্রকৃতি টের পায় মানী। সে বুঝতে পারে, তার বিপিনদার ক্ষিদে পেয়েছে কিনা অথবা সে ক্লান্ত—কাজেই একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। মুখ ফুটে তাই সবকথা বলতেও হয় না বিপিনকে। মানী যেন কেমন করে সবকিছু বুঝে ফেলে। বাবার মৃত্যুর পর কুসঙ্গে জড়িয়ে অধঃপাতে যাওয়া, দু'হাতে টাকা উড়িয়ে সংসারে দারিদ্র্যকে ডেকে আনা, এমনকি নিজের জীবনের ভাগ্যাহত পরিণতির জন্য তার ভূমিকা—অতীতের এইসব কোনো কথাই সে গোপন করে না মানীর কাছে। রাণাঘাট বা বনগাঁ-য় এমন কোনো কুস্থান ছিল না, যেখানে সে যায়নি। মদ খেয়ে দু'হাতে টাকা উড়িয়েছে। বাবার রেখে যাওয়া বিষয়-সম্পত্তির সর্বনাশ করেছে। মনোরমার গায়ের গয়না বন্ধক দিয়ে অন্য মেয়েমানুষের আবদার রেখেছে। জমিদার অনাদিবাবুর কাছারিতে তার বাবা বিনোদ চাটুজ্জে যখন নায়েবের কাজ করতেন, সেইসময় মাঝে মধ্যে বাবার সঙ্গে কাছারিতে আসত বিপিন।

জমিদার-কন্যা মানীর সঙ্গে তার ছিল খেলার সম্পর্ক, প্রগাঢ় সখ্যতা। তারপর কালক্রমে শৈশব-কৈশোরের অর্ধস্ফুট অন্ধকার থেকে খরদীপ্ত যৌবনের বিচিত্র মধ্যাহ্নে যখন তারা পদার্পণ করেছে, তখন সেই পুরোনো সখ্যতা কেমন করে যে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে, তা ওরা বুঝতেও পারেনি। বাবার মৃত্যুর প্রায় সাত-আট বছর পরে, অনাদিবাবুর ডাকে সাড়া দিয়ে তার কাছারিতে নায়েবের শূন্যপদে যোগদান—বিপিনের জীবনে, সম্পর্কের অন্য এক জায়গাকে খুলে দেয়। দাম্পত্যহীন পৃথিবীতে প্রবেশের ছাড়পত্র তাকে দেয় মানীর ভালোবাসা। রাতের অন্ধকারে বা নিস্তব্ধ দুপুরে বাড়ির জানলা ধরে তারই অপেক্ষায় মানীর দাঁড়িয়ে থাকা এবং সামান্য অবকাশ পেয়ে দু'জনের নিভৃত আলাপচারিতা, বিপিনের মনকে অপরিসীম মুগ্ধতায় ভরিয়ে রাখে। জ্ঞান-বুদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা—সবদিক থেকেই মানীর তুলনা পাওয়া কঠিন। সে যখন বাপের বাড়িতে থাকে, বিপিনের খাওয়া-শোওয়া, সুবিধা-অসুবিধা—সবকিছুর খেয়াল রাখে। তার সে তত্ত্বাবধান কখনো আবার শাসনের রূপও ধরে। আসলে, মানীর ভূমিকা কেবলমাত্র বিপিনদার উন্নতিকল্পে আগ্রহী এক প্রেরণাদাত্রীর। তারই সহযোগিতায় বিপিন পড়াশুনা করে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই পড়ে ডাক্তারি করতে শুরু করে। কালক্রমে পাড়াগাঁয়ে বেশ খনিকটা জনপ্রিয়তা লাভ করে বিপিন। পসার বাড়ায়। রোজগার বাড়ে তার। ডাক্তারের ভূমিকায় অভাবী সরল গ্রাম্য মানুষদের সেবা করে বিপিন। একদিকে মানী, অন্যদিকে আর এক বধূ শান্তি—দু'জনেই বিপিনের জীবনে অভাবনীয় মাধুর্য ও অবিস্মরণীয় বৈভব ছড়ায়। দুই নারীকে কেন্দ্র করে বিপিনের মনের গোপনতম কোণে উপ্ত হয় প্রকৃত ভালোবাসার বীজ। সম্পর্কের গভীরে নিহিত এক অকল্পনীয় রহস্যের পাঠোদ্ধার করতে চায় সে, অথচ পারে না বলে মানী ও শান্তির ভালোবাসার টানকে উপেক্ষা করাও সম্ভব হয় না তার পক্ষে। দাম্পত্যের পাশাপাশি এইভাবে তৈরি হয় নিষিদ্ধ ভালোবাসার আর এক সংসার।

জীবিকার অনুষঙ্গে কিংবা জীবনের প্রেরণায় মনোরমা কখনোই বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে না বিপিনের কাছে। যে অনাদি চৌধুরি একসময় বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্জের মনিব ছিলেন, বাপের মৃত্যুর পর সেই জমিদারেরই নায়েবি করেছে বিপিন। জমিদার তনয়া মানী সময়ের এক নিষ্ঠুর কারসাজিতে, বর্তমানে কলকাতার অবস্থাপন্ন এক উকিলের ঘরনিতে পরিণত হয়েছে। সেখানে হয়তো ভোগবিলাস স্বাচ্ছন্দ্য আরাম সবকিছুই আছে, কিন্তু প্রেম নেই। অন্তত উপন্যাস পড়ে বোঝা যায়নি যে, স্বামীর ভালোবাসা আদৌ মানী পেয়েছে কিনা! তার মনের গোপনতম বিন্দু থেকে মাঝে মধ্যে হয়তো উঠে আসে মূর্তিমান এক শূন্যতা : 'যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে ব'সে ধান কাটি/ও মোর মনে জাগে তার লয়ান দুটি'— বৃদ্ধ আইনদ্দির নাতির গাওয়া গানের দু-একটি কলি বিপিনকে অন্যমনস্ক করে দেয়। দিগন্ত বিস্তীর্ণ মাঠ, বিলের ধারে

সবুজ ধানের ক্ষেত, জলে সোলাগাছের হলদে ফুলের রাশি, আকাশে উড্ডীয়মান বাবুইপাখির ঝাঁক কিংবা হরিদাসপুরের বাঁশবনের মাথায় হেলে পড়া অস্তমান সূর্যের আলো—সবকিছু মিলে বিপিনের মনে কেমন যেন এক উদাস করা ও অপূর্ব ব্যথাভরা অনুভূতির সৃষ্টি করে—

> যেন মনে হইল, মানীকে এ জগতে বুঝিবার ভালবাসিবার লোক নাই। মানী যাহার হাতে পড়িয়াছে, সে মানীর মূল্য বোঝে নাই। মানীর জীবনকে ব্যর্থতার পথ হইতে যদি কেহ রক্ষা করিতে পারে, তাহার মুখে সত্যকার আনন্দের হাসি ফুটাইতে পারে, তবে সে বিপিন নিজেই। বিস্তীর্ণ সংসারে মানী হয়তো বড়ো একা, যেমন সে নিজেও আজ একা।

দু'টি জীবনের হিসেব নিকেশের পাতা এইভাবে মিলে যায় পরস্পরের সাথে। এর পূরবী, ওর বিভাস—এসে একে অপরের হাত ধরে। মনের পৃথিবীতে শুরু হয় তাদের যুগল চলন, অযুত আলোকবর্ষ ধরে। প্রেমের দুর্নিবার গতি মন্বন্তর ও মহাযুগ পার হয়ে চলে যায়। সন্ধ্যারাতে প্রেমের অগণিত প্রদীপ জ্বলে ওঠে লক্ষ আলোকবর্তিকায়।

বিপিনের কথা নিভৃতে চিন্তা করেছে মানী। একবছর বয়সে তার খোকা যখন মারা যায় রাত তিনটের সময় ভবানীপুরে তার শ্বশুরবাড়িতে, সেখানে তখন 'একশ কান্নাকাটির মধ্যে' অদ্ভুতভাবে তার মনের ক্যানভাসে ভেসে উঠেছে বিপিনদার মুখচ্ছবি। দুঃখ তাদের নৈকট্য বাড়িয়েছে। বহুদিনের অদর্শনে কাতর হয়ে ঠিকানা গোপন করে সে একটি চিঠিও লিখে ফেলেছে বিপিনের কাছে। আসলে মানীর শিক্ষা-দীক্ষা, আভ্যন্তরীণ গুণ—কোনোকিছুই বহির্বিশ্বে স্বাবলম্বিতার কোনো জমি পায়নি। বিপিনের উষ্ণস্মৃতির অবলম্বন ছাড়া মহাপৃথিবীতে মানী নিতান্তই নিরাশ্রয়। শেষবিদায়ের সময় মনোরমার সংসারে বিপিনকে পাঠাতে গিয়েও সে কেঁদেছে, পিছু ডেকেছে, কিন্তু পথ আটকায়নি। তার চোখের জল, অবাধ্য মনের গতিবিধি—এটা অন্তত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বিপিনকে সে ভালোবাসে। নিষিদ্ধ ভালোবাসার রুদ্ধ জগৎ থেকে, কক্ষচ্যুত এই মানুষটিকে সংসারের নিস্তরঙ্গ বলয়ে ফেরাতে গিয়ে, অজ্ঞাতসারে বিপিনের মোহমুক্তি ঘটিয়েছে মানী। জীবনে চলার পথ অবারিত হয়েছে এই যুবকের। এটাই তার আত্মস্থতার উপার্জন। সত্যের উচ্চতর বৌদ্ধিক বলয়ে পৌঁছতে পেরেছে তার মন। নিরাসক্তির দর্শন অন্তর্জগৎকে আলোকিত করেছে। এরজন্য মানীর কাছে বিপিন চিরঋণী।

> গরুরগাড়ী ছাড়িল। অনেকখানি রাস্তা-মেঠো নির্জ্জন পথ, কৃষ্ণপক্ষের ভাঙ্গা চাঁদের জ্যোৎস্নায় মেটে পথের ধারের গ্রাম্য বাঁশবন, ক্বচিৎ কোনো আমবাগান কিংবা বেগুন-পটলের ক্ষেত, আখের ক্ষেত, অস্পষ্ট ও অদ্ভুতভাবে দেখা যাইতেছে। বিপিনের মনে অন্য কোনো জগতের অস্তিত্ব নাই—কোথায় সে চলিয়াছে—এই

> আনন্দ ও বিষাদের আলোছায়া-ঘেরা পথে কত দূর-দূরান্তের উদ্দেশে তার যাত্রা যেন সীমাহীন, লক্ষ্যহীন—সে চলার বিজন পথে না আছে শান্তি, না আছে মনোরমা। কেহ নাই, সেখানে সে একেবারে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, সম্পূর্ণ একা। কিংবা যদি কেহ থাকে, মনের গহন গভীর গোপন তলায় যদি কেহ থাকে, ঘুমাইয়া থাকুক সে, গভীর সুষুপ্তির মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া রাখুক সে।

তিন

নায়েবি ছেড়ে বিপিনের ডাক্তারি, প্রজা পিটিয়ে খাজনা-আদায় থেকে দারিদ্র্যের সেবায় আত্মোৎসর্গ—এক অর্থে তার জীবিকা বৃত্তির স্থূলতা থেকে সূক্ষ্ম অনুভবে উত্তরণ। সংসারের বীতশ্রদ্ধ ও অলস এক পরগাছার—এ যে রীতিমতো মানুষ হয়ে ওঠার অনবদ্য চেষ্টা। এর জন্য দাম্পত্য বহির্ভূত ভালোবাসার জয়ধ্বনি করতে হয় বৈকি। সে প্রেম সম্মুখে চলতেও পারে, আবার প্রেমাস্পদকে সঠিক পথে চালাতেও পারে। সমগ্র আখ্যান জুড়ে তাই নিষিদ্ধ ভালোবাসার জয়-জয়কার। তুলনায় দাম্পত্য প্রেম পড়ে থাকে দূরে, পরিত্যক্ত অবহেলায়। বিপিনের পেশাবদল এবং যাবতীয় জ্ঞানলাভের মূলে আছে মানীর কল্যাণহস্তের স্পর্শ। এই আখ্যানকে বিভূতিভূষণ তৈরি করেছেন নিজের কোনো না কোনো অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে। সে অভিজ্ঞতার প্রসাদ, অধরা মাধুরীর অপূর্ণতা—নিজের চেতনে কিংবা অবচেতনেই হয়তো সাহিত্যের ব্যঞ্জনায় মূর্ত করতে চেয়েছেন তিনি। মানীর আত্মা ও অবয়বে যে মিশে আছেন সুপ্রভা। তবে, মানী পুরোপুরি সুপ্রভা নয়। ভেদ আছে দু'জনের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী ছিলেন সুপ্রভা দত্ত। বিভূতিভূষণের সঙ্গে এই বিদূষীর সম্পর্ক অস্বীকার করার মতো নয়। দু'জনের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হতো। ভাব বিনিময় তো স্বাভাবিক ব্যাপার। বিভূতির হৃদয় জুড়ে ছিলেন সুপ্রভা। মানী তাঁরই সাহিত্যিক প্রতিমূর্তি। সুপ্রভাকে লেখা বিভূতিভূষণের চিঠির অংশ হুবহু উঠে আসে—'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে, মানীর প্রতি বিপিনের মনোভাবের ব্যঞ্জনায়। এ রচনা সম্পূর্ণভাবেই মানী-নির্ভর, বরং বলা ভালো মানীর প্রেম এবং শুভেচ্ছা-নির্ভর এক আখ্যান। মানী অন্দরের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে বিপিনকে বাইরের কাজে উৎসাহ দেয়, তবু নিজে সে অন্দরমহলের সীমানা পেরিয়ে বাইরে আসতে পারে না।

তবে, কোনো এক সুপ্রভার সঙ্গে কোনো একজন শিল্পী বিভূতিভূষণের সম্পর্কের খুঁটি-নাটি নিয়ে পাঠকের মনে যদি নতুন করে তৈরি হয় অনুসন্ধিৎসা, তাহলে ভবিষ্যতে সমালোচনার ব্যবচ্ছেদে বিভূতি-সাহিত্যের নর-নারীর সম্পর্কগুলো নিয়ে নতুনভাবে কাটা-ছেঁড়া হবে। মানী বিপিনের সম্পর্কের রসায়ন বৌদ্ধিক সমালোচকের তীক্ষ্ণযুক্তির ধারালো অস্ত্রে সেদিন রক্তাক্ত হবে বলে মনে হয়। কিন্তু সেই পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের প্রাপ্ত নির্যাস তথা ফলাফল নতুন সত্যের আবরণ উন্মোচন করবে।

আসলে, মানীর সাহিত্যিক বিন্যাসের বিনির্মাণ বিভূতিভূষণের নিজস্ব আওতায় পড়ে। তাকে পাঠক নিজস্ব বোধের পরিমণ্ডলে গ্রহণ করার সময়, স্বেচ্ছাকৃত কৌতূহলে—খনিকটা অবদমিত ইচ্ছার প্রেরণায়, বিভূতিভূষণ সুপ্রভা সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত একটা পরিশিষ্ট বিপিন-মানী সম্পর্কের সাহিত্যরূপের উপান্ত পর্যায়ে মনে মনে জুড়ে দেয়। এর দায় লেখকের নয়। তিনি যতটা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব—বলেছেন। পাঠক তার উপর রং মাখিয়ে তৈরি করে ওই পরিশিষ্ট। সুপ্রভার মতো মেয়েরা, বিশ শতকের দুই কি তিনের দশকে বেথুন কলেজ—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি লেডি কীন কলেজ পর্যন্ত যারা পৌঁছায়, তারা বিভূতিভূষণের মতো সাহিত্যিকের বয়ানে ঠিক কীভাবে বদলায়—এসব কিছু গভীর অভিনিবেশের বিষয়। সবটাই তো পাঠকের পাঠ এবং নির্মাণ। লেখক তো কখনো বলেননি কিংবা বলতে চাননি, হয়তো সচেতনভাবে চিন্তাও করেননি যে, ধাতুগতভাবে সুপ্রভার মানসপ্রকৃতি যেমন হলে তাঁদের সম্পর্কের দ্বন্দ্ব-জটিলতা খানিকটা প্রশমিত হতো, তেমন কোনো আভাস আসলে তিনি মানীর ভেতরে দেখতে চান। আবার সুপ্রভা বিভূতিজীবনে মানী হলে, ‘বিপিনের সংসার’ উপন্যাসের মানী অবিকল একইরকম থাকত কিনা, পাঠকের তা জানা নেই।

চার

পরনারীর সঙ্গ করা বিপিনের রক্তের দোষ। তার বাবা বিনোদ চাটুজ্জে ছিলেন শক্তসমর্থ জোয়ান ও দাপুটে এক পুরুষ মানুষ। গোয়ালার এক বালবিধবা সুন্দরী মেয়ে কামিনীর সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। মেয়েটির ঘরে নিত্য যাতায়াত ছিল বিনোদের। তার বঞ্চিত নারীহৃদয়ের সবটুকু কৃতজ্ঞতা প্রেমের আকারে সে ঢেলে দিয়েছিল নায়েব মশাইয়ের চরণযুগলে। সে কথা বিপিন জানে। ওই মহিলার মনে চিরটাকাল শ্রদ্ধার মূল্যবান আসনটি দখল করেই রয়ে গেলেন বিনোদ। অথচ, তাঁর কাছ থেকে কিছুই পেল না কামিনী। বিনোদ যথাসময়ে চলে গেলেন পরলোকে। সংসারে আবর্জনার মতো পড়ে রইল কামিনী।

> সারাজীবন একসঙ্গে যাহার সহিত কাটাইয়া, নিজের উজ্জ্বল যৌবন যাহাকে দান করিয়া কামিনী নারীজন্মের সার্থকতাকে বুঝিয়াছিল, সেই বিনোদ চাটুজ্জের অভাবে তাহার জীবন শূন্য হইয়া পড়িবে ইহাও বিচিত্র কথা নয়।

বৃদ্ধাবস্থায় বড়ো করুণ মৃত্যু হয়েছিল তার, একাকী নির্জন ঘরে। কামিনী মাসির মৃত্যুতে খানিকটা হলেও মাতৃশোকের আঘাত পেয়েছিল বিপিন। কারণ, অভাগিনী এই মহিলা তাকে ছেলের মতো স্নেহ করতেন। কামিনীর মৃত্যু বিপিনের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং পুরোনো দিনগুলো স্মৃতির সঙ্গে ছেদ ঘটায় তার মানস-আত্মার।

রক্তের সেই দোষে আক্রান্ত হয় বিনোদ চাটুজ্জের মেয়ে বীণাও। অল্পবয়সী এই বিধবা, বয়স্ক এক সংসারী যুবক পটলের প্রেমে পড়ে। বয়সের ধর্ম ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাদের। ওদের দু'জনের গোপন মেলামেশাকে কেন্দ্র করে গ্রামে কুৎসা রটে। বাড়িতে বাড়িতে কথা ওঠে। বিপিনদের সংসারে নেমে আসে দুর্যোগ। এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে এইভাবে ছড়িয়ে পড়ে নিষিদ্ধ ভালোবাসার বীজ।

বিপিনের মনে স্থায়ী আঁচড় কেটে যায় আরো একটি নিষিদ্ধ ভালোবাসার সম্পর্ক। ব্রাহ্মণ সন্তান বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী এবং বাগদী পাড়ার অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে মতি। বিশ্বেশ্বরের নারীবিহীন নিরামিষ জীবনে একদিন নেমে আসে ভালোবাসার প্রপাত। নিচুজাতের নারীসঙ্গে জাত খোয়ায় এই পুরুষ। সঙ্গে ভাসানপোতা স্কুলের চাকরিটিও। অবস্থাপন্ন বাপের ঘরের স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে এক-কাপড়ে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে ঘর ছাড়ে মতি। অভাব ও দারিদ্র্যকে সঙ্গী করে জেয়ালা-বল্লভপুরে এসে নতুনভাবে ঘর বাঁধে দু'জনে। জোয়ান পুরুষটির অসুখের সময় বুক দিয়ে আগলে রেখে সেবা করে তাকে বাঁচায় মতি। পরিশ্রমের কোনো খামতি তার মধ্যে লক্ষ করা যায়নি। অভাবের সংসারে প্রতিদিন খুব ভোরবেলায় হিমজলে শাক তুলে রোজ চিংড়াঘাটার বাজারে বিক্রি করে আসে, কাঠ ভাঙে, মাছ ধরে, ধান ভানে। তবে উপার্জন হয় সামান্য কিছু। শরীরে সহ্য হয় না এত পরিশ্রম। ক্রমে জ্বর ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মেয়েটি শয্যা নেয়। শেষ শয্যা। বিপিন ডাক্তার ও প্রেমিক স্বামীর সমস্ত সেবাযত্নকে ব্যর্থ করে পূর্ণিমার রাতে মারা যায় মেয়েটি। 'বল্লভপুরের বিলের ধারের সে ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত বিপিন ভুলে নাই। সে রাতটিতে বাগদীর মেয়ে মতি তাহার মনে একটা খুব বড়ো দাগ রাখিয়া গিয়াছে। অন্য এক জগতের সহিত পরিচয় করাইয়া গিয়াছে।' নিষ্কাম ভালোবাসার কী মর্মান্তিক পরিণাম! আজও চোখ বুজলে বিপিন সে রাতের ছবি স্পষ্ট মনের মধ্যে দেখতে পায়। 'সেই জেয়ালা-বল্লভপুরের বিল, সেই চাঁদের আলো, বিলের ধারে চিতা'—একদিকে সে, অন্যদিকে বিশ্বেশ্বর—সবকিছু চোখের সামনে আজও ছায়াচিত্রের মতো ফুটে ওঠে।

পাঁচ

নীরবতার ভাষা গভীর। নীরবতার বাণী অনেক কিছু বলে যায়। গভীর রাতের তারা ভরা আকাশ চুপ করে কান পেতে শোনে—নিখিলের ওই বাণী। বনজ্যোৎস্নায় কিংবা সবুজ অন্ধকারে অব্যক্ত কথার অযুত তরঙ্গ বয়ে যায় শুধু একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। অপেক্ষার মুহূর্তগুলো তখন ভারী হয়ে ওঠে। বিমূর্ত কথারা অবয়ব পেতে চায়। হয়তো কোনো নারীশরীর। চেনা ছক আর বাধাবৃত্ত ভেঙে জঙ্গম জীবনের অনুসন্ধিৎসু পথিক বিপিন শুনতে পায় ওই কথা...শব্দ তরঙ্গ। গভীররাতে কিংবা শান্তদুপুরে। জন কোলাহল থেকে অনেকদূরে। বিজন পল্লিগ্রামের আটপৌরে সংসারের

আনাচে-কানাচে। নিঃসঙ্গ কাছারি ঘরে। মনে হয় সবকিছুই যেন কেমন একটা স্বপ্ন... মায়া... মতিভ্রম। মনোরমা... মানী... শান্তি। নিরালায় মনের এস্রাজ বেজে ওঠে কোমল সুরে। আত্মমগ্ন যুবক তখন বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ভালোবাসার দ্বারস্থ হয় বিপন্ন ও মূর্চ্ছিত আত্মার সেবা-শুশ্রূষা করতে। স্বপ্নের ঘোরে জেগে ওঠে একাধিক নারীমুখের প্রতিচ্ছবি। ভালোবাসার কী নাম গোত্র ঠিকানার প্রয়োজন! মোটেই নয়। জীবনে কখন কীভাবে প্রেম আসে, তা কেউ বলতে পারে না। যেমন এসেছিল বিপিনের জীবনে। নিঃশব্দে দ্বিতীয়বার।

পিপলিপাড়ার বাসিন্দা বৃদ্ধ রামনিধি দত্তের মেয়ে শান্তি যেন মানীরই সমগোত্রীয়। দত্ত মশাইয়ের চণ্ডীমণ্ডপে থেকেই বিপিন তার ডাক্তারি শুরু করে। সবেমাত্র তার পেশার জীবনে একটা অধ্যায়ের অবসান ঘটেছে। জমিদার বাড়িতে নায়েবের চাকরি থেকে সে ইস্তফা দিয়েছে। সে তো আর তার বাবা বিনোদ চাটুজ্জের মতো দক্ষ নায়েব নয়। গরিব প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা, প্রয়োজনে কঠোর এবং নির্দয় হওয়া তার কম্ম নয়। সে মানীর কথা রাখতে পারেনি। তাকে না বলে, তার অনুমতি না নিয়েই নায়েবের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। জীবনের একটি পর্ব সমাধা হয়ে গেছে। এরজন্য প্রবল অনুতাপ হয় বিপিনের। মানীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি মানতে না পারার কষ্ট। অথচ, তার দেখানো পথেই হেঁটেছে বিপিন। জীবনের অন্য আর এক পর্বের সূচনা ঘটেছে। ডাক্তারি শুরু করেছে সে। এ ব্যাপারে প্রথমদিকে রামনিধি দত্ত ও তাঁর পরিবারের তরফ থেকে যথেষ্ট সাহায্য এবং সাহচর্য পেয়েছে বিপিন। নীল আকাশে সন্ধ্যাতারার মতো তার জীবনে আবির্ভাব ঘটেছে শান্তির। বিপিনের প্রতি এই বিবাহিতা যুবতির অকৃত্রিম সেবাযত্ন, নিঃস্বার্থ পরিচর্যার আকুলতা প্রকারান্তরে ভালোবাসারই অন্য এক রূপ। বিপিন প্রথমে তা বুঝতে পারেনি। শেষে তা বুঝিয়েছে মানীই— 'মেয়েমানুষের চোখ এড়ানো কঠিন বিপিনদা, ও মেয়েটি তোমায় ভালোবাসে।' আর তাই সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না। অথচ মনে মনে বড্ড কষ্ট পায়। সে যে অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। তাকে দেখলে বোঝা যায়, নিস্তরঙ্গ পল্লিগ্রামের শান্ত দুটো চোখ কার অপেক্ষায় যেন অধীর হয়ে রয়েছে। হয়তো বিপিনেরই প্রতীক্ষায়। হায়, পুরুষমানুষ যে বোঝে না নারীর হৃদয়ের ভাষা, তার ছলছল দুচোখের সংলাপ। শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের আস্তানায় শান্তি যখন যেভাবে এসে থেকেছে, সেইসময় বিপিনের খাওয়া-দাওয়া সেবাযত্নের কোনো ত্রুটি রাখেনি এই পল্লিবধূটি।

> খাওয়া শেষ করিয়া বিপিন বাহিরে আসিল। ভাবিল, বেশ মেয়েটি। এমন দয়া শরীরে, এমন মমতা, যেন নিজের বোনটির মতো বসে বসে খাওয়ালে।

বীণার কাছ থেকে এইরকম সেবা কখনো পেয়েছে কিনা, বিপিনের তা মনে পড়ে না। মানী ও শান্তি যেন একই ছাঁচে ঢালাই করা। 'তবে প্রভেদও আছে,

মানী মনে প্রেম জাগায় আর এ জাগায় স্নেহ ও শ্রদ্ধা।' অথচ, ভালোবাসা আলেয়ার মতো। তার পেছনে ছুটতে ছুটতে শেষপর্যন্ত ক্লান্ত পথিক দিশাহারা হয়ে যায়। প্রেমের জালে আটকে পড়ে হাঁসফাঁস করে। তথাপি, অমৃতকুম্ভের সন্ধান মেলে না। চাওয়া-পাওয়ার নিত্যদ্বন্দ্বে উত্থিত হয় আরক্ত বাসনা। সন্ধ্যা বা রাতে প্রেমিকের ব্যথাভরা দীর্ঘশ্বাস পৃথিবীর বাতাসকে আরো বেশি ভারী ও বিষন্ন করে তোলে। মরীচিকার পশ্চাতে ছুটে তাই কোনো লাভ নেই। বিপিন বোঝে। ভালোবাসা অনেকটা সেই মরীচিকার মতো। তাকে পুরোপুরি পাওয়া হয়ে ওঠে না কখনো। শান্তির ক্ষেত্রে বিপিন তাই প্রথম থেকেই বেশ সাবধানী।

> না আসুক, বিপিন আর জালে জড়াইবে না। কেহই শেষপর্যন্ত টেঁকে না ওরা। কেবল নাড়া দিয়া যায় এই মাত্র। কষ্টও দিয়া যায় খুব। মানী যেমন গিয়াছে, এও তেমনি চলিয়া যাইবে। দরকার কি এইসব আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া?

মানী আলেয়া হলেও, তার মতো পথভ্রষ্ট পথিককে সে পথ দেখায়। তার মুখখানা মনে পড়লে বিপিনের ভারি কষ্ট হয়। কিন্তু সেই কষ্টের মধ্যেও ব্যথাভরা অপূর্ব এক আনন্দের স্বাদ পায় বিপিন। এরজন্য নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যবধানের প্রয়োজন আছে বৈকি। 'সর্ব্বদা তাহাকে দেখিতে পাইলে, এ মনের ভাব থাকিত না, একথা এখন সে বোঝে।'

আকস্মিক দর্শনে নারীর প্রতি রূপমুগ্ধতা জাগার বয়স বিপিনের নয়। তবুও তো ভালোবাসা পিঁড়ি পেতে রাখে ছায়াঘেরা উঠোনে, নীল দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ার আগে তীব্রতা বেড়ে যায় তার। অনিরুদ্ধ বেগে ধাবিত হয়ে সে কাঁপিয়ে তোলে সত্তার ভূ-খণ্ড। স্বপ্নসুন্দর নীলিমায় বেপথুমান নম্রনীল ভালোবাসার কম্পন। একদিকে বিপিনের জীবনে সীমা-স্বর্গের ইন্দ্রাণী মানী, অন্যদিকে শান্তির পবিত্র আত্মদান। আত্মদহন। বিপিনের নিঃসঙ্গ প্রবাস জীবনে স্নেহ-পরায়ণা এই নারীর অকৃত্রিম সাহচর্য তার মনকে আনন্দে ভরিয়ে রাখে। 'কোন্ দূর নক্ষত্রের দেবলোক হইতে শান্তির মতো মেয়েরা, মানীর মতো মেয়েরা, পৃথিবীতে জন্ম নেয়!' তার জীবনে প্রেম আসে করুণা ও সহানুভূতির ছদ্মবেশে। শান্তি শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে, ওই মেয়েটির শূন্যতা বিপিনের মনকে দার্শনিক করে তোলে।

> সংসারের ব্যাপারই এই, চিরদিন কেহ থাকে না। মানীকে দিয়াই সে জানে। জালে জড়াইবে না বলিলেই কি না জড়াইয়া থাকা যায়? কোথা হইতে আসিয়া যে জোটে!

না পাওয়ার নৈরাশ্য তখন বিপিনের বুভুক্ষু মনকে কাতর করে। আকাশ ভরা জ্যোৎস্নার আলো। সন্ধ্যারাতের গাম্ভীর্য। রান্নাঘরের উনুনে চাপানো হাঁড়িতে ফুটন্ত ভাতের শব্দ আর ঘ্রাণ। সবকিছু মিলে বিপিনের একাকিত্ব আরো ঘন হয়ে ওঠে। কেন এমন হয়! মানুষ তা বোঝে না। তবুও এই অনুভূতির স্বাদ বড়ো রমণীয়।

শান্তির শূন্যতা বন্ধন-অসহিষ্ণু এই পুরুষের জীবনে নতুন এক আবেগের জন্ম দেয়। হয়তো সে বাঁধা পড়ে আবারও।

> নিজের মনের অবস্থা দেখিয়া সে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল। শান্তি তাহার কে? কেউ নয়, দু'দিনের আলাপ— এই তো কিছুদিন আগেও সে ভাবিত, মানীর মতো ভালোবাসা জীবনে আর কাহারও সঙ্গে কখনো হইবার নয়—হইবেও না। মানী ছাড়া আর কাহারও জন্য মন খারাপ হইতে পারে—একথা কিছুদিন পূর্ব্বেও কেহ বলিলে সে কি বিশ্বাস করিত? এখন সে দেখিয়া বুঝিতেছে মনের ব্যাপার বড়োই বিচিত্র, কেহই বলিতে পারে না কোন্ পথে কখন তাহার গতি।

নিয়তি সুযোগ করে দেয়। দু'জন মানুষের কাছাকাছি আসার সুযোগ। মনের মধ্যে ভালোবাসার রং আরও পাকা হয়। মনোগহনের বিসর্পিল চোরাগলিতে কতো আলো-আঁধারি খেলা চলে। গড়ে ওঠে এক দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত। যুক্তির প্রলেপ দিয়ে তাকে ঢাকা যায় না। বিস্মৃতির গভীরতায় সে হারিয়ে যায় না। অবদমিত প্রবৃত্তির দুঃসহ তাড়নায় মনের স্থিতাবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। বিপিন আরো কাছ থেকে দেখার সুযোগ পায় শান্তিকে। শান্তির শ্বশুরের চোখের চিকিৎসা করানোর সুবাদে, রোগীকে নিয়ে বিপিনের সাহচর্যে এই দম্পতি রাণাঘাটে আসে এবং সিদ্ধান্ত পাড়ার বাসায় গিয়ে ওঠে। শহরে আসতে পেরেছে বলে শান্তি বেচারি তো বেজায় খুশি। জীবনে যেন আনন্দের জোয়ার এসেছে। 'সোনাতনপুরের মতো অজ পাড়াগাঁয়ে বাপের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ীও ততোধিক অজ পাড়াগাঁয়ে—রাণাঘাট তাহার কাছে বিরাট শহর। এখানকার প্রত্যেক জিনিসটি তাহার কাছে অভিনব ঠেকিতেছে।'

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যের নায়ক-নায়িকারা কত অল্পে তুষ্ট। তুচ্ছ বস্তুর মধ্যে অতুচ্ছের সন্ধান করে চলে তারা। এইভাবে ক্রমশ, জীবনে মহনীয় অনুভূতির স্বাদ পায়। অপু, দুর্গা, জিতেন, কাজল—এরা কেউই কিন্তু এই ধারার বাইরে নয়। সত্যচরণ, বিপিন, শান্তি, হাজারি ঠাকুর—সকলেই এর আওতায় পড়ে। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' উপন্যাসে রাণাঘাট স্টেশনের চিত্র আমরা পেয়েছি ওই স্টেশনের ধারেই হাজারী ঠাকুরের রান্নার গুণে জনপ্রিয় একটি হোটেল। আলোচ্য 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসেও রাণাঘাটের প্রসঙ্গ একাধিকবার ঘুরে-ফিরে এসেছে। রাণাঘাট শহরের পথে শান্তির সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো, খাওয়া-দাওয়া এবং দু'জনে পাশাপাশি বসে জীবনে প্রথমবার টকি দেখার স্বাদ, অমলিন এক অনুভূতির ছোঁয়ায় তাদের মনকে ভরিয়ে রাখে। মেয়েটির নারীত্বের যে সৌন্দর্য পল্লিগ্রামের আবহাওয়ায় বিপিনের কাছে অনাবিষ্কৃত ছিল, শহরে এসে তা সে আবিষ্কার করতে পারে। মনে হয়—'শান্তি যে এমন সুন্দর দেখতে, এমন চোখের ভঙ্গি ওর—এ এতদিন তো ভাবিনি?' অবাধ স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে শান্তির নারীত্বের এই সৌন্দর্যের স্বাদ পাওয়া সম্ভব হয়েছে

তার পক্ষে—'শান্তির মধ্যে যে নায়িকা এতকাল ছিল ঘন ঘুমে অচেতন, আজ সে জাগিয়াছে। অপরূপ তার রূপ, অদ্ভুত তার ঐশ্বর্য। বিপিন ইহা ঠিক বুঝিল না।'

দৈবের করুণা হলে, রহস্যময়ী নারী তার প্রিয়জনের কাছে স্বেচ্ছায় ধরা দেয় সৌন্দের্যের গোপন পসরা নিয়ে। পুরুষ নিজেকে মনে করে ভাগ্যবান। একটি নিমেষ সামনে এসে দাঁড়ায়। চার চোখের মিলন হয়। মনে মনে গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে যায়। কিছু সময়ের জন্য থেমে যায় মহাকালের চিরচঞ্চল গতি। রক্তিম অনুরাগে গোধূলি আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। তারপর, জীবনের খেলাঘরে কোথায় হারিয়ে যায় সেইসব মুহূর্ত। মাথা খুঁড়ে মরলেও মানুষ আর তার হদিশ পায় না। রাণাঘাট থেকে ফেরার পর আর কখনো এভাবে শান্তিকে দেখতে পায়নি বিপিন। কিন্তু দু'টি হৃদয় যেন এসে পড়ে কাছাকাছি। রাণাঘাটে কাকতালীয়ভাবে মানীর সঙ্গে দেখা না হলে, শান্তির হৃদয়রহস্যের এই গভীর তত্ত্বটি বিপিনের স্থূল মস্তিষ্কে ঢুকত না কখনো। সে তো বর্তমানে অতিমাত্রায় সাবধানী।

উপন্যাসের শেষ দু'টি বিদায়দৃশ্য পাঠকের মনকে কাতর করে। বিপিন ফিরেছে মনোরমার সংসারে। অনাদিবাবুর শ্রাদ্ধশান্তি মিটে গেলে পলাশপুর থেকে বিপিনের বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে মানী কেঁদেছে। পিছু ডেকেও নিজেকে সংযত করে গড় হয়ে সে প্রণাম করেছে তার ভালোবাসার মানুষটিকে। 'বিপিন দেখিল, তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে।' এ হল প্রেমের অঞ্জলি। এ জন্মের মতো হয়তো এটাই শেষবারের দেখা। পলাশপুরের পর্ব চুকিয়ে রাণাঘাটে ফিরেছে বিপিন। এবার শান্তির কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পালা। অর্থাৎ, দ্বিতীয় বিদায়দৃশ্য। অবোধ মেয়েটির নিতান্ত এক সরল প্রশ্নে, তার মনের ভেতরে কামড়ে ধরেছে যন্ত্রণা—'আমার জন্যে আপনার মন কেমন করে একটুও?' এর উত্তর কীভাবে দেবে বিপিন! মনের কথা কী মুখে সব বলা যায়! বলা উচিত নয়। বলতে গেলে সঠিক ভাবে সবটুকু বলা হয় না, নয়তো সব গোলমাল হয়ে যায়। তাতে করে অনেক সময় আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়। দুর্বল মুহূর্তেও বিপিন তাই অসাবধানী হয় না। আত্মসংবরণ করে নেয়। না পাওয়ার চাইতেও পেয়ে হারানোর দুঃখটা যে বুকে বেশি করে বাজে! শান্তি বুঝেছে এইবারই শেষ। এরপর আর কোনোদিন পরম অভাবনীয়কে এত কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। চোখের জল বাঁধ মানেনি তাই। মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে আচমকা জেগে ওঠার পর, দুর্লভ কিছু মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছে বিপিন, যার মধ্যে নিহিত ছিল শান্তির সঙ্গে তার এ যাবৎ সম্পর্কের সারাৎসার। বিভূতিভূষণ লিখেছেন—

> মাঝরাতে একবার কিসের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিল—বাহিরের রোয়াকে কিসের শব্দ হইতেছে। বিপিন জানালা দিয়া বাইরের দিকে চাইয়া দেখিল, শান্তি রোয়াকের

> পৈঠায় বাঁশের আলনার খুঁটি হেলান দিয়া একা বসিয়া আছে; এবং শুধু বসিয়া আছে নয়, বিপিনের মনে হইল, সে হাপুস্ নয়নে কাঁদিতেছে—কারণ রোয়াকের পৈঠা বিপিনের ঘরের জানালার ঠিক কোণাকুণি।

পরদিন বিদায়ের মুহূর্তে বিপিনের চরণে সে নিবেদন করে শেষ প্রণামটুকু।

ভালোবাসার বাঁধনগুলো এইভাবে একের পর এক না কাটলে বিপিনের পক্ষে ঘরে ফেরা এবং মনোরমার কাছে পৌঁছানো কখনো সম্ভব হতো না। অবশেষে, মনোরমার সংসার হয়ে উঠতে পেরেছে বিপিনের সংসার। আশ্চর্য কৌশলে বিভূতিভূষণ তা করে দেখিয়েছেন। নায়কের মনে তথাপি চিরস্থায়ী একটি ক্ষত থেকে গেল। যাপনের এই অভিজ্ঞতা আরো বেশি পরিণত করে তুলল তাকে। মহাকালের ছায়াঘেরা বীথিপথে একে একে হারিয়ে গেল কামিনী... মতি... মানী... শান্তি... আরও কেউ। বিপিনের পাশে রইল শুধু মনোরমা। অদাম্পত্যের আকাশে কক্ষচ্যুত নীহারিকার মতো মুক্ত বিহারের পর, ব্যক্তিনায়ক ফিরে এল তার দাম্পত্যের ছোট্ট উঠোনে। ‘বিপিনের সংসার’ উপন্যাসটিও হয়ে উঠল শিল্পসার্থক।

উৎসের সন্ধানে

১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বিভূতি রচনাবলী’ (ষষ্ঠ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৌষ,১৩৯৮।

২. রুশতী সেন, ‘বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস’, প্যাপিরাস, কলকাতা, আগস্ট, ১৯৯৮।

৩. সুতপা ভট্টাচার্য, ‘কথা সাহিত্যের একলা পথিক বিভূতিভূষণ’, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি,১৯৯৫।

বিভূতিভূষণের ‘দুই বাড়ি’ : বাস্তব ও রোমান্টিকতার মিশেল

সুজয় বসাক

কল্লোল উত্তর বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের অন্যতম মহারথী,‘বন্দ্যোপাধ্যায়-ত্রয়ী’-র প্রথমজন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে একজন কৃতবিদ্য লেখক, তিনি জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত অক্লান্তভাবে লিখে গিয়েছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের এমন একজন লেখক, যাঁর পড়ার ভাণ্ডার অফুরন্ত। বিভূতিভূষণের আবির্ভাবের জন্য বাংলা সাহিত্য অপেক্ষমান ছিল, নিন্দা-মন্দের মাঝখানে সহজেই তাঁকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। বাংলার অখ্যাত পল্লি নিশ্চিন্দিপুরের স্নেহ-নিবিড়, ছায়া-শীতল পরিবেশ থেকে, তার সহজিয়া জীবনপ্রবাহের অন্তহীন অথচ অন্তর্লীন জিজ্ঞাসার উপলব্ধি থেকে বিভূতিভূষণ যে ‘পথের পাঁচালী’ নিয়ে এলেন, তাকে গ্রহণ করতে বাঙালি পাঠক এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করল না। তিনি কল্লোলের পাশ্চাত্যানুকরণের তির্যক জীবনচর্যার ভঙ্গিসর্বস্ব আবেদনের বিপরীতে বাংলার মেঠো পথের শীতল স্পর্শের আবাহনীর সুর নিয়ে এলেন—বাংলা পল্লির পদ্মদীঘির মিষ্টি জল নিয়ে এলেন পরানুকরণের উঞ্ছবৃত্তিতে ক্লান্ত তৃষিত বাঙালি পাঠককুলের জন্য। কী দিয়েছেন বঙ্গ-সাহিত্যকে বিভূতিভূষণ? অবজ্ঞাত বঙ্গভূমিকে চিনিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ‘কল্লোল’-এর সমকালে উদ্দামতা ও সার্বিক সাহিত্যপ্রীতির মধ্যে স্নিগ্ধকোমল প্রাণের সঞ্চার সাধন করেছিলেন। আসলে কল্লোলীয় উদ্দাম জীবনপ্রবাহের পঙ্কিল আবর্তে তিনি এক অদ্ভুত রকমের শুচিস্নিগ্ধ সহৃদয়তার আমদানি করেছিলেন। যখন আমরা দীর্ঘকালীন বিরোধ ও কঠিন প্রতিবাদের দ্বারা যে সহজ সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি বিভূতিভূষণ অবলীলাক্রমে শুধুমাত্র দৃষ্টান্তের দ্বারা সাহিত্যের সেই চিরন্তন সত্যের প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ যে স্মরণীয় হয়ে আছেন, তার প্রধানতম কারণ যে তাঁর সৃষ্টির অনন্যসাধারণ মৌলিকতা—একথা অনস্বীকার্য। তাঁর এই মৌলিকত্ব একান্তভাবে ঐতিহ্যবাহী, বিভূতিভূষণের কাছ থেকে জানা যায়, এখানো বহু বিস্ময় ঐতিহ্যের ভেতরেই অটুট রয়ে গেছে। তার ভেতর থেকেই একজন লেখকের সমগ্রতার সন্ধান আমরা পেতে পারি, প্রকৃতি-মানুষ-অলৌকিকত্ব সব মিলিয়েই সেই সম্পূর্ণতা। আমাদের আশেপাশের নানান সৌন্দর্য, নানান অ-দেখা পূর্ণতা রয়েছে, অথচ তাকে প্রতি মুহূর্তে আমরা অবহেলায় পেরিয়ে চলে যাই, বিভূতিভূষণ যদি

সাহিত্যকে কিছু দিয়ে থাকেন তবে এক মুগ্ধ বালকের অক্ষয় দৃষ্টির মধ্য দিয়ে সেই না-দেখা, না বুঝতে চাওয়া অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডকেই দান করে গেছেন। তাঁর কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়—তিনি যা কিছু দেখেছেন তা সবই পূর্ণ। পূর্ণেরই অংশ বলে সকল কিছুই স্বরূপত পূর্ণ, এই হল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা।

বিভূতিভূষণের স্বল্পখ্যাত উপন্যাস 'দুই বাড়ী' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির কাছে-পিঠে আসতে পারেন না বটে, কিন্তু লেখকের মানসিকতার মৌল লক্ষণগুলির স্পর্শ থেকে বঞ্চিত নয়। ১৯৪১ সালে বিভূতিভূষণ যখন খুব দ্রুত 'দুই বাড়ী' উপন্যাস লিখেছিলেন, কখনো স্বগ্রাম বারাকপুরে, কখনো বা কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে বসে, সেই বছরই মহালয়ার দিন 'দুই বাড়ী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য সেই সময় বিভূতিভূষণ-সুপ্রভার বিনিময়ের দিন শেষ হয়ে গেছে। এই সমাপ্তির মূলে ১৯৪০-এর ২৯ এপ্রিল সুপ্রভার বিবাহ এবং সেই বছরই ৩ ডিসেম্বর বিভূতিভূষণের সংসারী হওয়ার কোনো ভূমিকা ছিল কি না, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। হয়তো তাঁরা দু'জনে একে অপরের স্মৃতি নিজস্ব সাংসারিকতার দৈনন্দিন আচরণের নেপথ্যে লালন করেছেন। যে আন্তরিক বিনিময় সুপ্রভার সঙ্গে সম্ভব, সেই বিনিময় কল্যাণীর সঙ্গে বিভূতিভূষণ করতে পারেননি। আবার একথাও ঠিক যে, এতদিনের পথিক বৃত্তির শেষে ধূলিমলিন অবসন্ন মানুষটিকে কল্যাণী নিরাপদ সুখী গৃহকোণের আস্বাদ ও আশ্রয় দিতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ, কিশোরী কল্যাণী যা দিতে পারল বিভূতিভূষণকে, তেমনটা দিতে পারেননি লেডি কীন কলেজের অধ্যাপিকা সুপ্রভা। আর 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে মানী আর বিপিন যে কোনো নির্দিষ্ট সম্পর্কের নিশ্চিতিতে পৌঁছতে পারেনি, তা বিভূতিসাহিত্যের পাঠক মাত্রেই জানেন।

'দুই বাড়ী' উপন্যাসে নিধু আর মঞ্জুর ব্যক্ত এবং অব্যক্ত বেদনা খড়কুটোর মায়াতেই যেন আচ্ছন্ন রইল। অবশ্য এসময় বিভূতিভূষণের জীবনে সুপ্রভা শুধুই স্মৃতি। গ্রামের অভাবী গৃহস্থ রামতারণ চৌধুরীর বড়ো ছেলে নিধিরামের আর্থিক প্রতিকূলতায় ভালো মতো লেখাপড়া শিখতে না পারা, রুজির চেষ্টায় মফস্বলে মোক্তারি করা নিধিরাম—জজসাহেব লালবিহারী চাটুজ্যের মেয়েকে, সিমলে গার্লস স্কুলে পড়া মঞ্জুকে দেখে ভাবে—

> ...পাড়াগাঁয়ে মেয়েরা হাইস্কুলে পড়া দূরের কথা অনেকে বাংলা লেখাপড়াই ভালো জানে না।...সে এমন একটি জিনিস দেখিতেছে, যাহা সে কখনো পূর্বে দেখে নাই।'

জজের বাড়ির কৃষ্টিসম্পন্ন কন্যাটির কোমল রেশম অনুভূতির পাশে দুঃখ-দারিদ্র্যবেষ্টিত ক্ষুদ্রতা, ক্লিষ্টতার মধ্যে সমাসীন কুড়ুলগাছি গ্রামের চিত্র উদ্ভাসিত করে বৈপরীত্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু বৈভবের সঙ্গে চেতনার সূক্ষ্মতা মিশ্রিত হয়ে তা সাধারণের বোধবুদ্ধিকে অতিক্রম করতে পারে, বিভূতিভূষণের দৃষ্টি অবশ্য

সেখান থেকে দূরে সরে যায়নি। দুই বাড়ির ধারা দু'রকমের বটে, কিন্তু কোনো 'কু' বা অশোভনতার সঙ্গে বিভূতি-সাহিত্যের সংযোগহীনতার জন্যে দুই অসম আর্থিক পরিবেশের মধ্যে একটি সাধারণ গুণ লক্ষণীয়, তা সহজতা ও সারল্য, অপরকে আপন করে নেওয়ার মানসিকতা; সে কারণে বিশেষ কোনো সংকট থেকে উপন্যাস মুক্ত—ঘটনা পল্লিগ্রামের হলেও তাতে যে ধরনের গ্রাম্য সংকীর্ণতা প্রত্যাশিত, তার দেখাও বিশেষ মেলেনি—জাগো ঠাকুরণ, তিনুর মার উপস্থিতি সত্ত্বেও উঠতি ছেলে-মেয়েদের মিলিত নাটকের প্রস্তুতি, অসম সামাজিক সম্পর্কের পরিবারের ওঠাবসা নিয়ে গ্রামীণ কোনো রাজনৈতিক চক্র গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে, মঞ্জু এবং নিধুর মধ্যে ভালো গড়ে ওঠেনি। অন্যদিকে মঞ্জু এবং নিধুর মধ্যে ভালো লাগা খুব ধীরে অথচ শৈল্পিক রীতিতে ভালোবাসায় এসে পৌঁছেছে, যদিও ভবিষ্যতে এর কোনো পরিণতির সম্ভাবনা নেই। তার কারণ, দুই পরিবারের সামাজিক ও আর্থিক অসংগতিই কেবল নয়, সাব-ডেপুটি সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঞ্জুর বিবাহের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। একে সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় জজ সাহেবের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হবার উপযুক্ত পাত্র, অন্যদিকে জুনিয়র মোক্তার নিধুর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, এক্ষেত্রে উভয়ের সূক্ষ্ম ভালোবাসার পরিণতিহীনতা সম্পর্কে পাত্র-পাত্রী উভয়েই সচেতন। নইলে নিধু কয়েক শনিবার আসেনি বলে উদ্বিগ্ন হওয়া সত্ত্বেও মঞ্জু তাকে চিঠি দিতে পারেনি, একথা মঞ্জু জানালে উত্তরে নিধু জানায়—'আমার সৌভাগ্য মঞ্জু কিন্তু সেইজন্যে মনে হয় আর তোমার সঙ্গে মেশা উচিত নয় আমার।' প্রত্যুত্তরে মঞ্জু জানায়, 'কিছু ভাববেন না, নিধুদা। আমি ছেলেমানুষ নই—কষ্ট করতে পারব জীবনে। ও জিনিস কষ্টের জন্যেই হয়। আপনি আশীর্বাদ করবেন যেন সহ্য করতে পারি—।' মঞ্জু যে উপলব্ধির পরিপূর্ণতায় পৌঁছেছে এবং নারীত্ব ও ভালোবাসা চিরকালের জন্যে নিধুর জন্যে অক্ষত রেখে যেতে পারবে—এ দৃঢ় অঙ্গীকার 'ও জিনিস কষ্টের জন্যেই হয়' উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। মনে হয়, কোনো সংকট-সংঘর্ষের লড়াইয়ের পর জয়ী হওয়ার চেয়ে এ জয় আরও গভীরতর। নারীর প্রেম যে সহস্রবর্ষের সাধনার ধন, আরেকবার তা প্রমাণিত হল। তাই আগে নিঃসংকোচে নিধুকে মঞ্জু বলতে পেরেছে 'আপনার জন্যে আমার মন কেমন করে আপনি এখান থেকে চলে গেলেই'—এর চেয়ে স্পষ্ট উক্তি আর কী হতে পারে? নিধুর দিক থেকেও মঞ্জুর প্রতি আকর্ষণ অনুক্ত থাকে না। নিধুরও স্বীকারোক্তি—

> তোমাকে আর পর বলে মনে হয় না। তাই এমন কথা বলে ফেলি যা হয়তো পরকে বলা যায় না। তুমি জজবাবুর মেয়ে বলে সবাই সমীহ করে চলবেন কিন্তু আমি ভাবি ও তো মঞ্জু।

মঞ্জুর গান শোনাও নিধুর এক নতুন অভিজ্ঞতা, কারণ—

> এসব দেশে মেয়েরা গান গাহে না। মেয়ে হারমোনিয়াম বাজাইয়া পুরুষের সামনে গাহিতেছে, এ একটা নূতন দৃশ্য...মঞ্জু সত্যিই হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান গাহিল।...কোনো লজ্জা সংকোচ নাই, বেশ সহজ, সরল ব্যবহার।

পুজোয় মঞ্জুরা কোন্ বই অভিনয় করবে, সে ব্যাপারে নিধুদার মতামত মঞ্জুর কাছেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নিধিরাম মোক্তার গ্রামের বালক-বালিকাদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতার বিচারক হয়। অথচ জীবনে কয়টি কবিতাই বা নিধু আবৃত্তি করেছে, কখানাই বা বই সে পড়েছে। নিধু যখন নাটক নির্বাচন প্রসঙ্গে বলে—'আমি কি বইয়ের কথা বলব বল...আমি কখনো কিছু দেখিনি', তখন মঞ্জুর মনে হয় 'চাল দেওয়া ছোকরা সে তাহার মামার বাড়ীর আশে-পাশে অনেক দেখিল, কিন্তু নিধুদার মতো বাজে চাল এতটুকু নাই...।' নিধুকে সে বলে—'একখানা হাতে লেখা কাগজ বের করব ভাবচি, তাতে আপনাকে লিখতে হবে কিন্তু।' নিধুর খাবার নিয়ে মঞ্জু অভুক্ত বসে থাকে আর নিধুর মনে হয়, '...কোনো মেয়ে তো এ পর্যন্ত তাহার না খাওয়ার জন্য নিজেকে অভুক্ত রাখে নাই।'

কাহিনি যত এগোয়, পাঠক বুঝতে পারে যে, হাইস্কুলে অ্যাডিশনাল হিস্ট্রি আর সংস্কৃত পড়া মঞ্জু তার কণ্ঠের 'কচ ও দেবযানী' আবৃত্তিতে কিংবা গানে, তার হারমোনিয়ামের সুরে, 'মুক্তধারা' অথবা 'ফাল্গুনী'র মতো নাটকের সঙ্গে নিজের পরিচিতিতে, হাতের লেখা পত্রিকার পরিকল্পনায়, আবার সযত্ন চপ-নিমকি ভাজায়, নিধুকে খাওয়ানোর আকুল আগ্রহে যেন সেই কলেজে পড়া আর লক্ষ্মী পুজো রন্ধনশিল্প-আলপনাশিল্পকে মিলিয়ে মিশিয়ে বিভূতিভূষণের একান্ত কাম্য এক প্রেরণা বানিয়ে চলেছে। নিধু বোঝে, মঞ্জুকে সে যতই ভালোবাসুক, জজসাহেবের মেয়ের বিয়ে গরিব মোক্তারের সঙ্গে হতে পারে না। আর জজসাহেব যখন তরুণ হাকিম সুনীলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে আগ্রহী হন এবং হাকিম সাহেব মঞ্জুকে দেখে মুগ্ধ হন, তখন নিধুর বেদনা আর একলা নিধুর থাকে না। পাঠক দেখেন, '...ভরসাহারা ক্ষুদ্র বালিকার মতো মঞ্জু বসিয়া চোখের জল ফেলিতেছে...।'

উপন্যাসের পরিণতিতে নিধু আর মঞ্জু বিদায় গ্রহণের অবকাশ পায় না। কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরবার পথে জ্বরে অচৈতন্য নিধিরাম পড়েছিল সাঁকোর উপরে। অনেকদিনের অজ্ঞান-অচৈতন্য পেরিয়ে, টাইফায়েড জ্বর ছেড়ে সে যখন চোখ মেলে, মঞ্জুদের বাড়ি তখন তালাবন্ধ। জজসাহেব লালবিহারী চাটুজ্যের শখ হয়েছিল ছুটিতে গ্রামে আসার, ধূমধাম করে দুর্গা পুজো করার। গ্রামে তো তাঁদের মাত্র কয়েক মাসের মেয়াদই ছিল। মায়ের মুখে নিধু শোনে, মঞ্জু কত সময় তার রোগশয্যায় বসে থেকেছে, চলে যাওয়ার দিন কত চোখের জল ফেলেছে, নিধুর চিকিৎসার সব ব্যবস্থা

সেই করেছে জজসাহেবকে বলে। মঞ্জুদের তালাবন্ধ বাড়ি দেখতে দেখতে নিধু ভাবে—

> আগেও তো কেহ ছিল না এ বাড়িতে, কখনো কেহ থাকিত না, এখনো কেহ নাই, ইহাতে নতুন কি আছে?...মধ্যে যে আসিয়াছিল সে তো দু'দিনের স্বপ্ন।

মঞ্জুর মায়ায় ভরা ঐ বাস্তবকে যে নিধু আজ স্বপ্ন বলে সান্ত্বনা খোঁজে, তা যেন নিধুর পুরানো এক স্বপ্নকে, তার দ্বন্দ্বকে ভাঙতে চায়।

'দুই বাড়ী' উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য বা অভিনবত্ব হল বাস্তব ও রোমান্টিকতার সহাবস্থান। কিন্তু উপন্যাসটিকে অপূর্ণ প্রেমের আখ্যান ছাড়া আর কোনো পরিচয়ে চিহ্নিত করা যায় না। ভীরু ও সংশায়িত প্রেম বিভূতিভূষণের উপন্যাসে, 'দুই বাড়ী'র আগে যতবারই এসেছে, কখনোই তা এই উপন্যাসের মতো মুখ্য হয়ে ওঠেনি। নিধিরামের সঙ্গে মিলতে পারল না যে মঞ্জু, তাকেও কোনো হতভাগ্য, লাঞ্ছিতা বা বঞ্চিতার দলে ফেলা যায় না। এই উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড লেখা হলে মঞ্জুর হয়তো পূর্ণ পরিণতির আভাস থাকত। তবে প্রথম খণ্ডে মঞ্জু কোনো করুণার পাত্রী নয়। আবার 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে বিপিনের সঙ্গে মানীর শেষ বিনিময়ে যে সাংসারিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব খানিকটা সাবালক ভাষা খুঁজেছিল, তেমন কোনো স্পষ্টতাও নিধিরামের টাইফয়েড জ্বরের আড়ালে চাপা পড়ে গেল। আর বিভূতিভূষণ তাঁর সচেতন মানসিকতাতেই যেন উপন্যাসের নাম দিলেন 'দুই বাড়ী'। অর্থাৎ, এ যেন অভাবী গ্রাম্য গৃহস্থ রামতারণের বাড়ির গল্প। অপূর্ণ প্রেমের আখ্যান ধরে পাঠক যেন খুঁজতে পারেন রামতারণের বড়ো ছেলে মফস্বলের মোক্তার নিধিরাম আর জজসাহেবের মেয়ে সিমলে গার্লস স্কুলের ছাত্রী মঞ্জুর সূচনা। এখন তারা যদি কখনো পরস্পরকে ভালোবাসে, তবে কী অবাস্তবতার পথে প্রেমের স্বপ্নাভিসার ছাড়া তার পরিণতির পথে কোনো সান্ত্বনাই নেই?

এইখানে কাহিনি শুরু হয়েছে নিধুর বাবা রামতারণ চৌধুরীর অভাবজনিত হীনতা দিয়ে, আবার নিধু পিতৃবন্ধুর কাছে মোক্তারি করার জন্যে উপস্থিত হয়ে অত্যল্পকালের মধ্যে ওকালতি ব্যবসার হৃদয়হীনতা, চাতুর্য, মিথ্যের বেসাতি মেনে নিতে না পারলেও সদ্য যুবকের নবীন চোখ দিয়ে সমস্ত সমাজের বিচারব্যবস্থার প্রহসন দেখেছে, এর থেকে আর অব্যহতি নেই, তাও তার জানা। এ সমাজব্যবস্থায় নিজেকে অভ্যস্ত করে নিয়েছে বলে আকাশকুসুম কোনো কল্পনাকে স্থান দেয়নি, বরঞ্চ প্রতি পদক্ষেপে বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছে, তাই কোর্ট ও মঞ্জুদের বাড়ির আবেষ্টনীতে তাকে অপ্রস্তুত হতে হয়নি। এরই মধ্যে একদিন সন্ধ্যের সময় গ্রামে ঢুকে 'নিজে বাড়ী পৌঁছনোর আগে সে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের বাড়ীর ঠিক সামনে সরু গ্রাম্য রাস্তার এপাশে লালবিহারী চাটুজ্যেদের যে বাড়ী সে ছেলেবেলা হইতে জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছে— সে বাড়ীতে আলো জ্বলিতেছে। এক আধটা

আলো নয়, দোতলার প্রত্যেক জানালা হইতে আলো বাহির হইতেছে— ব্যাপার কি?' এই হল 'দুই বাড়ী'-র রহস্য।

আসলে, ইংরেজি শিক্ষিত নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের যাত্রাপথ বিভূতিভূষণ তাঁর নিজস্ব ভাবনার পরিমণ্ডলে বুঝেছিলেন। ব্যারাকপুর গ্রাম থেকে, ইছামতীর তীর থেকে, বনগ্রামের হাইস্কুলে, কলকাতায় রিপন কলেজে, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে, জাঙ্গিপাড়ায় কি রাজপুরে স্কুল শিক্ষকের জীবিকায়, গোরক্ষণী সভার প্রচারে, ভাগলপুর জঙ্গলমহালে এস্টেটের ব্যবস্থাপনায় অনেক কিছু দেখতে দেখতে শিখতে শিখতে, অনেক কঠিনে ঠেকতে ঠেকতে দরিদ্র কথক-ব্রাহ্মণের পুত্র অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক হিসেবে। আর যখন 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' উপন্যাসের কথা ফিরছে বাঙালির মুখে মুখে, যখন প্রকাশিত হয়ে গেছে আরও কিছু স্মরণযোগ্য উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ, দিনলিপি সেই সময় বিভূতিভূষণ কলকাতার খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশনের বাংলার শিক্ষক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের ছাত্রী সুপ্রভা দত্তকে সেই ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২৪ আশ্বিন বিভূতিভূষণ চিঠিতে লিখেছিলেন—'আমি কোনো অবস্থাতেই ভুল্‌তে পারিনে যে আমি একজন সামান্য স্কুল মাস্টার।'

আসলে, ঔপনিবেশিক রাহুগ্রাসে শিক্ষিত বাঙালির রুজি-রোজগারের গ্লানি বিভূতিভূষণের অজানা নয়। তাই নিধিরাম মোক্তারের ভাবনার অনুষঙ্গে বিভূতিভূষণ লেখেন—'...এর চেয়ে স্কুল মাস্টারি করা অনেক ভালো ছিল।' সম্ভবত 'বিপিনের সংসার' এবং 'দুই বাড়ী'তে বিভূতিভূষণ চাইছিলেন, পাঠক যেন বিপিনের অথবা নিধিরামের ভিতরে লেখককে তেমন শনাক্ত করতে না পারেন। সেই কারণে বিপিন হল নায়েব থেকে পাশ না করা ডাক্তার আর নিধিরাম হল মোক্তার। নিজেকে আড়াল করবার এই প্রবণতা যে, 'আরণ্যক'-এর সত্যচরণের তুলনায়, 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এর জিতুর তুলনায় এবং অবশ্যই 'অপরাজিত'র অপুর তুলনায়, বিপিন এবং নিধিরামের নির্মাণে বেশি বর্তাল—এর কোনো কারণ কি পাঠক অনুমান করতে পারেন? স্বয়ং স্রষ্টা কি বুঝেছিলেন যে, তাঁর জীবনের কোনো একান্ত নিভৃতির রেশ একেবারে অনিবার্য হয়ে এসে পড়েছে 'বিপিনের সংসার' ও 'দুই বাড়ী' উপন্যাসের গ্রন্থনায়? বিভূতিভূষণ যখন মঞ্জুকে গানে, অভিনয়ে, 'কচ ও দেবযানী' আবৃত্তিতে ভরিয়ে তুলছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর স্মৃতিতে অমলিন ছিল নৃত্যগীত পটীয়সী সুপ্রভার কথা। মনে ছিল, সেই 'যৌবন-সরসী-নীরে' কিংবা 'দ্বার খুলে আর রাখবো না'র মতো গানের প্রসঙ্গ।

যখন 'দুই বাড়ী' উপন্যাসের মঞ্জু হাতে-লেখা পত্রিকার পরিকল্পনা করছিল, লেখক নিশ্চয়ই ভোলেননি সুপ্রভার হাতে লেখা পত্রিকা 'নির্ঝর'-এর প্রসঙ্গ। এই 'নির্ঝর' পত্রিকার সূত্রেই বিভূতিভূষণ আর সুপ্রভার পরিচয়। সুপ্রভা যখন তাঁর হাতে-লেখা

পত্রিকার জন্য লেখকের খোঁজ করছিলেন পরিচিত মহলে, তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি এই সূত্রে 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' খ্যাত বিভূতিভূষণের সঙ্গে আলাপ হয়ে যেতে পারে। আবার নিজের স্নাতক পরীক্ষার পরবর্তী অবকাশে 'নির্ঝর'-এর মতো পত্রিকার পরিকল্পনা করতে পারে বিভূতিভূষণের দেশ-কালের যে মেয়ে, তার সঙ্গে আলাপ বা নৈকট্যের কল্পনাও কি ব্যারাকপুরের দীনহীন কথক-ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ সন্তানের স্বাভাবিক আয়ত্তের ভিতরে ছিল? অন্যদিকে, কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে দর্শনে স্নাতক পরীক্ষা দিয়ে সুপ্রভা যখন মিরাশিতে পৈতৃক বাড়িতে ফিরলেন, সে বাড়িতে তখন নিয়মিত আসে শনিবারের চিঠি, প্রবাসী, জয়শ্রী, থেকে শুরু করে Spectator-এর মতো পত্রিকা। বাড়ির গ্রন্থসম্ভারও কম নয়। সুপ্রভার এই যাত্রাপথ ব্যারাকপুর গ্রামের দীনহীন কথকব্রাহ্মণের জ্ঞানপিপাসু পুত্রের আপার প্রাইমারি পাঠশালা থেকে বনগ্রামের বড়ো স্কুলে পৌঁছানোর পদযাত্রা থেকে অনেকখানি আলাদা। মহানন্দ কথকের বড়ো ছেলে শৈশবে-বাল্যে অবস্থাপন্ন বন্ধুর কাছ থেকে বই ধার করে এনে রাত জেগে পড়ত। অভাবের সংসারের মহানন্দ কত কষ্টে বিভূতির হাতে একটি কি দুটি বই তুলে দিতে পারতেন? তথাপি শেষপর্যন্ত পিতৃহীন বিভূতিভূষণ আধুনিক শিক্ষিত হওয়ার ব্রতকেই জীবনে মানলেন। কেননা, আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার সেই ব্রতকে বাদ দিয়ে, সমকালের এক জ্ঞানপিপাসু ভ্রমণপাগল হওয়া যায় না, গোরক্ষণী সভা থেকে ভাগলপুরের জঙ্গলমহাল থেকে কলকাতার খেলাত স্কুল পর্যন্ত অভিজ্ঞতার শরিক হওয়া যায় না, হওয়া যায় না 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের স্রষ্টা। কথক-ব্রাহ্মণের ছেলে যদি রায়সাহব মহেন্দ্রচন্দ্র দত্তের মেয়ের থেকে অনেক দুর্গম আলোকপর্ব অভিযানকে শরীর-মন দিয়ে বহন না করেন, তবে তো সুপ্রভার মতো বান্ধবী তাঁর জীবনে আসতে পারে না। আর এমন বোধের বিভূতিভূষণের মুক্তি মেলে না—তথাপি তাঁর পথযাত্রা সুপ্রভার জীবনযাত্রা থেকে ভিন্নতর হলেও যেমন সুপ্রভা বিভূতিভূষণকে বারবার মুগ্ধ করে, তেমনি আবার ওই একই ভিন্ন দ্বন্দ্বের জটিলতায় হয়তো তাঁদের দু'জনের সম্পর্ক কোনো নিশ্চিত পরিণতির প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয়। জীবনের সেই নিভৃত প্রেরণার গোপন দ্বন্দ্বমুখর অনুভবের চড়াই-উতরাই পেরিয়েই 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত'-র বিভূতিভূষণকে পৌঁছাতে হয় 'বিপিনের সংসার', 'দুই বাড়ী'তে।

'দুই বাড়ী' উপন্যাসের মঞ্জু তার সারল্যে, সহজতায়, ও আতিথেয়তার কল্যাণে 'দুই বাড়ী'র অন্তরাল ভেঙে মধ্যস্থ হয়ে উঠতে চেয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে 'দুই বাড়ী'র বৈষম্যের পর্দা খুলে গতায়তের সঙ্গে সম্পর্ক হল, কিন্তু এখানেও লক্ষণীয় পরিণতি না বিষাদ বা শুভ, এককথায় পরিপূর্ণতার অভাবে এক জায়গায় এসে থমকে গেল। বিভূতিভূষণের গল্পের বৈশিষ্ট্য, বিশেষত নর-নারীর প্রেম পরিণতিহীন,

সুনীলবাবুর সঙ্গে মঞ্জুর বিবাহ ঠিক হওয়ার পর, নিধু কাব্যে উপেক্ষিত, তাই মঞ্জুকে দেখার প্রবল বাসনাতেই অসুস্থ শরীরে ফেরার পথে দীর্ঘ অসুস্থতার শিকার হল, এর মধ্যে ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ার জন্যে জজসাহেবকে ফিরে যেতে হল—স্বাভাবিকভাবে মঞ্জুও গেল, তখন জ্বরে বেহুঁশ নিধু—শুভবোধ তো প্রার্থিত ছিল না উপন্যাসে, তবু বাধাটুকু অটুট রেখে নিধুকে মধ্যপথে রেখে কাহিনির বিচ্ছেদ ঘোষিত হল।

'দুই বাড়ী' উপন্যাসের নায়িকা মঞ্জু যখন গানে-কবিতায়-অভিনয়ে, হাতে লেখা পত্রিকায়, রান্নায়-যত্নে-সেবায় ভরে তুলতে চাইছে বিভূতি-সাহিত্য, সুপ্রভা তখন সদ্য স্মৃতি হলেও স্মৃতি, বিভূতি জীবনে অতীত সে। সুপ্রভার সঙ্গে বিনিময় যদি কোনোদিন শেষ হয়ে যায়, তবে কেমন হবে সেই সমাপ্তির স্বরূপ? আর জীবনের বিনিময় যখন সত্যিই ফুরিয়ে গেছে, তখন নিধিরাম আর মঞ্জুর বিদায়বেলাকে নিধুর অচৈতন্য জ্বরে আড়াল করা ছাড়া বুঝি আর কোনো বিকল্প বিভূতিভূষণের নেই। সাহিত্যিক জীবনকে যেভাবে বিনির্মাণ করতে চান, তেমনভাবে সেই সাহিত্যে তো জীবনের আন্তরাল থেকে কিছু অন্যতর অভিপ্রায়ও তিনি ব্যক্ত করতে পারেন। 'দুই বাড়ী' উপন্যাস প্রসঙ্গে বাণী রায় প্রশ্ন তুলেছিলেন—

> আপাতদৃষ্টিতে রূপগুণশালিনী ধনী কন্যা ও সাধারণ নায়কের প্রেমবন্ধনের হেতু কি? ...কেন 'অপরাজিতে'র অভিজাত লীলা অপুকে ভালবাসল? ...কেন 'বিপিনের সংসারে' জমিদার দুহিতা মানী বাবার নিতান্ত অধম কর্ম্মচারী বিপিনকে ভালোবাসে? ...'দুই বাড়ী'-র লালবিহারীবাবুর রূপবতী গুণবতী কন্যা নিধিরামের প্রেমে পড়ে কেন? ...'দুই বাড়ী'র মিলন সম্ভব নয়, শুভ নয় তিনি জানতেন। তাঁর রাজকুমারী কুইন ক্রিশ্চিনার মতো প্রেমে সিংহাসন ত্যাগ করতে চায় না। চোখের জল মুছে জীবনের ঘটনা মেনে নেয়।

আসলে 'দুই বাড়ী' উপন্যাসের কাহিনি ছোটোগল্পের কাহিনির মতো অন্তরের চিরন্তন অতৃপ্তির মধ্যে লবণহীন ব্যঞ্জনের মতো স্বাদহীন হল। অবশ্য উপন্যাসের পরিণতিতে লেখকের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত, দুই বাড়ির বৈষম্য ও সম্পর্ক, নিধু ও মঞ্জুর নৈকট্য ও গণ্ডগ্রামে শিল্পিত কিছু মুহূর্তের নাটকীয় অভিনয় সমাপ্ত হয়ে গেল। আর এজন্যে দুইবাড়িকে বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বে না দেখে একের সঙ্গে অন্যের অচ্ছেদ্যতা অনুভব করা গেল।

<u>উৎসের সন্ধানে</u>

১. বিভূতি রচনাবলী (১০ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।
২. ড. গোপিকা নাথ চৌধুরী : বিভূতিভূষণ, 'মন ও শিল্প'।
৩. রুশতী সেন : বিভূতিভূষণ, 'দ্বন্দ্বের বিন্যাস'।

বিভূতিভূষণের ‘অনুবর্তন’ : শিক্ষককুলের ‘সুখ-দুঃখের লীলাভূমি’

পিয়ালী খাঁ

‘অনুবর্তন’ বিভূতিভূষণের লেখা একাদশতম উপন্যাস। উপন্যাসটি কোনো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি, ১৯৪২ সালের ২২ জুলাই একেবারে গ্রন্থাকারে বের হয়েছে। এই উপন্যাসটিকে শিক্ষকজীবনের কথকতা বলা যায়। বাংলা সাহিত্যে এ বিষয়ে আরও লেখা থাকলেও সে সবই বিভূতিভূষণের পরে। উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় যথার্থেই বলেছেন—

> শিক্ষকদের নিয়ে লেখা এমন অভিনব উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণই পথিকৃৎ। শুধু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, পাশ্চাত্যের পরিধিও যদি ধরি, সেখানেও তাঁকে অগ্রগামী বলা অন্যায় হবে বলে মনে হয় না। অনেক উপন্যাস আছে যেখানে নায়কের জীবনের অংশে বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি শিক্ষক সম্প্রদায় নিয়ে লেখা একমাত্র জেমস্ হিল্টনের ‘গুড বাই মি. চিপ্স’ (১৯৩৪ সালে প্রকাশিত) ছাড়া আর কোনো বইয়ের নাম স্মরণে আসে না।

‘অনুবর্তন’ সম্পূর্ণত এক বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাহিনি। বিভূতিভূষণ নিজে কলকাতায় ও মফস্বলে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেছেন। সেই অভিজ্ঞতার বিস্তৃত জগৎকে কাজে লাগিয়েই তিনি রচনা করে ফেললেন গোটা একটি উপন্যাস। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসে যেমন চোখে পড়ে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় যোগ, এ উপন্যাসে সেখানে শুধুই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের অন্তর্বয়ন। শিক্ষককুলের দ্বন্দ্ব, মহত্ত্ব, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা নিয়েই রূপায়িত হয়েছে এ উপন্যাসের আখ্যান। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ‘অনুবর্তন’ এক চরম বাস্তবভিত্তিক বা বাস্তবধর্মী উপন্যাসও বটে। এ হল বিভূতি-সাহিত্যের দলছাড়া বিচিত্র সৃষ্টি।

‘অনুবর্তন’ এককথায় চলমানতার ইতিহাস। পথ বিভূতিভূষণকে চিরকালই আকর্ষণ করে— একথা পুনরায় বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসেই পথ কোনো না কোনো ভাবে তার দাবি নিয়ে উপস্থিত। ‘পথের পাঁচালী’তে অপু তাই পথের দেবতার অমোঘ আহ্বান শোনে। ‘আরণ্যক’-এ তাই শহুরে উন্নাসিক সত্যচরণের অনন্তকালের পৃথিবী, অনন্তকালের অরণ্য, অনন্তকালের মানুষের পথে মিলিত হওয়া।

'অনুবর্তন'-এ একটি বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রবহমানতার কথা উঠে আসে। উভয়েই তারা এক পথের পথিক— সে পথ কালের পথ। 'জীর্ণ জরা' ঝরে গিয়ে নতুন করে ফুল ফোটে সে পথে, প্রাণ জেগে ওঠে। সে পথে একদা নারায়ণবাবুকে নিয়ে মডার্ন ইনস্টিটিউশন-এর প্রধান শিক্ষক অনুকূলবাবু যাত্রা শুরু করেছিলেন। তারপর সেই পথে নারায়ণবাবু ও অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সঙ্গী করে বর্তমান প্রধান শিক্ষক মি. ক্লার্কওয়েলের এগিয়ে যাওয়া। আর তারপর? ভবিষ্যৎকে কে খণ্ডন করতে পারে? কালের সুগভীর নির্দেশে ক্লার্কওয়েলেকেও স্থান ছেড়ে দিতে হয়। এগিয়ে চলে শুধু 'অনুবর্তনে'র পথ।

'অনুবর্তন'-এ কত না বিচিত্র চরিত্র ভিড় করেছে। উদার, অনুদার, লোভী, মহৎ কতই না মানুষ উপস্থিত! আমাদের মনে পড়ে যদুবাবুকে, যিনি নিজে ট্রামে গিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাঁটিয়ে নিয়ে যান এবং তাদের টিফিনের পয়সা আত্মসাৎ করে রেঁস্তোরায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করেন। আপাতভাবে চরিত্রটি লোভী, সুবিধাবাদী, মিথ্যেবাদী, স্বার্থপর হলেও তাঁর নিদারুণ দারিদ্র্যজনিত করুণ অবস্থা আমাদের দুঃখার্দ্র করে। নিজের স্ত্রীকে আত্মীয় অবনীর বাড়ি বছরের পর বছর রেখে আসেন যদুবাবু। তাঁর নিরুপায় অবস্থা উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

> যদুবাবু ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ারের বেঞ্চিতে বসিয়া মনে মনে বহু আলোচনা করিলেন। স্ত্রীকে এখন কলিকাতায় আনা অসম্ভব।
>
> কুড়ি টাকা মাত্র সম্বলে বাসা করিয়া এক মাসও চালাইতে পারিবেন না। বেড়াবাড়ী এখন গেলে অবনী দস্তুরমত অপমান করিবে তাঁহাকে। সুতরাং তিনি কলিকাতায় মেসেই থাকিবেন, স্ত্রী কাঁদাকাটা করিলে কী হইবে?

আবার এই উপন্যাসেই দেখা মেলে নারাণবাবুর মতো আদর্শবান মহান শিক্ষকের, যিনি নিঃসন্তান হয়েও ছাত্র চুনির মধ্যে নিজের সন্তান বাৎসল্য উজাড় করে দেন। এখানেই আমরা পেয়ে যাই ক্ষেত্রবাবুকে, আত্মকেন্দ্রিক মি. আলমকে, হতদরিদ্র বৃদ্ধ গ্রন্থকার রাখাল মিত্তিরকে, নবীন প্রতিবাদী শিক্ষক রামেন্দুকে, দরদী মেম মিস্ সিব্‌সন্, নীতিনিষ্ঠ মি. ক্লার্কওয়েল ও অন্যান্যদের।

বর্তমানে উপন্যাসের সূচনাংশটি লক্ষ করা যাক—

> ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটের আর পিটার লেনের মোড়ে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল-বাড়ীটা বেশ সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। বেলা দশটা। ছাত্রের দল ইতিমধ্যে আসিতে শুরু করিয়াছে,...।

এই স্কুলটি অর্থাৎ মডার্ন ইন্‌স্টিটিউশন ওরফে ক্লার্কওয়েল'স মডার্ন ইন্‌স্টিটিউশনকে ঘিরেই চিত্রিত হয়েছে শিক্ষককুলের প্রতিদিনকার জীবন কাহিনি, পক্ষান্তরে যা

জীবনযুদ্ধেরই নামান্তর। ক্লার্কওয়েল সাহেবের অঙ্গুলিহেলনের উপর তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জীবন নির্ভর করে। দুর্ভাষী, একগুঁয়ে হেডমাস্টারের মুখের একটা বাক্যই তাঁদের থরহরিকম্প হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট— 'মাই গেট্ ইজ ওপ্ন্'। সাহেবের আড়ালে যত সমালোচনাই করুক না কেন, কোনো শিক্ষকেরই তাঁর সামনাসামনি কিছু বলবার ক্ষমতা থাকে না। অবশ্য রামেন্দুবাবু বিদ্যালয়ে যোগদান করার পর এই অবস্থার বেশ খানিকটা পরিবর্তন হয়। কড়া অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে হেডমাস্টার ক্লার্কওয়েল তাঁর সাধের বিদ্যালয়টি পরিচালনা করেন। বিভূতিভূষণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর স্কুলের বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেছেন। যেমন— অভিভাবকদের কাছে শ্রেণি অনুযায়ী রিপোর্ট পাঠ কোনো স্কুলেই হয় না, 'কিন্তু সাহেবের বিশ্বাস, ইহাতে অভিভাবকেরা সন্তুষ্ট থাকে, স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বাড়ে।' শিক্ষার্থীদের পড়াশুনোর মান কীভাবে উন্নত হয়, সে দিকে সাহেবের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। নিজের কর্তব্য-কর্মে তিনি অবিচল। কাজেই অন্যান্য শিক্ষকদের 'সময়নিষ্ঠা ও কর্তব্যানুরাগ' বিষয়ে ত্রুটি দেখলেই তিনি খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন, আর সাথে সাথে শোনা যায় সেই জলদগম্ভীর নির্দেশ—'মাই গেট্ ইজ্ ওপ্ন্...।' এমনকি কর্তব্যে অবহেলাকারী শিক্ষককে তিনি সাস্পেন্ড করতেও বিরত হয় না। প্রকৃতপক্ষে, বিদ্যালয়ের ভালো-মন্দ বিষয়ে তিনি খুবই সচেতন এবং তাঁর উদ্দেশ্যও অত্যন্ত মহৎ—

> ক্লার্কওয়েল শিক্ষকদের সভায় অতি তুচ্ছ কথা বলিবার সময়ও জজ সাহেবের মত গাম্ভীর্য ও আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বাজেট সভায় বাজেট পেশ করিবার সময় অর্থসচিব যত না বাগ্মিতা দেখান তদপেক্ষা বাগ্মিতা দেখাইয়া থাকেন। তিনি বর্তমানে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া টাই ধরিয়া কখনও দক্ষিণে কখনও বামে হেলিয়া গম্ভীর সুরে আরম্ভ করিলেন, টিচার্স, আজ আপনাদের ডেকেচি কেন, এখনি বুঝবেন। আমরা এখানে কতকগুলি তরুণ আত্মার উন্নতির জন্যে দায়ী (বড় বড় কথা বলিতে ক্লার্কওয়েল সাহেব খুব ভালোবাসেন), আমরা শুধু মাইনে নিয়ে ছেলেদের ইংরেজি শেখাতে আসিনি, আমরা এসেছি দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল বালকদের সত্যিকার মানুষ করে তুলতে আমরা তাদের সময়নিষ্ঠা শেখাব, কর্তব্যনিষ্ঠা শেখাব— তবে তারা ভবিষ্যতে সুনাগরিক হয়ে দেশের বড়ো বড়ো কার্যভার হাতে নিয়ে নিজেদের জীবন সার্থক করে তুলতে পারবে, সেই সঙ্গে দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি হবে।

কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শিক্ষকদের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

এহেন নিয়মনিষ্ঠ হেডমাস্টারের গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি হল— তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যথা সময়ে বেতন দিতে পারেন না। যদিও এর জন্য তিনি দায়ী নন।

তবে নিন্দুকেরা বলে তাঁর অতিরিক্ত কড়াকড়ির জন্য বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা কমে যাচ্ছে, এছাড়া অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় তাঁর ও মিস্ সিব্‌সনের বেতনটা দৃষ্টিকটু রকমের বেশি। আর ঠিক এখান থেকেই শুরু হয় যদুবাবু, ক্ষেত্রবাবুদের জীবনের অর্থনৈতিক দুরবস্থা। সে সময় স্কুলে শিক্ষকতা করার পাশাপাশি একাধিক টিউশনি না করলে জীবনযাপন করা দুরূহ হয়ে পড়ত। দারিদ্র্য ছিল তাঁদের নিত্যসঙ্গী। কাজেই গ্রীষ্মের ছুটি পড়ার আগে কোনো বেতন পাওয়া যাবে না শুনে 'মাস্টারদের মুখ শুখাইয়া গেল। হেডমাস্টারের কাছে দরবার শুরু হইল।...দুই একজন শিক্ষক একটু ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, আমরা তবে খাব কি?'

এদিকে গ্রীষ্মের ছুটিতে স্ত্রী নিভাননী ও দুই-তিনটি ছেলে-মেয়েকে নিয়ে দীর্ঘ কয়েক বছর বাদে ক্ষেত্রবাবু গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যান। প্রথম কয়েকদিন এখানকার তাজা শাক-সব্জি, খাঁটি দুধকে অমৃত ও গ্রামকে স্বর্গ বলে মনে হলেও কিছুদিন বাদে থেকেই ভাবনার আমূল পরিবর্তন ঘটে—

> যে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের নাম শুনিলে গায়ের মধ্যে জ্বালা ধরে, চাকুরির সময় যাহাকে কারাগার বলিয়া বোধ হইত, সেই স্কুলের কথা এখন যখন মনে হয় তখন যেন সে প্রশান্ত মহাসাগরের নারিকেল-দ্বীপপুঞ্জ ঘেরা পাগো-পাগো দ্বীপ, চিরবসন্ত যেখানে বিরাজমান...।

যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা জীবনে তাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন, সেই জীবনটাই বড়ো বেশি কাম্য হয়ে ওঠে। শুধু ক্ষেত্রবাবু নয়, জ্যোতির্বিনোদ, যদুবাবু প্রমুখদেরও একই অবস্থা। সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্তের সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায়—

> এই উপন্যাস পুরোপুরি কলকাতার।... মাস্টাররা গ্রামে গিয়ে কলকাতার আট বাই নয় অন্ধকার ভাড়া ঘরখানিতে ফিরবার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছে। কলকাতা আরও অনেক গল্পে বিস্তৃতভাবেই আছে, কিন্তু কলকাতার এই আগ্রাসী মূর্তি নেই। ('বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০২)

বাস্তবিকই শিক্ষকেরা শহর কলকাতা ও বিদ্যালয় ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে এই পরিচিত পরিবেশে ফেরার জন্য হাঁফিয়ে উঠেছে—

> বিভূতিবাবুর অধিকাংশ রচনায় যেমন থাকে এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই—চরিত্রগুলি সুস্থির এবং টিপিক্যাল। কোনোরূপ জটিলতা তাদের কারুর মধ্যে নেই। তারা চিত্রমাত্র, কোনোরূপ জীবনজিজ্ঞাসা বা বিশেষ ধরনের তাৎপর্য চরিত্রগুলির কারুর মধ্যে নেই (তদেব, পৃ. ৩০৩)।

এই উক্তির যথার্থতা মেনে নিয়েও বলতে হয় চরিত্রগুলির সমারোহে, চলনে-বলনে উপন্যাসটি সুখপাঠ্য হয়েছে। বাস্তবিক এ উপন্যাস 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক' বা

'ইছামতী'র সমগোত্রীয় বা সমতুল্য কোনোটাই নয়। এ উপন্যাসে পল্লি-প্রকৃতির বর্ণনা করার সুযোগ খুব সামান্যই এসেছে। আর ঢেঁকি তো স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। কাজেই সেই স্বল্প পরিসরে ঔপন্যাসিক আমাদের করট ও ফিঙে পাখির ডাক শুনিয়েছেন, নানান জলচর পক্ষী— সরাল, পানকৌড়ি, বক, শামুকুড় প্রভৃতির কথা স্মরণ করিয়েছেন, আর সেই সাথে ঘেঁটু, সোঁদালি, আতাফুলের কুঁড়ি, প্রস্ফুটিত তুঁতপুষ্পের ঘন সুবাস গ্রহণ করিয়েছেন। তবে এ উপন্যাস প্রকৃতির নয়, মানুষের বিচিত্র রঙে রঙিন। মানুষের বিচিত্র সম্পর্কের কথারূপ। হিন্দু উৎসব সম্পর্কে অজ্ঞ সাহেব ক্লার্কওয়েল যখন স্কুলে নোটিশ করেন—'The school will remain closed tomorrow the 9th inst. for great Hindu festival, Ghanta Karan Puja.' তখন তা আমাদের হাসির উদ্রেক ঘটায়। বুঝতে পারি সাহেবের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছে চতুর হেডপণ্ডিত। আবার এই স্কুলের শিক্ষকদের নিজেদের মধ্যেও ঝামেলাঝাটি চলে। শুরু হয় দলবাজি, পরিচালন সমিতির সদস্যের বাড়ি গিয়ে হেডমাস্টারকে পদচ্যুত করার চেষ্টা— যা যে কোনো কালের বিদ্যালয়ের সুপরিচিত চিত্র বলেই মনে হয়।

এ উপন্যাসে আছে ছাত্র-শিক্ষকের চিরাচরিত সম্পর্কের কথা। শ্রেণিকক্ষের দুষ্টু-মিষ্টি মুখগুলো প্রবীণ শিক্ষকদের চকিতে স্মৃতিতে উদয় হয়, আবার কত শত মুখ মিলিয়ে যায় স্মৃতির অতলে। বহু বছর বাদে তাদের কারোর সঙ্গে দেখা হলে গর্বে বুক ভরে ওঠে শিক্ষকের, বর্ষিত হয় অন্তরের আশীর্বাদ। প্রসঙ্গত, আমাদের মনে পড়ে যায় কালিদাস রায়ের একটি কবিতা—

বর্ষে বর্ষে দলে দলে   আসে বিদ্যামঠতলে,
চলে যায় তারা কলরবে,
কৈশোরের কিশলয়   পর্ণে পরিণত হয়
যৌবনের শ্যামল গৌরবে...।
রাজপথে দেখা হলে   কেহ যদি গুরু ব'লে
হাত তুলে করে নমস্কার,
বলি তবে হাসিমুখে—   বেঁচেবর্তে থাকো সুখে
স্পর্শ করি কেশগুলি তার।' (ছাত্রধারা)

নারাণবাবুর মতো আদর্শ শিক্ষকেরা বিদ্যালয় গৃহকে ইটের দেওয়ালে আবদ্ধ কক্ষ মনে করেন না, মনে করেন পবিত্র স্থান রূপে—সে স্থান মানুষ গড়ার। আমরা জানি বিভূতিভূষণের লেখার পরতে পরতে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা নানা বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি নিয়ে উপস্থিত হয়। এখানেও তার অন্যথা হয়নি। নারাণবাবুর মতো মহান, আদর্শ শিক্ষকের মধ্যে তাই দেখা মেলে স্বয়ং ঔপন্যাসিকের।

এ উপন্যাসে ইতিহাসের কলরব শোনা গেছে এবং তা উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে যথেষ্ট আলোড়িত করেছে। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হল, কীভাবে এই উপন্যাসটি শিক্ষকদিগের সুখ-দুঃখের লীলাভূমি হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে তাদের পরিবারের উপর আলোকপাত করতে হয়। আসলে এ উপন্যাস শিক্ষকদের পেশাগত পরিবারগত পরিচয়ের নির্ভরযোগ্য দলিল হয়ে উঠেছে। বিভূতিবাবুর 'বাস্তবতা আমাদের আমূল নাড়া দেয়। মানুষের জীবনের ছোটো ছোটো হাসি-কান্না, মান-অভিমান, সাফল্য-ব্যর্থতা যেভাবে ছড়িয়ে থাকে তার রচনায় যে মনে হয় এর যেন, কোনো অন্ত নেই, কোনো সীমা-পরিসীমা নেই, দোষে-গুণে মিলিয়ে হয় মানুষ। (অরুণ সেন, 'বিভূতিভূষণ : আধুনিক জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ) ক্লাসে ফাঁকি দেওয়া শিক্ষকও তাঁর অন্য মানবিক গুণের জন্য তাই পাঠকের কাছে মার্জনা পেয়ে যান সহজেই, যেমন যদুবাবু তাঁর শেষ পরিণতিতে শত অন্যায় করেও স্ত্রীর থেকে ক্ষমা পেয়ে যান। বিপত্নীক হয়ে সংসারের অচলাবস্থা কাটাতে ক্ষেত্রবাবু আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেন এবং তরুণী বধূকে নিয়ে বেশ সুখেই দিনাতিপাত করতে থাকেন। কিন্তু পিছু ছাড়ে না দারিদ্র্য। তাই সহানুভূতি জাগলেও সহমর্মী হয়ে রাখালবাবুকে তাঁর অসময়ে সাহায্য করতে পারেন না। রাখালবাবুর বাসায় তিনি ছাড়াও তাঁর স্ত্রী, দুটি ছোটো ছোটো ছেলে, এক বিধবা ভগ্নী ও তাঁর একটি মেয়ে—এতজন সদস্যের খাওয়া-দাওয়ার খরচ জোগাতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন অসুস্থ রাখালবাবু। একথা শুনে—

> ক্ষেত্রবাবুর মনে যথেষ্ট দুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হইল। নিজেকে তিনি ওই অবস্থায় ফেলিয়া দেখিলেন কল্পনায়। কিন্তু তিনি কী করিবেন! তাঁহার হাতে বাড়তি পয়সা এমন নাই, যাহা দিয়া তিনি এই দুঃস্থ বৃদ্ধ গ্রন্থকারকে সাহায্য করিতে পারেন।

উপন্যাসে এই গরিবির চিত্র যেন সর্বত্রই প্রকট। সময়ের সংকটে পড়ে স্কুলও এমনই 'পুওর' যে মৃত স্যারের (নারায়ণবাবুর) একটি ফোটো বা অয়েলপেন্টিং স্কুলের দেওয়ালে টাঙানোর অর্থটুকুরও জোগান হয় না। তাই বার বার ধুয়ো বাক্যের মতো শোনা যায়—দু'মাস খেটে এক মাসের বেতন নিতে হয়, মাস্টারদের মাইনে পনেরো বছরের মধ্যে বাড়া তো দূরের কথা কেবলই কমে যাচ্ছে আর এর ফল অবশ্যম্ভাবীভাবে ভুগতে হচ্ছে তাদের পরিবারবর্গকে।

বেতনের অভাব, এত কষ্ট, এত হাহাকারের মধ্যেও বিদ্যালয় থেকে অনতিদূরের চায়ের দোকানটি মাস্টারদের কাছে একটুকরো স্বর্গের মতো। কারণ এখানেই তাঁরা মনের দুটো কথা স্বস্তিতে বলতে পারেন। এই আলোচনাক্ষেত্রে উঠে আসে নানা বিষয়— বিদ্যালয়, পরিবার তথা পারিপার্শ্বিক সব কিছু। তাঁদের কথাবার্তায় উঠে

আসে একে অপরের সম্পর্কে নিন্দা-মন্দ, ভালো-খারাপ সমস্তটাই। একটা বিস্কুটের সাথে অতিরিক্ত কেক খেতে হলে তা মাস্টারদের পক্ষে সাধ্যাতীত হয়ে যায়—এ বাস্তব কঠিন হলেও ঘোর সত্য। তবু এরই মধ্যে মাঝে মাঝে ক্ষেত্রবাবু, রামেন্দ্রবাবুরা চা-বিস্কুটের অর্ডার দেন, সকলকে খাওয়ান। বোঝা যায় পকেটের টান কখনো মনের টানের থেকে বেশি হতে পারে না। এই চায়ের দোকানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মাস্টারদের মধ্যে এক সুন্দর হৃদ্যতা। এটি হয়ে ওঠে এক অনাবিল আনন্দের স্থান।

সংবাদপত্রে 'জাপান য়্যাটাক্স্ পার্ল হারবার' —এই সংবাদ পাঠ করে আর জাপানি বোমার আতঙ্কে শিক্ষকদের জীবন অদলবদল হতে থাকে। অনেকেই ভয়ে, আশঙ্কায় কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে থাকেন। একই অবস্থা হয় ছাত্রদেরও। ফলে স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়। এক দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে যায় হাওড়া স্টেশনে— 'প্রত্যেক ট্রেন ছাড়ছে, লোকে লোকারণ্য। লোক গাড়িতে উঠতে পারছে না—দশটাকা, পনেরো টাকা করে কুলিরা নিচ্ছে। এত ভিড় যে, স্ট্যান্ড রোড একেবারে জ্যাম—ই.আই.আর. এর গাড়িতে ওঠবার উপায় নেই।'

উপন্যাসের শেষে খানিকটা তথ্য পরিবেশনের ভঙ্গিতে ঔপন্যাসিক জানান—

> ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল দিন পাঁচ ছয় খুলিয়াছে। দুই-তিনজন ব্যতীত অন্য সব শিক্ষক আসিয়াছেন। আসেন নাই কেবল জ্যোতির্বিনোদ আর শ্রীশবাবু। তাঁহারা দেশের স্কুলে চাকুরি পাইয়াছেন। ছেলেরাও বেশি নাই, এ-ক্লাসে পাঁচজন ও-ক্লাসে দশজন। অনেকে বলিতেছে স্কুল টিকিবে না।
>
> আর আসেন নাই যদুবাবু। সাহেবের সারকুলার বই লইয়া কেবল রাম ক্লাসে ক্লাসে ফিরিতেছে—স্কুলের সুযোগ্য প্রবীণ শিক্ষক যদুগোপাল মুখুজ্যের পরলোকগমনে স্কুল দুই দিন বন্ধ রহিল। ...তাঁহার মৃত্যুতে স্কুলের যে অপরিসীম ক্ষতি হইল... ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপন্যাসের নাম 'অনুবর্তন'। অর্থাৎ অনুসরণকারী বা অনুগমনকারী। নারাণবাবু, যদুবাবুরা তাঁদের ইহলোকের কর্মসমাপ্ত করে পরলোকের পথে অনুগমন করলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে তাদের কর্মক্ষেত্রের পথে পা বাড়াল। জাপানি বোমার আতঙ্কে শঙ্কিত হয়ে সকলে শহর ছেড়ে গ্রামের পথে একে অপরের অনুগমন করল। আর ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল তার নির্দিষ্ট রুটিন অনুযায়ী নির্দিষ্ট নিয়মের পথে অনুগমন করল। সারকুলার বই হাতে কেবলরামের ক্লাসে ক্লাসে ছুটোছুটিই তার প্রমাণ।

পূর্বেই বলা হয়েছে এ উপন্যাস বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক নয়। 'পথের পাঁচালী', 'ইছামতী'র পাশাপাশি উচ্চারিত হবার মতোও নয়। তবু এ উপন্যাস

উপভোগ্য। দুঃখ যে জীবনের মহৎ সম্পদ হতে পারে তা তো এ উপন্যাস থেকেই জানলাম আমরা। যে জীবন অশ্রুকে জানে না, ব্যর্থতাকে জানে না—সে তো অসম্পূর্ণ। দারিদ্র্যই যদি না থাকত তবে তো ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের শিক্ষকেরা একে অন্যের সাথে এমনভাবে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিতে পারতেন না, এমন আত্মার আত্মীয়ও হয়ে উঠতে পারতেন না আর আমাদের হৃদয়েও এমনভাবে স্থান করে নিতে সফল হতেন না।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বিভূতি রচনাবলী', সপ্তম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ।

২. সন্তোষকুমার দত্ত : 'বিভূতিভূষণ : স্বকাল ও একাল'।

৩. ক্ষেত্রগুপ্ত : 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস', তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থ নিলয়।

৪. সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়—'বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য'।

৫. রুশতী সেন : 'বিভূতিভূষণ দ্বন্দ্বের বিন্যাস'।

৬. অরুণ সেন সম্পাদিত—'বিভূতিভূষণ : আধুনিক জিজ্ঞাসা'।

বিভূতিভূষণের ‘দেবযান’ : ক্লোস রিডিং

রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

‘দেবযান’ উপন্যাসটির শুরু হচ্ছে ‘middle of action’ অনুসারে। বস্ত্র ব্যবসায়ী রায়সাহেব ভর্ষারাম কুণ্ডু গ্রামে থাকেন, তাঁর মেয়ের বিয়ে। বরপক্ষের নিবাস কলকাতায়, তারা মোটর গাড়ি এবং রিজার্ভ বাসে করে এসেছে। অমন ফুল দিয়ে সাজানো গাড়ি এ গ্রামের লোক কেউ দেখেনি। ভর্ষারামবাবু এবং তার পরিবারেরা এই বরযাত্রীকে আপ্যায়ন করে কৃতার্থ হলেন। ‘আহা! এইখানে আরও দুটো মাছের মুড়ো দাও।’ অন্যদিকে নাটমন্দিরে বিভিন্ন গ্রামের সাধারণ লোক খেতে বসেছে। তো, এই সাধারণ লোকেদের ঠিকমতো পরিবেশন করা হচ্ছে না। তাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ আছে যে অন্যলোকেদের থেকে একটু সরে বসেছে। এই ব্রাহ্মণের নাম যতীন। স্পষ্টত, বিয়ে বাড়ির কোলাহলের মধ্যে একজন অবজ্ঞাত মানুষ এই যতীনের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। যতীনই আলোচ্য গল্পের নায়ক।

যতীন এম.এ. পর্যন্ত পড়েছে। গান্ধীর নন-কো-অপারেশন মুভমেন্টে যোগ দিয়েছিল। কলেজ ছেড়ে গাঁয়ে ফিরে এসেছে। যতীনের বাবা-মা নেই। যতীনের বিয়ে হয়েছিল, কয়েকটি ছেলেমেয়ে ছিল, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে সে বাপের বাড়ি চলে গেছে। যতীন তাদের পৈত্রিক বাড়িতে একা থাকে।

বিভূতিভূষণের সময় থেকে আজকের সময়ের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখনো গ্রামে এম.এ. পাশ ছেলেমেয়েরা রয়েছে বেকার। কেউ কেউ সারাদিন টুইশনি করে কিন্তু গ্রামে বেতন কম, তাতে সংসারও চলে না এবং যতীনের মতো জীবনে ব্যর্থ ছেলেমেয়ে আজকেও দেখতে পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। একইরকমভাবে আমরা ভাবতে পারি, সেকালে যদিও এম.এ. পাশ খুব কম ছিল—তারাও বেকার থাকতো। বউ ছেলেমেয়ে তাদেরও ছেড়ে যেত। অর্থাৎ গল্পের শুরু এমন একটা সমাজব্যবস্থার ছবি দিয়ে যা বাস্তবসম্মত। বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে যতীনের তার বউয়ের কথা মনে পড়ল। একটা সময় ওরা স্বামী-স্ত্রীতে খুনসুটি করে খুব ভালো ছিল—আজ পাঁচবছর বাপের বাড়ি গিয়ে আশালতা একটাও চিঠি দেয়নি। যতীন বউয়ের খবর নিতে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছল। কিন্তু সেখানে সে বউয়ের দেখা পেল না। তার শাশুড়ি

বললেন, সে এখানে নেই। পরে ছোট্টো মেয়ে আন্না বলল, ‘দিদি এখানেই আছে, কোথাও যায়নি...ওর সইমার কাছে লুকিয়ে আছে।’

যতীন মন-ভাঙা দেহটা নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। বউ-ছেলে-মেয়ে নেই, বাপ-মা মারা গেছে। যতীন যদিও শিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র, তবু গ্রামের সমাজে সে একঘরে বা ‘outsider’। যতীন যতই ভাবে আগের কথা ভাবব না আশার কথা তাকে পেয়ে বসে। দারিদ্র্যকে সে কষ্ট বলে মনে করে না। কিন্তু কেউ তাকে ভালোবাসে না এই কষ্টই তাকে যাতনা দেয় বেশি।

যতীন অনাহারে রোগে মারা গেল। বাইরে থেকে লোকজন এসে দোর ভাঙল। দেখতে পেল, যতীন বিছানায় মরে কাঠ হয়ে আছে। কতক্ষণ মরেছে, কে জানে। যতীনের মৃতদেহ সৎকার করা হলো।

উপন্যাসের দ্বিতীয় সেকশনে যতীন হঠাৎ দেখতে পেল তার খাটের পাশে পুষ্প তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে।

অর্থাৎ যতীন লৌকিক ভাষায় যখন খাটের ওপর মরে কাঠ হয়ে আছে এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত তার দোর ভেঙে লোকজন তার মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে, সেই সময়ের মধ্যে লৌকিক অর্থে মৃত যতীনের সঙ্গে পুষ্পর দেখা। এর অর্থ হলো যতীন দেহগতভাবে মারা গেছে; কিন্তু সে ঐ তথাকথিত মৃতদেহের মধ্যেও কোনো অনির্দেশ্যভাবে বেঁচে আছে। তাই খাটে শুয়েও সে পুষ্পকে দেখতে পাচ্ছে।

যতীনের মনে হলো একসময় পুষ্পকে সে খুব ভালোবাসত। ছোটোবেলায় নৈহাটির ঘাটে সে পুষ্পর সঙ্গে কতবার ফুল ভাসিয়ে জলে খেলা করছে। তখন ওদের বয়েস তেরো, দু-দশদিন নয়, দেড়-দুই বছর ধরে দু’জনে কত খেলা করেছে, গল্প করেছে। যতীনের মাসিমার মৃত্যুর পর পুষ্পর কাছে যাওয়া বন্ধ হলো। শোনা গেল, একবছর বাদে পুষ্প বসন্তরোগে মারা গেছে।

সেই পুষ্প! যতীন অবাক দৃষ্টিতে পুষ্পর দিকে চেয়ে রইল। যতীন বলে ওঠে, তুই কোথা থেকে এলি পুষ্প? তুই তো কতকাল আগে—পুষ্প হেসে বলল—‘মরে গিয়েছি, কিন্তু তুমিও তো মরে গেছ যতীনদা’। অর্থাৎ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যতীনের পুষ্পর সঙ্গে দেখা হলো। পুষ্প যতীনের বাল্যবন্ধু ছিল এবং সে অনেকদিন মারা গেছে, অতএব লৌকিক অর্থে যারা মৃত তাদের মধ্যে এখন কথোপকথন চলছে। আশ্চর্য মুন্‌শিয়ানার সঙ্গে বিভূতিভূষণ তাঁর পাঠককে লোকায়ত জীবন থেকে লোকোত্তর জীবনে নিয়ে গেছেন।

যতীন এখন লৌকিক অর্থে মৃত। কিন্তু তবুও তার হঠাৎ ভয় হলো। তার জ্বর হয়েছিল একথা তার মনে আছে। জ্বরের ঘোরে সে আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখছে না তো। অর্থাৎ লৌকিক অর্থে মৃত্যু হবার পরেও যতীনের অহং লৌকিক

ধ্যান-ধারণাতেই আবদ্ধ। লোকোত্তর কোনো সত্তা বা লোকোত্তর কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে, এটা সে এখনও ভাবতে পারছে না। যতীন যেমন লোকোত্তর কোনো অস্তিত্বের স্তর ভাবতে পারে না তেমনি পাঠকও। কুশলী লেখক বিভূতিভূষণ পাঠকের প্রশ্নটিকেই সবসময় তুলে ধরেন এবং তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন যাতে পাঠক একসময় স্বেচ্ছায় তার সংশয়কে দমন করেন।

পুষ্প খাট থেকে যতীনকে নামিয়ে নিল (যদিও খাটে যতীনের দেহ কাঠ হয়ে পড়ে রইল) এবং পুষ্প ও যতীন দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে বার হয়ে এল। পুষ্প বলল : 'আমাদের শরীরে পৃথিবীর জড় পদার্থের স্পর্শ লাগে না।' যতীন ভাবে এই যে দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা— একি স্বপ্ন! কিন্তু তেইশ বছর আগে যে পুষ্প মারা গেছে সেই পুষ্প তো সামনেই আছে। যতীন ভাবে—মৃত্যু মানে যদি পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে মৃত্যুকে লোকে ভয় করে কেন? হঠাৎ যতীন দেখল সে এক নতুন দেশে এসেছে। দেশটা পৃথিবীর মতো। তার পায়ের তলায় নদী, গাছপালা, মাঠ কিন্তু তাদের সৌন্দর্য অনেক বেশি— সেখানে সূর্য নেই, সেখানে অন্ধকারও নেই।

'ন তত্র সূর্য্যোভাতি, ন চন্দ্রমা' অথচ সর্বত্র একটা অপার্থিব মৃদু আলো—'A light that was never on sea or land'। পুষ্প যতীনকে নিয়ে এল সেই বুড়োশিবতলার ঘাটে। সেই গঙ্গা। যতীন প্রশ্ন করল এ কোথায় নিয়ে এলে?পুষ্প বলল যতুদা, এ স্বর্গ। সকলের স্বর্গ তো এক নয়। তারপর মৃদু হেসে সলজ্জ সুরে যতীনের মুখের দিকে চেয়ে পুষ্প বলল—'এ আমাদের স্বর্গ—তোমার আর আমার।' সেই তেরো বছরের মেয়ে পুষ্প আর যতীন একসময় বুড়োশিবতলার ঘাটে খেলা করেছিল, ঝগড়া করেছিল। তারপর পুষ্প অকালে মারা যায়। বিদেহী পুষ্প কিন্তু যতীনের প্রতীক্ষায় ছিল এবং যতীনের মৃত্যুর দু'তিনদিন আগে থেকেই যতীনের পাশে ছিল অশরীরী।

দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি কল্পনা করেন যে, কোনো একটি মহিলা স্বর্গের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। পৃথিবী থেকে তার প্রণয়ী কখন স্বর্গে উঠে আসবে এই প্রতীক্ষায়। তিনি ভাবছেন, স্বর্গে যখন তার স্বামী উঠে আসবেন তখন স্বর্গের এখানে ওখানে স্বামীর হাত ধরে কেমন বেড়াবেন, মায়ের সামনে স্বর্গের ফোয়ারাতে চান করবেন।

ইতালির কবি দান্তের হাত ধরে যখন ভার্জিল পারাদিসো বা স্বর্গের দুয়ারে এসে পৌঁছলেন তখন দান্তের প্রণয়িনী বিয়েত্রিচে যে ছোটোবেলায়ই মারা গেছে, সে এসে দান্তেকে হাতে ধরে স্বর্গে নিয়ে গেল এবং স্বর্গে উভয়েই দিব্যানন্দে বিভোর হয়ে একে অন্যের খেয়াল রাখল না। কিন্তু বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে পুষ্প লোকোত্তর জগতে

তার দয়িত যতীনের প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছে এবং যতীনকে নিয়ে সে তার শৈশবের স্বর্গে ফিরে এসেছে। যে বুড়োশিবতলার ঘাটে যতীনকে নিয়ে এসেছে সেই বুড়োশিবতলার ঘাট, পার্থিব ঘাট নয় কিন্তু তার অনুকল্প এবং পার্থিব ঘাটের চেয়ে অনেক বেশি সত্য। তেইশ বছর আগে যতীন যে ঘাটে খেলা করেছে তেইশ বছরে তো সেই ঘাটের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তেইশ বছর আগে যে ঘাটে খেলা করেছে সেই ঘাট অপরিবর্তিত ভাবে এখন লোকোত্তর জগতে যতীনের কাছে প্রত্যক্ষ। তাহলে কি বলতে হবে বৌদ্ধ আলোয় বিজ্ঞানের কথা। আপাতদৃষ্টিতে, বাস্তব নদী প্রবাহের মতো সেখানে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হচ্ছে এবং সেখানে পরিবর্তনই সত্য। কিন্তু লোকোত্তর জগতে সমষ্টি মনে প্রতিটি ক্ষণই চিরায়ত। প্রত্যক্ষে যখন দেখি পরিবর্তনই সত্য তখন মানুষ বুঝি কল্পনা করে অপরিবর্তনীয় ক্ষণ আছে, যেখানে কালের চির চঞ্চলগতি থমকে যায়। আর এই সত্যকে যদি পরাবাস্তব ভাবি তাহলে বাস্তবের প্রতিটি ক্ষণ সেই পরাসত্যের, পরাবাস্তবের অবতরণ। বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলে নিত্য বৃন্দাবন অবতরণ করেছে পার্থিব বৃন্দাবনে। মথুরা ইস্টিশনে নেমে যেখানে যেতে হয়। তবে কি বলব whatever imagination uses to be beautiful is truth? রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের মিথ সম্পর্কে এজন্যে বলেন, 'অযোধ্যা সত্য নয়, সেই সত্য যা রচিবে তুমি।'

এই যে লোকোত্তর স্তর—সেখানে পুষ্প অনেকদিন ধরে আছে আর যতীন সবেমাত্র এসেছে। পুষ্পর কাছে এই লোকোত্তর স্তর যখন সহজ ও স্বাভাবিক তখন যতীন এখানে প্রতিটি পদক্ষেপে হোঁচট খাচ্ছে। পৃথিবীর সংস্কার এবং নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে টানাপোড়েন যতীনকে অত্যন্ত মানবিক করে তুলেছে। স্বর্গে দান্তে অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এইরকম মানবিক হয়ে ওঠেননি। দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটির প্রেমিকা; তার দয়িতকে যে স্বর্গে নিয়ে যাবে—সে স্বর্গ একটাই স্বর্গ—যেখানে দেবদূতেরা সেতার বাদনে ব্যস্ত। কিন্তু পুষ্পর নিজস্ব স্বর্গ আছে—এক একজনের স্বর্গ এক-এক রকম। এই লোকোত্তর জগতে যার যা ইচ্ছে সেটাকে সে কল্পনায় গড়ে নিতে পারে।

তার মানে পার্থিব জগতে আমাদের কল্পনা যায় বহুদূর। আমাদের আকাঙ্ক্ষা বহুমুখী কিন্তু বাস্তব কখনই কল্পনাকে ছুঁতে পারে না। অতএব পৃথিবীতে হতাশা এবং ব্যর্থতা অনিবার্য। কিন্তু লোকোত্তর জগতে, যে জগতে পুষ্প আছে, সে জগতে যতীন সবেমাত্র এসেছে, সে জগতে যে যা মনে করে সে তাই পায়। পুষ্প বলে এই জগতে বস্তুর ওপর চিন্তার শক্তি বা স্বভাব খুব বেশি। বাইবেল যখন বলে God made man in his own image কিংবা God said let there be light and there is light অথবা উপনিষদ যখন বলে—আমি এক, বহু হব; সঙ্গে

সঙ্গে বহু বিচিত্র বহু ব্রহ্মাণ্ডের multiverse সৃষ্টি হলো। তখন প্রতিপন্ন হয় চিন্তা-ই সকল সৃষ্টির উৎস। পুষ্প বলে, 'যতীনদা তোমাকেও চিন্তা করতে শিখতে হবে।' আসলে চিন্তার শক্তিকে যে বাড়াতে পেরেছে, ইচ্ছেমতো চালাতে পারে—সে এ দেশের বড়ো কারিগর। আমরা জানি না, এদেশে সোনার পাথরবাটি কোনো কারিগর তৈরি করতে পারে কিনা!

পুষ্প বলে এই চিন্তাও এক ধরনের 'বস্তু'। পার্থিব বস্তু নয় বটে। তবু, যতীন প্রশ্ন করে—

> এদেশে আর সব লোক গেল কোথায় পুষ্প...? পুষ্প হেসে বলে, এটা তৃতীয় স্তরের ওপরের অঞ্চল। তুমি জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছ বলে এখানে আসতে পেরেছ—আর এসেছ আমি এখানে তোমায় ডেকেছি ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা করেছি, তোমার দুঃখের দিনের অবসানের জন্য।

অর্থাৎ ইহলোকের দুঃখ-কষ্ট লোকোত্তর জগতে সুখের প্রতিশ্রুতি দেয়, আবার আর একদিক থেকে আমাদের প্রিয়জনেরা লোকোত্তর জগৎ থেকে আমাদের অপার্থিব সুখের জগতে নিয়ে যাবার জন্য যদি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন তাহলে সেই প্রার্থনা সফল হতে পারে। লোকোত্তর জগতের একটি স্তর আছে এবং আমরা এই প্রথম ভগবানের উল্লেখ পেলাম। কথায় কথায় যতীনকে পুষ্প বলল—

> চলো তোমাকে পৃথিবীতে নিয়ে যাই। তোমার মৃতদেহটা শ্মশানে দাহ হচ্ছে তোমার দেখা দরকার। পুষ্প যতীনের হাত ধরল। তাদের গ্রামের শ্মশানে যতীন দেখল, সে আর পুষ্প দাঁড়িয়ে আছে। চিতার ধোঁয়া গাছটার মাথা পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে।

সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে ধ্যানের নানা-প্রকারের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে একটি ধ্যান হলো নিজের মৃতদেহ নিজে তাকিয়ে দেখা। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মৃতদেহটা ওরা ট্রাকে করে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর ঠেলে দিল। মুহূর্তে শেষ। কিন্তু যখন কাঠ দিয়ে চিতা সাজানো হত তখন মৃতদেহটা অনেকক্ষণ ধরে পুড়ত। আর সেটা ধ্যানে দেখা—তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা যেত। হয়তো এই ধ্যানের ফলশ্রুতি হল এই যে অন্তত এই শরীরটা আমি নই।

বিভূতিভূষণ কৌশলে যতীনকে তার মৃতদেহ পুড়তে দেখে পাঠকের মধ্যে ঐ ধরনের ধ্যান বোধহয় সঞ্চার করলেন। অতএব পাঠকও এখন বিদেহী হয়ে লোকোত্তর জগতগুলোতে যতীন বা পুষ্পের মতো বিচরণ করতে পারে। যতীন এখন জানে মর্ত্যে সে মারা গেছে। তার ইচ্ছে হলো আশালতাকে সে একবার দেখবে। পুষ্প যতীনকে বলল, 'তুমি ভাব যে তুমি আশালতার বাড়িতে গেছ। তাহলেই তুমি সেখানে পৌঁছে যাবে।'

মর্ত্যে The spirit is willing but the flesh is weak। আমি মনে মনে ইচ্ছে করলেই কোনো জায়গাতে পৌঁছতে পারি না। কিন্তু যে লোকোত্তর জগতে যতীন আছে সেখান থেকে সে মর্ত্যের যেকোনো জায়গায় ইচ্ছেমাত্র পৌঁছতে পারে।

আশালতাকে আঁচল পেতে মাটিতে ঘুমাতে দেখে যতীন যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। তার আদৌ ইচ্ছে নেই স্বর্গে যাবার। যতীনের দারিদ্র্য দেখে আশালতা বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। আর আসেনি। কিন্তু যতীনের তাই থেকে আশালতার প্রতি কোনোরকম বিরাগ জন্মায়নি। উল্টে পার্থিব অর্থে আশালতা যে বিধবা এবং তার যে অপরিসীম দুঃখ হতে পারে এই ভাবনায় যতীন আকুল। যতীন আশালতাকে ছেড়ে স্বর্গে আসতে চায় না। আত্মীয় পরিজনের জন্য এই যে মায়া, এই মায়াই তো একটি সত্তাকে বারংবার মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে ফেরৎ নিয়ে আসে।

যতীনের সঙ্গে তার মায়ের দেখা হলো। তার মায়ের যখন পৃথিবীতে বাহান্ন বছর বয়স তখন তিনি মারা যান। যতীনের সঙ্গে যতীনের বাবারও দেখা হলো। বাবা বললেন, তোমার এখনও আসবার বয়স হয়নি বাবা। আর কিছুদিন পৃথিবীতে থাকলে বিষয়-সম্পত্তিগুলোর একটা গতি হতো। অর্থাৎ যতীনের বাবা এমন এক ধরনের ব্যক্তি যিনি লোকোত্তর জগতে বসেও বিষয়-সম্পত্তির হিসেব করে চলেছেন। বলাবাহুল্য, এইসব ব্যক্তি মাটির পৃথিবীর টানে ফিরে আসবেনই। যতীনের মা বললেন—

> পুষ্পর মতো যতীনকে আর কেউ ভালোবাসে না। আর ঐ পুষ্পই যতীনকে লোকোত্তর জগতের তৃতীয় স্তরে নিয়ে এসেছে। যতীনের মা স্নেহের দৃষ্টিতে পুষ্পর দিকে চেয়ে বললেন—এত অল্প দিনে ও যেখানে আছে সেখানে আসা যায় না। ওর পবিত্র একনিষ্ঠ ভালোবাসা এখানে এনেছে ওকে। কত উঁচু জাতের লোকের সঙ্গে ওর আলাপ আছে দেখিস্।

যতীনের মায়ের কথার legitimation হলো—প্রকৃত ভালোবাসা ব্যক্তিকে লোকোত্তর জগতে খুবই উন্নত স্তরে নিয়ে যায়। যতীনের মা বলেন, 'কবে ছেলেবেলায় সাগন-কেওটাতে থাকতে তোকে ভালো লেগেছিল। জীবনে সেই ওর ধ্যান-জ্ঞান। তোকে আর ভুলতে পারল না। তুই বৌমার ব্যাপারে পৃথিবীতে কষ্ট পেতি, পুষ্পর এখানে কী কান্না।' অর্থাৎ পুষ্পর যতীনের জন্য ভালোবাসা পার্থিব অর্থে নিঃস্বার্থ ছিল। আর সেইজন্যেই হয়তো লোকোত্তর উচ্চস্তরে পুষ্প থাকতে পারে।

এছাড়াও যতীনের মায়ের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি পুষ্প যে স্তরে আছে সেখান থেকে সে উচ্চতর স্তরে যায় এবং বহু উঁচু জাতীয় লোকের সঙ্গে ওর আলাপ। যতীনের মা বলেন—তাঁরা যখন আসেন আমি থাকতে পারি না তাঁদের সঙ্গে।

যতীনের মায়ের এই কথা থেকে একাধিক Legitimation হয়। প্রথমত, লোকোত্তর জগতে বহু স্তর আছে। যতীনের বাবা দ্বিতীয় স্তরে থাকে যেহেতু তিনি পৃথিবী ছেড়ে পৃথিবীর বিষয়-সম্পত্তির কথা ভুলতে পারেননি। আবার অকলঙ্ক প্রেমের শক্তিতে পুষ্প তৃতীয় স্তরের বাসিন্দা।

দ্বিতীয়ত, আমাদের পৃথিবীতে আমরা মানুষরা যেমন একটা কুকুরকে কুকুর বলে বুঝতে পারি, যদিও একটা কুকুর মানুষকে মানুষ বলে বুঝতে পারে না, তেমনি তৃতীয় স্তরের বা দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তিরা ইচ্ছেমতো পৃথিবীর সব কিছু ইচ্ছে করলেই দেখতে পারে। কিন্তু লোকোত্তর জগতের প্রথম স্তর পৃথিবীর মানুষেরা আমরা ঐ দ্বিতীয় স্তর বা তৃতীয় স্তরের ব্যক্তিদের দেখতে পারি না। একই ভাবে এই তৃতীয় স্তর বা দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তিরা লোকোত্তর জগতের পঞ্চম বা ষষ্ঠ ইত্যাদি স্তরের ব্যক্তিদের দেখতে পারে না বা চিনতে পারে না বা বুঝতে পারে না। পৃথিবীকে যদি প্রথম স্তর বলা হয় আর পুষ্প যদি তৃতীয় স্তর বা স্বর্গলোকের বাসিন্দা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সামনে সপ্তলোকের অনুষঙ্গে উপস্থিত হয়। এই সপ্তলোক হল যথাক্রমে—ভূলোক, ভুবলোক, স্বরলোক, মহোলোক, জনলোক, অপলোক এবং সত্যলোক। ভূ ভুবঃ স্বরঃ মহঃ জনঃ অপঃ সত্য—এই সাতটিকে সুধীন দত্ত একটি কথার দ্বিধা থরোথরো চূড়ে সাতটি অমরাবতী দেখেছিলেন। 'দেবযান'-এ বিভূতিভূষণ এই মহাব্যাহৃতির রহস্য উন্মোচন করতে বসেছেন।

যতীনের সঙ্গে আমরা পাঠকরাও আমাদের নিজেদের দেহকে মর্ত্যে কল্পনাচক্ষে পুড়তে দেখেছি। অতএব, দেবযানের পাঠকরা আমরা সবাই বিদেহী ব্যক্তি। এবার পুষ্প যতীনকে যখন বিভিন্ন লোকোত্তর স্তরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে আমরাও যতীনের সঙ্গী হয়ে সেই পরিচয়ের ভাগ পাব।

যতীন পুষ্পকে প্রশ্ন করে—'কতদিন হয়ে গেল এখানে এসেছি বলতে পারিস্ পুষ্প? এখানে দিন-রাত্রি কোনো হিসেব পাই না। পুষ্প বললে—এখানে দিন-রাত্রির কোনো দরকার যখন নেই, তখন ঘড়ি দেখার অভ্যেসটা ছেড়ে দাও।'

আসলে ঘড়ি দেখার সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গভীর সম্পর্ক। পৃথিবীতে এখন দিন-রাত্রি উঠে গেছে। রাতের বেলাও দিনের আলোয় ক্রিকেট খেলা হয়। এখন ঘড়িই সব। দশটায় অফিস যেতে হবে না তিনটেয়। সভ্যতা যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে সকাল বিকেল দ্বিপ্রহর বা সন্ধ্যে ইত্যাদি শব্দগুলো হয়তো অভিধানে archaic বলে চিহ্নিত হবে। এই ঘড়ি যদি না থাকতো আমরা সকাল বেলা পাখির ডাকে ঘুম থেকে উঠতাম আর পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়তাম। কিন্তু পুষ্প যে তৃতীয় লোক বা স্বরলোকের বাসিন্দা সেখানে উৎপাদনশীল কোনো কাজ নেই। ঘড়ি নেই। সূর্য চন্দ্রও নেই। তাই সকাল সন্ধ্যেও নেই। এখানে সময় অবারণ।

যতীন বা আমাদের পৃথিবীর অভ্যেসটা যায়নি বলে আমারা সংস্কারবশত জিজ্ঞেস করে ফেলি—এখন ক'টা বাজে। বা আজ কত তারিখ?

এই নতুন জগতে এসে যতীনের নানা প্রশ্নের উদয় হলো। পুষ্প বলে, 'তোমাকে নিয়ে যাব সেখানে। খুব উঁচু এক আত্মা। আমায় বড়ো স্নেহ করেন...। বৈষ্ণব সাধু।'

আমরা দেখেছি পৃথিবীতে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে যারা ভাবছেন তাঁরা মৃত্যুর পরেও বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে ব্যস্ত আছেন। যেমন—যতীনের বাবা। তিনি লোকোত্তর জগতের দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করতে পারেননি। অন্যপক্ষে, পৃথিবীতে যাঁরা ধর্মানুশীলন করেছেন তাঁরাও লোকোত্তর জগতে ধর্মানুশীলন করেন এবং বৈষ্ণব বৈষ্ণব-ই থাকেন। খ্রিস্টান খ্রিস্টান-ই থাকেন। কিন্তু বিভূতিভূষণের অভিজ্ঞতা বা পুষ্পের অভিজ্ঞতা—তাঁরা লোকোত্তর জগতে অনেক উঁচু স্তরে থাকেন।

যতীন তার মায়ের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে সেই ঊর্ধ্বতরলোকে যাওয়া শক্ত। কিন্তু পুষ্প বলে ঊর্ধ্বতরলোকে যাওয়া যায়। বেশিক্ষণ থাকা যায় না। আমাদের মর্ত্যের মানুষও হয়তো স্বপ্নে বা সুষুপ্তিতে ঊর্ধ্বতরলোকের রাসলীলা দেখে আসে। কিন্তু যেহেতু ওই ঊর্ধ্বতরলোকে আমাদের বেশিক্ষণ স্থিতি হয় না সেই হেতু আমাদের কাছে ঐ রাসলীলা স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম বা কবির কল্পনা বলে মনে হয়।

কিন্তু পরমুহূর্তেই পুষ্প বলে—যতুদা তোমাকে পৃথিবীতে যেতে হবে। আজ তোমার শ্রাদ্ধের দিন। যতীন বলে আমি যাব না সেখানে। পুষ্প হেসে বলে—যখন কচি হাতে ছলছল চোখে তোমার নামে পিণ্ড দেবে, সে এমনই আকর্ষণ তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে।

বিয়েত্রিচে যখন দান্তেকে পারাদিসোতে ডেকে নিয়ে গেল তখন না বিয়েত্রিচে না দান্তে— কারুরই পৃথিবীর কথা মনে থাকেনি। তারা পিতা ঈশ্বরকে নিয়ে বিভোর হয়ে যায়।

কিন্তু যখনই আমরা উচ্চতরলোকের আত্মার সাথে পরিচয় করার কথা ভাবছি তখনই পৃথিবী যতীনকে এবং আমাদেরকে সংসারে টেনে নিয়ে গেল। সংসার এবং স্বর্গের এই tension বিভূতিভূষণের 'দেবযান' উপন্যাসকে একটা অজ্ঞাতপূর্ব মাত্রা দিয়েছে। এই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু গদ্যে বা পদ্যে এর আগে কখনও চিত্রিত হয়নি। Never attempted before in prose or rhyme এবং সংসার দুঃখের হলেও তার সৌন্দর্যটি বিভূতিভূষণ মরমিয়া কলমে দৃশ্য-স্পৃশ্য হয়ে উঠেছে।

'যখন কচি হাতে ছলছল চোখে তোমার নামে পিণ্ড দেবে সে এমনই আকর্ষণ তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে'।—এই বাক্যটির প্রথমার্ধে 'চ' এবং 'ছ' এর অনুপ্রাস, ঘৃষ্ট ধ্বনি 'ছ'-এর অভিঘাত, সদ্য পিতৃহারা শিশুর রুদ্ধ বেদনাকে ধ্বনির আশ্চর্য ব্যবহারে দৃশ্য ও স্পৃশ্য করে তোলে। পংক্তিটির দ্বিতীয়ার্ধে আকর্ষণ শব্দটির বিবৃত স্বরধ্বনি

'আ'-এর ব্যাপ্তিকে 'ক'-কণ্ঠধ্বনি খানিকটা সংযত করলেও 'ষ'-এর অন্তঃস্থ 'র' এবং অবারণ শিস্ ধ্বনি 'ষ' ঐ কণ্ঠস্বরের বাধাকে অতিক্রম করে আমাদের টেনে নিয়ে যায় পিণ্ডি গ্রহণের জন্যে। 'র্ষ' আর কোনও কথা শোনে না কোনও বাধা মানে না।

সংসারে বিরহ বিয়োগ এ সকলই সত্য। কিন্তু বিভূতিভূষণের লেখনীতে সংসার সুন্দর তার বিরহে, তার বিয়োগ ব্যথাতে। Our Sweetest songs are those that tell us the saddest thoughts.

পৃথিবীতে কোনো দৃশ্যই চিরস্থায়ী নয়। সেখানে যেটা বুড়োশিবতলার ঘাট ছিল একান্ত নির্জন। যেখানে পুষ্প আর যতীন কৈশোরে খেলা করেছিল, সেই বুড়োশিবতলার ঘাট এখন হয়তো অনেক পাল্টে গেছে। ঘাটের ধারে সিগারেটের দোকান, রেস্টুরেন্ট। নদীতে ভটভটি চলে। জলে আর মাছেরা খেলা করে না। বিল-ছোঁ পাখিরা আর আকাশে ওড়ে না। কিন্তু পুষ্প লোকোত্তর জগতের তৃতীয় স্তরে সেই বুড়োশিবতলার ঘাটকে অক্ষত রেখেছে। সেখানে যতীন আর পুষ্প যখন ছোটোবেলায় খেলা করতো ঘাটটা ঠিক যেরকম ছিল সেই রকমই রেখেছে—আশৈশব যত দিন না যতীন স্বর্গে আসছে এবং সেই ঘাট স্বর্গলোকে এখনও আছে। এর আড়ালে একটা Aesthetics বা নন্দনতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। সৃষ্টিতে যেকোনো মুহূর্তে আপাতদৃষ্টিতে বিনাশলীলা আবার কোনো এক অলৌকিক স্তরে অবিনাশী। এক অর্থে স্বরলোকে পুষ্প রচিত শিবতলার ঘাট Eliot-এর অলৌকিক শিল্পলোকের কথাই মনে করিয়ে দেয়। Eliot বলেছিলেন ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিরহের প্রক্ষোভগুলোকে নৈর্ব্যক্তিক জগতে প্রেরণ করার নামই শিল্প বা আর্ট। পুষ্প-যতীনের শৈশবের শিবতলার ঘাট ঐ শিল্প স্বরূপ স্বরলোকে অটুট। সামনে কুলকুল বাহিনী গঙ্গা নীল আকাশের তলা দিয়ে উড়ে যায় একদল পাখি। সেই শিবতলার ঘাটে বসে যতীনের মন আশাকে নিয়ে ব্যস্ত। পৃথিবীতে সে আশাকে সুখ দিতে পারেনি। সে অকর্মণ্য স্বামী। নিজের কর্তব্য পালন করার শক্তি তার ছিল না। যতীনের মনে পার্থিব সুখ-দুঃখ, ব্যর্থতা, অহঙ্কার এখনও পৃথিবী উত্তর জগতে নাড়া দিচ্ছে। একে বোধহয় প্রেম বলে। পার্থিব জগতে সংসারের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষেরই তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব থাকে। যতীনের মনে ঐ পুরুষ-সুলভ অহংকার রয়েছে এবং যেহেতু সে সংসারে সেই অহংকার অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি সেই হেতু তার ব্যর্থতা-বোধ স্বর্গেও তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

পুষ্প বলে—দয়া বা সহানুভূতি তোমায় নামাবে না...কিন্তু সাবধান বিষয় সম্পত্তির কথা যেন ভেবো না। এসো আমার সঙ্গে।

দুজনে শূন্যপথে নীলাভ শূন্য সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে উড়ে চলল...দূর দূর...বহুদূর। তারা ক্রমে একটা নতুন লোকের সমীপবর্তী হতে লাগল। যতীনের সমস্ত দৈবিক চেতনা অবশ হয়ে এল—বিলুপ্তপ্রায় চেতনার মধ্যে দিয়ে তার মনে হলো বহু

কদম্বদ্রুম যেন কোথায় মুকুলিত লতানিকর বিকশিত...। যতীন সংজ্ঞা হারাল। কারণ এই উচ্চলোকের অভিজ্ঞতা করার শক্তি তার গড়ে ওঠেনি। পুষ্পের সঙ্গে এইখানে এক দেবকল্প মহাপুরুষের পরিচয় হলো। তিনি পুষ্পকে ছুঁলেন আর পুষ্পের সামনে একটা দৃশ্য বা Vision নিজেকে মেলে ধরল—সামনে এ এক অন্য পৃথিবী। বিশাল জলাভূমিতে বড়ো বড়ো অতিকায় জীব-জন্তু কর্দমে ওলোট-পালট খাচ্ছে। বাতাসে অস্বাচ্ছ্যন্দকর গরম জলীয় বাষ্প। সূর্যের তেজ অতিশয় প্রখর...তারপর ছবির পর ছবি। কত দেশ কত যুদ্ধ কত সৈন্য। আত্মা বললেন—বহুদূর অতীতে ফিরে চাইছিলাম। কত কল্প আগেকার আমারই বহুপূর্ব জন্ম।

বলা হয়ে থাকে, বোধিবৃক্ষতলে ভগবান বুদ্ধের সিদ্ধিলাভের মুহূর্তে তিনি এক লহমায় তাঁর অগণিত পূর্বজন্মকে বায়োস্কোপের মতো দেখেছিলেন। যেহেতু কোনো মুহূর্তেরই মৃত্যু নেই যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের কাছে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত চিরন্তনবৎ। ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর পূর্বজন্মের পাঁচশ' সাতচল্লিশটি কাহিনি জাতকের গল্পে উল্লেখ করেন। আর এইখানে মহাপুরুষ বহুকল্প আগের তাঁর পূর্বজন্মের কাহিনি পুষ্পর সামনে রূপবাণীতে তুলে ধরলেন।

এবার দেবতা বিদায় নিলেন। বহুদূর ব্যাপি নভোমণ্ডল জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল তাঁর দেহজ্যোতিতে। অচেতন যতীনকে নিয়ে পুষ্প তার আবার তৃতীয় লোকে ফিরছে। ফেরার পথে যতীনের চৈতন্য ফিরল। যতীন বলে—আমি ভাবতাম আমি খুব উঁচুস্তরে এসেছি। এখন দেখলাম তার চেয়েও উঁচু অনেক স্তর বা লোক আছে। পুষ্প হেসে বলে—এক শুদ্ধ আত্মার কাছে সে শুনেছে সপ্তম স্তর পর্যন্ত আছে যেখানে পৃথিবীর মানুষ যেতে পারে। তার ওপরেও অসংখ্য স্তর আছে। সেসব পৃথিবীর মানুষের জন্য নয়।

অর্থাৎ ভূলোক, ভুবলোক, স্বরলোক, মহোলোক, জনলোক, অপলোক, সত্যলোক—এই ব্রহ্মাণ্ডের শেষ নয়—

> যং ব্রহ্মা বরুনেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বান্তি দিবৈঃ স্তবৈর্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপষিদের্গায়ন্তি যং সামগাঃ। / ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।

এই সৃষ্টির অমেয় এবং তার অসংখ্য স্তর। যতীন কিন্তু পৃথিবীতে সদ্য-বিধবা তার স্ত্রী আশাকে দেখতে পায়। শেষপর্যন্ত পুষ্প আর যতীন পৃথিবীতে আশার বাড়িতে নেমে আসে। আশা রান্নাঘরে আসছে যাচ্ছে। ছেলেদের খাইয়ে আঁচিয়ে দিলে। ঘরে গিয়ে বাবার জন্য পান সাজলে...। যতীন সব সময় ওর পাশে পাশে সামনে রোয়াকে ঘরে...। আশার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুষ্প আর যতীন। এই হলো যতীনের শ্বশুর বাড়ির দেশ। ...গাড়ু হাতে যে আসছিল যতীনকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল।

যতীন এত মন দিয়ে পৃথিবীর কথা ভাবছিল যে কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবীতে দৃশ্য হয়ে উঠল। কিছু সাহসী লোক এসে খুঁজতে লাগল লেবু গাছের আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। পুষ্প আর যতীন তাদের দেখছিল। কিন্তু তারা কিছু দেখতে পেল না।

আশাকে নিয়ে ভাবনা যতীনকে সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখে। একদিন সে একমনে দুর্গা সপ্তসতী চণ্ডীর একটা শ্লোক আবৃত্তি করতে করতে ইচ্ছে করল যে সে পৃথিবীতে যাবে। পরক্ষণেই সে অনুভব করল যে মহাশূন্যে মহাবেগে সে কোথায় চলেছে। এরোপ্লেন যারা চালায় তারা দিক্ ভুল করতে পারে। কিন্তু একজন অন্ধ লোক স্রেফ ইচ্ছে শক্তির সাহায্যে মহাশূন্য অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছল।

আমরা যেন কোনো আধ্যাত্মিক জগতে adventure করতে বেরিয়েছি। বেরিয়ে একটা Science fiction এর পরিমণ্ডলে এসে পড়েছি। যতীন দেখল আশার দেহের মধ্যে দিয়ে ঠিক আমার মতো এক সূক্ষ্ম মূর্তি বার হলো।

বলা হয়ে থাকে বড়ো বড়ো শ্রেষ্ঠ যোগীরা শরীরগতভাবে নিশ্চিত থাকে, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরে তারা যথা ইচ্ছা তথা যান। এখানে আমার সূক্ষ্ম শরীর নির্গত হলো কিন্তু সেই সূক্ষ্ম শরীরে কোনো চৈতন্য নেই। অর্থাৎ আশা পৃথিবীর যে স্তর তা থেকে উন্নততর কোনো স্তরে গেলে তার চৈতন্য বিলোপ হয়। যেমন, যতীনের চতুর্থ স্তরে গিয়ে চৈতন্য লুপ্ত হয়েছিল।

পুষ্প ও যতীন স্বরলোকে নিজেদের বাড়ির সামনে গল্প করতে লাগল। এমন সময়ে আকাশে উজ্জ্বল নীল আলো দেখা গেল। পুষ্প বলল—চেয়ে দেখো, দেবতা। বিদ্যুতের ভাষায় তাঁর কথা। নবম বা দশম স্তরের আত্মা। তিনি বিদ্যুৎ ইশারায় পুষ্পের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ছিলেন। পুষ্প শেষপর্যন্ত আরেক দেবতাকে ডাকল যাতে ঐ দেবতা প্রশ্নকর্তা দেবতার সঙ্গে সংলাপ করতে পারেন। দুই দেবতার মধ্যে কথাবার্তা চলছিল। বিভূতিভূষণের ভাষায় দু'খানা বড়ো যুদ্ধ জাহাজ যেন পরস্পর পরস্পরের ওপর তীব্র অক্সি-হাইড্রোজেন আলোর সার্চলাইট নিক্ষেপ করছে। দুই দেবতার সংলাপের সার কথা হলো—এই যে আগন্তুক দেবতা বহুদূরের—অন্য নক্ষত্র জগতের অধিবাসী। তিনি বহু কোটি বছর আগে নতুন দেশ আবিষ্কারে বেরিয়েছেন বিশ্বের সীমা আবিষ্কার করবেন বলে। এতকাল ধরে বেগমান বিদ্যুতের অপেক্ষাও দ্রুততর গতিতে শুধু শূন্যে বেরিয়ে বেড়াচ্ছেন। সম্প্রতি নক্ষত্রের গ্রহে এবং বিভিন্ন লোকের গোলোক ধাঁধায় তিনি দিশেহারা হয়ে শক্তিহীন, বিমূঢ়।

মর্ত্যে যেমন লোকে দুঃসাহসিক অভিযান করে, ক্যাপ্টেন কুক জাহাজকে একই দিকে চালিত করে শেষপর্যন্ত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যেখান থেকে যাত্রা শুরু

করেছিলেন সেখানেই এসে পৌঁছোলেন, ঠিক একইভাবে মর্ত্যের মানুষের মতো অস্তিত্বের সীমা খুঁজে দেখবেন বলে নবম বা দশম স্তরের কোনো সত্তা কোটি কোটি বছর আলোর চেয়েও জোরে ছুটে বেড়িয়ে গ্রহ-নক্ষত্রের গোলক ধাঁধায় অবসন্ন হয়ে পড়লেন।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বিশ্বরূপ দেখতে গিয়ে বলেছিলেন—'অনাদি মধ্যানং অনন্ত বীর্য্যম্' বিশ্বের অন্ত খুঁজতে গিয়ে খাবি খাচ্ছেন। তিনি সূর্যের নামই শোনেননি। পৃথিবী তো দূরের কথা। আমরা সাধারণত জড় এবং জীব দু'রকম ব্যাপার বুঝি। পুষ্প জড়-জগৎ এবং আত্মিক জগতের কথা বোঝে। কিন্তু সেই আগন্তুক দেবতার কাছে জড়লোক এবং আত্মিক লোক—এ দুটোই সম্পূর্ণ নতুন। বিশ্বভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি আত্মিক লোকে নেমে এসেছেন। বিভিন্ন বিরুদ্ধভাবের মধ্যে দিয়েই চলা তাঁর স্বভাব। তিনি জড়লোকেও অবতরণ করবেন। জড়লোককে জানবেন। এ যেন আমুন্দসেনের মেরু প্রদেশের খোঁজে তুষার ঝড়ের মুখোমুখি হওয়া।

ঐ আগন্তুক দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে যতীন আর পুষ্প চলেছে। পৃথিবীর নিকটে এসে দেবতা বললেন—মেঘের মতো কী সব বিশ্রী চিন্তার ধোঁয়া চারিদিকে। অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষের যে ভাবনা চিন্তা সেগুলো আগন্তুক দেবতার কাছে বিশ্রী মেঘের মতো দৃশ্য। চিত্রকল্পটি দান্তেকে মনে করিয়ে দেয়।

আগন্তুক দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে পুষ্প আর যতীন কাটিহার থেকে মুঙ্গেরগামী একখানা ট্রেনের কাছে এল। দেবতা কৌতুকের দৃষ্টিতে হেসে বললেন—এই কি দ্রুত যাবার নমুনা। নমুনা দেখে তো খুব আশা হয় না। এদের দ্রুতগামিতার ভবিষ্যৎ ইতিহাস সম্বন্ধে।

স্পষ্টত, আগন্তুক দেবতার দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর প্রযুক্তি বিদ্যাগত উন্নয়ন বা অগ্রগতি সম্পর্কে বিভূতিভূষণের বক্রোক্তি।

একটা ভুট্টা ক্ষেতে দুটি ছোটো ছেলে মেয়ে ভুট্টা চুরি করতে গিয়ে ক্ষেত্রস্বামীর কাছে ধরা পড়ে যায়। আগন্তুক দেবতার শিশু দুটির জন্য মায়া হলো। তিনি ক্ষেত্রস্বামীর মনে সদয় চিন্তা নিক্ষেপ করতে চেষ্টা করলেন। ক্ষেত্রস্বামীর হৃদয় পরিবর্তিত হলো। তিনি ছেলে-মেয়ে দুটিকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আচ্ছা যা... আর কখনও আসিস্ না।

আগন্তুক দেবতা মানুষকে দেখে বললেন, আহা এদের তো বড়ো কষ্ট। কী অদ্ভুত এই সৃষ্টি। যত দেখছি ততই এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আগন্তুক দেবতা বলেন, আমার কি ইচ্ছে জান? এদের মধ্যে মানুষ হয়ে থাকি। এদের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করি।

তবে কি বুদ্ধ, খ্রিস্ট এরকমই কোনো আগন্তুক দেবতা? যাঁরা পৃথিবী নামক চোখের জলের উপত্যকা দেখে মানুষের মধ্যে নেমে এসেছিলেন মানুষের দুঃখ দূর করতে?

আগন্তুক দেবতা তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন। তিনি এদের পর এক বিশ্ব পার হয়ে এসেছেন। কত স্বয়ংপ্রভ বাষ্পমণ্ডলী...। কিন্তু এই multiverse এর সীমা তিনি জানেন না।

পুষ্প আর যতীন তাদের স্বরলোকের বাসস্থানে বসে আছে। সেদিন পুষ্প পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তৈরি করল। আর ঐ জ্যোৎস্নার আলোয় তাদের বাসস্থান ভেসে যায়। পুষ্প বলে স্বরলোকে যেকোনো ঋতু বা যেকোনো সময়কে তৈরি করতে পারা যায়। ব্যক্তি এখানে সময়ের পিঞ্জরে বাধা নয়। সময় ব্যক্তির ইচ্ছা-নির্ভর নয়।

যতীন এই সময়ে তার মর্ত্যের স্ত্রী আশার কথা ভাবছিল। পুষ্প সে কথা বুঝতে পেরে বিষণ্ণ হয়ে উঠল এবং যতীন ও পুষ্পের চারপাশে যে জ্যোৎস্না সেটা ম্লান হয়ে উঠল। অর্থাৎ এই স্বরলোকে প্রভাত কখনই রাত্রির অবসানে আসে না। যখনই চিত্ত জেগে ওঠে তখনই প্রভাত হয়। ঠিক তেমনি পুষ্প যতীনকে বলে—আজ কল্প পর্বতে গান-বাজনার দিন। চলো তোমাকে শুনিয়ে আনি। কল্প পর্বতে যেতে গিয়ে যতীন দেখল তারা একটা অত্যন্ত সুন্দর দেশে এসে পৌঁছেছে, যার সঙ্গে পৃথিবীর খুবই কম মিল।

পুষ্প বলেছে—দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ স্বর্গলোকে আত্মারা পৃথিবী থেকে সবে এসেছে বলে পৃথিবীর স্মৃতি তাদের স্বর্গ গড়তে অনেকটাই সাহায্য করে। কিন্তু কল্প পর্বতের নিকটবর্তী দেশে পৃথিবী থেকে সদ্য-মরে যাওয়া মানুষেরা আসতে পারে না। সেখানে অন্যান্য অনেক স্তরের আত্মারা আসে বলে সেই অঞ্চল পৃথিবী থেকে ভীষণ ভিন্ন।

আমাদের কোলকাতা শহরেও অনেক enclave আছে যেখানে গেলে মনেই হয় না আমরা পশ্চিম বাংলায় আছি। কারণ সেই সব enclave-এ বর্তমান পাঠকের মতো বাঙালি মাস্টারের প্রবেশাধিকার নেই। সেখানে লস এঞ্জেলস্, নিউ জার্সি ইত্যাদি নানা গ্রহ-উপগ্রহের দেবতারা আসা-যাওয়া করে।

অল্পক্ষণ বাদেই যতীন ও পুষ্পের সামনে একটা অনুচ্চ পাহাড় দেখা দিল। সেখানে বহু দেব-দেবী একত্র হয়েছেন। তাদের অঙ্গের জ্যোতি ও রূপে সমস্ত ভূমিশ্রী আলোকিত হয়ে উঠল, তাদের দেব নিঃসৃত উচ্চ বৈদ্যুতিক শক্তির স্পন্দনে মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের নির্ঝর হয়ে উঠেছে যেন।

'দেবতা' শব্দটি 'দিব্' ধাতু থেকে এসেছে। যিনি ক্রীড়া করেন তিনি দেবতা।

যিনি উজ্জ্বল তিনি দেবতা। এক্ষেত্রে দেবতা শব্দের দ্বিতীয় অর্থটি নেওয়া হয়েছে। দেবতাদের অঙ্গ-কান্তিতে চারিদিক উজ্জ্বল মুখর—

> সেই পাহাড়ের চুড়ো থেকে এক অপূর্ব মধুর শব্দের ঢেউ উত্থিত হলো? দেব-দেবীরা সকলে অবনত মস্তকে শুনতে লাগলেন...শুনতে শুনতে যতীনের মনে হলো সে আর পৃথিবীতে বদ্ধ আত্মা নয়। সে মুক্ত, সে বিরাট।...যতীনের মনের কোনো গুপ্ত কক্ষে গভীর অনুভূতির দ্বার খুলে গেল। সে দেখতে পেল তার পৃথিবীতে যাপন করা অনেক পূর্ব জীবন...আশা কি এক জন্মের আশা না পুষ্প এক জন্মের পুষ্পটি—কত বিস্মৃত মরুদ্বীপে কত শ্যামল পল্লীর কুঞ্জে কুঞ্জে...কত দর্শান গ্রামে ব্যাধ রূপে। কত শ্বাকদ্বীপে ক্রৌঞ্চমিথুন রূপে...কতবার ওদের দেখাশোনা কতবার ওদের ছাড়াছাড়ি।

হয়তো ঐ কল্পলোকের গান নাদধ্বনি। সেটা কণ্ঠ সংগীত নয়, যন্ত্র সংগীত নয় এবং ঐ সংগীতের অভিঘাতে যতীনের জননান্তর সৌহৃদানি প্রত্যক্ষভূত হলো।

ভগবান বুদ্ধদেব যখন বোধিলাভ করেন তখন তাঁর অনন্ত পূর্বজন্মের কথা চলচ্চিত্র সারির মতো প্রত্যক্ষীভূত হলো। প্রসঙ্গত, যে জন্মে তিনি পূর্ব জন্মকে প্রত্যক্ষ করলেন সেই জন্মটি তাঁর শেষ জন্ম।

যতীন যে জন্ম-জন্মান্তরের কাহিনি দেখল। সেখানে সর্বত্র-ই সে কেন্দ্রে। তার একদিকে আশা আরেকদিকে পুষ্প। তথাকথিত উপন্যাসে প্রেমের ত্রিকোণ থাকে। আর যতীন-আশা ও পুষ্পের এই প্রেমের ত্রিকোণ জন্ম-জন্মান্তর ধরে চলেছে। অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাতে যতীনই প্রেমের ত্রিকোণের কেন্দ্রে।

তবে বর্তমান 'দেবযান' গ্রন্থে প্রেমের ত্রিকোণের আরেকটি মাত্রা আছে। একটি তলে যেমন যতীন, আশা ও পুষ্প রয়েছে তেমনি আরেকটি স্তরে পুষ্প যখন স্বর্গের প্রতিনিধি আশা তখন মর্ত্যের প্রতিনিধি। আর যতীনের দুই কান ধরে দুই জনে দিচ্ছে টান। একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে খুব স্পষ্ট বোঝান যায়—

কল্প পর্বত থেকে ফেরার পথে যতীন আর পুষ্প এক উজ্জ্বল দেবীকে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখল। দেবী বললেন—কল্প পর্বতের গান শুনে তাঁর পৃথিবীর কথা মনে পড়ে। পৃথিবীর দুঃখ শোক তিনি অপনোদন করতে চান। কিন্তু তিনি অনেক

দিন আগেই পৃথিবী থেকে এসেছেন। তাঁর মতো আরেকজন ঋষি আছেন। তিনিও পৃথিবীর দুঃখে কাতর। কিন্তু পৃথিবীর স্থূল, জগতে তাঁরা প্রবেশ করতে পারেন না। তাই তাঁরা একটা মাধ্যম চান যা পৃথিবীর স্থূল জগতে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে। পুষ্প ও যতীন তাঁর সহায়তা করার জন্য তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। দেবী ওদের সঙ্গে নিয়ে সেই ঋষির কাছে গেলেন। ঋষি আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন আমি বাল্মীকি। তমসা নদীর তীরে পৃথিবীতে তাঁর যে আশ্রম ছিল তারই অনুকল্প আশ্রমে তিনি লোকোত্তর জগতে থাকেন। আর তিনি যে সব চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যে তাঁর প্রিয় চরিত্র ছিল সীতা। সুতরাং সেই সীতাও তাঁর আশ্রমে থাকেন এবং সেই সীতা আর কেউ নয়, যে দেবী অশ্রু বিসর্জন করছিলেন সে দেবী যতীন আর পুষ্পকে হাতে ধরে বাল্মীকির আশ্রমে নিয়ে এসেছেন তিনিই সীতা।

যতীন আর পুষ্পর কাছে প্রত্যক্ষ যে দেবী তিনি যদি ঋষি বাল্মীকির মানসকন্যা হয়ে থাকেন তাহলে যা কিছু প্রত্যক্ষ তাই তো স্বপ্ন। ঋষি বাল্মীকিও হয়তো সত্য নয়। কারোর মানস সন্তান।

ঋষি বাল্মীকি পুষ্প ও যতীনকে বললেন—পৃথিবীতে গিয়ে আমি কিছু করতে পারিনি। বহুকাল আগে ভবভূতিকে প্রভাবিত করে একখানা কাব্য লিখিয়েছিলাম। চমৎকার কাব্য হয়েছিল। আর বাংলাদেশের মধুসূদনকে দিয়ে আর একখানা কাব্য লেখাতে গিয়েছিলাম... গিয়ে দেখি কয়েকটা ভিন্ন দেশীয় কবি তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদের প্রভাবই তার ওপর বেশি কাজের হল আমি গিয়ে ফিরে এলাম। বাল্মীকি সীতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন তুই একাই যা মা। এঁদের নিয়ে যা। এঁরা নতুন পৃথিবী থেকে এসেছে। এঁদের দিয়ে কাজ ভাল হবে।

আমরা এর আগে এক দেবতাকে দেখেছি। তিনি পৃথিবীর একটি ভুট্টাক্ষেতের মালিকের চিন্তাকে নিজের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত করেছিলেন। দুটি ছেলেমেয়ে ভুট্টা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে ছিল। কিন্তু দেবতার চিন্তা ক্ষেত্রপালকে প্রভাবিত করাতে ক্ষেত্রপালের হৃদয় পরিবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু ঋষি বাল্মীকি মধুসূদনের হৃদয়কে প্রভাবিত করতে পারলেন না। সত্যিই কি পারেননি? ‘মেঘনাদবধ কাব্যে’র চতুর্থ সর্গ নিঃসন্দেহে বাল্মীকিকে অনুসরণ করেছে এবং সেখানে অশোক কাননে সীতা অকলঙ্ক বাঙালি বধূ যে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে দিনগুলি কীভাবে কেটেছে তার স্মৃতিচারণ করছে। শুধু তাই নয়, ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ একটি যুদ্ধের শেষে শুরু হচ্ছে এবং চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি শেষ হচ্ছে।

যেখানে অ-রাম অথবা অ-রাবণ হবে ভুবন। কিন্তু পাঠকের কাছে সেক্ষেত্রে পরিষ্কার যে যুদ্ধে রামই জিতবেন যেহেতু ‘যতো ধর্ম ততো জয়েৎ’। যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে We feeling আছে। আর রাবণের মধ্যে

অহংবোধ অতি প্রবল। তাই রাবণের ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং শেষপর্যন্ত মধুসূদন ঠিক বাল্মীকিরই অনুসরণ করেননি? সে যাই হোক সীতা চরিত্র যদি বাল্মীকির সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে বাল্মীকি চরিত্রটি নিঃসন্দেহে বিভূতিভূষণের সৃষ্টি।

প্রশ্ন ওঠে : দেবযানের বিভূতিভূষণ এবং বিভূতিভূষণের দেবযান কি তবে বর্তমান লেখক-পাঠকের মধ্যে যে সংলাপ চলছে সেই সংলাপের সৃষ্টি?

সে যাই হোক সীতা যতীন আর পুষ্প পৃথিবীতে এসে পৌঁছল। পৃথিবীর যে দেশটায় পৌঁছল সেখানে রোদ্দুরের মুখ দেখা যায় না। কুয়াশায় চারদিক ঘেরা। প্রথমে একটা গ্রামে গিয়ে ওরা পৌঁছাল। সেখানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ...একটা গ্রামে মোটর ভ্যান এসেছে মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলবার জন্য। পুলিশের লোক জেলের কয়েদিদের দিয়ে মৃতদেহ বহন করাচ্ছে। তারা রাস্তার ধার থেকে ঘরের মধ্যে থেকে মৃতদেহের ঠ্যাং ধরে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে মোটর ভ্যান বোঝাই করছে।

আমরা পাঠকরা ভাবি যদি শিবতলার ঘাটকে স্বর্গে রচনা করা যায়, যদি বাল্মীকির আশ্রম স্বর্গে অক্ষত অটুট থাকে তবে তো এই দুর্ভিক্ষকেও স্বর্গে চিরায়ত করে রাখা যায়। আর যা চিরায়ত তা হয়তো ক্লেশের নয়। যিনি তার স্রষ্টা তাঁর কাছে সেটা খেলা।

কথোপকথনের মধ্যে মেয়েটি বলল—বড়ো বড়ো দুর্ভিক্ষ, মড়ক, বন্যা প্রভৃতি যাতে দেশকে দেশ বা জাতিকে জাতি কষ্ট পায় এসবের মূলে অতি উচ্চ দেবতা যাঁরা গ্রহদেব— Planetary spirit তাঁদের হাতে রয়েছে। তাঁদের উদ্দেশ্য বা কর্মপ্রণালী আমরা বুঝি নে... এর হয়তো কোথাও একটা বড়ো উদ্দেশ্য রয়েছে। আমাদের দৃষ্টি ততদূর পৌঁছায় না। কিন্তু উন্নত দেবতারা সে সব বোঝেন বলে হস্তক্ষেপ করেন না।

যতীনরা তাদের স্বর্গের বুড়ো শিবতলার বাড়িতে ফিরে এল। করুণাদেবী/সীতাদেবী মাঝে মধ্যেই ওদের কাছে আসতেন ঊর্ধ্বলোকের নানা ফলমূল নিয়ে। এমনিতে আপেল বা পেয়ারা যদি শরীরে nutrition দেয় তবে এই ফলগুলো মানুষের আত্মিক শক্তির Nutrition। ফলগুলো সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিতে হয় নইলে কোথায় উঠে যায়।

একদিন করুণাদেবী ওদের নিয়ে গেলেন খুব নিম্নস্তরের ব্যক্তির কাছে। সেখানে পুষ্প বা করুণাদেবী দৃশ্য হতে পারেন না। কিন্তু যতীন দেখা দিতে পারে। ঐখানে একটি লোক প্রেত হয়ে আছে। কিন্তু সে জানে না যে সে আর মানুষ নেই, পৃথিবীতে নেই, সে একটা প্রেত। আসলে পুলিশের ভয়ে একটা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে একা একা থাকত এবং একা একা থাকতে থাকতেই সে মরে গেছে। কাজেই সে ভাবতে পারে না যে পৃথিবী থেকে চলে এসেছে অন্যত্র। বিভূতিভূষণ এই Parable টার

মধ্যে দিয়ে আমাদের শাসন-ব্যবস্থার সম্পর্কে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের তীর ছুঁড়েছেন। পুলিশের ভয়ে পালিয়ে মানুষ একা থাকতে থাকতে সে প্রকৃতপক্ষে প্রেতই হয়ে যায়। যতীন তার কাছে আসতে সে ভাবল যে, কোনো দারোগা এসেছে বুঝি। করুণাদেবী তার মৃত বৌকে নিয়ে এলেন। দু'জনে মুখোমুখি হতে বৌ তাকে বুঝিয়ে দিল যে সে যদিও বৌটাকে মুগুর দিয়ে মেরে ফেলেছিল তবুও বৌ-এর খপ্পর থেকে সে পালাতে পারেনি এবং সে বোঝাল যে যতীন দারোগা নয়। সে বরকে বোঝাল যে যতীনকে তার প্রণাম করা উচিৎ। যতীন ও আরো দুই অদৃশ্য আত্মা তাদের মঙ্গলের জন্য সেখানে উপস্থিত।

প্রেতরূপী ঐ লোকটা ভাবতেই পারেনি যে সে পৃথিবী ছেড়ে চলে এসেছে। করুণাদেবীর একটাই কাজ সেটা হল এদের মনে করিয়ে দেওয়া যে এরা আসলে পৃথিবী থেকে চলে এসেছে। এদের হৃদয়ে প্রেম-প্রীতির উদ্বোধন করা।

যারা কমিউনিস্ট তারা ভাবে শ্রমিকদের আত্ম-সচেতন করতে হবে। ফোর্ড, রকফেলার, আম্বানীরা কেন ঐ শ্রমিকদের কাজের ফসল তাদের ঘরে তুলবে? বড়ো বড়ো হিন্দু ধর্মের প্রবক্তারা আমাদের মতো নিম্নবর্গের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন আমরা আসলে দেহ নই। আমরা আত্মা যা আগুনে পোড়ে না। জলে ভেজে না। লোকোত্তর জগতের করুণাদেবীও ঠিক একই ভাবে নিম্নস্তরের আত্মাদের আত্মসচেতন করে তোলার চেষ্টা করেন যাতে করুণার মধ্যে দিয়ে তারা উন্নততর লোকে যেতে পারে। অর্থাৎ বিভূতিভূষণ দেবযানের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই সমাজব্যবস্থাকে নতুন ভাবনা দিয়ে কীভাবে স্বর্গে রূপান্তর করা যায় তার বুঝি একটা বাস্তবধর্মী পদ্ধতির কথা বলছেন। দাস ক্যাপিটাল বা স্বামী বিবেকানন্দ রচনাবলী আমরা যেমনভাবে পড়ি তেমনি করেই বিভূতিভূষণের দেবযান পড়তে পারি।

কিন্তু প্রশ্ন হল—যে প্রেত অবস্থাতে আছে এবং সে জানে না সে প্রেত, জানে না যে সে নিম্নস্তরে আছে তাকে উচ্চস্তরের Awareness দিয়ে কি লাভ? পুষ্প তো উচ্চস্তরের আত্মা। সে দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর শিবতলার ঘাটকে স্বর্গে রচনা ক'রে তার যতীনদার জন্য অপেক্ষা করেছে। যতীনদাকে তার দরকার ছিল। সে হয়তো যতীনদাকে পেল। ঐ প্রেত বৃদ্ধটির তার বৌ-এর জন্য কোনো মনোবাসনা ছিল না। তার কাছে তার বৌকে এনে কি লাভটা হল? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে? আমরা এখনও অবারণ আনন্দে আছেন এমন কোনো দেব-দেবী দেখিনি তো। অবারণ পুলিশের ভয়ে যদি কেউ চিরকাল থাকে সে তো আনন্দ কাকে বলে জানবে না। অতএব অবারণ আনন্দে যদি কেউ থাকতে পারত তার সঙ্গে অবারণ ভয়ে যে থাকে তার তফাৎ কি? আনন্দ, দুঃখ, ভয় এই সব মানুষের তৈরি। সংসারের রচনা। সেগুলো মৃত্যুর পরেও আমাদের তাড়া করে।

যাই হোক এই বৃদ্ধ পলাতক জঙ্গলের প্রেতটিকে উদ্ধার করার ফলে যতীন এবং পুষ্পের পুণ্য হল এবং তাদের সঙ্গে প্রেমের দেবীর পরিচয় হল। প্রেমের দেবীর কাজ বহুদূর প্রসারিত। নানা গ্রহে, নানা নক্ষত্রে, নানা লোকে তাঁর কাজ চলছে। তাঁর অনেক সঙ্গী- সাথী আছে। প্রেম এবং করুণা পরস্পরের সঙ্গী। সেহেতু প্রেমের দেবীও করুণা দেবী পরস্পর পরস্পরের সঙ্গী। প্রেম ও করুণা পরস্পর ফুল ও সুতোর মত একসঙ্গে আছে। সুতোকে ফেলে মালা গাঁথা যায় না। ফুলকে বাদ দিয়ে সুতো নিয়ে মালা হয় না।

কেন বিনি সুতোয় মালা হয় না?

বড় ঠুনকো হয়।

করুণা প্রেমকে সাহায্য না করলে প্রেম হয় ঠুনকো। আর প্রেম পেছনে না থাকলে করুণা রক্তাল্পতা রোগে মরে।

পুষ্প বুঝতে পারল উচ্চতরলোক থেকে কোনো দেব-দেবী তাকে ডাকছে। গোলাপী আলোর সরল জ্যোতিরেখা অনুসরণ করে সে মহাশূন্য পথে উঠল। পুষ্প যে স্বর্গে পৌঁছল পৃথিবীর ভাষায় হয়তো তার কিছুটা বর্ণনা করা যায়। কিন্তু তার অন্তঃপ্রবিষ্ট ভাবখানিকে কিছুতেই বলা যাবে না। সেখানকার মাটিতে পা দিলেই মনের শোক-দুঃখ-স্নেহ-প্রেম কল্পনা শতগুণে বেড়ে যায়।

আমরা বলব—এই জগৎ কবিদের জগৎ। মর্ত্যের শ্রেষ্ঠ কবিরা নিশ্চয়ই এই জগতে প্রবষ্টি হয়ে মর্ত্যের শোক-দুঃখকে তীব্রতর করে পৃথিবীর ভাষায় তাকে অনুবাদ করেন। জীবনানন্দ বলেছিলেন—কেউ কেউ কবি সকলেই কবি নয়। বিভূতিভূষণ বলেন—প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই কবিসুলভ অনুভূতিগুলো আছে। কেবল আস্বাদ করার ইন্দ্রিয় ঘুমিয়ে আছে।

উচ্চ জগতের তীব্রতর স্পন্দন তরঙ্গ সহজেই ব্যক্তি ধারণ করতে পারে না। আর বিভূতিভূষণ বলেন—সেইজন্যই তো গঙ্গার দাপটে ঐরাবত ভেসে গিয়েছিল। মহাদেব গঙ্গার স্রোতকে মাথায় না নিলে সেই বেগবতীকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা যেত না। গঙ্গা অবতরণের মিথকে বিভূতিভূষণ নতুন করে উপস্থাপন করলেন।

তো এই নতুন স্বর্গে পুষ্প প্রণয়দেবীকে দেখতে পেল। প্রণয়দেবী পুষ্পকে ডেকে পাঠিয়েছেন। প্রণয়দেবীকে এর আগে পুষ্প একবার দেখেছিল। এখন তাঁকে তার থেকে অনেক বেশি কিশোরী দেখাচ্ছে। আসলে আমরা যাদের দেব-দেবী বলি তাঁরা সব চৈতন্যের এক একটি বিন্দু। যখন যেরকম প্রয়োজন হয় সেই রকম রূপ তাঁরা নিতে পারেন— যাতে মানুষেরা স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় ট্রাডিশন অনুযায়ী মূর্তিতে তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন। একথা নিশ্চয়ই গীতোক্ত বাণীর ব্যাখ্যায় 'যথামাং প্রদ্যনেন্ততাং স্তথৈব ভজাম্যহম্'। যে আমাকে যে রূপে ভজনা করে আমি

তাকে সেই রূপে থেকেই সন্তুষ্ট করি। প্রণয়দেবী বলেন—পৃথিবীতেও একই ব্যাপার হয়। একটি আত্মা যে প্রকার— তার পরিবেশও সেই প্রকার হয়। তবে পৃথিবীতে মন জড়কে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু স্বর্গে এবেলা ওবেলা ইচ্ছে অনুযায়ী রূপের পরিবর্তন হয়।

প্রণয়দেবীর ঘরের জানলায় পুষ্প এসে দাঁড়ালো। দাঁড়ানো মাত্র তার দৃষ্টিশক্তি সহস্রগুণে বেড়ে গেল। লক্ষ কোটি যোজন দূরবর্তী এক অতি ক্ষুদ্র গ্রহ—পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র গ্রাম ওর নয়নপথে পতিত হল।

দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটির Blessed Douozel স্বর্গের বারান্দা থেকে মহাশূন্যের দিকে তাকিয়েছিল। তার কাছে পৃথিবী একটা ক্ষুদ্র পোকা বলে মনে হয়েছিল। এই মহাজাগতিক কল্পমত্ত পুষ্পকে ভর করেছে। সেই পৃথিবীকে অতি ক্ষুদ্র দেখেছে। কিন্তু যেহেতু তার দৃষ্টিশক্তি অনেক বেড়ে গেছে সে সেই ক্ষুদ্র পৃথিবীর মধ্যেই একটি গ্রামকে দেখতে পাচ্ছে এবং সেই গ্রামে নারকেল সুপারি গাছে ঘেরা ছোট্ট একটা একতলা কোঠাবাড়িতে বিয়ে হচ্ছে। সকলের একটা ব্যস্ততা ও উৎসাহের ভাব কিন্তু সরু পাড় ধুতি পরণে একটি সতেরো-আঠারো বছরের কিশোরী নিরানন্দ মুখে ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে আছে...। দেবী বললেন—

> ঐ যে মেয়েটা দেখছো ওর নাম সুধা। ও আজ বছর দুই বিধবা হয়েছে। এত বছরে বিবাহ হয়েছিল। স্বামীকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল। আজ ওর ছোটো বোনের বিয়ে।
>
> সুধা রোজ রোজ স্বামীর জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। শুধু এই জন্মে নয় পর পর তিন জন্মই সুধার এই অবস্থা। পুষ্প প্রণয়দেবী এবং যতীন মেয়েটির কাছে এল। মেয়েটির স্বামীও এখন বিদেহী আত্মা—মেয়েটির সঙ্গে আছে।

প্রণয়দেবীর শান্ত কোমল ভাব সুধার স্বামীকে প্রভাবিত করল। সুধার মতো মেয়েদের দুঃখ-কষ্টে প্রণয়দেবী উদ্বেল হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন 'তোর মতন লক্ষ লক্ষ মেয়ে রয়েছে আমার পৃথিবীতে। তাদের ছেড়ে স্বর্গেও যেতে পারি না।' বিভূতিভূষণ দেবযানে বারে বারেই পৃথিবীতে ফিরে আসেন এবং গ্রাম বাংলার দৈনন্দিন জীবনের অগণিত অশ্রুসিক্তা চিত্রকল্প প্রত্যক্ষ করেন।

পুষ্প বলল, 'আপনার মতো দেবী ইচ্ছে করলে সুধার কোন উপকার হয় না?'

দেবী বললেন, 'আমি সেবা করতে পারি। বিশ্বের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করার আমি কে? আমার মত হাজার হাজার দেব-দেবী আছেন। তাছাড়া পৃথিবীর মানুষদের নিয়ে আমার কারবার। অগণ্য জীবলোক রয়েছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তাদের জন্য অন্য সব দেব-দেবী রয়েছে।'

সুধার কাছে গিয়ে যতীনের আশার কথা মনে পড়ল। যতীন সেদিন ওর

স্বর্গলোকের বাসায় অন্যমনস্কভাবে আশালতার কথা ভাবছিল। হঠাৎ চমকে ওঠে সে দেখলে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন—লোকোত্তর জগতেও পৃথিবীর সংস্কার যায় না। তারজন্যেই পৃথিবীতে বারবার জন্মাতে হয়। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের প্রত্যক্ষ অনুভূতি চাই। একটি গাছের দুটি ডালে ওপরে নীচে দুটি পাখি বসে রয়েছে। নীচের পাখিটা মিষ্টি ফল খাচ্ছে, কটু ফল খাচ্ছে। ওপরের পাখিটা নির্বিকার অবস্থায় বসে আছে। নিজ মহিমায় মগ্ন। ওপরের পাখি পরমাত্মা। নীচের পাখি ইন্দ্রিয় সুখমগ্ন জীবাত্মা। নীচের পাখিটা যখন ওপরে উঠে ওপরের পাখিটার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবে তখনই নিচের পাখিটার মুক্তি।

উপনিষদের একটি চিত্রকল্পকে অন্যভাবে উপস্থাপনা করা হল। কিন্তু পাঠকের কাছে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। ঐ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম নিজেকে নিয়েই যদি বিভোর থাকেন, সেটাই যদি তাঁর চরিত্র হয় তবে যে মানুষটি নিজেকে নিয়ে নিজে বিভোর থাকে আমরা যাকে Narcissas বলি সেও তো ব্রহ্মকল্প।

ঐ জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী তাঁর অতীতের সাধন ভজনের কথা বললেন। তার সমাধির কথা বললেন। সন্ন্যাসী এত জোরে জোরে কথাগুলো বললেন যে যতীনের মনে হলো তার সমস্ত শরীরে হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলে গেল। তারপরে তার জ্ঞান রইল না। সে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে সে কোথায় চলেছে।

ইংরজে কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেন তিনি দেহগতভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন তাঁর সকল ইন্দ্রিয় অবসন্ন হয়ে পড়ল। আর তিনি জাগ্রত আত্মা হয়ে আনন্দের শক্তি নিয়ে সবকিছুর আড়ালে যে প্রাণ আছে তাকে প্রত্যক্ষ করলেন। স্বরলোকের যে সূক্ষ্ম দেহ যতীনের সেই সূক্ষ্ম দেহ সুপ্ত হল এবং সূক্ষ্মতর দেহে সে ঐ জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসীর অনুসরণ করে বিশ্বরূপ দেখতে লাগল। রূপলোক ছাড়িয়ে সে অরূপলোকে পৌঁছলো। মহাব্যোমে মহাশূন্যে অনন্ত স্বয়ম্ভু স্বপ্রকাশ নির্বিকল্প সেই একা মাত্র আছে। আর কোথাও কেউ নেই। সেইই সব।

যতীন আর কিচ্ছু জানে না। যতীনের জ্ঞান ফিরে এল। সন্ন্যাসী হেসে বললেন—কি হলো? দেখলে? একটু পরে পুষ্প এল। যতীন তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল—‘এক মহাপুরুষ এসে অদ্ভুত দর্শন করিয়ে গেলেন আমার গা ছুঁয়ে। এখন বুঝেছি সব মিথ্যে।’ পুষ্প বলল—

> কিছুই বোঝোনি...এ আমি অনেকদিন জানি। কিন্তু তাতে কি? এতেই আনন্দ। যুগে যুগে আসব যাব, এর শোক দুঃখেও আনন্দ খুঁজে নেব। লীলাসঙ্গী হয়ে থাকব তাঁর। তিনি খেলা করছেন। খেলুড়ে না থাকলে লেখা করবেন কাকে নিয়ে? সবাই ব্রহ্মা হয়ে বসে থাকলে সব শূন্য নিরাকার। কিছুই নেই আবার সবই আছে। খেলা করো না দুদিন যতদিন তিনি খেলাবেন।

পুষ্প বলল—'আশা বৌদির বিপদ। আশার কাছে যেতে হবে।' আশাদের গ্রামে হঠাৎ পুষ্প পুকুরপাড়ের ঐ দিকে চেয়ে বলল—'ঐ দেখো যতীনদা।' যতীন দেখল, আশা যদু মুখুজ্জ্যের ছেলে নেত্যনারায়ণের সঙ্গে গোপনে যোগ দিল। নেত্যনারায়ণ আশাকে অন্যত্র নিয়ে যাবে। একসঙ্গে থাকবে। ফিরে এসে আশা দুটো মুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল।

এর আগে নেত্যনারায়ণের সঙ্গে আশাকে দেখে যতীনের রাগ হয়েছিল। এখন করুণা হল। আশা ঘুমিয়ে পড়লে পুষ্প যতীনকে বলল যতীন এবং আশার দাম্পত্য জীবনের কোনও একটি দৃশ্য গভীরভাবে চিন্তা করে আশার সামনে তুলে ধরতে। পুষ্প আর যতীন চলে গেল। আশা ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে পড়ল। এইমাত্র সে স্বপ্ন দেখেছে স্বপ্নটা জীবন্ত ছিল। নেত্য আশার কতগুলো সোনার গয়না হাত করে ওকে কোলকাতায় এনে রেখেছে। সেখানে আশা হাতে চুড়ি পড়ে। কপালে সিঁদুর দেয়। যতীন রোজ সেখানে যায় রাত্রে। তার চোখে আশা এবং নেত্যর দৈনন্দিন জীবনের কাহিনি ফুটে ওঠে।

অনেকটা এলিজাবেথীয়ান যুগের Drama-র মতো। সেখানে কোনো নিহত ব্যক্তির প্রেত দেখতে থাকে তার সম্পর্কিত পৃথিবীর পাত্র-পাত্রীদের কাহিনি। যতীনও তেমনি আশার কাহিনি দেখছে। বিভূতিভূষণ এখানে আগের কাহিনি বর্ণনা করছেন না। আমাদের চোখের ওপর আশার জীবনে ঠিক কী ঘটেছে, আশা কী করছে, কী বলছে সেটা নাটকের মতো মেলে ধরছেন।

যতীন আশার কথা পুষ্পকে বলেছিল। করুণাদেবীর কাছে একদিন সে পুষ্পকে নিয়ে গেল। যতীনের বক্তব্য পুষ্পই বলল। আশা কোলকাতার বাসাবাড়িতে মাঝ রাত্তিরে মার খেয়ে সারা রাত কেঁদেছে। যতীনের মনে বড়ো কষ্ট। করুণাদেবী সব শুনে বললেন— এতে তাঁর কিছু করার নেই। কন্যা যতদিন না ঠেকে শিখবে তার জ্ঞান হবে না...ভগবান প্রত্যেক লোককে বড়ো দেখতে চান। সব সুন্দর নির্মল দেখতে চান। কষ্ট দিয়ে, শোকের বোঝা দিয়ে, রোগের বোঝা দিয়ে ব্যক্তির মনে সেগুলো জাগিয়ে দেবার কৌশল তাঁর জানা আছে। দেবী বললেন—আশার হৃদয়ে প্রেম নেই। সবই স্বার্থ। এখন যার সঙ্গে আছে তাকেও তেমন ভালোবাসে না। সাংসারিক স্বার্থ। যতীন বলে—ওর জন্য মন বড়ো খারাপ, ওর কষ্ট দেখে।

দেবী বললেন—তুমি যাকে ভাবছো কষ্ট বা পাপ ও তাকে ভাবছে সুখ। ও যেদিন পাপ ভেবে ত্যাগ করবে সেদিন ওর উন্নতি। দেবীর মতে, আশাকে এখন কোনোভাবেই সাহায্য করা যাবে না। স্পষ্টত, সুধার সঙ্গে আশার পার্থক্যটি যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হলো। দেবী একটি আধ্যাত্মিক উন্নত অবস্থার মেয়েকেও দেখালেন। তার স্বামী শিকারী ছিল। কার্পেসিয়ান পর্বতে শিকার করতে

গিয়ে বুনো শুয়োরের হাতে মারা পড়ে। সে আজ সতেরো আঠারো বছরের কথা। মেয়েটি আজও স্বামীর তামাক খাবার নলটা যত্ন করে পরিষ্কার করে। ফুল দিয়ে সাজায়...দুঃখ-কষ্ট কতো পেয়ে আসছে। খেতে পায় না। তবুও স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান।

বিভূতিভূষণ যদিও শ্রী মধুসূদনের চারপাশে ভিনদেশীয় কবিদের দেখেছিলেন। এই সতী-সাধ্বী নারীর চিত্রকল্প কিন্তু মূলত Victorian. রানী ভিক্টোরিয়ার স্বামী অ্যালবার্ট অত্যন্ত অল্প বয়েসে মারা যান। অ্যালবার্ট অত্যন্ত প্রতিভাবান ছিলেন। ছোটো বয়েসে বিধবা হয়েও রানী ভিক্টোরিয়া দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন স্বামী অ্যালবার্টের ছবির সামনে প্রত্যেক দিন ফুল দিতেন। তাঁর ঘরের বিছানার চাদর পাল্টে দিতেন। রানী ভিক্টোরিয়া তাঁর সভায় কোনো লাস্যময়ী বিধবাকে পছন্দ করতেন না।

দেহী মাত্রেরই পার্থিব প্রয়োজনীয়তা আছে, সামাজিক প্রয়োজনীয়তা আছে। সেখানে কোনো বিধবা যদি সামাজিক অনুশাসনকে মেনে নিয়ে বাঁচতে চায় তো তাকে উন্নতমনা বলা হবে না কেন? আশা সামাজিক অনুশাসন মেনে নিয়েছে এই অর্থে যে, সে বিধবা হওয়া সত্ত্বেও শাঁখা-সিঁদুর পরে নেত্যর সঙ্গে ঘর বেঁধেছে। নেত্যকে সে ভালোবাসে না ঠিকই। কিন্তু আমাদের দেশে আগে ভালোবাসা তারপরে তো বিয়ে হয় না। অদৃষ্ট যদি কারোর ওপরে কোনো স্বামীকে চাপিয়ে দেয় সেই স্বামী যদি মেয়েটিকে এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভরণ পোষণ না দিতে পারে অথবা সেই স্বামী যদি মারা যায় তাহলে সেই স্বামীর প্রতি প্রেমকে অক্ষুণ্ণ রেখে নারীকে শহিদ হতে হবে, দারিদ্র্যে-খিদেতে মৃত্যুবরণ করতে হবে, সে কেমন প্রেম? মেয়েটিকে সেক্ষেত্রে বিধবা হলেই আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হতো। প্রকৃতপক্ষে, এই তথাকথিত সতীত্ব, প্রেম, প্রীতি—এ সবই তো সমাজের সৃষ্টি। আশাকে লৌকিক অর্থে ব্যভিচারিণী বললেও আমরা কিন্তু কোথাও ব্যভিচারিণী দেখিনি। সংসার যদি করতেই হয় নিষ্কামভাবে সংসার করতে গেলে একজন নারীর জীবনে তার স্বামী যদি মরেই যায় অথবা নিখোঁজ হয়ে যায় সে আরেকটি স্বামী গ্রহণ করতেই পারে। কারণ সে প্রেমের অজুহাতে বিবাহ করেনি। জীবন ধারণের জন্য বিবাহ করেছে। এটাই তো নিষ্কাম জীবনের আদর্শ। কিন্তু স্বর্গের দেবীরাই মর্ত্যের বধূদের বুঝতে পারছেন না। জনান্তিকে একজন চটুল পাঠক প্রশ্ন করে—শাশুড়িরাই কি transform হয়ে দেবী হয়েছেন। আরও কথা হলো এই যে, করুণাদেবী আর কেউ নন, ঋষি বাল্মীকির করুণা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাল্মীকিকে করুণার মূর্ত ছবি হিসেবে এঁকেছেন। তারই অভিঘাতে বিভূতিভূষণের ঋষি বাল্মীকি চরিত্র। তাঁর মানসকন্যা সীতার আর এক নাম করুণা। কিন্তু সেই সীতা দেবীও রামায়ণে রামের ছন্দ অনুসরণ করেননি।

তিনি তাঁর সতীত্ব প্রমাণ করার জন্যে সর্বসমক্ষে পাতালে চলে গেলেন। আর অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁর সতীত্ব প্রমাণ করে তিনি অযোধ্যায় রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন না। অথচ সেই সীতা দেবী/করুণা দেবী আশার হৃদয়ে প্রেম নেই বলে অভিযোগ করছেন। সাধারণ পাঠক বোধহয় এই ধরনের করুণার প্রত্যাশী নয়।

পুষ্প বলে, যদি আশার মনে প্রত্যেকদিন ভালো অনুভূতি দেবার চেষ্টা করা হয়? দেবী বলেন, ধূসর মরুভূমিতে বীজ বুনলে কি হয়? যে চায় সে পায়। যে কেঁদে বলে— ভগবান আমাকে ক্ষমা করো। আমায় পথ দেখিয়ে দাও। সে পাপ-পুণ্য বুঝেছে তাই তার কাছে দেবতারা ছুটে যান। যে যা চায় সে তা পায়। যে বলে আমি ভগবানকে দেখব ভগবান তাঁকে দেখা দেন। সে যেভাবে চায় সেই রূপে ধরে ভগবান তাঁকে দেখা দেন।

সংশয়ী পাঠকদের প্রশ্ন : পাপ-পুণ্যের ধারণা তো নির্বিকল্প বা absolute নয়। সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে সে ধারণা ভিন্ন। আর মানুষের মনে যদি পুণ্য করার সংকল্প জাগে তবে তো পাপের ভয় তাকে সারাক্ষণ তাড়া করে।

দেবী যতীনকে বলেছিলেন, তাঁর পৃথিবীতে ঘন ঘন যাওয়া ঠিক নয়। কারণ পৃথিবীর ভাবরাশি তাকে পৃথিবীর দিকে টেনে নিয়ে যাবে। যতীন তবুও আশার কাছে যায়। আশাকে সাহায্য করার জন্য পুষ্পকে করুণা দেবীর কাছে যেতে বলে। পুষ্প জবাবে বলে এতে কোনও ফল হবে না। আশাবৌদির আচ্ছাদিত চেতন, আলো জ্বাললে কি হবে? ঢাকনার মধ্যে আলো সেঁধবে না। গীতা বলে, জ্ঞান সমস্ত মানুষের ভেতরেই আছে। কিন্তু অজ্ঞানের আবরণে সে আচ্ছাদিত। ঠিক যেমন ভ্রূণ অবস্থায় শিশু মায়ের পেটে আচ্ছাদিত থাকে। গীতার এই কথাটিকে পুষ্প অত্যন্ত সহজভাবে ব্যাখ্যা করে। আশাবৌদির স্তর হচ্ছে আচ্ছাদিত চৈতন্যের স্তর। তারপর মুকুলিত চৈতন্য ইত্যাদি। সবার ওপরে বিকশিত চৈতন্য যেমন বড়ো বড়ো সাধকদের।

ভবলোকের পথে যতীন আর পুষ্প চলেছে। সেখানে আত্মাদের নানান রকম রং। কেউ ধূসর বর্ণের, কেউ লাল মেটে সিঁদুরের রং। সাধারণত আত্মার রঙের কথা শাস্ত্রে বিশেষ দেখা যায় না। মহাভারতের অন্তর্গত বৃত্রগীতায় আত্মার রঙের কথা আছে। পুষ্প বলে আত্মাদের রং দেখে বোঝা যায় কে কোন্ স্তরে আছে। নীলবর্ণ আত্মা ক্বচিৎ দেখা যায়। নীলবর্ণের আত্মারা উর্ধ্বলোকের বাসিন্দা। পুষ্প আর যতীন কথা বলতে বলতে এক ভক্ত সাধকের আশ্রমে এসে পৌঁছল। পুষ্প যেমন স্বরলোকে তার ঘাট তৈরি করে রেখেছে তেমনি এখানে এক সাধু মন্দির করে রেখেছেন। আর মন্দিরের গর্ভগৃহে গোপাল মূর্তি। সাধু বৈষ্ণব। তিনি সর্বাগ্রে বললেন—বিগ্রহ দর্শন করে এসো।

যতীন প্রশ্ন করে—'এতো স্বর্গ। ভগবানের সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যাবে। মূর্তি পৃথিবীতে দরকার হতে পারে। এখানে কেন?' সাধু বললেন, 'আমি পৃথিবীতে এই বিগ্রহের পূজারি ছিলাম। বড় ভালোবাসি ওকে। ছেড়ে থাকতে পারি না। তাই এই মন্দির স্থাপন করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছি। সেবা আরাধনায় দিন কাটে বড় আনন্দে।'

সাধু বললেন, তাঁর বিগ্রহ জীবন্ত। মন্দির থেকে চঞ্চল মধুর সজীব কণ্ঠে কে বলে উঠল—ওখানে বসে বকবক না করে এখানে এসে আমায় একবার জল খাইয়ে যাও না বাপু। তেষ্টায় মলুম। সাধু চমকে উঠলেন। পুষ্প ও যতীন চমকে উঠল। সাধু জল নিয়ে মন্দিরের মধ্যে অদৃশ্য হলেন...সাধু বললেন—তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক। সপ্তগ্রামে বাড়ি ছিল তাঁর। সপ্তগ্রামে হরিদাস শিক্ষা দিয়েছিল ভক্ত চায় ভগবানের প্রতি ভক্তি। আমাদের তাতেই আনন্দ। মহাপ্রভু ভগবানে মিলিয়ে গেছেন। তিনি নারায়ণের অংশ। মাঝে মাঝে আমাদের ডাকে এই আশ্রমে উৎসব হয়। সেই উপলক্ষ্যে বড়ো বড়ো বৈষ্ণব আচার্য এমন কি জীবগোস্বামী, মীরাবাঈ পর্যন্ত আসেন। ওঁরা আরও উচ্চলোকে আছেন। অনেকে জীবকে শিক্ষা দিতে দু-একবার পৃথিবীতে নেমেছিলেন।

সাধু আরও বললেন, পৃথিবীর মতো জীবলোক আরও অনেক এবং অনেক রকম আছে। আশা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে করুণাদেবী বলেছিলেন, পৃথিবীর সংসারে দুঃখ-কষ্টে যাদের জন্ম-জন্মান্তরে শিক্ষা হয় না তাদের অন্যলোকে পাঠান হয়। সেখানে জীবন বেশি ধীর গতিতে এগিয়ে চলে। সাধু বলেন, বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত জগৎ আছে—সেখানে মানুষ পৃথিবীর চেয়ে অনেক দীর্ঘজীবী। যাঁদের উন্নতি হতে দেরী হবে জানা যাচ্ছে পৃথিবীতে তাদের এই সব ধীর প্রৌঢ় পৃথিবীতে পাঠান হয়। অনেকদিন সময় পায় বলে শেখবার ও শোধরাবার অবকাশ ও সুযোগ পায়। সেখানে পৃথিবীর হিসেবে যার যাট বছর বয়স সে সবে যুবক।

সাধু বলেন, সেসব জগতেও জীব শিক্ষার জন্যে উচ্চস্তরের আত্মারা নেমে যান, দেহ গ্রহণ করেন। পৃথিবীর থেকেও বেশি কষ্ট পেতে হয় তাঁদের সেসব খানে। সাধু, পুষ্প এবং যতীনকে নিয়ে বৃন্দাবনে চললেন আকাশপথে। যতীন এর আগে বৃন্দাবন দেখেনি। সাধু বৃন্দাবনে চার পাঁচটি বড়ো বড়ো গাছের ক্ষুদ্র বাগান দেখিয়ে বললেন—'ঐ দেখ বীরঘাট...এখানে মহাপ্রভু স্নান কোরে উঠে গোপালের দেখা পেয়েছিলেন।'

তারপরেই সেকালের ঝুলনো প্রদীপের আলোয় সুন্দর বিগ্রহের সামনে ওরা গিয়ে দাঁড়াল। যতীন অবাক হয়ে দেখল, দেহধারী দর্শকদের মধ্যে বহু অশরীরী দর্শক এসে দাঁড়িয়ে বিগ্রহের আরতি দর্শন করছেন। বৈষ্ণব সাধু একজনকে দেখিয়ে যতীনকে বললেন—কবি ক্ষেমদাস। উনি বৃন্দাবনের বড়ো ভক্ত। এই মন্দির এই কুঞ্জবন ছেড়ে থাকতে পারেন না।

আমরা এর আগে দেখেছি, যারাই মারা গেছে তারা পৃথিবী ছেড়ে অন্যলোকে চলে গেছে। কিন্তু এবার দেখছি, যারা মারা গেছেন তারা বিদেহী অবস্থাতেও অনেকে পৃথিবীকে আঁকড়ে আছেন। সাধু ক্ষেমদাসের সঙ্গে যতীনদের আলাপ করিয়েছিলেন। ক্ষেমদাস সাধুজীকে বললেন, 'আপনারা ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের পার্শ্বচর। আপনাদের মতো ভাগ্য আমি করি নাই। আমার কৃষ্ণ বিশ্বের বনে বাঁশি বাজিয়ে বেড়ায়।'

স্পষ্টত, কবির কাছে এই সংসার অরণ্য প্রকাশ এবং এই সংসার অরণ্যে কৃষ্ণের বাঁশি কবি শোনেন। তাই যখন যতীনদের উপদেশ দেওয়া হয় মর্ত্যে যেও না—মর্ত্যের ভাব বড় স্থূল। তখন সেই মর্ত্যেই ক্ষেমদাস প্রমুখ কবিরা থাকেন নিত্য বৃন্দাবন প্রত্যক্ষ করতে।

পুষ্প জিজ্ঞেস করে, রাধা কোথায়? কবি বলেন রাধাও তো কল্পনার সৃষ্টি। যে নারী ভালোবাসে সেই রাধা। যতীনের প্রশ্নোত্তরে ক্ষেমদাস বলেন, কালিদাসকে তিনি দেখেছেন। পৃথিবীর কালিদাস নয়—যে নিত্য মুক্ত কবি আত্মা কালিদাস রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই আত্মার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তিনি চিদানন্দময় অপ্রাকৃত আত্মা। নানা দেশে নানা প্রাকৃত দেহ ধারণ করে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আজ নাম কালিদাস, কাল চণ্ডীদাস পরে ক্ষেমদাস তাতে কী?

বৃন্দাবনের গোবিন্দ মন্দিরের আরতি বহুক্ষণ থেমে গেছে। মন্দিরের সামনে একটা হিন্দুস্থানী টাঙ্গাওয়ালা যাত্রীর সঙ্গে ভাড়া নিয়ে বকাবকি করছে। তার ওপাশেই মদনমোহনের মন্দিরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সাধুরা আজ সমবেত হয়েছেন। সেখানে পুষ্পের মতো নারীর স্নেহ বকুল ফুলের সুবাস। স্বর্গ ও মর্ত্য এখানে একই চিত্রকল্পে বিধৃত। একে কি সুররিয়ালিস্ট দর্শন বা Vision বলব?

পৃথিবীর হিসেবে দীর্ঘ দু'বছর কেটে গেল। হঠাৎ পুষ্প যতীনকে বলল, আশার খুব বিপদ। যতীনের উৎসাহে পুষ্প এবং যতীন অদৃশ্যভাবে আশার কাছে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে দেখল নেত্য মদ খেয়ে আশাকে যা ইচ্ছে তাই বলছে। তবে আশা চরিত্রে একটা Development চোখে পড়ে। যতীন সম্পর্কে নেত্য কোনো কথা বললে আশা সেটি সহ্য করে না। নেত্য বলে, তোর নিজের বিয়ে করা ভাতার কোনোদিন তোকে খেতে দেয়? আশা আধ-বসা অবস্থায় উঠে ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, খবরদার তিনি সগ্গে গিয়েছেন। তাঁর নামে কিছু বোল না।

পুষ্প পৃথিবীতে আর থাকতে পারছে না। সে যতীনকে বলল—চলো। কিন্তু যতীন আশাকে ছেড়ে যাবে না। অগত্যা পুষ্প বলল, আমি এখন আসি। ভোর হলে আসব। ইতিমধ্যে মাঝ রাত্তিরে নেত্য ঘুমিয়ে পড়েছে। আশাও প্রতিবেশীর বাড়িতে ঘুমোচ্ছে। যতীন মহাশূন্যে এসে তৃতীয় স্বর্গের পথ খুঁজে পায়নি। একটা অনির্দেশ্য শক্তি তাকে চুম্বকের মতো পাতাল তলাতল প্রভৃতি নরকের দিকে টেনে

নিয়ে যাচ্ছে। যতীন যেন ভীম আবর্তে তলাতল পাতালের অভিমুখে কোথায় চলেছে। তারপর চারদিক অন্ধকার। যতীন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

অনেকক্ষণ, অনেক যুগ কেটে গেছে। পুষ্পের ডাকে যতীনের চৈতন্য হল। পুষ্প এবং আর এক জন তাকে যেন ডাক দিচ্ছে। যতীন বলল—'আঁ্যা শিগগির চলে এসো। ওঁ কৃষ্ণ ওঁ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করো।' যতীন জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখল সামনে পুষ্প ও পুষ্পের মা। তারপর চারদিকে চেয়ে দেখে আরও অবাক হয়ে গেল। বিছানার সামনে মেঝের ওপর মলিন শাড়ি পরণে একটি মেয়ে। মেয়েটির কোলে একটি মৃত শিশু। সম্ভবত ছ'সাত মাসের। পুষ্প বলল—

> চলে এসো যতীনদা। চলো সব বলছি। তুমি পুনর্জন্মের টানে পড়ে পৃথিবীতে জন্মে ছিলে ছ'সাত মাস। ঐ তোমার মা। আজ আবার দেহ থেকে মুক্তি পেলে। এই মৃত শিশুই তুমি। কি বিপদেই না ফেলে দিলে আমাকে।

সত্যিকারের গল্প তৈরি হয় যখন গল্পকার তার গল্পের স্থান কাল পাত্র নির্দেশ করেন। তাই দেখা যায়, পুত্রহারা জননীর আকুল কান্না ছেড়ে যতীন তক্ষুণি চলে যেতে পারল না। পুষ্প যতীনকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীর ঝাপসা আকাশ ছাড়িয়ে এক সুউচ্চ পাহাড় চূড়ায় এসে বসল। ওরা যেন নির্মল দেবলোক থেকে পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে। যতীন এবার বোঝে মৃত্যু বলে তাহলে কোনও জিনিস নেই। এই তো সে মরে গেল শেষ রাত্রে। অথচ এখানে সে পর্বত শিখরে বহাল তবিয়তে সমাসীন। পুষ্প যতীনের মনের ভাব বুঝতে পারল। হাজার হোক যতীনদা পুরুষ মানুষ University-র ছাত্র ছিল। জিনিসগুলো চট করে ধরতে পারে।

যতীন আবার পৃথিবীতে ফিরে গেল। যার শিশু হয়ে সে জন্মেছিল সেই মাকে দেখতে। অল্পবয়সী মায়ের শাশুড়ি বললেন—বৌ কেঁদো না? দুটি খাও। তুমি তো অবুঝ নও। আবার হবে। এয়োস্ত্রী মানুষ। ভাবনা কি। কোল জুড়ে আবার হবে।

যতীন বলে জগতে যখন এত কষ্ট—তখন আমি সুখে থেকে কি করব পুষ্প? পৃথিবীটাই আমার ভালো। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানে জমি চাষ করি। স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াই, মাকে খাওয়াই। সব নিয়েই তো সংসার। চাষা যদি লাঙ্গল না চষবে, তাঁতি কাপড় না বুনবে, মজুর যদি তোমার আমার হয়ে না খাটবে তবে একদিন সংসার কেমন চলে চলুক তো। পুষ্প বলে পৃথিবীর মানুষ তুমি এখন আর নও। এই কথাটা তুমি ভুলে যাচ্ছ। পৃথিবীর মানুষ যখন ছিলে তখন যে কথাটা বলছ তা বললে মানাত। বিধাতার-নিয়মেই এই। পৃথিবীর জীবন থেকে এখানে আসতে হয়। সকলের জন্য কষ্ট করব বললেই তোমার শুনছে কে?

স্পষ্টত, একটি স্তরে দেবযান A novel of idea যেখানে দুটি idea-র মধ্যে সংঘাত। একটি idea-কে ভাষা দিচ্ছে পুষ্প এবং পার্থিব idea-কে ভাষা দিচ্ছে যতীন।

প্রসঙ্গত, যতীনের চরিত্রের Development হয়েছে। এখন সে আশার কথাই শুধু ভাবে না। মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা ভাবে। পুষ্প আর যতীন আকাশে তাকিয়ে দেখল সেই পথিক দেবতা, যিনি বহু কল্প আগে বিশ্বের শেষ সীমা দেখবেন বলে যাত্রায় বেড়িয়েছেন, তিনি আকাশ পথে যতীন পুষ্পর চোখের সামনে দিয়ে কোন্ গ্রহপুঞ্জের দিকে ছুটে গেলেন। যতীন ও পুষ্প করুণাদেবীর কাছে এল। করুণাদেবীকে তারা পথিক দেবতার কথা বলল। করুণাদেবী বললেন সেই পথিকদেবতা সম্ভবত কোনো নাস্তিক দেবতা। তিনি ভগবান বা ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। তবে মহাশক্তিধর বটে। করুণাকে বললেন, তিনি ঐ পথিক দেবতাকে চেনেন না।

করুণাদেবীর এই কথার legitimation খুব স্পষ্ট। নাস্তিক হলেই আমরা যাকে ঐশী শক্তি বলি, বিভূতি বলি, যার সাহায্যে কোনো ব্যক্তি গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটে যেতে পারে সেটা থাকবে না—এমন কোনও কথা নয়। করুণাদেবীর নির্দেশে পুষ্প আর যতীন চোখ বুঁজল। দেশ অতিক্রম করতে হল না। কালের ব্যবধান অনুভূত হল না। পুষ্প আর যতীন বুঝল তারা এক নতুন জাগয়ায় এসেছে। ওরা এক নিমেষে বিরাট আত্মা হয়ে গেছে। বাধা-বন্ধনহীন সর্ব সংস্কারমুক্ত দেবাত্মা। আর সেখানে এক অপূর্ব জ্যোতির্ময় দেবমূর্তি। পুষ্প তাঁকে একবার দেখেছে। করুণাদেবী সেই দেবমূর্তির সঙ্গে পুষ্প ও যতীনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কথা প্রসঙ্গে পথিক দেবতার কথা উঠল। সেই জ্যোতির্ময় তরুণ দেবতা বললেন, ওই পথিক দেবতা নাস্তিক নয়। তাঁর উপাসনাই হল ঐ পরিভ্রমণ।

আমাদের পৃথিবীতেও অনেক পর্যটক সাধু আছেন। তাঁরা কখনও এক স্থানে তিন রাত্রি বাস করেন না। চলাই তাঁদের সাধনার অঙ্গ। জ্যোতির্ময় দেবতা বললেন ঐ পথিক দেবতা পূর্বকল্পেই দেবত্ব লাভ করেছিলেন। তিনিও পুনর্জন্মের আকর্ষণকে ভয় করেন। পুনর্জন্মের আকর্ষণকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে দেবতা বললেন, যতীনের বারংবার পৃথিবীতে যাওয়া ঠিক নয়। যতীনের উচিৎ পৃথিবীকে এড়িয়ে যাওয়া।

যতীন প্রতিবাদ করে বলল, পৃথিবীতে জন্ম যদি হয়ই, যতীন দুঃখিত হবে না। পৃথিবীতে জন্ম নিলে কষ্টটা কী? দেবতা বললেন, যে জানে যে এই বিশ্বের সব কিছু এক বস্তু তার কাছে পৃথিবী ও স্বর্গ একই সুরে বাঁধা। কিন্তু সবাই তো তেমন করে পৃথিবীকে দেখতে পারে না। সাধারণ মানুষ ভূলোক, ভুবলোক, স্বরলোকে যাতায়াত করে। সেখান থেকে তারা পৃথিবীতে জন্মায় আবার মরে, আবার জন্মায়। চাকার মতো ঘুরছে এই জন্ম মৃত্যুর আবর্ত।

দেবতা, যতীন, পুষ্প, করুণাদেবী চললেন পৃথিবীতে—বাংলাদেশে। সেখানে গঙ্গা চোখে পড়ল। মুর্শিদাবাদের আম বাগান। দেখা গেল অনেক ধূসর রঙের আত্মা

সেখানে এ বাড়ি সে বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরছে। দেবতা বললেন, ওরা পৃথিবীতে জন্ম নেবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৃষ্ণাই পুনর্জন্মের কারণ।

'তৃষ্ণা' কথাটি বৌদ্ধ দর্শনের কথা মনে করিয়ে দেয়। বুদ্ধদেব আত্মায় বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু তিনি জন্ম-মৃত্যু—পুনর্জন্মের চক্রে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে তৃষ্ণা বা তন্‌হাই এক জন্ম থেকে আরেক জন্মে যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুধর্মের জীবাত্মা ও বুদ্ধদেবের তৃষ্ণার কোনো গুণগত প্রভেদ নেই। সামনে সুন্দর একটি পুরুষ দেখলে আমরা বলতেই পারি— আহা কী সৌন্দর্য দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি জীবাত্মা বোধহয় ততদিনই জীবাত্মা যতদিন তার মধ্যে তৃষ্ণা থাকে। সুতরাং জীবাত্মা পুনর্জন্ম নেয় বলাও যা, তৃষ্ণা পুনর্জন্ম নেয় বলাও বোধহয় তাই। দেবতা, করুণাদেবী, পুষ্প, যতীন এসে পৌঁছল বাংলাদেশের ওপরে হিমালয়ে। সেখান থেকে তিস্তা দেখা যায়। দেবতা বললেন, ভূলোক, ভূবলোক এবং স্বরলোকের মধ্যে যে আত্মারা ঘোরাফেরা করে তাদের পুনর্জন্মের সম্ভাবনা প্রবল। এই মানব আবর্তন পেরিয়ে স্বরলোক ও জনলোক। অপলোক ও সত্যলোকের যে পথ সেই পথ দেবযান পথ।

আমরা এতক্ষণ বিভূতিভূষণের 'দেবযান' গ্রন্থটিকে নিয়ে আলোচনা করছি। কিন্তু গ্রন্থের নামকরণ নিয়ে প্রকাশ্যে ভেবে দেখিনি। যান শব্দের অর্থ হল 'Transport'। বৌদ্ধরা হীনযান এবং মহাযান—দু'ধরনের যানের কথা বলেছেন। যাঁরা কেবল নিজের তৃষ্ণার নির্বাণ চান তাঁরা হীনযানে চলেন। যাঁরা অস্তিত্বের প্রতিটি অনু-পরমাণুর তৃষ্ণার নির্বাণ কামনা করেন তাঁরা মহাযানে চলেন। 'সৎধর্মপুণ্ডরিক' গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধ বলেন, হীনযান মহাযান আলাদা কিছু নয়। মানব আবর্তের বাইরে বেরিয়ে এসে যারা আধ্যাত্মিকতার পথের পথিক তাঁরা সবাই দেবযানে চড়েন। যদিও এই আধ্যাত্মিকতার পথ এবং পথের যান বহু প্রকার। এরোপ্লেন যেমন অনেক প্রকারের হতে পারে—Boeing, Jambo, Jet ইত্যাদি।

জ্যোতির্ময় দেবতা বললেন, মর্ত্যলোকেরও পরপারে ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে যে ব্রহ্মলোক সেখানে যাঁরা যান ভগবানের সঙ্গে তাঁরা এক হয়ে যান। মানব আবর্তে তাঁরা আর ফিরে আসেন না। যতীন প্রশ্ন করে—এরই নাম কি মুক্তি? জ্যোতির্ময় দেবতা বলেন—একেই ভারতবর্ষের ঋষিরা মুক্তি বলে। খেয়াল রাখতে হবে জ্যোতির্ময় দেবতা সত্যলোকের পরপারে ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে ব্রহ্মলোককে স্থাপনা করেছেন। তাঁর কথা ঋক্‌বেদের পুরুষ সূক্ত মনে করিয়ে দেয়। পুরুষ সূক্তের বিষয়বস্তু সহস্র শীর্ষ পুরুষ এই অনাদি, অনন্ত, অমধ্য অস্তিত্বকে দেখেছি। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সীমা খুঁজছেন। সেই ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে ব্রহ্মলোক।

জ্যোতির্ময় দেবতা বললেন, ব্রজলোকে কেউ উপনীত হলে ভগবানের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন : সেই ভগবানই তো এই ব্রহ্মাণ্ড এবং

ব্রহ্মাণ্ডের জীবকূল হয়ে লীলা করছেন। তাই ভগবানের সঙ্গে এক হলেও সত্যিই কি কোনো দিন নিস্তার পাওয়া যাবে? জ্যোতির্ময় দেবতা বললেন, এক কবির কথা। তিনি ভ্রাম্যমান কবি। পাহাড়ে বনে বৃক্ষলতায় বসে রূপের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। তবে কি তিনি পৃথিবীতে আসক্ত নন? না, তাঁর তৃষ্ণা পার্থিব তৃষ্ণা নয়? তিনি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ধ্যান করেছেন। তিনি জনলোকের অধিবাসী। তিনি নিজের আনন্দের জন্য পৃথিবীতে নেমে এসেছেন এবং বহু লেখক ও কবিকে অদৃশ্যভাবে প্রেরণা দান করেন।

অর্থাৎ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিরা আপনার অজ্ঞাতসারে ঐ মহাকবির কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করেন। যেমন, গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী Muse-রা কবিদের ওপর ভর করেন। জ্যোতির্ময় দেবতা বলেন, পৃথিবীর সব দেশে সব ঈশ্বরে ভক্তিমান লোক মানব আবর্তকে জয় করতে পারে না। বিশ্বের যিনি কর্তা তিনি কোনো বিশেষ দেশ বা বিশেষ জাতিকে কৃপা করতে পারেন না।

ইহুদিরা মনে করেন, তাঁরাই ঈশ্বরের নির্বাচিত বীজ। বৈষ্ণবরা নামে জপ করেন শুধু। ভক্তি দিয়ে তাঁরা ভগবানে আত্মস্থ হয়ে দেবযান প্রাপ্ত হন। জ্ঞানীরা ধ্যানদৃষ্টিতে ব্রহ্মলাভ করেন। নাম ও উপাধি পরিত্যাগ করতে পারলে লোক ব্রহ্মলাভ করতে পারে।

ওরা চারজনে মানস সরোবর পৌঁছলেন। কৈলাসে সিদ্ধযোগীরা থাকেন। এঁরা নির্জনতা পছন্দ করেন। কারণ নির্জনতাই এঁরা শক্তি অর্জন করেন। ব্রহ্মজ্যোতি এই অবস্থায় এঁদের মধ্যে প্রবেশ করে। জ্যোতির্ময় দেবতা পুষ্পকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি আমি ভিন্ন কোথায়? নিজেকে ছোটোভাব কেন? তাই তো ছোটো হয়ে থাক। বড় হও, বীর্যবান হও। সচেতন হয়ে যদি তোমরা আমাদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াও বিদ্রোহের পথে সেও ভালো।' 'নায়াম আত্মা বলহীন লভ্যঃ।' রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু—সবাই তো ঈশ্বরের বিরোধিতা করে মুক্তিলাভ করেছে। কিন্তু যতীন পাঠকের হয়ে প্রশ্ন করে—'এই যে যুদ্ধ জাতিতে জাতিতে রক্তারক্তি এও কি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী?' জ্যোতির্ময় দেবতা বললেন—কি হয় যুদ্ধে? মানুষ মারা যায়।...এই তো? কিন্তু মৃত্যুর অসত্যতা এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ?

যাঁরা জানেন, মানুষ দেহ নয় আত্মা এবং আত্মার মৃত্যু নেই—তাঁরা মৃত্যুকে ভয় পাবেন না। কিন্তু আজকে আনবিক যুদ্ধের দিনে মর্ত্যের সব মানুষই এমনকি গোটা পৃথিবীটা ছাই হয়ে যেতে পারে। সেখানে ব্যক্তির মধ্যে শক্তিমান হওয়ার সুযোগ কোথায়? আর পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে প্রেম ও করুণা পৃথিবীতে প্রচারের অর্থ কি? এমন কি একটা মানুষই বা অপ্রাকৃতভাবে কেন মরবে? তাহলে প্রেম ও করুণার শক্তি কোথায়?

জ্যোতির্ময় দেবতা বলেন জীব যতক্ষণ না ভগবানের খোঁজ করে ততক্ষণ ভগবান তার কাছে নিজের ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন না। শক্তি মৈত্রী উপলব্ধির জন্যে জীবকে প্রস্তুত থাকতে হয়। যোগ্যতা অর্জন করতে হয় তবেই জীব ঈশ্বরের কাছ থেকে শান্তি ও মৈত্রী লাভ করবে। পুনশ্চ, ভগবানের ধৈর্য অপরিমেয়। পৃথিবীর মানুষ যদি সংসারের দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিয়ে শান্তি, মৈত্রী ও করুণার কথা না শিখতে পারে তাহলে তাকে অন্য পৃথিবীতে জন্মাতে হবে। পুষ্প, যতীন, দেবী এবং ঐ তরুণ দেবতা সেই Slow Earth দেখলেন। সেখানে মানুষ পৃথিবীর হিসেবে তিন শ' বছর বাঁচে। সেখানে সব কাজ ধীরে ধীরে হয়। একটি হ্রদে কতগুলি সুসজ্জিতা নর-নারী সেখানে নৌকোয় প্রমোদবিহার করছিল। দেবতা বললেন, ক'বছর এরা এমনি ধারা জলবিহার করছে জানো? তোমাদের পৃথিবীর মাপের তিনটি বছর। তাড়াতাড়ি নেই এদের। এখানে বাল্য দীর্ঘ, যৌবন দীর্ঘ। তাই সৌরমণ্ডলের পৃথিবীতে যা মানুষ শিখল না সেটা ঐ Slow Earth-তে শিখিবে।

ঠিক কথা। তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি আনবিক যুদ্ধ হয় এবং সৌরমণ্ডলের পৃথিবীটা যদি হঠাৎ একটা কাঠ কয়লায় পরিণত হয় তাতেও তা হলে কোনো আপত্তি নেই। আমাদের ছ'শ কোটি লোক ঐ Slow Earth-এ জন্মাবে এবং শক্তি ও মৈত্রীর কথা শিখবে। অতএব তৃতীয় মহাযুদ্ধ যখন যে কোনোদিন ঘটে যেতে পারে এই ধরনের মিথ মানুষের মৃত্যুতে হয়তো কিছু সান্ত্বনা দেবে। কিন্তু তথাকথিত বাস্তবে আমাদের এই সৌরমণ্ডলের পৃথিবীটাই একমাত্র মহাকাশ যান যেখানে আমরা খেয়ে পরে, শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারি। এই মহাকাশ যাত্রিটি নষ্ট হয়ে গেলে আমরা নেমে আরেকটি মহাকাশযানের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারি না।

করুণাদেবী বললেন, ঐ জ্যোতির্ময় দেবতাই গ্রহদেব বৈশ্যবন। গ্রহদেব বললেন, বুদ্ধি দিয়ে ঈশ্বরকে বোঝা যায় না। যেহেতু সেই ইন্দ্রিয় মানুষের নেই। তবে শুধু তাঁকে ভালোবাসা দিয়ে মেন ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করে এমন ভূমি লাভ করা যায়, যে ভূমি থেকে তাঁকে অনুভব করা যায়।

দেবতাদের সান্নিধ্যে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরে ঘুরে বেরিয়ে যতীন ও পুষ্পের মনে বারে বারে প্রশ্ন ওঠে এই অনন্ত বহু ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাকে কি জানা যায়? আমরা এখনও অবধি যত মহাত্মা ও দেবতার সঙ্গে দেখা করেছি তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন তাঁরা কেউই ঈশ্বরকে তাঁর স্বকীয় মহিমায় দেখেননি। যদিও তাঁর অবস্থিতি উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু অন্যপক্ষে, উপনিষদের ঋষি বলেছেন 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্।' গ্রহদেব উপনিষদের ঐ বাণী থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন তাঁকে জানলেই লোকে মৃত্যুকে উত্তরণ করতে পারে। যতীন ও পুষ্প স্বরলোকে নিজেদের বাসায় ফিরে এল। যতীন আবার পৃথিবীতে যেতে চায়। তার যে মা ছ'মাসের শিশু সন্তান যতীনকে হারিয়েছে তার কাছে।

ঘরের মধ্যে বিছানা পাতা; তাতে যতীনের সেই তরুণী মা আধ-ময়লা লেপ কাঁথা গায়ে শুয়ে ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। শুধু এখানে নয়, পাশের বাড়িতেও তাই। জানলার কাছে ছোটো তক্তপোশে আরেকটি বউ শুয়ে জ্বরে এপাশ-ওপাশ করছে। তার পাশে দুটি ছোটো ছেলে। জ্বরে ভুগছে তারাও। ম্যালেরিয়া হয়েছে। অপুষ্টি রোগ গ্রাম বাংলার চোখে-মুখে। যদিও দেবতারা বলেন রোগ-দুঃখ-কষ্ট দিয়ে মানুষকে তাঁরা মুক্তি পদযাত্রী হিসেবে তৈরি করছেন। পাঠক মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে গ্রাম বাংলার মানুষের কি কর্মফল এমনই ছিল যে তারা অপুষ্টিতে, ম্যালেরিয়ায় ভুগবে সর্বত্র।

যতীন যখন তার মায়ের কাছে তখন পুষ্প পাশের বাড়িতে আরেকটি বউ-এর কাছে গেল। পুষ্প ফিরে এল। যতীন জিজ্ঞেস করল, পাশের বাড়ির বউটি কেমন? পুষ্প হেসে বলল, বউটির চরিত্র ভালো না। পুষ্প এখন যে কোনো মানুষের মনের চিন্তা পড়তে পারে। পুষ্প বলল যে, পাশের বাড়ির বৌটি চিন্তা করছে ওর একজন প্রণয়ীকে। নাম তার হরিপদ। এই দুপুরে নদীর ঘাটে গিয়ে তার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করার কথা ছিল। জ্বর এসেছে ঠেসে দুপুরের আগেই। এক অর্থ বলা যায় বিভূতিভূষণের ‘দেবযান’ বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন Situation-এর আশ্চর্য মন্তাজ। পৃথিবী-উত্তর বিভিন্ন লোককে আমরা যারা কুসংস্কারসম্পন্ন পাঠক হয়তো সত্য ভাবতে পারি। অন্যথায় Enlightened পাঠকরা সেগুলোকে মনোজগতের বিভিন্ন স্তর হিসেবে ব্যাখ্যা করবেন। সে যাই হোক স্বপ্নের জগতেরও বিভিন্ন স্তর এই গ্রন্থে রয়েছে, এবং তার একেকটি Situation-এর সঙ্গে বাস্তব রণ-রক্ত সফলতার জগতের Situationগুলোকে আশ্চর্যভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আমরা যখন দেবতাদের কথা শুনি তখন তমসার পরপারে মহান্ পুরুষকে উপলব্ধি করার বাসনায় মোহিত হয়ে যাই। আবার যখন জ্বালা-যন্ত্রণার পৃথিবীতে আসি তখন বাস্তব জীবনের একটা পরকিয়া প্রেমের ছবি আমাদের আকৃষ্ট করে। মেয়েটির জ্বর হয়েছে। তাই সে প্রিয়তমের সঙ্গে দেখা করতে পারল না। জ্বরের মধ্যেও সে কিন্তু গোপনে তার দয়িতের সঙ্গে দেখা করতে পারেনি, সেই কথাটাই ভাবছে। এর ফলে চরিত্রটি সজীব পৃথিবীর চরিত্র বলে মনে হয়। নীতিবাগীশরা কি বলবেন জানি না। কিন্তু এই চরিত্রগুলো আমাদের আকৃষ্ট করে। পৃথিবীর জীবন যেমন আমাদের মোহিত করে রেখেছে। প্রেম এবং করুণা যদি এই চিত্ত বিক্ষেপণে সাহায্য না করে তাহলে প্রেম ও করুণার মূল কি?

যদিও তৃতীয় স্তরের বাসিন্দা পুষ্প মেয়েটিকে ভালো নয় বলে চিহ্নিত করেছে। যতীন তার মায়ের শিয়রে বসে তাঁর মনের বাঁচার উৎসাহ গড়ে তুলেছে। তিনি খানিকটা সুস্থ হয়েছেন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের একটা Situation বিভূতিভূষণ তুলে

ধরেছেন। তাঁর স্বামী ৬০ টাকা money order পাঠিয়েছেন। ৬০টি টাকা যতীনের মায়ের কাছে ৬০টি মোহর। স্বামী পুজোয় আসতে পারবেন না। আফিসে কাজ। পুষ্প যতীনের মায়ের মন পড়ে বুঝল, যতীনের মা সতী-সাধ্বী। সে অলক্ষ্যে আশীর্বাদ করল, তাঁর স্বামী পুজোর সময় অবশ্যই আসবে।

যতীন অবশ্য সংসারকে এখন দূর থেকে বুঝতে পারে। এক শুঁয়োপোকা কাঁদছিল তার ভাই মারা গেছে বলে। একটা লোক এসে বলল, প্রজাপতিটাকে দেখো। তোমার ভাই মরেনি—প্রজাপতি হয়ে গেছে। সংসারে মৃত্যু বলে কিছু নেই। আমাদের অজ্ঞানতা থেকে মৃত্যুর ধারণার উৎপত্তি। তাদের স্বর্গের বাসায় ফিরে যাওয়ার সময় যতীন ও পুষ্পের পথে পথিক দেবতার সঙ্গে দেখা হল। পথিক দেবতা বললেন, সৌরমণ্ডলের পৃথিবীতেই শুধু জীব নেই। অগণিত নক্ষত্রলোকে অসংখ্য গ্রহ বর্তমান; যেখানে অগণিত শ্রেণির জীব বাস করছে। সেই পথিক দেবতা ওদের চক্ষের পলকে এক নতুন জগতে নিয়ে গেলেন।

তারা এ কোথায় এসেছে—এক বিরাট অগ্নিমণ্ডল তাদের সামনে—সেই অগ্নিমণ্ডলের মধ্যে বহু লক্ষ বিশালকার বলয়ে যে লক্ষ কোটি মন বিগলিত হচ্ছে। পথিক দেবতা বললেন, এই হল রুদ্রের বাম মুখ। বেদের ঋষিরা রুদ্রের দক্ষিণ মুখ, দক্ষিণ বাহু প্রার্থনা করেছেন যা স্নিগ্ধ এবং মঙ্গলময়। এই রুদ্ররূপই অর্জুন দেখেছেন গীতার একাদশ অধ্যায়ে। দেবতা বললেন, বিশাল বিশ্বের রূপ সবাই সহ্য করতে পারে না। দেখতে চায়ও না। ভগবান তাকেই এসব দেখান, যে বিশ্বের বিরাটত্ব দেখে ভয় পাবেন না।

এক অর্থে দেবযানে, গীতার একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন যে বিশ্বরূপ দেখেছেন তাকেই যেন পুষ্প আর যতীনের লোকোত্তর জগতের পরিক্রমা; Detail-এ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

পথিক দেবতা হেসে পুষ্প ও যতীনকে বললেন, শুধু বিশ্বদেবের মোহন মূর্তিই দেখবে, তাঁর করাল রূপ দেখলে ভয় পাবে কেন? ঋষি বলেছেন, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আবরণ সমেত জ্বলছে। তারই এক ঝলক পুষ্প ও যতীন দেখল। বিশ্বের মোহন রূপ যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, ধ্বংসের রূপকেও যদি সেইভাবে মেনে নিতে পারি তাহলে তো সমাজে প্রেম ও ঘৃণা, সত্য ও অসত্যের, পাপ ও পুণ্যের কোনো প্রভেদ থাকে না। কোনো জীবনধারাই কোনো জীবনধারার চেয়ে উন্নত নয়। হতে পারে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পরে আরও অন্যান্য জগৎ আছে। ভুবলোক, স্বরলোক, মহোলোক ইত্যাদি। কিন্তু স্বরলোক বা জনলোকের জীবন যাত্রা এই সংসারে জীবন-যাত্রার চেয়ে উন্নততর একথা আমরা কোন্ জোরে দাবী করব?

পথিক দেবতা বলেন, এমন অনেক জগৎ আছে যেখানে তাঁর প্রবেশাধিকার নেই। আর তিনি মহাবিশ্বের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা ছুটে বেড়ান। কারণ এটাই তাঁর তপস্যা। তিনি সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টাকে সম্ভোগ করেন।

পথিক দেবতা যতীন ও পুষ্পকে এমন গ্রহের কথা বললেন, যেখানে জীবে জীবে যুদ্ধ, রক্তপাত নেই, অনেক জাতি নেই। ভেদবুদ্ধি অত্যন্ত কম। সহজে খাদ্য মেলে। যেখানে অল্প সময়ের মধ্যে বেশি কাজ করতে হয়। কাজেই আলস্যের স্থান নেই। এসব কথা শুনে পুষ্প ভাবে কোনো এক সুদূর জন্মান্তরে কোনো আদর্শ গ্রহলোকে যদি সে জন্ম নেয়; তাহলে নীল জ্যোৎস্নায় শৈলারণ্যে, উপত্যকার সানুদেশে সে হাত ধরাধরি করে বেড়াবে যতীনদার সঙ্গে।

পুষ্প ও যতীন আবার ফিরে গেল। গভীর রাত্রি কলকাতায়। নেত্যনারায়ণ ওকে ফেলে আজ মাস চারপাঁচ হল চলে গেছে দেশে। আশার মনে নিরাশার অন্ধকার ছেয়েছে তার বড়জোর দশটা দিন। এখন আশার বাড়িওয়ালী আশাকে নানা রকম উপার্জনের ইঙ্গিত করছে। এক ব্যবসাদার তাকে দেখেছে দোতলার ছাদ থেকে—আশা যখন ওদের বাসায় তেতলার ছাদে কাপড় তুলতে গিয়েছিল। পাশের একটা গভীর খোলা জানলা দিয়ে যতীন দেখল কয়েকটি ভদ্রলোক সাজেপোশাকে বেশ অবস্থাপন্ন বলেই মনে হয় একটি ঘরে বসে তাসের জুয়া খেলছে। টুসু বলে একটি মেয়েকে দু'তিনবার ডাকলে সে প্লেটে কতগুলো কাটলেট নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দেয়। পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সের একটি লোক একটি মিনতির সুরে বলে আমার দুহাত বন্ধ। মুখের সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে যাও টুসু। যতীন ভাবে আশাকে কীভাবে রক্ষা করা যায়। পুষ্প বলে আশাকে এখন কোনোভাবে রক্ষা করা যাবে না, তাকে তার কর্মফল ভোগ করতে হবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে—'হে ঈশ্বর। এই হতভাগিনী আশাবৌদির মঙ্গল হোক।'

যতীন তাকে নিয়ে যাতে পুষ্প উচ্চতর স্তরে যায় সেজন্য আবদার করল পুষ্প শূন্য পথে অনেক ঊর্ধ্বে উঠে এল যেখানে উচ্চলোকের জ্যোতির্ময় অধিবাসীদের যাতায়াতের পথ। তারপরেই এক অদ্ভুত দেশ। সেখানে বন আর পাহাড়ের মেলা। বনকুসুমের অজস্রতা। ঐখানেই একটা হ্রদের ধারে লতাবেষ্ঠিত একটা গৃহ। যেখানে একজন সৌমমূর্তি পুরুষ ঘরের মধ্যে বসে। তিনি পুষ্প আর যতীনকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে বললেন কোথা থেকে আসছ?—যতীন বলল—তৃতীয় স্তর থেকে আসছি। ভদ্রলোক বললেন—তাহলে তো তারা ভদ্রলোক ঘরবাড়ি কিছুই দেখতে পেল না। ভদ্রলোক যে লোকে আছেন সেটি মহলোক।

মহলোক একটা স্তর—এটা বিশেষ অবস্থাও বটে। আমি বাঙালি জাত কেরাণী। পশ্চিমবাংলা থেকে আমেরিকা যেতে পারি। আমেরিকা একটি পুন্য স্থান। এই

স্থানান্তরের জন্য আমার মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের দরকার হয় না। কিন্তু স্বরলোক থেকে মহলোক যেতে হলে মহালোকের উপযুক্ত মানসিক অবস্থা দরকার না হলে আমি মহলোক প্রত্যক্ষ করতে পারব না। কথোপকথনে বোঝা গেল পুষ্পের মানসিক অবস্থা মহোলোকের উপযুক্ত। কথায় কথায় ভদ্রলোক বললেন, আড়াই হাজার বছর আগে তিনি পৃথিবীর অধিবাসী ছিলেন। সেই হল তার শেষ জন্ম। সেবার তিনি গ্রামে ছিলেন। তার আগে দুটো জন্ম তিনি ভারতবর্ষে এবং একটা জন্ম তিনি মিশরে কাটিয়েছেন। প্রশ্ন করায় তিনি জবাব দিলেন, তিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন না। ভগবান অচিন্ত্যনীয়। যেভাবে কল্পনা করে তাকে সেইভাবে তিনি দেখা দেন। সবই তার মূর্তি। এই গাছপালা এই বন এই ভূমি মেয়েটি অতএব তার কোন নিত্য মূর্তি নেই।

যতীন বলল, পৃথিবীতে বহুদিন যাননি? ভদ্রলোক বললেন—বসন্তকালে পৃথিবীতে তিনি মাঝে মধ্যে যান। জ্যোৎস্না রাতে নীল নদীর তীরে তিনি ভগবানের ধ্যান করেন। যতীন প্রশ্ন করে পৃথিবীর মানুষের কর্তব্য কী? ভদ্রলোক বলেন প্রেম। কিন্তু পৃথিবী প্রেমের বাণী শোনবার জন্য প্রস্তুত হয়নি। পৃথিবী থেকে সত্য বিদায় নিয়েছে। পৃথিবীর এখনকার দর্শন হচ্ছে খাওয়া পরার দর্শন। মানুষের দেহ ধরে ভগবান বহুবার একথা বলেছেন। কিন্তু কে শুনছে? জোর করে মানুষের ওপর কোনো সত্য, কোনো বাণী চাপান যায় না।

ভদ্রলোক পুষ্প আর যতীনকে নিয়ে নিমেষে পৃথিবীতে নেমে এলেন। রাভি নদীর তীরে পাঞ্জাব প্রদেশে গাছের তলায়—একটি তরুণ যুবক ধ্যানমগ্ন। ইতিমধ্যে আকাশপথ আলোর রেখা ধরে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ ঐ ধ্যানরত যুবকের পাশে এসে দাঁড়ালেন। পুষ্প ও যতীন সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল উনি কে? জনলোক, মহলোকের ব্যক্তিদের পৃথিবীতে আসতে কষ্ট হয়। কিন্তু ঐ জ্যোতির্ময় পুরুষ সত্যলোকের প্রাণী। তিনি সত্যপ্রিয় ভগবদভক্ত যুবকটিকে প্রেরণা দিতেই তাঁর কাছে আসেন। ভদ্রলোক বলেন, অতীতে পৃথিবীতে এই রকম এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ ঘটে; তার দশ জন্মের সাধনা এক জন্মেই সফল হয়েছিল।

ভগবানের কৃপা না হলে সিদ্ধিলাভ হয় না। ভদ্রলোকের ইচ্ছা একবার পৃথিবীতে দেহ ধারণ করবেন, প্রেমের বাণী প্রচার করার জন্য। কিন্তু দেহ ধারণ করলেই বিস্মৃতি আসে। অন্য দিব্য পুরুষরা তখন নানাভাবে জাতককে মনে করিয়ে দেয়, তার পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য ভোগ নয়। গোরক্ষনাথ একবার মায়ার সংসারের শরীর পেয়েছিলেন। তখন তাঁর শিষ্য মীননাথ ঢাক বাজিয়ে গোরক্ষনাথের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য মনে করিয়ে দেন।

ভারতবর্ষের কিছু কিছু মনীষী বলেন, ত্যাগ না হলে মুক্তি হয় না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'ভোগেন মোক্ষ সাধনম্'। ভোগের মধ্য দিয়ে তথাকথিত ভোগের আসক্তি চলে যায়। বৈরাগ্য আসে। যিনি সত্যিকারের ত্যাগী, তিনি জানেন না—তিনি ত্যাগ করেছেন। যিনি ত্যাগী তাঁর কাছে ত্যাগেই ভোগের আনন্দ। জন্মান্তরের মধ্যে হয়তো এই ধরনের ত্যাগ আত্মার অবিনশ্বরতাকে প্রমাণ করে।

আলোচনার সমাপ্তিতে এসে বলা যায়, বিভূতিভূষণের কলম অনেক সময় ক্যামেরার মতন কাজ করে। তিনি এমনভাবে ঘটনাকে তুলে ধরেন, যেন মনে হয় ক্যামেরা নিয়ে প্রত্যেকটি বিষয় আমাদের সামনে উপস্থাপন করছেন। তাই আশার আত্মহত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করি অনেকটা স্লো-মোশন টেলিফিল্মের মতো। এখানে বিভূতিভূষণ 'Ominiscient narrator' নন। তিনি যা ঘটেছে তা আনুপূর্বিক দেখাচ্ছেন; যেন বর্তমানে আমরা চোখের উপর দেখছি। সিনেমায় সবকিছু প্রত্যক্ষ বর্তমান, অতীতের কাহিনিও প্রত্যক্ষ বর্তমান হয়ে যায়। সেই অর্থে বিভূতিভূষণের 'দেবযান' সিনেম্যাটিক, ফিল্ম স্ক্রিপ্ট যেন।

‘কেদাররাজা’ : এক গ্রাম্য ভূস্বামীর আখ্যান

শৈবাল কুমার নন্দ

বিভূতিভূষণের উপন্যাস বলতে এক নিঃশ্বাসে যে নামগুলো উচ্চারিত হবে (‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’, ‘আরণ্যক’, ‘দেবযান’, ‘ইছামতী’, ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’ বা ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ , ‘কেদাররাজা’ সেগুলোর মধ্যে পড়ে না। বস্তুত, ‘কেদাররাজা’ উপন্যাসটি সাধারণ পাঠকসমাজে সেরকম পরিচিত বা বহুপঠিত নয়। ‘পথের পাঁচালী’ বা ‘অপরাজিত’ যেমন সত্যজিতের চলচ্চিত্রায়নের ফলে আন্তর্জাতিক পরিসরেও বিস্তৃত বা রবীন্দ্র পুরস্কার পাওয়ার জন্য ‘ইছামতী’ বা নিছক প্রকৃতি বর্ণনার উপন্যাস হিসেবে ‘আরণ্যক’ বা অন্য জগতের, অন্য দর্শনের কথা বলার জন্য ‘দেবযান’ যেমন পাঠকসমাজে মোটামুটি পরিচিতি লাভ করেছে ‘কেদাররাজা’ তেমন নয়। একান্ত বিভূতিভূষণ-প্রেমিক পাঠক বা গবেষক ছাড়া ‘কেদাররাজা’-র মতো উপন্যাস খুব কমজনেই হয়তো পড়েছে বা মনে রেখেছে। বিভূতিভূষণের অন্যান্য উপন্যাসগুলোর মতো এ উপন্যাসেও কিছু সাধারণ বিভূতিভূষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—সহজ-সরল প্লট, গ্রাম্য প্রকৃতির বর্ণনা, শুভ-অশুভের দ্বন্দ্ব, মূল চরিত্রের মধ্যে শিল্পীসত্তার বিকাশ, অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত উপাদানের প্রভাব (যেটা এই উপন্যাসের একটা অন্যতম দিক), কিছুদিন শহর বা অন্য জায়গাতে থাকার পর আবার শেষে জন্মভিটা বা গ্রামের দিকেই ঝোঁক ইত্যাদি। গ্রাম্য সমাজ-অর্থনীতি, গ্রামীণ মানসিকতা, সাধারণ মানুষের হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, লোভ, লালসা, ভালোভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার স্বাভাবিক ইচ্ছা, চার দেওয়ালের সংকীর্ণ সীমা ভেঙে বাইরের টানে ঘুরে বেড়িয়ে আসার ইচ্ছা, গান-বাজনা-মজলিশ-আড্ডা ইত্যাদির মধ্যে ডুবে থেকে অভাব-অভিযোগ, অপ্রাপ্তি, অপূর্ণতাকে ভুলে থাকার চেষ্টা ইত্যাদি টুকরো টুকরো খণ্ডচিত্র সাজিয়েই কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ ‘কেদাররাজা’-কে গড়ে তুলেছেন। কালজয়ী উপন্যাস না হলেও এই উপন্যাস এক অর্থে সাধারণ মানুষের কথাই বলে—পূর্বপুরুষের আভিজাত্য, ধনসম্পদের জৌলুস-স্মৃতিতে মগ্ন হয়ে থাকা এক খেয়ালি, শিল্পীপ্রাণ মানুষ ‘কেদার’, যাঁকে তাঁর গ্রাম গড়শিবপুরের অনেকেই ব্যঙ্গ করে ‘কেদাররাজা’ বলে। সেই মানুষ, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা-হতাশা,

বাদ্যশিল্পী (ভালো বেহালা বাজান) হিসেবে কিছু করতে চাওয়ার স্বপ্ন দেখেন তিনি। সংসারে একমাত্র অকালবিধবা মেয়ে শরৎকে নিয়ে পূর্বপুরুষদের বিশাল, ভাঙা বাড়িতে ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা গড়ের মধ্যে গ্রামের বাইরে থাকেন কেদাররাজা। বস্তুত, এ উপন্যাস এক অর্থে হতাশা-সীমাবদ্ধতা জয় করে মানুষের পূর্ণতা—আশার পথে এগিয়ে চলার গল্পও শোনায়।

এ উপন্যাসের প্লট সরল ও সহজ। আখ্যানের মধ্যে কোনো জটিলতা, টানাপোড়েন বা মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত নেই। গড়শিবপুর নামঙ্কিত পল্লিগ্রামেই এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্ররা আবর্তিত। পরে গল্পের প্রয়োজনে আর মাত্র দুটি জায়গাতে কুশীলবদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে—কলকাতা ও কাশী। উপন্যাসের যবনিকাপাতও হয়েছে ঐ গড়শিবপুর গ্রামেই। এই গ্রামেই কেদারদের পূর্বপুরুষেরা জমিদার বা স্থানীয় রাজবংশের প্রতিভূ ছিলেন। তাঁর কোনো এক পূর্বপুরুষের সঙ্গে মুসলমান ফৌজদারের দ্বন্দ্ব বেধেছিল—ছড়ার আকারে তা এখনো এসব এলাকাতে প্রচলিত—যে ছড়ায় উল্লিখিত রাজা দেবরায় ও ভূমিপাল রায় কেদারেরই দুই ঊর্ধ্বতন পুরুষ—

হাট জগদলে পানি প্যালাম না
তীর খেয়ে ভিরমি নেগেচে—
দেবরায়ের সেপাই যে ভাই যমদূতের চ্যালা
ভুঁইপালের তীরন্দাজে দেয় বড় ঠ্যালা—
(ও ভাই) হাট জগদলে পানি প্যালাম না
তীর খেয়ে ভিরমি নেগেছে—

তবে বর্তমানে পূর্বপুরুষদের অস্তিত্ব বলতে শুধু ঘন জঙ্গলে ঢাকা ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ, ভাঙা দেউড়ি, মজে যাওয়া গোটা তিনেক বিশালাকার দিঘি (কালো পায়রার দিঘি, রানিদিঘি ও চালধোয়া দিঘি), ভাঙা মন্দির ও গোটা এলাকাতে ছড়ানো বিভিন্ন ভাঙা ও ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেবীমূর্তি—সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ্য ভগ্নপ্রায় বারাহী দেবীর মূর্তি যাকে নিয়ে ও অঞ্চলে কল্পকাহিনি ও লোকগাথা প্রচলিত। যদিও পূর্বপুরুষদের এহেন ইতিহাস সম্বন্ধে কেদার প্রায় অজ্ঞই। একমাত্র মেয়ে শরৎসুন্দরীকে নিয়ে কোনোমতে ভাঙা, বিশাল বাড়িতে দিন কাটান। বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই বিধবা হয় মেয়ে—সেই থেকে শ্বশুরবাড়িতে ফিরে না গিয়ে বিপত্নীক বাবার দেখাশুনো করতে বাপের বাড়িতেই থেকে যায় সে। মায়ের মতো এত রূপসী সে নয় বটে, 'তবুও এ গ্রামের মধ্যে তার মতো সুন্দরী মেয়ে আর নেই।' অভাবের তাড়নায় বাড়ির দামি কাঁসা-পিতলের বাসন ও অন্যান্য আসবাবপত্র বাঁধা দিয়ে, বিক্রি করে আজ আর কিছু নেই—পাথরের খোরাই সম্বল। বৈষয়িক দিকেও কেদার একেবারেই অনভিজ্ঞ। তাঁর পৈতৃক কিছু জমির খাজনা তিনি আদায় করেন বটে—কিন্তু তাও নির্মমভাবে পেশাদারি ভঙ্গিতে পারেন না। ফলে শরৎকে খুব কষ্ট করেই সংসার চালাতে হয়।

এদিকে খাওয়া দাওয়া ও রান্না-বান্নার মান এসব বিষয়ে খুবই খুঁতখুঁতে কেদার। রান্না মুখে লাগে না—এই অজুহাতে প্রায়ই ভাতের থালা ছেড়ে উঠে পড়েন তিনি। মেয়ের সাথে ঝগড়া-বিবাদও এ নিয়ে প্রায় লেগে থাকে। সংসার অনভিজ্ঞ এই মানুষটি গড়ের পুকুরে গণেশ মুচির সাথে ছিপ ফেলতে যান—একজন বর্শেল হিসেবে তাঁর খুবই নামডাক। এছাড়াও শ্রীবাস মুদির দোকানের সান্ধ্য আড্ডাতে যে গান-বাজনার আসর বসে সেখানেও মুখ্য ভূমিকা তাঁর। ভালো বেহালা বাজাতে পারেন তিনি। গ্রামের মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত সম্প্রদায় তাকে পাত্তা না দিলেও, নীচু শ্রেণির মানুষদের কাছে তিনি রাজার মতোই সম্মান ও গুরুত্ব পান। অধিকাংশ দিনই গভীর রাতে বাড়ি ফেরেন—মেয়ে ততক্ষণে বাবার জন্য অপেক্ষা করে করে ঘুমিয়ে পড়ে। এদের নিস্তরঙ্গ জীবনে একদিন ঝড়ের মতোই হাজির হয় প্রভাস। গ্রামেরই ছেলে, তার বাবা কলকাতায় গিয়ে ভাগ্য ফিরিয়ে আজ বিরাট ব্যবসায়ী— তিন চারটে বাড়ি, মোটর সবই আছে। এই প্রভাস প্রলোভন দেখায় শরৎ ও কেদারকে কলকাতায় যাওয়ার জন্য। কোনোদিন কলকাতা বা বাড়ির বাইরে পা না-দেওয়া শরৎ ও কেদার এই প্রলোভনে ভুলে গিয়ে একদিন প্রভাস ও তার বন্ধু অরুণের সঙ্গে কলকাতায় হাজির হয়। সেখানে কলকাতার একটু আগে দমদমে এক বাগানবাড়িতে তাদের রাখা হয়। প্রভাস ও অরুণের লক্ষ্য ছিল যেভাবেই হোক দু'জনকে আলাদা করে বাইজি পাড়াতে নিয়ে যাবে শরৎকে ও সেখানে তাকে হয় বিক্রি করে দেওয়া হবে, না হয় কোনো খারাপ কাজে লাগানো হবে। পাশের বাড়িতে গান-বাজনার লোভে ব্যস্ত থাকে কেদার আর ওদিকে কলকাতার বিভিন্ন দ্রষ্টব্য জিনিস দেখার লোভে সরলমতি শরৎ, অরুণ ও প্রভাসের সঙ্গে নিজের অজান্তেই এসে ওঠে এক বাইজি মহলায়, সেখানে হেনাবিবি নামক এক পেশাদার অভিনেত্রী ও বাইজির কাছে মিথ্যা পরিচয়ে তাকে একদিন রেখে দেওয়া হয়। গিরীন নামে আরেকজন বন্ধু (যে খুবই বদমাশ ও ক্রূর প্রকৃতির মানুষ) ওখানে এসে জোটে, এদিকে কেদারের কাছে গিয়ে তারা বলে আসে যে, শরৎ অরুণকে ভালোবাসে ও তার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে। আর কোনোদিন বাবার কাছে ফিরে আসবে না বলেছে। এ খবরে ব্যতিব্যস্ত, হতভম্ব কেদার বিভ্রান্ত হয়ে, থানা-পুলিশের বিড়ম্বনার ভয়ে আরো ভীত হয়ে বাগানবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। সব কিছু জানার ও বোঝার পর শরৎও ওখান থেকে পালানোর ফন্দি করে কিন্তু তাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়। কমলা ব'লে ঐ মহল্লার এক সহৃদয়া মেয়ের সাহায্যে শরৎ সেখান থেকে পালিয়ে কালীঘাটের মন্দিরে জনৈকা গৌরীমা নামক সন্ন্যাসিনীর কাছে আশ্রয় পায়। সেখান থেকে এক মধ্যবিত্ত বাড়ির গৃহিণীর সঙ্গী হয়ে সে রাজগীর গয়া ইত্যাদি জায়গাতে ঘুরে ঐ গৃহিণীর এক জা (মিনুর কাকিমা), তার কাশীর বাড়িতে রাঁধুনি ও পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত হয়।

প্রথমে কলকাতা পরে কাশী—শরতের চেতনা, জ্ঞান, বিবেচনার পরিধি বাড়তে থাকে। বাবার কথা মনে করে মাঝে মাঝে দুঃখও পায় সে। কাশীতে রেণুকা নামে এক প্রায়ান্ধ গৃহবধূর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় তার। তারই পরিচিত আর একটি বাড়ির খোকার মধ্যে নিজের সুপ্ত মাতৃত্বের সন্ধান পায় সে। অবশেষে কাশীতে (তাদের বাড়িতে অনেকদিন আগে আশ্রয় নেওয়া ও অসুস্থ হয়ে পড়া ভবঘুরে ব্রাহ্মণ) গোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের সাথে দেখা হয়। গোপেশ্বরকে সব কিছু খুলে বলে শরৎ। তখন গোপেশ্বরই তাকে সঙ্গে করে কাশী থেকে কলকাতায় নিয়ে আসে—কিছুদিন কলকাতায় নিজের পরিচিত একজনের বাড়িতে সযত্নে রাখে। কেদারের খোঁজ-খবর করে অনেক চেষ্টার পর সন্ধান পায় গড়শিবপুর থেকে বেশ কিছুটা দূরে হিংনাড়ার ঘোষেদের আড়তে কাজ করছেন কেদার পরিচয় গোপন রেখে। তার সাথে দেখা করে তাকে শরতের ব্যাপারে সব খুলে বলে গোপেশ্বর। অবশেষে বাবা-মেয়ের মিলন হয়। কেদার, শরৎ ও গোপেশ্বর তিনজন ফিরে আসে আবার গড়শিবপুরের নিস্তরঙ্গ গ্রাম্যজীবনে। ইতিমধ্যে সেখানেও ঘটে গেছে দু-একটি পরিবর্তন। শরতের ফিরে আসার খবর পেয়ে প্রভাস-অরুণ-গিরীন আবার গ্রামে এসে হাজির হয়— শরৎ যে বাইজিপাড়ায় খারাপ মহল্লায় রাত কাটিয়েছে এটা সবাইকে বলে দেবে বলে শরৎকে ভয় দেখাতে শুরু করে। এরকম সময়ে শরতের ছোটো বোনের মতো গ্রামের মেয়ে রাজলক্ষ্মী (যে শরতের চিরকালের সাথী ও সমব্যথী) তার বিয়ের রাতে জঙ্গলের মধ্যে বারাহী মূর্তির পাশেই গিরীনের মৃতদেহ দেখতে পায় শরৎ। 'দেহটা যেখানে পড়ে, তার পাশেই মাটিতে ভারি ভারি গোল গোল কিসের দাগ, হাতীর পায়ের দাগের মতো। ...ঘাড়টা যেন শক্ত হাতে কে মুচড়ে দিয়েছে পিঠের দিকে, সেই মুণ্ডুটা ধড়ের সাথে এক অস্বাভাবিক কোনের সৃষ্টি করেছে'। এই বীভৎস মৃতদেহ দেখে ভয়ে জ্ঞান হারাল শরৎ। অনেক পরে কেদার ও গোপেশ্বর তার সংজ্ঞাহীন দেহ ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে যায়। ঐ অলৌকিক শক্তির (হস্তপদভগ্ন বারাহী দেবীর পাষাণ মূর্তি) প্রতি কেদারের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনেই এ উপন্যাসের শেষ হয়।

এই উপন্যাসে বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটলেও তাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র অবশ্যই কেদার। আত্মভোলা, বিষয়বুদ্ধিহীন এই গ্রাম্য মানুষটি নিজের স্বার্থ বা বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বড়ই উদাসীন। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া অবশিষ্ট কিছু জমির খাজনা আদায় করে কায়ক্লেশে তার ও তার মেয়ে শরৎ-এই দুজনের সংসার চলে কোনোরকমে, হোঁচট খেয়ে। সেখানেও অধিকাংশ দিন চাল বা শাক্-সবজি সংগ্রহের প্রধান দায়িত্ব শরৎকেই নিতে হয়। কারণ কেদার খাজনা আদায়ের ব্যাপারে নির্মম বা পেশাদার নন। স্বেচ্ছায় যে যা দেয় তাই তার অবলম্বন। কোনোরকমে সকালে খাজনা যেটুকু আদায় করার তা করে দিয়ে, কোনোদিন বা

শুধু তাগাদাটুকুই দিয়ে দুপুরে বাড়িতে স্নানাহার সেরে সন্ধ্যা নামতে না নামতেই সে বেরিয়ে পড়ে তার সান্ধ্য গান-বাজনার মজলিশে—শ্রীবাস মুদির দোকানে। সেখানে কৃষ্ণযাত্রা বা কোনো পৌরাণিক পালাতে সুর দেয় কেদার, তার হাতের বেহালা তখন যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। এছাড়া প্রায় সারা জীবন গ্রামে কাটানো কেদার বাইরে কোথাও যাওয়ার ব্যাপারেও অনিচ্ছুক, উদাসীন। কলকাতায় সে যৌবনকালে বারদুয়েক মাত্র গেছে। ফলে প্রভাসদের সঙ্গে কলকাতায় যাওয়ার প্রস্তাবে প্রথমে সে রাজি না হলেও, মেয়ের আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস দেখে নিমরাজি হয়। সেখানে দমদমের বাগানবাড়িতে ও পাশের বাড়ির শশিভূষণ চাটুজ্জের সাথে আলাপের পরেই তার গান-বাজনা প্রীতির কথা জানতে পেরে সেখানেও তিনি শশিভূষণের জোগাড় করে আনা বেহালার সাহায্যে প্রায়দিন মজলিশ বসান। শরৎ চলে যাওয়ার পর প্রভাস ও গিরীনের চক্রান্তে ভয় পেয়ে ও শরৎ সম্বন্ধে কুৎসায় বিভ্রান্ত হয়ে যখন তিনি বাড়ি ছেড়ে অজানা পথে বেরিয়ে পড়েন,তখন সেখানেও অন্যের অযাচিত সাহায্য নেওয়ার ব্যাপারে তার উদাসীনতা, অন্যের দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রতি এক ধরনের জন্মগত সংকোচ কাজ করে তার মধ্যে। অবশেষে নিজের গ্রাম থেকে অনেক দূরে হিংনাড়ায় পরিচয় গোপন করে এক সেরেস্তায় কাজ নেন। গোপেশ্বর যখন তাঁর সন্ধান পায় তখনও তিনি নিজের দ্বিধা-জড়তা-গণ্ডিবদ্ধতা অতিক্রম করতে আড়ষ্টতা বোধ করেন। অবশেষে গোপেশ্বরের সাহায্যে যখন কেদার ও শরতের দেখা হয় আবার সব ভুল বোঝাবুঝির অবসানে সবাই যখন আবার গড়শিবপুরে ফিরে আসে, তখন যেন কেদার আবার তার আগেকার স্বতঃস্ফূর্ততা, সহজ স্বাভাবিক গতিশীল জীবন ফিরে পান। মোটামুটি সরল-সহজ এই গ্রাম্য মানুষটির চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বহুমুখিতা, মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন ইত্যাদি জটিল মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলো নেই বললেই চলে। বস্তুত, কেদার চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ যেন কিছুটা নিজেকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

কেদারের পরেই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তার মেয়ে শরৎসুন্দরী। জন্মগত সৌন্দর্যের অধিকারিণী এই মেয়ে বিধবা—বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই স্বামীকে হারিয়ে বৃদ্ধ বাবার দেখাশোনা করার জন্য শ্বশুরবাড়ির অধিকার ফেলে রেখেই বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছিল সে। সেই থেকে কেদারের সমস্ত কিছুই তত্ত্বাবধান করে সে। শাসনে-স্নেহে-প্রশ্রয়ে, কখনো বা তর্জন-গর্জনে বাবাকে সবসময়ই ব্যতিব্যস্ত রাখে সে, অতিথি-পরায়ণতা ও সেবাপরায়ণতা তার চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। গোপেশ্বর তাদের বাড়িতে অতিথি হিসাবে আশ্রয় নেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লে শরৎই রাত জেগে বাবার মতোই যত্নে-শুশ্রূষায় তাকে সুস্থ করে তোলে। গ্রামের চার দেওয়ালের বৈচিত্র্যহীন গণ্ডির একঘেঁয়ে জীবনে হাঁপিয়ে ওঠা শরৎ

প্রভাসের আগমনে যেন স্বস্তি পায়। সে সরল, মানুষের প্রতি বিশ্বাস তার অটুট—তাই প্রভাসের গূঢ় অভিসন্ধি আঁচ করতে পারে না, কলকাতা বেড়ানোর প্রস্তাবে এককথাতেই রাজি হয়ে যায় কোনো সন্দেহ না করেই। বাইরের জগৎকে সে নিজের মতো করেই দেখে ও বিচার করতে চায়। কলকাতায় অবশেষে বাইজি বাড়িতে এসে সে সবকিছু বুঝতে পারে—ভালো-খারাপ, শুভ-অশুভ, সৎ-অসৎ-এর পার্থক্য এক লহমায় পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে। কিন্তু নিজের দৃঢ় চারিত্রিক কাঠিন্যের জন্য সমস্ত প্রলোভন জয় করে সে। কমলার সাহায্য নিয়ে ওখান থেকে পালায়। এরপরে রাজগীর, গয়া ইত্যাদি জায়গা ঘুরে অবশেষে কাশীতে কিছুদিন থিতু হয়। সেখানেও তার প্রতিবাদী চরিত্র, অন্যের প্রতি সেবাপরায়ণতা ও বাৎসল্যসিক্ত মাতৃত্ববোধের এক নতুন বিকাশ দেখা যায় তার চরিত্রে। অনেক পরে গ্রামে ফিরে এসেও সে থেকে যায় একই রকম। রাজলক্ষ্মীর প্রতি তার স্বাভাবিক ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, কর্তব্যপরায়ণতা পূর্ণ বিকশিত হয় রাজলক্ষ্মীর বিয়ের সময়ে। গ্রাম্য প্রকৃতি, সৌন্দর্য, পুরনো সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের প্রতি টান, নিজের পূর্বপুরুষদের বংশগরিমাতে ভাস্বর হওয়া দৃপ্ত বংশমর্যাদাবোধ, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লৌকিক দেবী বারাহীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা ও বরাবরই অন্যায়-প্রলোভনের বিরুদ্ধে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার দৃপ্ত মানসিকতা তাঁর চরিত্রকে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সম্পূর্ণ ও বহুমাত্রিক করে তুলেছে।

এ উপন্যাসের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বৃদ্ধ গোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। ভবঘুরে স্বভাবের গোপেশ্বরের একমাত্র নেশা ঘুরে বেড়ানো। বাড়িতে মন টেঁকে না তার। সেখানে ছেলে-বৌমাদের সংসারে সম্পর্কের কৃত্রিমতা ও উদাসীনতায় পথকেই আশ্রয় করে সে। পায়ে হেঁটে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরতে ঘুরতে গড়শিবপুরে কেদারের বংশের অতিথিশালার খোঁজে কেদারেরই কাছে পৌঁছায়। পূর্বে অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা জমকালো রকমের থাকলেও বর্তমানে তারা এলে কেদার তাদের তার ভাঙা বাড়িতেই আশ্রয় দেয় ও অতিথি ব্রাহ্মণ বলে তার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা নিজের বাড়িতেই করে। সেভাবেই আশ্রয় নেওয়া গোপেশ্বর কিছুদিন পরে অসুস্থ হয়ে পড়লে শরৎ দিনরাত এক করে সেবা-শুশ্রূষায় তাকে সুস্থ করে তোলে। তারপরও কিছুদিন কেদারের বাড়িতে থেকে শরতের কাছ থেকে যত্ন-সেবা নিয়ে আবার পথে নেমে পড়ে সে। এরপরে তার সঙ্গে আবার শরতের দেখা হয় কাশীতে যখন মিনুর কাকিমার বাড়িতে শরৎ কাজ করছে। শরতের কাছে সমস্ত কথা শুনে গোপেশ্বর কথা দেয় যেভাবেই হোক কেদারকে খুঁজে বার করবে ও বাবার সঙ্গে মেয়ের মিলন ঘটাবে। তা সে করেও। কেদারকে হিংনাড়া গ্রাম থেকে খুঁজে বের করে শরতকে কাশী থেকে নিয়ে এসে তিনজনে মিলে আবার গড়শিবপুরের পুরনো ভিটেতে ফিরে আসে।

সেই থেকে কেদারের বাড়িতেই সে কেদারের গানবাজনার মজলিসের সহযোগী হয়ে (নিজে ভালো তবলা বাজাতে পারে) থেকে যায়। একদিন গভীর রাতে জঙ্গলে গিয়ে তার অলৌকিক অভিজ্ঞতাও হয়, হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে কেদারকে সব বলে—

> এইরকম রাত্রে একদিন গোপেশ্বর ভয় পেলেন কালোপায়রা দীঘির পাড়ের জঙ্গলে। বেশি রাত্রে তিনি কি জন্যে দীঘির পাড়ের দিকে গিয়েছিলেন—সেদিন আকাশে একটু মেঘ ছিল, ঘুম ভেঙে তিনি রাত কত তা ঠিক আন্দাজ করতে পারলেন না। দীঘির জঙ্গলের দিকে একাই গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কোথায় যেন পদক্ষেপের শব্দ। তাঁর কানে গেল—গুরুগম্ভীর পদক্ষেপের শব্দ। উৎকর্ণ হয়ে কিছুক্ষণ শুনে গোপেশ্বরের মনে হলো তাঁরই কাছাকাছি গভীর বনঝোপের মধ্যে কে যেন সাবধানের সঙ্গে ধীরে ধীরে পা ফেলে চলেছে—তাঁর দিকেই ক্রমশ এগিয়ে আসছে নাকি? চোর টোর হবে কি তা হলে? না কোনো ছাড়া গরু বা ষাঁড়—
>
> কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হলো এ পায়ের শব্দ মানুষের নয়—গরু বা ষাঁড়েরও নয়। পদশব্দের সঙ্গে কোনো কঠিন জিনিসের যোগ আছে— খুব ভারি ও কঠিন কোনো জিনিস।
>
> হঠাৎ গোপেশ্বরের মনে হলো শব্দটা যেন—তাঁকেই লক্ষ করে হোক বা নাই হোক—মোটের ওপর খুব কাছে এসে গিয়েছে। তিনি আর কালবিলম্ব না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে নিজের ঘরে ঢুকতেই পাশের বিছানা থেকে কেদার জেগে উঠে বললেন, কি, কি—অমন করছ কেন দাদা?
>
> —ইয়ে, একবার বাইরে গিয়েছিলাম— কিসের শব্দ— তাই ছুটে চলে এলাম—কেমন যেন গা ছম্ ছম্—
>
> —শব্দ? ও শেয়াল টেয়াল হবে—
>
> —না দাদা, মানুষের পায়ের শব্দের মতো, ভারি পায়ের শব্দ—যেন ইঁট পড়ার মতো—
>
> কেদার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, হুঁ, আজ কি তিথি?
>
> —তা কি জানি, তিথি টিথির কোন খোঁজ রাখিনে তো—
>
> —হুঁ। নাও শুয়ে পড় দাদা...একটা কথা বলি, অমন একা রাত্তিরবেলা যেখানে সেখানে যেও না—দরকার হয় ডাক দিও।

গোপেশ্বরের চরিত্রটিও তার কিছু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও পাঠকদের মুখে হাসি ফোটায়। খল চরিত্রগুলোর মধ্যে তিনমূর্তি প্রভাস-অরুণ-গিরীন ও তাদের গড়শিবপুর গ্রামের সহকারী বটুক উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে প্রভাসের আদি বাড়ি গড়শিবপুরে হলেও বর্তমানে সে কলকাতারই স্থায়ী বাসিন্দা। অরুণ ও গিরীন কলকাতারই লোক। তাদের লক্ষ্য যেভাবেই হোক না কেন শরৎকে বাইজিপাড়ায় তোলা, তার নামে

বদনাম ছড়ানো ও পরে তাকে দিয়ে অসৎ উদ্দেশ্য সাধন করানো। এ কাজে গ্রামে শরৎ থাকাকালীন তারা বটুক বলে একজনের (গ্রাম সম্পর্কে সে শরতের দাদা হয়) সাহায্যেও নেয়। এ তবে প্রভাস ও অরুণ কিছুটা ভীতু প্রকৃতির—পরিস্থিতি সমালোচনার সহজাত দক্ষতা তাদের ততটা নেই। এছাড়াও শরতের স্পষ্টবাদী স্বভাবের জন্য তারা ভয়ও পায় শরতকে। কিন্তু গিরীন ঠান্ডা মাথার শয়তান। যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির মোড় ঘোরাতে ওস্তাদ। শরত যে অরুণের সঙ্গে চলে গেছে—এরকম মিথ্যা গুজব সেই কেদারকে জানায় এবং এজন্যে তারা পুলিশের কাছে যাবে ও পুলিশ আসবে কেদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে—এ সমস্ত বলে ভয় দেখিয়ে বিভ্রান্ত করে সে কেদারকে দমদমের বাগানবাড়ি ছাড়তে বাধ্য করে। এমনকি শরৎ যখন বাইজিপাড়ার বাড়ি থেকে পালিয়ে গৌরীমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে, সে সময় একদিন গঙ্গাস্নানে গিয়ে রাস্তাতে গিরীন-প্রভাস-অরুণের সঙ্গে দেখা হতেই তারা শরৎকে জোর করে তাদের সঙ্গে যেতে। রাস্তায় লোক জড়ো হতে শুরু করলে গিরীন ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করে—

> কলকাতা শহরের রাস্তা— একটি তরুণী মেয়েকে ঘিরে তিন-চারজন লোককে কথা-কাটাকাটি করতে দেখে দু-একজন লোক জমতে শুরু করল। একজন ছোকরা এগিয়ে এসে বলল, কি হয়েছে মশাই? গিরীন কুণ্ড ঈষৎ সলজ্জ সুরে বলল, ও আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার মশাই। আপনারা যান।
>
> আর একজন বলল, ইনি কে? কি বলছেন? আপনারা নিয়ে যেতে চাইছেন কোথায়?
>
> প্রভাস বলল, উনি আমাদের লোক—
>
> গিরীন বলল, মশাই আপনারা ভদ্দরলোক, চলে যান। আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে—সে-সব কথা শুনে আপনাদের লাভ কি? আমাদের মেয়েমানুষ ঝগড়া হয়ে রাগ করে চলে এসেছে, তাই নিয়ে যেতে এসেছি।

এছাড়াও গড়শিবপুর গ্রামের নীলমনি চাটুজ্জে, শ্রীবাস মুদি, যার দোকানে সান্ধ্য মজলিসে গান-বাজনা করেন কেদার, কেদারের মাছধরার সঙ্গী বিখ্যাত বর্শেল গণেশ মুচি, পঞ্চায়েত প্রধান পঞ্চানন বিশ্বাস, শরতের সহচরী ও বোনের মত রাজলক্ষ্মী, সাধু সেকরা, বৃদ্ধ জগন্নাথ চাটুজ্জে যার কাজই পরচর্চা করা ও অন্যের বাড়ির কেচ্ছার খবর রাখা, চণ্ডীমণ্ডপের মালিক সাতকড়ি চৌধুরী, গেঁয়োহাটির ক্ষেত্র কাপালি যার কাছ থেকেই কেদারের হিংনাড়া গ্রামে আড়তে কাজ করার খবর পান গোপেশ্বর, গৌরীমা, বাইজিপাড়ার হেনাবিবি ও কমলা, মিনুর মা, মিনু, মিনুর কাকীমা, রেনুকা যে কাশীতে শরতের সবসময়ের সহচরী, খোকা যার প্রতি শরত তার সুপ্ত মাতৃস্নেহের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে ইত্যাদি চরিত্রগুলো ছোটো পরিসরে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা

ও উপন্যাসের আখ্যানের কাছে তাদের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করেছে। এই ছোটো চরিত্রগুলোও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে ও স্বাভাবিকতায় উপন্যাসটিকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে।

এ উপন্যাসের খলচরিত্রগুলো কেউ গ্রামের নয়, সবাই শহরেরই। প্রভাসের জন্ম গড়শিবপুরে হলেও সে ছোটো থেকেই কলকাতাবাসী। বাকি দু’জন অরুণ ও গিরীন—তাদের জন্ম-কর্ম সবই কলকাতায়। শরতকে আবিষ্কার করে প্রভাসই। গ্রামে কোনো একটা দরকারে এসে গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিদের অনুরোধে প্রাইমারি স্কুলটা পাকা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই সূত্রেই কেদারের বাড়িতে তার যাওয়া ও শরতের সঙ্গে পরিচয়। প্রথমে শরতদিদি সম্বোধন করে, সহজ-সরল-আবেগমাখা কথা বলে, কখনো বা গয়না উপহার দেওয়ার চেষ্টা করে শরতের মন জয় করে সে। তারপর শরৎ ও কেদারকে কলকাতা ঘুরে বেড়িয়ে দেখানোর প্রস্তাব দেয় সে। কেদার প্রথমে রাজি না হলেও শরতের জেদের কাছে তাকেও হার মানতে হয়। চিরকাল একঘেয়ে, দমবন্ধ করা সংকীর্ণ চার দেওয়ালে আবদ্ধ শরৎ, তার জীবনের ব্যর্থতা-অপ্রাপ্তি ভুলতে চায় কলকাতার মতো বড়ো জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে, অজানাকে চিরকালের আগ্রহে ভালো করে জেনে। ওদিকে প্রভাসের উদ্দেশ্য ছিল অন্য। তার একবন্ধু অরুণকে নিয়ে সে কেদার ও শরৎকে তার দমদমের বাগানবাড়িতে তোলে। প্রভাস চরিত্রটির মধ্যে লোভ-লালসা, ধুরন্ধর স্বার্থবুদ্ধি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য যথেষ্টই প্রকট। তবে তার মানসিক দৃঢ়তা ও সাহস তুলনামূলকভাবে কম। প্রতিকূল পরিস্থিতি ঠিক মতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সে। সেদিক দিয়ে তাকে আদর্শ ভিলেন বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। তার বন্ধু অরুণও অনেকটা তারই মতো। স্বার্থবুদ্ধি, অন্যের ক্ষতি করার মানসিকতা থাকলেও সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধির অভাব রয়েছে তারও। সেদিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলো গিরীন। প্রভাস ও অরুণ উভয়েরই কলকাতাবাসী বন্ধু, তার মধ্যে ভিলেন সুলভ সমস্ত কিছুই পুরোমাত্রায় আছে। সব থেকে বড়ো কথা পরিস্থিতি সামলানোর মতো ঠান্ডা মাথা ও উপস্থিত বুদ্ধির বাস্তব প্রয়োগ করতে দক্ষ সে। শরতের সম্বন্ধে মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে কেদারকে বিভ্রান্ত করে পুলিশের ভয় দেখিয়ে তাকে বাগানবাড়ি ছাড়ানোর পেছনে গিরীনেরই মাথা কাজ করেছে। আবার শরৎ যখন হেনাবিবির বাইজিমহল থেকে পালিয়ে গৌরীমায়ের আশ্রয়ে ছিল—সে সময় গঙ্গাস্নান করতে যাওয়ার পথে যখন তার সঙ্গে গিরীন-প্রভাস-অরুণের দেখা হলো তখনো ছলে-বলে-কৌশলে শরতকে তাদের সঙ্গে আবার বাগানবাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও সে করে। শরত বাধা দিতে গেলে যখন রাস্তায় কৌতূহলী মানুষের ভীড় জমে যায়, তখনো সে ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। মিথ্যা কথা সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে গিরীনের জুড়ি নেই। সোজা কথায় যখন শরত রাজি হয় না তখন তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে—

> মিষ্টি কথায় কাজ হাসিল হ'ল না দেখে সে ভয় দেখাতে আরম্ভ করল। চোখ রাঙিয়ে বললে, সহজে না যাও—জানো আমি কি করতে পারি? আমার নাম গিরীন কুণ্ডু—থানায় এজাহার করাবো তুমি হেনা বিবির হার চুরি করে এনেছ! এক্ষুনি চালান দিয়ে দেবে জানো?

তারপর ওখানে উপস্থিত জনতা যখন শরতের পক্ষ নেয় তখন বেগতিক দেখে দলবল নিয়ে সে সরে পড়ে—

> গিরীন কুণ্ডু আর যাই হোক, নির্বোধ নয়। বেগতিক বুঝে সে দলবল নিয়ে মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল।

সমস্ত খারাপ দিকগুলো সমেত গিরীনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ খলচরিত্র হিসাবে মানতে পাঠকের কোনো অসুবিধা হয় না।

এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বা প্রধান চরিত্র কেদার যাকে ঘিরে উপন্যাস আবর্তিত। তার পূর্বপুরুষেরা গড়শিবপুরের রাজা ছিল। ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ, ভাঙা দেউড়ি, ছড়ানো-ছেটানো ভাঙা দেবীমূর্তি, তিনটে মজে যাওয়া দিঘি এগুলো সবই অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু বর্তমানে কেদার গরীব, জমিজমার সামান্য খাজনা সম্বল—তাও আদায় হয় অনিয়মিত। কিন্তু গ্রামের সবাই ব্যঙ্গ করেই হোক বা সম্ভ্রম দেখিয়েই হোক তাকে 'কেদাররাজা' হিসাবে সম্বোধন করে। উপন্যাস শুরু ও হয় সেভাবেই—

> দুপুর বেলায় নীলমনি চাটুজ্জে বাড়ি ফেরবার পথে গ্রামের মুদির দোকানে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ গো ছিবাস, কেদার রাজাকে দেখেছিলে আজ সারাদিন?

কেদার বিষয় বুদ্ধিসর্বস্ব নন। বরং কল্পনাবিলাসী, খেয়ালী, আত্মভোলা মানুষ। গ্রামের মানুষও তাই মনে করে—

> কেদার রাজা এসব গোলমালের ভেতর থাকতে চান না, কখনও পছন্দ করেন না। নির্বিবাদী লোক। নীলু খুড়োর যা লোভ!

বাড়িতে নিত্য অভাব, সংসার চালানোর বিড়ম্বনায় মেয়ের সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি লাগে, কেদারের একমাত্র ছেলে, সেও নিরুদ্দেশ হয়। আমরা দেখি যে, অবসর সময়ে গড়ের পুকুরে গণেশ মুচির সাথে মাছ ধরে সময় কাটান কেদার—

> কেদার রাজা চোখে মুখে স্বীয় কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার আত্মপ্রসাদ সূচক একখানি হাস্য বিস্তার করে বললেন, ওরে বেটা, আজ ত্রিশ বছর বর্শেলগিরি করছি এটুকু আর বুঝিনে? খোলার শেষের গাঙ, এখানে চারকাঠি না বেঁধে বাঁধব কি না পুকুরে? হ্যা হ্যা হ্যা—

আরো একটা শখ আছে তার—বারুইপাড়ায় কৃষ্ণযাত্রার দলে বেহালা বাজানো—

> তা নয়, আসলে বাবা বারুইপাড়ার, কৃষ্ণযাত্রার দলের আখড়ায় গিয়ে এমন বেহালা বাজাবেন, এই তাঁর বৈষয়িক কাজ। যদি কেউ লোক পাঠিয়ে থাকে, সেখান থেকেই পাঠানো সম্ভব।

শ্রীবাস মুদির চালাঘরে সান্ধ্য আড্ডাতে কেদার গানের মজলিশে যোগ দেন নিয়মিত—

> ছিবাস মুদির চালাঘরে ঝাঁপ পড়ে গিয়েছে, কারণ এমন গাঁয়ে এই রাতে খরিদ্দার কেউ আসবে না—কিন্তু ঘরের ভেতরে চার-পাঁচজন লোক বসে। ছিবাস বললে, আসুন বাবাঠাকুর, আপনার জন্য সব বসে—বলি বলে গেলেন আসচেন, তা দেরি হচ্ছে কেন—আসুন বসুন—কেদার বেহালায় কসরৎ দেখালেন প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে, তার পর আবার গান শুরু হলো। রাত আন্দাজ এগারোটার সময় কি তারও বেশি যখন, গানের আড্ডা তখন ভাঙল।

ওদিকে বাবার জন্য অপেক্ষা করে করে শরৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। গানের নেশা, বাজনার খেয়াল মাথায় চাপলে কেদারকে রোখা মুশকিল। দুঃখের বিষয়, তার মেয়ে শরৎ সুর সম্বন্ধে নেহাতই অবুঝ ও আনাড়ি। জমি-জমার খাজনা আদায়ের ব্যাপারেও কেদার দক্ষ ও পেশাদার হয়ে উঠতে পারেননি। পূর্বপুরুষদের গৌরবগাথা, বংশের ইতিহাস, অলৌকিক লোকগাথা এগুলো সম্পর্কেও ততটা ওয়াকিবহাল নন তিনি। মেয়ে শরৎকে পূর্বপুরুষদের গল্প বলেন বটে, কিন্তু তা অনেকটাই বানিয়ে বানিয়ে। যখন নিজে কৃষ্ণ যাত্রার দল খোলেন, তার রিহার্সালে প্রতিটি মুহূর্তে তিনি খুব সিরিয়াস—

> কেদার খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে বললেন—আরে ছিবাস যে! এই যে রিষিকেশ, এসো বসো—তোমরা না এলে তো রিয়্যাশাল আরম্ভ হয় না। বেশ ভালো করেই বসো।

পার্ট মুখস্থ করিয়ে বলানোর ব্যাপারেও তিনি খুব কড়া—

> কেদারের হুকুম অমান্য করবার সাধ্য নেই কারো এ আসরে। হৃষিকেশ কর্মকার দু-একবার ঢোক গিলে, দু-একবার ঘরের আড়ার দিকে তাকিয়ে বিপন্ন মুখে বলতে শুরু করলে—

প্রভাসের প্রলোভনে কলকাতার বাগানবাড়িতে এসেও পাশের বাড়ির চাটুজ্জে মশাইয়ের সাথে গান-বাজনার আড্ডাতে মাতেন তিনি, মেয়ের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলে গিরীনেরা যখন তাকে বিভ্রান্ত করে তখন তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো হয়ে যান—

> এমন জটিল ঘটনাজালের মধ্যে কখনো পড়েননি, এমন ধরনের চিন্তায় তাঁর মস্তিষ্ক অভ্যস্ত নয়। একটা কথাই শুধু বার বার তার মাথায় খেলতে লাগল—পুলিশে গেলে তাঁকে মেয়ের বিরুদ্ধে এজাহার করতে হবে, তাতে তাঁর মেয়ের জেল হয়ে যেতে পারে।

ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে দূরের গ্রামে আত্মগোপন করে থাকেন কেদার, পরে গোপেশ্বর যখন সব ব্যবস্থা করে কাশী থেকে শরৎকে ফিরিয়ে আনে ও কেদারকে খুঁজে বের করে সবাই মিলে গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসে স্বস্তি পান কেদার—

> কেদার নিশ্চিন্ত আরামে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললেন, আর কোথাও বেরুতে ইচ্ছে করে না দাদা। বিদেশে বড় গোলমাল শুনলে তো সবই! আমাদের এই জায়গাটাই ভালো—

আবার যাত্রাদলের রিহার্সালের সেই পরিচিত চেনা, কড়া মেজাজের শিক্ষাগুরু হয়ে ওঠেন তিনি। এ ধরনের মানুষদের কাছে তিনি প্রকৃতই রাজা, শাসক, সার্থকনামা—

> গেঁয়োহাটি কাপালী পাড়ার মধু কাপালী, নেতা কাপালী এসে পীড়াপীড়ি ...সবাই রাজামশাইকে একবার দেখতে চায়, এদের ওপর কেদারের যথেষ্ট আধিপত্য, অন্য সময় যে কেদার নিতান্ত নিরীহ— এদের দলের দলপতি হিসাবে তিনি রীতিমতো কড়া ও উগ্র মেজাজের শাসক।

গান, রাগ-রাগিনী সুরের তাল-লয়-মাত্রা নিয়ে তিনি সমান তালে আলোচনায় উৎসাহী, তখন বাস্তব পৃথিবীর খেয়াল থাকে না তাঁর—

> তাঁরা মুখুজ্জে বাড়ির জামাই সোমেশ্বরের কাছে নতুন রাগিনীর সন্ধানে গিয়েছিলেন, বোধ হয় খানিকটা কৃতকার্যও হয়েছেন, তাঁদের মুখ দেখলে সেটা বোঝা যায়।
>
> গোপেশ্বর খেতে খেতে বললেন— গলাটা ভালো লোকটার।
>
> —বেশ। ভৈরবীখানা গাইলে বড়ো চমৎকার—অবরোহীতে একবার যেন ধৈবৎ ছুঁয়ে নামলো—
>
> —না, না, আমার কানে তো শুনলাম না। কোমল ধৈবৎ তো লাগবেই অবরোহীতে—
>
> —সেটা আমার খুব ভালো জানা আছে— শুনবে? এই শোন না– আচ্ছা খেয়ে উঠি। অবরোহীতে কোমল নিখাদ, তার পরেই কোমল আসছে।

অলৌকিক শক্তির প্রতি ভয় কৃতজ্ঞতা রয়েছে তার—বারাহী দেবীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন উপন্যাসের শেষে। স্রষ্টা বিভূতিভূষণ কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে আপন খেয়ালে গড়েছেন। কিন্তু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চরিত্রটি স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ, খেয়ালী পাহাড়ী নদীর মতো।

এ উপন্যাসে লেখক 'Third Person omniscient Narrator'-এর কণ্ঠে ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় পুরুষ বক্তা ঋজুভাবে, সরল গদ্যরীতিতে চরিত্রগুলোর বর্ণনা দেয়। গ্রামবাংলার প্রাচীন সমাজচিত্র, ভূ-প্রকৃতি, অতীত গৌরব, ধর্ম, লোককথা,

কল্পকাহিনি, সাধারণ মানুষের লোভ-লালসা-ঈর্ষা-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি স্বাভাবিক মোহ, একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচার ইচ্ছা—মানুষের সহজাত সব প্রবৃত্তিই নিপুণ শিল্পীর মতো ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। পাঠকের চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠতে থাকে এক এক করে। কোনো জটিল মনস্তত্ত্ব গভীর মানসিক টানাপোড়েন, মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত—আধুনিক উপন্যাসের এ সমস্ত দিক এখানে অনুপস্থিত। সরলভাবে গ্রাম্য সমাজ ও তার পাশাপাশি শহুরে মানুষদের জীবনকথা, তাদের চাল-চলন, স্বভাব এগুলোও ফুটিয়ে তুলেছেন স্বাভাবিকভাবে। গল্পের গতি সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলে কখনো গড়শিবপুর গ্রামে, কখনো বা কলকাতা বা কাশীর মতো শহর বা ঘন বসতিপূর্ণ এলাকাতে, ঔপন্যাসিকের কথনরীতি এখানে সরাসরি পাঠকদের মনের গভীরে ঢুকে গিয়ে একটা ভালোরকম First Impression তৈরি করে দেয়।

এ উপন্যাসে অলৌকিক প্রভাব যথেষ্ট—যা উপন্যাসটির একটি অন্যতম দিক। উপন্যাসটি আকর্ষণীয় করার জন্য লেখক প্রথম থেকেই প্রকৃতি বর্ণনার পাশাপাশি কেদারের পূর্বপুরুষদের বিভিন্ন কাহিনি ও সেগুলোর সঙ্গে জড়িত লোকগাথা বর্ণনাতেও যথেষ্ট সাবলীল—

> এ অঞ্চলে প্রবাদ, উত্তর দেউলে এক বিশালকান্তি পুরুষকে কখনো কখনো নাকি দেখা গিয়েছে— হাতে তাঁর বেত্রদণ্ড, মুখে তর্জনী স্থাপন করে তিনি চিত্রার্পিতের মতো উত্তর দেউলের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে।
>
> বারাহী দেবীর ভগ্নপ্রায় মূর্তি সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনির রটনা রয়েছে। শোনা যায়, কোনো বিশেষ তিথিতে ঐ পাথরের মূর্তি সচল হয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। অনেককাল আগে কালাপাহাড় দেবীর মূর্তি ভেঙে চুরে বেদী থেকে অনেক নীচে ফেলে দিয়েছিল। সেই থেকে নির্দিষ্ট এক তিথিতে ঐ মূর্তি সচল হয়ে আবার নাকি ফিরে আসে তার বেদীতে। তখন সামনে জীবিত কোনো মানুষ পড়লে ঘোর অমঙ্গল—
>
> —হস্তপদহীন বারাহী দেবীর পাষাণ মূর্তি ছাতিমবনের নিবিড় ছায়ায় অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছে কতকাল।
>
> —সেও তো শোনা কথা। কালাপাহাড় না কে... দেবীর মূর্তি ভেঙেচুরে মন্দির থেকে ফেলে দেয় টান মেরে—
>
> শরৎ সাহসিকা মেয়ে, তবুও বাবার কথায় যে ছবি তার মনে জাগলো—তাতে সে শিউরে উঠলো, কারণ সে শুনে এসেছে সে সময় যে সঞ্চারণশীল জাগ্রত পাষাণ মূর্তির সামনে পড়ে, তার সেদিন বড়ই দুর্দিন।

এক গভীর রাতে শরতের ঘুম ভেঙে যায়। কেদার সেদিন বাড়িতে নেই। রাজলক্ষ্মী

শরতের পাশেই শুয়েছিল। বাইরে নিঝুম জ্যোৎস্না, রাতে কার পায়ের শব্দ শোনা যায়—

> শরৎ কিন্তু ওর কথা না শুনেই দোর খুলে দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াল। ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না, কেউ কোথাও নেই! তবুও তার স্পষ্ট মনে হলো খানিক আগে কেউ এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার কোন ভুল নেই। হঠাৎ তার মনে পড়ল, আজ ত্রয়োদশী তিথি।
>
> তাদের এখানে প্রবাদ আছে, বারাহী দেবীর পাষাণ-মূর্তি ত্রয়োদশী থেকে পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত তিনদিন, গভীর রাত্রিকালে নিজের জায়গা থেকে নড়েচড়ে বেড়ায় গড়বাড়ির নির্জন বনজঙ্গলের মধ্যে। সেই সময় যে সামনে পড়ে, তার বড়ো অশুভদিন।

শরতের সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল এই অলৌকিক ব্যাপারকে প্রত্যক্ষ করে—

> যদি সত্যিই বারাহী দেবীর বুভুক্ষু ভগ্ন পাষাণ-বিগ্রহ রক্তের পিপাসায় তাদেরই ঘরের আনাচে-কানাচে শিকার খুঁজে বেড়াতে বার হয়ে থাকে?

গোপেশ্বরেরও একই অভিজ্ঞতা হয়। একদিন রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কালোপায়রা দিঘির পাড়ের দিকে গিয়েছিলেন তিনি—

> উৎকর্ণ হয় কিছুক্ষণ শুনে গোপেশ্বরের মনে হলো তাঁরই কাছাকাছি গভীর বনঝোপের মধ্যে কে যেন সাবধানের সঙ্গে ধীরে ধীরে পা ফেলে চলেছে— তাঁর দিকেই ক্রমশ এগিয়ে আসছে নাকি?...পদশব্দের সঙ্গে কোন কঠিন জিনিসের যোগ আছে—খুব ভারি ও কঠিন কোন জিনিস।

গিরীন কুণ্ডু প্রাণও হারায় এই অলৌকিক শক্তির খপ্পরে পড়ে। শরতকে আবার কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আশা কাটাতে না পেরে মাঝে মাঝেই গ্রামে আসা-যাওয়া করা গিরীন রাজলক্ষ্মীর বিয়ের দিনই জঙ্গলে বেঘোরে মারা যায়। তার মৃতদেহ দেখতে পায় শরৎ—

> এক জায়গায় গিয়ে হঠাৎ সে ভয়ে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।...শরৎ কাছে গিয়ে চমকে উঠল— কলকাতার সেই গিরীনবাবু।
>
> মরে কাঠ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ... গিরীনের দেহটা যেখানে পড়ে, তার পাশেই মাটিতে ভারি ভারি গোল গোল কিসের দাগ, হাতীর পায়ের দাগের মতো।...সে চিৎকার করে মূর্ছিতা হয়ে পড়ে গেল। হাত থেকে সন্ধ্যাপ্রদীপ ছিট্‌কে পড়ল বাদুড়নখীর জঙ্গলে।

অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস এই উপন্যাসের পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে যা উপন্যাসটিকে এক মায়াবী সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে।

গ্রামীণ সমাজচিত্র, অর্থনীতি, গ্রামবাংলার মানুষের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বর্ণনা রয়েছে এ উপন্যাসে। এর প্রাসঙ্গিকতা আজকের আধুনিক প্রেক্ষিতে হয়তো কিছুই নয়। কিন্তু যে সময়ে এটা লেখা হয়েছিল তখন এই উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা ছিল যথেষ্ট। তৎকালীন গ্রাম্য সমাজের নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে এখানে। অবস্থা পড়ে যাওয়া বনেদী পরিবারের মানুষের অসহায়তা, আত্মগরিমা অথচ সংসার চালানোর ব্যর্থতা—এই বৈপরীত্যে কেদার বিধ্বস্ত, বিদ্ধ। মেয়ে শরৎ রাজবংশের মেয়ে, তাও সাধারণ বাড়ির পরিচারিকার মতো সমস্ত কাজ করতে হয় তাকে। মাঝে মাঝে স্বপ্নও দেখে সে। তাদের বংশের সেই আত্মঘাতী রানীমা তাকে বংশের মর্যাদা রক্ষার কথা বলছেন, নিজেকে সবসময় শুদ্ধ-পবিত্র রাখার কথা বলছেন। বাস্তবে শরৎ তা করেছেও। হাজার প্রলোভনে, গিরীনদের অজস্র ছল-চাতুরী সত্ত্বেও সে নিজেকে সীতার মতোই অগ্নিশুদ্ধ, পবিত্র করে রেখেছে। এ উপন্যাসের গ্রহণযোগ্যতা এখানেই। পাঠকদের ভালোমানুষ, ভালো চরিত্রের মানুষ হওয়ার বার্তাও রয়েছে এখানে। মানুষ তার অসহায় অবস্থার মধ্যে থেকেও কীভাবে নির্লোভ ও চরিত্রবান থাকতে পারে কেদার ও শরৎ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। লেখকের বার্তাও হয়তো তাই। প্রধান চরিত্র দুটির মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মানসিক শুদ্ধতা ও দৃঢ়তার শিক্ষাই বোধহয় দিতে চেয়েছেন।

নিছক সমালোচকের দৃষ্টিতে ‘কেদার রাজা’র বিশ্লেষণে হয়তো অনেক ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা, বৈচিত্র্যের অভাব ইত্যাদি প্রকট হতে পারে। কিন্তু মুগ্ধ এক পাঠকের নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে এ উপন্যাসকে স্নিগ্ধ মানবিক সম্পর্কে সিক্ত, গ্রাম্য প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও অলৌকিক লোকগাথামণ্ডিত বিবরণ সম্পৃক্ত এবং সর্বোপরি লোভ-লালসা-স্বার্থচিন্তা অতিক্রম করে মহত্তর মানববন্দনার জয়গানে মুখর এক খণ্ডচিত্র বলেই মনে হবে। লেখকের বক্তব্য ও বার্তা সংগত কারণেই স্পষ্ট ও প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। নিজের মতো করে সমাজকে গড়তে চেয়েছেন, বদলাতে চেয়েছেন বিভূতিভূষণ। তাঁর সেই কল্পসমাজে হিংসা, দ্বেষ, লোভ, লালসা থাকবে না—থাকবে শুধু কেদার, শরৎ, গোপেশ্বর, রাজলক্ষ্মীদের মতো মানুষজন—সেই ‘ইওটোপিয়া’র চিন্তায় বিভোর হয়ে পাঠকও স্বপ্ন দেখে নতুন এক সমাজ, নতুন এক জনপদের।

অজানার অভিসারে : 'হীরামানিক জ্বলে'

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য

প্রতিদৈনিকতার তুচ্ছতায় হারিয়ে যাওয়া—ধানের শিষ ও শিশির বিন্দুর যে অনাবিল সৌন্দর্য, বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে তার সুনিপুণ রূপ নির্মাণ ঘটেছে। তাঁর প্রায় সমস্ত উপন্যাস ও ছোটোগল্পের মর্মমূলে এই ভাবনাটিকে আমরা সক্রিয় থাকতে দেখি। অতি তুচ্ছের মধ্যে সসংকোচে লুকিয়ে থাকা অসাধারণত্বকে তিনি খুঁজে নিয়েছেন, চারিয়ে দিয়েছেন তাঁর পাঠককুলের মধ্যে এমনটাই আমরা লক্ষ করেছি। 'হীরামানিক জ্বলে' (১৯৪৬) রচনায়ও বিভূতিভূষণের এই মৌল অভিপ্রায়টিকে আমরা সক্রিয় থাকতে দেখব।

আলোচ্য আখ্যানটিকে এককথায় অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় রচনার অন্তর্ভুক্ত করা চলে। বাঙালির জীবনে অ্যাডভেঞ্চারের বাহুল্য না থাকলেও অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় আখ্যানের প্রতি আমাদের আকর্ষণ অমোঘ। আমাদের কিশোর সাহিত্যের আদিযুগ থেকেই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি লেখার চেষ্টা চলেছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে 'সখা ও সাথী'র সম্পাদক ভুবনমোহন রায় 'সুন্দরবনে সাত বৎসর' নামে একটি অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস লেখা আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু সেটি আর সমাপ্ত হয়নি। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যকের ধন'কেই (১৯২৪) বলা যায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ অ্যাডভেঞ্চারধর্মী উপন্যাস। 'মৌচাক' পত্রিকায় এটি প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এর কিছু পরে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকাতেই লিখেছিলেন, অনবদ্য অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি 'চাঁদের পাহাড়' (১৯৩৭)। 'যকের ধন'-এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে হেমেন্দ্রকুমার 'মৌচাক' পত্রিকাতেই লিখেছিলেন 'আবার যকের ধন' (১৯৩২), যেটি আজও বাঙালি কিশোরদের প্রিয় বইগুলির অন্যতম। 'আবার যকের ধন'-এর ভূমিকায় হেমেন্দ্রকুমার লিখেছিলেন—

> বাঙালী ছেলেদের দেহের সঙ্গে মনও যাতে বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে, স্বদেশকে ভালোবেসে ও তাদের চিত্ত যাতে বিপুল বিশ্বের জলে-স্থলে-শূন্যে বেপরোয়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, মৃত্যুবন্ধুর বিপদের পন্থায় তাদের আনন্দের উৎস যাতে অসঙ্কোচে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, নানা বিরোধী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতেও সমান অটল থেকে তারা যাতে নিজেদের জীবন গঠন করতে শেখে, আমার এ শ্রেণীর

> অর্থাৎ 'যকের ধন', 'আবার যকের ধন', 'মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন' উপন্যাস রচনার আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই।

হেমেন্দ্রকুমার-বিভূতিভূষণের বিখ্যাত এইসব অ্যাডভেঞ্চারধর্মী রচনা ছাড়াও আরও কয়েকটি ভালো বাংলা অ্যাডভেঞ্চারধর্মী উপন্যাস হলো মণীন্দ্রলাল বসুর 'অজয়কুমার' (১৯৩০), রবীন্দ্রলাল রায়ের 'অভিশপ্ত', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পৃথিবী ছাড়িয়ে' (১৯৩৭), দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের 'বীরের দল' (১৯৪১), সতীকান্ত গুহ'র 'অমরলতা' (১৯৩৭), প্রবোধকুমার সান্যালের 'দুরাশার ডাক' (১৯৪২) প্রভৃতি। সাম্প্রতিক কিশোর সাহিত্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাকাবাবু' সিরিজের বেশ কয়েকটি রচনা 'পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক', 'জঙ্গলগড়ের চাবি', 'সবুজ দ্বীপের রাজা' ভালো অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় রচনা। এছাড়া বুদ্ধদেব গুহ'র ঋজুদা-রুদ্র সিরিজের অ্যালবিনো, রুআহা প্রভৃতি জঙ্গলভিত্তিক অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় রচনা। ব্রিটিশ ইংরাজিতে Adventure শব্দের অর্থ হিসাবে বলা হয়েছে—

> An adventure is a series of events that you become involved in that are unusual, exciting and perhaps dangerous...

এ জাতীয় রচনায় তার স্বাদ আমরা পাই। এ প্রসঙ্গে 'রবিনসন ক্রুসো', 'ট্রেজার আইল্যান্ড', 'অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেজ', 'ফাইভ উইক্স ইন এ বেলুন'—এরকম রচনার কথাও স্মরণ করা যেতে পারে, যেগুলি বিশ্বের জনপ্রিয় অ্যাডভেঞ্চার রচনার অন্যতম।

বিভূতিভূষণের মূলত, কিশোরদের উদ্দেশ্যে লিখিত কয়েকটি রচনাকে অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় রচনা বলা যেতে পারে। সেই 'পথের পাঁচালী' থেকেই 'যাত্রা' বা 'চলিষ্ণুতা'র একটা তত্ত্ব তাঁর উপন্যাস জাতীয় রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। বস্তুত, জীবন মানেই তো পথের পাঁচালি। সে এগিয়ে চলে দূর থেকে দূরান্তের পথে। জীবনের সেই পরিক্রমা আরও উদ্দাম ও বিপদসংকুল হয়ে ওঠে অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় রচনার অভিযাত্রায়। সেখানে কেবল ব্যক্তি মানুষের অন্তঃপ্রেরণাই থাকে না, সেই প্রেরণাকে প্রতিহত করবার জন্য উপযুক্ত প্রতিকূল শক্তিও থাকে। এককের কোনো গন্তব্য অভিমুখে এগিয়ে চলবার প্রেরণা ও পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে কখনো বা পরিণত হয় অ্যাডভেঞ্চারের অভিযাত্রা। আমাদের পূর্বোল্লেখিত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির কাঠামো এই জাতীয়। জীবনের একটা উন্মাদনা এই ধরনের রচনাকে বিশিষ্ট করে। বিভূতিভূষণের অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় রচনাতেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদুতা লক্ষ করা যায়। যে স্নিগ্ধ কোমলতা, জীবনের সমস্ত রূঢ়, কর্কশতার উপশমের মতো বিরাজ করে, বিভূতিভূষণের রচনার তা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। আমাদের আলোচ্য আখ্যানটি অবলম্বনে বিভূতিভূষণের অ্যাডভেঞ্চার জাতীয়

রচনার স্বাতন্ত্র্যটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। অবশ্য এ বিষয়ে বলাবাহুল্য, তাঁর সেরা রচনা 'চাঁদের পাহাড়'।

'হীরামানিক জ্বলে' আখ্যানটির কেন্দ্রীয় চরিত্র সুশীল। সুন্দরপুর গ্রামের পড়তি জমিদার বংশ মুস্তাফিদের বাড়ির ছেলে। কাহিনির সময়কালে মুস্তাফিদের আর্থিক অবস্থা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। তাদের দৌহিত্রবংশ রায়েদের অবস্থা এখন সমৃদ্ধ। অথচ এককালে মুস্তাফিদের অনুগ্রহভাগী ছিল রায়রা। পরবর্তীকালে, শহরে গিয়ে চাকরি করে সু-উপায়ী হয়েছে তারা। তাদের পারিবারিক অবস্থাও হয়েছে সমৃদ্ধতর। মাঝে-মাঝে তারা সুন্দরপুরে আসে কলকাতা শহর থেকে। সেই সময় মুস্তাফিদের তুলনায় তাদের অর্থকৌলীন্যও জাহির করে তারা। সময়ের সঙ্গে এগোতে পারেনি মুস্তাফিরা। সুন্দরপুরের জমিদারি আঁকড়ে বসে আছে। চাকরি করলে তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় থাকে না, এমন ধারণা তাদের। ক্রমে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে সুন্দরপুরে মুস্তাফিরা হলো তাচ্ছিল্যের লক্ষ্য। তাদের বংশধরেরা আখ্যাত হলো নিষ্কর্মা বলে। সেই মুস্তাফিদের ছেলে সুশীল, ম্যাট্রিক পাস। কিন্তু তারও জীবন চলে তার পূর্বজদের প্রথায়। এ জীবনে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একদিন বাড়ির অনুমতি নিয়ে কলকাতা চলে আসে সে, ডাক্তারি পড়বে বলে। ওঠে তার মামাবাড়িতে। ডাক্তারির ক্লাস শুরু হতে দেরি আছে, মামাবাড়ির ভিড়ভাট্টা তার ভালো লাগছে না, টাকা পয়সাও ফুরিয়ে আসছে; এমন এক সময় ময়দানে বিকেলে সে বসে আছে। আলাপ হলো জামাতুল্লা খালাসীর সঙ্গে। সে দিল সুশীলকে এক অদ্ভুত গুপ্তধনের সন্ধান। জামাতুল্লা খালাসিদের জাহাজ একবার 'সুলু সী'র কাছে এক ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে আটকে গিয়েছিল। সেখানে সে এক অজানা দ্বীপের সন্ধান পায়। সেই দ্বীপে সে এক পুরানো রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পায়। সেই সফর থেকে ফিরে পাঁচ-সাত বছর পরে ম্যানিলাতে এক বোম্বেটের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। সে তখন মৃত্যুশয্যায়। সেই বৃদ্ধের নাম নটরাজন। ত্রিবান্দ্রম শহরের কাটিউপ্পা গ্রামে তার বাস। সে বহু বছর ঘরছাড়া। তার স্ত্রী আর একটি পুত্র সন্তান আছে। তাদের কাছে সে পাঠাতে চায় এক গুপ্তধনের হদিশ। সে জামাতুল্লাকে দিল একটি পদ্মরাগমণির সীলমোহর ও সেই জায়গার আনুমানিক ম্যাপ। তার কথা শুনে জামাতুল্লা বুঝতে পারে যে দ্বীপ, যে মন্দির সেও একদা প্রত্যক্ষ করেছে, বৃদ্ধ নটরাজন তার কথাই বলছে। তারপর জামাতুল্লা সেই বৃদ্ধের কথামতন কাটিউপ্পা গ্রামে যায়, কিন্তু সেই বৃদ্ধের ছেলেটিও ততদিনে নিরুদ্দেশ, তার স্ত্রী অতি বৃদ্ধা। তাই সে গুপ্তধনের সন্ধান তাকে না দিয়ে ফিরে আসে। সুশীলকে সে অনুরোধ করে সেই গুপ্তধনের সন্ধানে বের হওয়ার জন্য।

তাদের আলোচনায় ক্রমে সুশীলের ইচ্ছা জন্মায় সেই অজানা দ্বীপের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার। গুপ্তধন তাকে তত আকর্ষণ করে না। কিন্তু রহস্যময় একটা স্থানের

হাতছানি সে অনুভব করে। তার মামাতো ভাই সনৎকেও সে নেয় তার অভিযানে। এক আত্মীয়ের কাছ থেকে ব্যবসার লগ্নি হিসাবে দু-হাজার টাকা জোগাড় করে। লাইব্রেরি থেকে মালয়-বোর্নিও প্রভৃতি অঞ্চলের বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে সে পড়াশুনাও করে। জামাতুল্লা তার পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের ধরে শুরু করে দেয় যাত্রার প্রস্তুতি। ইতিমধ্যে এক লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোকের কাছ থেকে তারা জানতে পারে, যেখানকার সীলমোহর তারা পেয়েছে সেই সভ্যতার প্রাচীনত্ব। এইসব প্রস্তুতির মধ্যে কারা যেন টের পায় তাদের গুপ্তধনের কথা। জামাতুল্লাকে কারা যেন অলক্ষ্যে থেকে আক্রমণ করতে চায়। যাই হোক প্রাথমিক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে তারা রওনা হয় অজানা সেই দ্বীপে, জামাতুল্লা যাকে বলে বিন্মমুনির দ্বীপ। সিঙ্গাপুরে তারা পৌঁছায়। আলাপ হয় জামাতুল্লার বন্ধু ইয়ার হোসেনের সঙ্গে। সেখানেও গুপ্তঘাতকেরা তাদের পিছু ছাড়ে না। যাইহোক, শেষপর্যন্ত তারা চীনা জাঙ্কে চেপে সুলু সী পাড়ি দিয়ে পৌঁছায় সেই দ্বীপে। বেশ কয়েকদিনের চেষ্টায় পৌঁছায় সেই প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষের কাছে। সুশীল, সনৎ, জামাতুল্লা পৌঁছেও যায় সেখানকার মন্দিরের তলস্থ ধনভাণ্ডারে। উপলব্ধি করে সেই সভ্যতার অদ্ভুত স্থাপত্য কৌশল ইত্যাদি। কিন্তু এই অভিযানের শেষ পরিণতি হয় বেদনাত্মক। মন্দিরের ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী দিয়ে আচমকাই ঢুকে পড়ে সমুদ্রের জল। জলরাশিতে সলিল সমাধি হয় সুশীলের ভাই সনতের। সেই স্থান থেকে তারা অল্প কিছু মূল্যবান পাথর, টাকা সংগ্রহ করেছিল। তার মূল্য দাঁড়ায় সত্তর-আশি হাজার টাকা। তারা তাদের চুক্তিমতো সেই টাকা সবাই ভাগ করে নেয়। টাকার হিসাবে তাদের তেমন কিছু বিরাট প্রাপ্তি নয়। কিন্তু সুশীলের কাছে সেই অভিজ্ঞতাই মহার্ঘ্য।

কাহিনির এই রূপরেখার উপর গড়ে ওঠা 'হীরামানিক জ্বলে' উপন্যাসের আখ্যানবৃত্তটি সরল। মূল কাহিনির সঙ্গে নানা উপকাহিনি মিশে তাকে জটিল করেনি। এটি আদ্যন্ত সুশীলের একটি অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভের কাহিনি। সেইমতই আখ্যানবৃত্তের আদি-মধ্য-অন্ত সজ্জিত। পাশাপাশি অন্যান্য উপকাহিনি যা সুশীলের Compare বা contrast-এর কাজ করবে এমন কোনো পরিকল্পনা করা হয়নি। মূলত, বর্তমান কাল ধরেই ঘটনাক্রমে এগিয়েছে। অতীতকালের যে ঘটনাসূত্র, তা জামাতুল্লার স্মৃতিচারণের মাধ্যমে এসেছে। কাহিনির স্থান সুন্দরপুর, কলকাতা, সিঙ্গাপুর ও বিন্মমুনির দ্বীপে পরিব্যাপ্ত। তবে একাধিক স্থানে একই কালে ঘটনার বিন্যাস দেখানো হয়নি। স্থানগুলি ধরে একাধিক্রমে ঘটনা এগিয়েছে। ঘটনার শেষে কলকাতায় আবার কাহিনির স্থান ফিরে এসেছে। সেই হিসাবে ঘটনাও প্রায় বৃত্তাকারে সূচক থেকে সমাপ্তি বিন্দুতে এসে মিলেছে। কাহিনির চরিত্রগুলিও সরল ধরনের। অভিযাত্রার নাটকীয়তা, বিপজ্জনকতা এই জাতীয় রচনার বৈশিষ্ট্য। তাই চরিত্রগুলি

অভিযানের উপযোগী করে কেবল নির্মিত হয়েছে। উপন্যাসের চরিত্রসুলভ বহুস্তরিকতা এতে লক্ষ করা যায় না। সুশীল, সনৎ, জামাতুল্লা, ইয়ার হোসেন সমস্ত চরিত্রই Flat ধরনের। অ্যাডভেঞ্চার গল্পের উপযুক্ত এক একটি চরিত্র হিসাবে এরা নির্মিত। যেমন সুশীল, সনৎ দুঃসাহসী তরুণ, জামাতুল্লা এদের উপযুক্ত সহচর নাবিক। ইয়ার হোসেন ও তার দলবল এদের সহযাত্রী হলেও, প্রতিস্পর্ধীসুলভ চারিত্রিক নির্মাণ এদের। এছাড়াও আছে গুপ্ত সমিতির কিছু লোকজন। যারা এখানে সুশীলদের দলের প্রতিপক্ষ হিসাবে নির্মিত হয়েছে। এই সমস্ত চরিত্র ও ঘটনার সমাহারে যে প্লটটি তিনি নির্মাণ করলেন তা কতখানি অ্যাডভেঞ্চার সুলভ হলো তা আমাদের বুঝে নেওয়ার দরকার আছে।

ভালো অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির মূল উপাদান হবে অভূতপূর্ব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ও নাটকীয় উৎকণ্ঠা। আলোচ্য উপন্যাসের ঘটনা পঞ্চাঙ্ক নাটকের মতোই এগিয়েছে। ঘটনার Exposition সুন্দরপুর গ্রাম, সুশীলের নিস্তরঙ্গ, নিরুপদ্রব জীবনযাপন; পুরুষানুক্রমে যে জীবনযাপনের ঐতিহ্য সে লাভ করে এসেছে। বাড়িতে বসেই তার সাতপুরুষ খেয়েছে। কোনোদিনই জীবনযাপনের তাগিদে তাদের বাইরে শ্রম করতে হয়নি। অপরিচিত জীবনের সঙ্গে বেঁচে থাকবার সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়নি।

সেই জীবনে প্রথম আঘাত লাগে তাদের দৌহিত্র বংশের অহমিকা প্রদর্শনের কারণে। রায়দের কালীপুজো, মুস্তাফিদের দুর্গাপুজোর তুলনায় অনেক বেশি আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। রায়দের সম্পন্নতার বিপ্রতীপে আসে মুস্তাফিদের নিশ্চেষ্টতা, আলস্য, কূপমণ্ডুকতার প্রসঙ্গ। যা আহত করে ম্যাট্রিক পাস সুশীলের অহংকে। নিজের জীবনের সদর্থক অস্তিত্বটিকে অনুধাবন করতে সুশীল চলে কলকাতা মহানগরীতে। ঘটনার Rising action-এর এখানেই শুরু। কলকাতা শহরে আকস্মিকভাবেই এক হতাশার মুহূর্তে তার সঙ্গে দেখা হলো জামাতুল্লা খালাসীর। সামান্য আলাপের পরেই সে জানাল তার অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথা। আপাত অবাস্তবকে সুশীল হয়তো মেনে নিল তার জীবনের অকিঞ্চিৎকরতা ও একঘেয়েমির বিপরীতে। কলকাতা শহর থেকে সুলু সী তে অবস্থিত সেই অজানা দ্বীপের কল্পনা করাও দুষ্কর। জামাতুল্লা সীলমোহর, পদ্মরাগমণি বিষয়টি সম্পর্কে আশ্বস্ত করে সুশীলকে। অভিযানে যাওয়ার জন্য সুশীল মনস্থির করতেই প্রতিপক্ষ শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। জামাতুল্লাকে মৃত্যুর আশঙ্কাতেও পড়তে হয়। সুশীলের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কারণে সে রক্ষা পায়। সুশীলের পরিচিত এক ভদ্রলোক বিচিত্র নক্সায় অঙ্কিত সীলমোহরটি দেখে সেটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে সুশীলকে নিঃসন্দিহান করলেন। খ্রিস্টীয় নবম শতকের পূর্বের একটি স্থানের সন্ধিৎসায় সুশীলের মন উদ্বেল হয়ে উঠল। লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশুনার পর প্রাচীন চম্পা রাজ্যের সমৃদ্ধি, সংস্কৃতি

ও ইতিহাস তাকে যেন সম্মোহিত করল। জামাতুল্লার কাছে গুপ্তধনের আকর্ষণ প্রধান। কিন্তু সুশীলকে হাতছানি দিতে থাকে যেন বিলীয়মান এক সভ্যতার নিদর্শন। সেই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে সংগ্রহ করে সে দু-হাজার টাকা রাহা খরচ। পাড়ি দেয় তারা তিনজন—সুশীল, সনৎ আর জামাতুল্লা সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়েও পদে পদে শঙ্কা। তাদের যাত্রাপথের প্রধান সহায়ক জামাতুল্লার বন্ধু এক প্রাক্তন বোম্বেটে ইয়ার হোসেন। কিন্তু সেই ইয়ার হোসেনের রূঢ়তা, ধূর্ততা, আধিপত্য স্থাপনের প্রচেষ্টা একটা সঙ্কটময় পরিস্থিতি তৈরি করেছে। কাহিনিতে উৎকণ্ঠা সঞ্চার করেছে। তার সঙ্গে সিঙ্গাপুর বন্দর শহরের অভিনব পরিবেশ পাঠকের কাছে রোমাঞ্চকর বলে মনে হয়। একদিকে সেখানে দিগন্তপ্রসারী সমুদ্র অপরদিকে এই এলাকার অপরাধ প্রবণতা—এই নিয়ে সিঙ্গাপুরের প্রেক্ষাপট নির্মিত। সেখানেই একটি কিউরিও দোকানে তাদের সীলমোহরের ছাপের মতোই আঁকা একটা ছুরি তারা দেখতে পায়। দোকানের মালিকের কাছে সেই প্রাচীন নগরী আর গুপ্তধনের কথা তারা শোনে। আবার সেই গুপ্তধনের সন্ধানে রত একটা গুপ্ত সমিতির কথাও তারা জানতে পারে। এরা অন্যদের হাতে এই চিহ্ন দেখলে তাদের হত্যা করতে উদ্যত হয়। অথচ দোকানের মালিক মনে করে আসলে সেই নগরী ও গুপ্তধন আসলে অলীক কল্পনা, না হলে এতদিনে কেউ না কেউ তার সন্ধান পেত। এমনিভাবে আশা-নিরাশার দোদুল্যমানতা ও বিপদের আশঙ্কা নিয়ে ঘটনাক্রম এগিয়ে চলে। সুলুসীতে তারা ভেসে পড়ে চীনা জাঙ্ক নিয়ে। পথের সেই বিপদসঙ্কুলতা এই কাহিনিতে অতিরিক্ত উত্তেজনা সঞ্চার করে। সমুদ্রে দিক্‌ভ্রান্ত হওয়া, ভয়ংকর ঢেউ আর তুফানের মোকাবিলা করা, ডুবো পাহাড়ে জাঙ্কের ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা, পদে পদে বিপদ ছড়ানো। সেই সমস্তকে অতিক্রম করে তারা অবশেষে পৌঁছায় তাদের অভীষ্ট দ্বীপে। সেখানেও চলার পথে অজস্র বাধা। তাঁবু ফেলবার জায়গা অপ্রতুল। ভয়ানক ঘন জঙ্গলের মধ্যে বড়ো বড়ো দোলানো লতার তলায় ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে রাত্রিবাস করতে হবে। সেখানকার জঙ্গলে তিনরকমের জীবেরই সংখ্যা বেশি—বড়ো বড়ো রক্তশোষক জোঁক, বিষধর সাপ, মৌমাছি। মাঝে মধ্যেই বৃষ্টি। এরকমই মাঝে মধ্যে গর্জন শোনা যায় বুনো হাতি বা বাঘেরও। তারই মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে জঙ্গল ও সমুদ্র থেকে শিকার করে তারা অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। তবে ইয়ার হোসেনের লোকবল ও অভিজ্ঞতা তাদের নানাভাবে সাহায্য করেছে। বেশ কয়েকদিন পর তারা প্রাচীন নগরীর প্রবেশদ্বার দেখতে পায়। নগরের সামনের পরিখায় কুমীরের আক্রমণে মারা যায় ইয়ার হোসেনের দলের একটি লোক। এরপর আরও তিনদিনের চেষ্টায় ইয়ার হোসেনকে এড়িয়ে তারা তিনজন পৌঁছে যায় প্রাচীন নগরীর মন্দিরের গর্ভগৃহে। ঘটনার Climax সেখানে, যেখানে গুপ্তধনের ভাণ্ডার তারা দেখতে পায়

আর তার সঙ্গেই গুপ্ত পয়ঃপ্রণালীর জলে সেই ধনভাণ্ডার তলিয়ে যায়, সঙ্গে মৃত্যু হয় সনতের। ঔপন্যাসিক এরপর ঘটনাজাল আর প্রলম্বিত করেননি—Falling action অতি সংক্ষিপ্ত। তারা নির্বিঘ্নে আবার ফিরে এলো। Catastrophe তে Poetic justice, স্বল্প কিছু মূল্যবান রত্ন যা তারা আনতে পেরেছিল তার সুষম বণ্টন আর সুশীলের অনন্য এক অভিজ্ঞতার সঞ্চয়, যা তার জীবনকে অর্থবহ করল।

ঘটনার পরিবেশ-পরিস্থিতি নির্মাণ এই ধরনের রচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। সুন্দরপুর, কলকাতার রেড রোডের পরিবেশ থেকে সিঙ্গাপুরের বন্দর কিংবা অজানা দ্বীপ সকল ক্ষেত্রেই লেখক বর্ণনায় বিভিন্ন পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষত, অজানা দ্বীপের প্রতিবেশ বর্ণনা তিনি নানাভাবেই করেছেন, যেহেতু এটি মূল বর্ণিতব্য। দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা এইরকম—

> সুশীল ও সনৎ দ্বীপের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ ধরনের ঘন বনানী এ পর্যন্ত তারা কোথাও দেখেনি— রীতিমতো ট্রপিক্যাল অরণ্য যাকে বলে...জলের ধার থেকেই অপরিচিত গাছপালা নিবিড় বন আরম্ভ হয়েছে— বনস্পতি মাতার বড়ো বড়ো গাছের গায়ে অর্কিডের ফুলগুলি সুগন্ধে প্রভাতের বাতাস মাতিয়েছে— মোটা মোটা লতা দুলছে এগাছ থেকে ওগাছে। কত রঙের প্রজাপতি উড়ছে— সামনে সুনীল সমুদ্র প্রস্তরাকীর্ণ তীরভূমিতে এসে সজোরে ধাক্কা মারছে...(পৃ. ১০৩৬)

কিংবা আর একটি বর্ণনা—

> আজ সে (সুশীল) সত্যই প্রত্যক্ষ করলে এমন বন, যা চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন, পড়ন্ত বেলায় কেবল সুউচ্চ বনস্পতিরাজির শীর্ষদেশ অস্তমান সূর্যের রাঙা আলোয় রঞ্জিত হয় মাত্র। ক্বচিৎ নিবিড় লতাঝোপের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো, চাঁদের আলো সামান্য মাত্র পড়ে, নতুবা সকল সময়েই গোধূলি দিনমানে। চিরগোধূলির জগৎ এটা যেন। (পৃ. ১০৩৭)

সেই অরণ্যের বিপদসংকুলতার বর্ণনা এইরকম—

> এরই মধ্যে গোধূলি গিয়ে যেন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে বনে। কিছুক্ষণ পরে দিক ঠিক করে তাঁবুতে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব হয়ে পড়বে। আরও কিছুক্ষণ কাটল, শেয়ালের দল বনের মধ্যে ডেকে উঠল—একটু পরেই বন্য হস্তীর বৃংহতি অরণ্যভূমি কাঁপিয়ে তুলবে, হায়েনার অট্টহাসিতে বুকের রক্ত শুকিয়ে দেবে। (পৃ. ১০৩৮)

প্রাচীন নগরীর স্থাপত্য বর্ণনা—

> মন্দিরের সামনে বড়ো চত্বরের কাছে এলো—কিন্তু সামনেই গোপুরমের মতো উঁচু পাইলন টাওয়ার।... গোপুরম ছাড়িয়ে মন্দিরের দেওয়াল, বিকটাকার দৈত্যের

> মুখের মতো সারি সারি অনেকগুলো মুখ দেওয়ালের গায়ে বেরিয়ে আছে...মন্দিরের বিভিন্ন কুঠরি। প্রত্যেক কুঠরির দেওয়ালে সারবন্দি খোদাই কাজ। (পৃ. ১০৪৩)

সুশীলের এই স্থাপত্য সম্পর্কে অনুভূতি—

> ভারত! ভারত! কত মিষ্টি নাম, কী প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্য ভাণ্ডার! তার নিজের দেশের মানুষ একদিন কম্পাস-ব্যারোমিটার যুগে সপ্ত সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে এখানে এসে হিন্দুধর্মের নিদর্শন রেখে গিয়েছে, তাদের হাতে গড়া এই কীর্তির ধ্বংসস্তুপে দাঁড়িয়ে গর্বে ও আনন্দে সুশীলের বুক দুলে উঠল। বীর তারা, দুর্বল হাতে অসি ও বর্শা ধরেনি, ধনুকে জ্যা রোপণ করেনি—সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে— এই অজ্ঞাত বিপদসঙ্কুল মহানগর—হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজা উড়িয়ে দিগ্বিজয় করে নটরাজ শিবের পাষাণ দেউল তুলেছে সপ্তসমুদ্র পারে। (পৃ. ১০৪৪)

উপন্যাসের মধ্যে সেই প্রাচীন চম্পা নগরীর সভ্যতা, স্থাপত্য কৌশল প্রভৃতির অত্যন্ত সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। যে মহান সভ্যতার বিলুপ্তপ্রায় ধ্বংসাবশেষ তারা দেখল, তার মহনীয়তা লেখক বারে বারে এখানে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করতে চেয়েছেন। এই বর্ণনার সূত্র ধরে পাঠকের সামনে এক অদৃষ্টপূর্ব জগত উন্মোচিত হয়ে ওঠে। বর্ণনার মুন্সীয়ানায় এই অভিযানের শরিক হয়ে ওঠে যেন সকল পাঠক।

গুপ্তধনের সন্ধানে অভিযান, অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসের খুবই সাধারণ বিষয়। তবে প্রচলিত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির তুলনায় বিভূতিভূষণের অ্যাডভেঞ্চারের বিশিষ্টতা এইখানেই যে তিনি অভিযাত্রার রোমাঞ্চকেই শুধু ব্যবহার করেননি, নিছক মানুষের কর্মপ্রচেষ্টাকেও ব্যাখ্যা করেননি; এই সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে প্রকৃতির অমোঘ বিধান, মানুষের বিশিষ্ট জীবনদর্শন এইসব বিষয়গুলিকেও তিনি জড়িয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিকসুলভ টেকনিকে—বিশিষ্ট অনেক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে যা দৃষ্ট হয় না। শুধু যাত্রাপথের উত্তেজনা নয়, অভিজ্ঞতালব্ধ গভীর জীবনোপলব্ধিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আলোচ্য উপন্যাসে সুশীল ও সনৎ চরিত্র দুটির বৈপরীত্য এখানে সূচিত হয়েছে। সুশীল, এই অ্যাডভেঞ্চারে যোগ দিতে চেয়েছে জীবনের কোনো নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কারণে। তার জীবনের সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডুকতা ইত্যাদি থেকে সে মুক্তি চেয়েছে। সেই মহান ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শনের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের অধঃপতিত বর্তমান তাকে পীড়িত করেছে। গুপ্তধন বা তার অর্থ তার কাছে অধিক গুরুত্ব পায়নি। জানবার আগ্রহই হয়েছে প্রধান। বিপরীতে সনৎ তার হঠকারী বুদ্ধি ও বয়সের চাপল্য সংযত করতে না পারায় বারে বারে বিপদে পড়েছে এবং শেষাবধি তার মৃত্যু হয়েছে।

তবু 'হীরামাণিক জ্বলে' বিভূতিভূষণের অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয়। এর আগেই লিখিত 'চাঁদের পাহাড়'কেই এই জাতীয় রচনার সফলতর সৃষ্টি

বলা যেতে পারে। 'চাঁদের পাহাড়'-এর প্রেক্ষাপট আরও বড়ো, কাহিনিতে অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ সঞ্চারিত হয়েছে তুলনায় বেশি। 'চাঁদের পাহাড়' পড়বার পর 'হীরামানিক জ্বলে'র প্লট হয়তো বা খানিকটা পূর্ব নির্ধারিত বলে মনে হয়। কখনো বা মনে হয়, পদে পদে যে বিপদের আশঙ্কা এই জাতীয় রচনায় অভিপ্রেত, লেখক নিজেই যেন সেই রাশ ধরে রাখছেন, পাঠককে উৎকণ্ঠার শেষ সীমায় যেতে দিচ্ছেন না। ইয়ার হোসেন চরিত্রটি নির্মাণে কিংবা গুপ্ত সমিতির সদস্যদের পরিকল্পনায় লেখকের সেই দুর্বলতাটুকু পাঠকের নজর এড়ায় না।

তবে বলা যায়, শ্বাসরোধকারী উত্তেজক ঘটনার নিরিখে না হোক, বৃহত্তর জীবনের হাতছানির রূপনির্মাণে রচনাটি যথাযথ হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটিকে লেখক এখানে চমৎকার ব্যবহার করেছেন। নৈমিত্তিকতার বাইরে বেরিয়ে অজানার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার রসভাষ্যে রচনাটি সার্থক।

শেষ পরিণতিতে 'হীরামাণিক জ্বলে' নিছক কিছু রত্নের নাম হয়ে থাকেনি। মানুষের অমূল্য অভিজ্ঞতার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

তথ্য নির্দেশ

উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত পৃষ্ঠা সংখ্যা 'বিভূতি উপন্যাস সমগ্র : ১', দ্বিতীয় কামিনী সংস্করণ, ২০১১, কামিনী প্রকাশনা অনুসারে প্রদত্ত।

‘অথৈ জল’ : নীতিবাগীশের মূর্খামি অথবা সংযমীর ভেসে যাওয়া

পার্থ ভোঁড়

উত্তম পুরুষে লেখা ‘অথৈ জল’ (১৯৪৭ খ্রী.) উপন্যাসে কথকই কেন্দ্রীয় চরিত্র। অন্যান্য চরিত্র ও ঘটনার উপস্থিতি এবং কখনো কখনো flash back-এর ব্যবহার কথক শশাঙ্ক (মুখার্জি) ডাক্তার চরিত্রটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে সহায়তা করেছে। উপন্যাসে কথক চরিত্রের জীবনে যে বাঁক এসেছে সেটাই মুখ্য উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

সুশিক্ষিত, ডাক্তার শশাঙ্ক আচার-ব্যবহারে ভদ্র-সভ্য। তবে জীবনে নিয়ম-নীতি মেনে চলেন বলেই তাঁর সামনে সনাতনের মুখে অন্য ডাক্তারের নিন্দা নীতিবিরুদ্ধ বলে মনে করেন তিনি—

> ...আমি অন্য একজন ডাক্তারের নিন্দাবাদ আমার সামনে হোতে দিতে পারি না। আমাদের ব্যবসার কতকগুলো নীতি আছে, সেগুলো মেনে চলাতেই প্রকৃত ভদ্রতা।[১]

স্ত্রী সুরবালা ও ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখী সংসারী শশাঙ্কবাবুর কাছে ডাক্তারিটা নিছক পেশা নয়, রুগির সেবা তাঁর কাছে মানবিক কর্তব্যও বটে। তাই পাশের গ্রামে শক্ত রুগি থাকলে কল না দিলেও তিনি স্বেচ্ছায় যান, আবার কল দিলে অনেক সময় কম ফীতেও রুগি দেখতে যেতে সম্মত হন, কারণ ‘গরীব লোকের কথা স্বতন্ত্র’। রুগি দেখার পর অন্য ডাক্তারের ডিসপেনসারির ওষুধ না দিয়ে নিজের ডিসপেনসারির ওষুধ দেন এই কারণে নয় যে অতিরিক্ত লাভ করবেন, আসলে তিনি জানেন—

> ওষুধের দামে ভিজিটের তিনগুণ আদায় করে থাকে এইসব পল্লীগ্রামের ডাক্তার...আমি তার প্রশ্রয় দিই নে। পাঁচ আনার ওষুধের দাম আদায় করে দু টাকা।[২]

ডাক্তারি পেশায় যেমন তিনি দায়িত্ববান তেমনি গ্রাম তথা সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনেও তিনি আগ্রহী। তাই রামপ্রসাদ চাটুয্যের সঙ্গে বাল্যবিধবা শান্তি (বর্তমান বয়স বাইশ-তেইশ বছর)-র অবৈধ সম্পর্ককে প্রশ্রয় দিতে পারেন না, বলেন—‘দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না, দেবোও না কখনো।’ আর তাই শীঘ্রই ব্যবস্থা নিতে পল্লিমঙ্গল সমিতির সভাপতি রূপে তিনি সমিতির সভ্যদের ডাকিয়ে রামপ্রসাদ চাটুয্যেকে যথোপযুক্ত শাসনের উপায়ও বাতলে দেন। প্রকৃত নীতিবাদী বলেই সমাজের কল্যাণার্থে ডাকা সভায় ব্যক্তিগত নিন্দা-অভিযোগের উত্থাপনকে প্রশ্রয় দেননি তিনি।

১৩ বছরের শান্তির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল পঞ্চাশ বছরের বুড়োর। দু'বছরের মধ্যে সেই স্বামী মারা যাওয়ার পর আজ শান্তির এই প্রণয় সম্পর্ক তথাকথিতভাবে অবৈধ হলেও জীবনের স্বাভাবিকতায় তা কি একেবারেই অসঙ্গত—এই প্রশ্নের কোনো স্থায়ী সমাধান কথকের কাছে না থাকলেও ব্যাপারটা কিছুটা হলেও তিনি বুঝতে পেরেছেন। তাই বাল্যবিধবা, নিতান্ত দরিদ্র, পরিপূর্ণ যুবতি শান্তির দিক থেকে তাঁর ভাবনা—'এ অবস্থায় কেউ যদি মেয়েটিকে প্রলোভন দেখায়—বিপথে পা দিতে সে মেয়ের কতক্ষণ লাগে?' শান্তি 'প্রলোভনে'ই পা দিক কিংবা প্রকৃত প্রেমের পথেই থাক না কেন, বিধবা নারীর এমন কাজ সমাজের দৃষ্টিতে অবশ্যই গর্হিত। আর সেজন্যই শুদ্ধ চরিত্রের শশাঙ্ক ডাক্তার শান্তির সঙ্গে রাস্তায় নির্জনে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করেন, চরিত্র কলঙ্কিত হওয়ার আশঙ্কায়। কারণ—

> শান্তির সঙ্গে নির্জ্জনে কথাবার্ত্তা বলতে দেখলে কেউ কিছু মনেও করতে পারে। ও মেয়ের চরিত্র কেমন জানতে আর লোকের বাকী নেই।[৩]

—সমাজ রক্ষক শশাঙ্ক ডাক্তার শান্তির এই অবৈধ সম্পর্কের অবসান চান, আবার নীতিবাদী বলেই গর্ভবতী শান্তির গর্ভপাত করা থেকেও বিরত থাকেন। অবশ্য এ ব্যাপারে শান্তির চেয়ে রামপ্রসাদের উপরই তাঁর রাগ বেশি। রামপ্রসাদের উপর তাঁর রাগের আর একটি কারণ, সে 'নাবালক বৈমাত্র ভাইগুলির ন্যায্য সম্পত্তি' তাদেরকে ফাঁকি দিয়ে একা ভোগ করে, যা শশাঙ্কবাবু মেনে নিতে পারেন না—'আমি গ্রামে বসে থাকতে কোনো অবিচার হোতে পারবে না।' স্ত্রী সুরবালা শশাঙ্ক ডাক্তারকে উপদেশ দিয়েছিল যে, ঈশ্বর পাপীর বিচার করবেন কিন্তু তাই বলে গ্রামের পল্লিমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী কেবলমাত্র নিজের কাজ ডাক্তারি নিয়েই ব্যস্ত থেকে গ্রামের নীতি নষ্ট হতে দিতে পারেন না, কারণ নিজেই জানিয়েছেন—

> ডাক্তারি আমার ব্যবসা, কিন্তু সমাজের প্রতিও আমার একটা কর্ত্তব্য আছে, সেটা খুব বড়।[৪]

এই কর্তব্যবোধেই দারোগাকে দিয়ে রামপ্রসাদকে এমন ভয় দেখলেন যে সত্যই সে গ্রাম ছেড়ে গেল, অবশ্য তারপর থেকে শান্তিকে ও আর এ গ্রামে দেখা যায়নি।

বাবার ইচ্ছার প্রতিবাদ না করে কথক নিজের গ্রামে ডাক্তারি শুরু করেছিলেন, কারণ গ্রামের লোকের উন্নতির ইচ্ছাটা তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই। মঙ্গলগঞ্জের লোকের পীড়াপীড়িতে তিনি সেখানেও একট শাখা ডাক্তারখানা খুলেছেন। রুচিবোধসম্পন্ন, মার্জিত এই শশাঙ্ক ডাক্তার একদিন মঙ্গলগঞ্জে ডিস্‌পেনসারির কাজ সেরে ভূষণ দাঁ-র অনুরোধে সেখানকার 'ঝুলনের বারোয়ারি'তে থাকতে রাজি হলেন খেমটা নাচ দেখার লোভে নয়; আসলে নিয়ম-নীতি আর কর্তব্যের বেড়াজালে তাঁর প্রাণও ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছিল। তাই তাঁর সহজ স্বীকারোক্তি—

আমার তত থাকবার ইচ্ছা নেই। খেমটা নাচ দেখবার আমি পক্ষপাতী নই, তবুও...আজ বরং একটু থেকে দেখেই যাই। অনেকদিন কোন কিছু দেখিনি। একঘেয়ে ভাবে ডাক্তারিই করে চলচি।[৫]

খেমটার আসরে দর্শকাসনে বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে উপবিষ্ট কথক দুই খেমটাওয়ালীর মধ্যে, তাঁদের কাছে আসতে থাকা নৃত্যরত বড় মেয়েটিকে কিন্তু অন্যান্য বিশিষ্টদের মতো 'প্যালা' যে দিলেন না তার মূল কারণ, কথক মনে করেন না যে 'খেমটার আসরে বসে খেমটাওয়ালীকে প্যালা দেওয়াটা খুব একটা ইজ্জতের কাজ' বরং তাঁর মনে হয় 'ওদের দেখাদেখি আমি যদি এই নর্ত্তকীদের পাদপদ্মে এতগুলো টাকা বিসর্জ্জন দিই তবে সে হবে ঘোর নির্বুদ্ধিতার কাজ।' কিন্তু বড়ো মেয়েটির পর যখন অল্পবয়স্ক নর্তকীটি তাঁর কাছে এসে গান গাইতে লাগল তখন তিনি মেয়েটির রূপে ও গুণে এমনই মুগ্ধ হলেন যে বিস্ময়ের ঘোরে সেই 'নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ'টিই করে ফেললেন তাকে দু'টাকা 'প্যালা' দিয়ে। পরে মেয়েটিকে আবার দু'বার প্যালা দিতে গিয়েও যে দিলেন না তার কারণ তা বোকামি হয়ে যাবে বলে নয়, আসলে 'পাছে আবদুল হামিদ কি গোবিন্দ দাঁ কিংবা প্রহ্লাদ সাধুখাঁ কিছু মনে করে।' আমরা বুঝতে পারি, মেয়েটির প্রতি একটা দুর্বলতা বা আকর্ষণ কাজ করছে বলেই তাঁর মনে এই ভাবনা আসছে। আর তাই নাচ শেষে গভীর রাতে ঘুমের মধ্যেও তিনি স্বপ্নে দেখেন—'সেই অল্পবয়সী মেয়েটি আমার চোখের সামনে সারারাত নাচতে লাগলো।' মেয়েটির প্রতি প্রবল আকর্ষণের কারণেই, মঙ্গলগঞ্জের বারোয়ারিতে পরের দিন তাঁর আমন্ত্রণ না থাকলেও, এমনকি সেদিন ওখানে তাঁর ডিসপেনসারির দিন না হলেও তিনি স্বেচ্ছায় যান এবং এই প্রসঙ্গে বলেন, 'এই বোধহয় জেনে শুনে প্রথম মিথ্যা কথা বললাম—সুরবালাকে'। পাঠক বুঝতে পারেন, এই বোধহয় নীতিবাগিশ ডাক্তার প্রথম নিজের সততার নীতির সঙ্গে সঙ্গে মান-সম্মানও বিসর্জন (বিনা আমন্ত্রণে অন্যত্র অনুষ্ঠানে যাওয়া) দিলেন অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণে।

খেমটার আসরের দ্বিতীয় দিনে অল্পবয়সী মেয়েটি তাঁর সামনে আসতেই তিনি সবার আগে দু-টাকা প্যালা দিয়ে দিলেন। পাঠকের মতো তাঁর মনেও প্রশ্ন জাগে—'আব্দুল হামিদের চোখে বড় হবার জন্যেই কি পকেট পুরে টাকা এনেছি প্যালা দেবার জন্যে'? না, তা নয়। তাহলে একেবারে প্রথমে তাঁর ভাবনায় একথা আসতো না যে 'খেমটাওয়ালীকে প্যালা দেওয়াটা খুব একটা ইজ্জতের কাজ' নয়, বরং ' ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ'। তাছাড়া, বড়ো মেয়েটিকেও আব্দুল হামিদরা তাঁর 'নাকের সামনে' টাকা প্যালা দিয়েছিল কিন্তু তিনি তো তখন আব্দুলের চোখে বড় হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাকে প্যালা দেননি। আসলে আব্দুল হামিদের চোখে বড় হবার জন্য নয়, ঐ কিশোরী নর্তকীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার চোখে বড়ো হতে চান বলেই পকেট পুরে টাকা এনেছেন প্যালা দিতে।

কথকের দেখা মেয়েদের মধ্যে এই অল্পবয়সী 'কিন্নরকণ্ঠী' নর্তকীটিই প্রথম স্থান পায়। মেয়েটিকে যেমন কথকের ভালো লাগে তেমনি মেয়েটির বারবার তাকানোতে বিপরীত দিক থেকে সেই ভাব অনুভব করে কথকের 'অত্যন্ত আনন্দ হোল'। যে আনন্দের তীব্রতা থেকে তিনি একথাও ভাবতে পারেন—'আমি সব যেন বিলিয়ে দিতে পারি যা—কিছু আমার নিজস্ব আছে।' এই কিশোরীর কাছে আত্মসমর্পণের বা আত্মবিসর্জনের সুনির্দিষ্ট সূচনা যেন এখানেই ঘটে গেল। মেয়েটির প্রতি তাঁর এই তীব্র আকর্ষণ 'উগ্র মদের নেশার মত...জীবনভোর এর মধ্যে ডুবে থাকলেও কখনো অনুশোচনা আসবে না' কথকের। আমরা বুঝতে পারি, এই কিশোরী পান্না (সুধীরাবালা)-র সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্বে কথকের জীবনে শান্তি ছিল, স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, কিন্তু তৃপ্তি ছিল না। সামান্য নর্তকী পান্না তাঁর 'অতি সাধারণ একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন' জীবনে 'নতুনের স্বাদ' এনে দিয়েছে। যে কারণে গ্রামের পাঁচজনের কাছে সম্ভ্রম ও সম্মানের যোগ্য, ভদ্র-শিক্ষিত ডাক্তার নৌকোয় শুয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে এমন কল্পনাও করতে পারেন—

> ডাক্তারি ছেড়ে দিয়েছি, সংসার ছেড়ে দিয়েছি, পান্না যদি আমাকে চায় তবে ওকে নিয়ে চলে গিয়েছি সুদূর পশ্চিমে কোনো অজ্ঞাত ছোট শহরে। পান্নার সীমন্তে সিন্দুর,...এখানে আমার বংশগৌরব আমার সব স্বাধীনতা হরণ করেছে।[৬]

মর্যাদাবোধসম্পন্ন, সম্ভ্রান্ত, নীতিবাগীশ ডাক্তারের এক নতুন ও অবৈধ জীবনে প্রবেশের দ্বারোন্মোচন ঘটল এখানেই, পান্নাকে তিনি কোনোভাবে হারাতে রাজি নন এবং এইজন্য একের পর এক মিথ্যা বলতেও তাঁর বিবেকে বাঁধে না। এমন কি কাপাসডাঙ্গায় রুগির অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও ডাক্তার সেখানে রুগি দেখতে গেলেন না কারণ পান্নার সঙ্গে তাহলে আর দেখা হবে না। তাই পান্নাকে রাত্রে কথকের ডিস্‌পেনসারিতে পৌঁছে দিয়ে তাঁর মনকে আরও দুর্বল করে দেওয়ার জন্য আব্দুল হামিদ ও গোবিন্দ দাঁকে কিছুটা দায়ী হয়তো করা চলে, কিন্তু মূল দায় কথকের নিজের। তিনি কখনোই মেয়েটির কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে চাননি। সেকারণেই ডিসপেনসারি থেকে মেয়েটিকে তাঁর চলে যেতে বলা। কেবলমাত্র অন্য কেউ জেনে যাবার আশঙ্কাতেই তাঁর এই মনের ভাব মেয়েটি বুঝতে পেরেছে, অনুভব করে তিনি আশ্বস্ত হন।

পান্নার পূর্বে অন্য কোনো নারীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় সম্পর্কের ব্যাপারে কথকের স্বীকারোক্তি—'ভগবান জানেন সুরবালা ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের দিকে কখনো খারাপভাবে চোখ মেলে চাইনি বা প্রেম করিনি' কারণ যে শুধু 'পাড়াগাঁয়ে ওসব নেই' বা 'সুযোগ সুবিধার অভাব' তাই নয়, তাঁর মতো 'নীতিবাগীশের এদিকে রুচিও ছিল না।' কিন্তু তাঁর 'বুভুক্ষু মন' এতদিনে জেগে উঠেছে রূপসী কিশোরী পান্নার স্পর্শে। সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধে যিনি নিবারণ ঘোষের ভাইপো কিংবা রামপ্রসাদকে শাসন

করেছেন অবৈধ সম্পর্কের অবসান ঘটাতে সেই ডাক্তার শশাঙ্কই আজ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন অন্য নারীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে। রামপ্রসাদ বা নিবারণ ঘোষের ভাইপোর চেয়ে তাঁর অন্যায় আরও বেশি। কারণ হরিদাস ঘোষের স্ত্রী বাইশ-তেইশ বছরের যুবতী, ব্যবসায়ী স্বামী 'মাসে দু'-একবার বাড়ি আসে কি-না সন্দেহ', পাশের বাড়ির নিবারণের ভাইপোর সঙ্গে তার প্রণয় তাই অবৈধ হলেও অস্বাভাবিক নয়, যেমন স্বাভাবিক বাল্যবিধবা শান্তির পরিপূর্ণ যৌবনকালে অবিবাহিত রামপ্রসাদের সঙ্গে প্রণয়; ঠিক ততটা সঙ্গত নয় যোল বছরের কিশোরীর সঙ্গে পঁয়ত্রিশ বছরের পরিপূর্ণ সংসারী রুচিশীল শিক্ষিত ডাক্তারের প্রণয়। কিন্তু প্রেম যে কোনো সুনির্দিষ্ট হিসেব মেনে চলে না সেটা ডাক্তার পূর্বে বোঝেননি বলেই তাঁর দৃষ্টিতে নিবারণ ঘোষের ভাইপো ও রামপ্রসাদ ছিল অন্যায়কারী, সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। যদিও বর্তমানে নিজে এ পথে এসে বুঝতে পারছেন, এই অবস্থায় মন কোনোরকম নিয়ম-নীতি মানে না। তাই তাঁর ভাবনায় পাই—

> বেচারী রামপ্রসাদের বোধ হয় এমনি অবস্থা হয়েছিল, তখন আমার অমন অবস্থা হয়নি, আমি ওর মনের খবর কেমন করে জানবো?[৭]

সংযমী, নীতিবাগীশ কথক, 'যে কখনও ছাত্রবয়সেও মেয়েদের ত্রিসীমানা মাড়ায়নি', 'অপূর্ব ধরনের রূপসী' না হলেও এক সামান্য কিশোরী নর্তকীর প্রতি এতটাই নেশাচ্ছন্ন যে তার জন্য স্বচ্ছন্দে সব কিছু খোয়াতে রাজি তিনি। কিন্তু সেটা যে তাঁর ভুল ছিল তা বোঝা যায় যখন পান্না তাঁর জীবন থেকে চলে যাওয়ার পর নিজের কৃতকর্মের অনুশোচনায় মাঝির অনুরোধেও শেষপর্যন্ত বাড়ি না যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি ভাবেন—

> যদি যেতাম বাড়ীতে মাঝির কথায়, তবে হয়তো ঘটনার স্রোত অন্য দিকে বইতো। কিন্তু আমি ডাক্তারি পাশ করেছিলাম বটে মেডিকেল কলেজ থেকে, তবুও আমি মূর্খ।...জীবনের জটিলতা ও গভীরতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই আমার।[৮]

খেমটার আসরের তৃতীয় রাত্রে তাই ঐ কিশোরীর 'মিনতি ও করুণ আবেদন' মাখা দৃষ্টি নিয়ে তার সঙ্গে কলকাতা যাওয়ার প্রস্তাব কথক প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি, কারণ 'পান্না যেন সুন্দরী মৎস্যনারী, অনেকদূরের অথৈ জলে টানচে আমাকে ওর কুহক দৃষ্টি'। কথক জানতেন, পান্না সুরবালার মতো 'দেবী' নয় কিন্তু বর্তমানে তিনি 'দেবী' চান না, তাঁর 'গোটা প্রথম যৌবন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে দেবীদের সংসর্গে', তাই আজ রূপ লাবণ্যে লাস্যময়ী 'বদমাইশ মেয়ে' পান্নাই তাঁর কাঙ্ক্ষিত। যদিও পান্না তাঁকে সত্যিই ভালোবাসে কি না এ ব্যাপারে তিনি কখনোই স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি।

পান্নাকে ভালোবেসে, পান্নার ভালোবাসা পেতে কথক সব ছেড়ে চলে আসেন ভবানীপুর অঞ্চলের ক্ষুদ্র গলিতে পান্নার বাসায়। কিন্তু এ বাসায় 'থাকা সম্ভব হবে না'

ভেবে কথক বাড়ি চলে আসেন এই কারণে নয় যে পল্লিটা 'খুব ভালো শ্রেণীর' নয়, আসলে ঐ বাসায় পান্নার মাসি কর্তৃক, পান্নার সঙ্গে তাঁর সহজ সম্পর্কে বাধা সৃষ্টিই ছিল কথকের বাড়ি ফিরে আসার মূল কারণ, আর তাই মঙ্গলগঞ্জের ডিস্‌পেনসারিতে পান্নার স্মৃতি তাঁকে যখন পুনর্বার পান্নার কাছে টেনে নিয়ে যায় তখন তিনি ঐ বাসায় থাকতে চাননি, পান্নাকে নিয়ে চলে যেতে চেয়েছেন সেখানে, 'যে রাজ্যে মাসী পিসীরা নেই।' কথক এ ব্যাপারেও সচেতন যে, তিনি যা করছেন সেটা সমাজগর্হিত, তাই পান্নাকে নিয়ে লেবুতলার এক ক্ষুদ্র গলির মধ্যেই তিনি বাসা ভাড়া নিলেন, যেখানে কেউ তাঁকে চিনবে না।

পান্নার প্রতি তাঁর তীব্র মুগ্ধতা মনের নিখাদ ভালোবাসা না কি সৌন্দর্যের মোহ? এ প্রসঙ্গে কথকের মন্তব্য—

> ওর মুখের সৌন্দর্য্য আমাকে এত মুগ্ধ করেচে যে ওর মুখের দিকে সর্ব্বদা চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।...ওর মুখের নেশা মদের নেশার মতই তীব্র আমার কাছে। বুঝচি মোহ আনচে। সর্ব্বনাশ করচে আমার,...কিন্তু ছাড়বার সাধ্য নেই আমার। ছাড়বোই যদি, তবে আর মোহ বলেচে কেন?[৯]

পান্নার প্রতি তাঁর 'মোহ' থাকলেও পান্নার তাঁর হৃদয়ে কোনো শ্রদ্ধার আসনে স্থান পায়নি। তাই বাড়িওয়ালা পান্নাকে কথকের 'স্ত্রী জেনে তাকে 'মাঠাকরুন' বলে সম্বোধন করলে কথকের ভাবনায় পাই—'পান্না নাকি মাঠাকরুন, মনে মনে হাসতে হাসতে এলাম।' কেবল একটি ক্ষেত্রে পান্না কথকের কাছে শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে তা হল, কথকের নিঃস্বতাকে তার 'অতি সহজভাবেই মেনে' নেওয়ার ক্ষমতা যা অনেক ভদ্রঘরের স্ত্রীদেরও থাকে না।

পান্নার সঙ্গে তাঁর এই নতুন জীবনে স্বচ্ছলতা নেই, সম্মান নেই কিন্তু এ জীবনে তিনি 'আমোদ ও তৃপ্তি' পেয়েছেন। তাই পান্নার সঙ্গে তিনি বাকি জীবন কাটাতে চান বলেই বর্তমানে সম্পূর্ণ বেকার কথকের কাছে খেমটা নাচ রুচিবিরোধী হলেও অর্থের প্রয়োজনে তিনি পান্নাকে মুজরা করতে দিতে সম্মত হন। এমনকি নিজেকে খেমটাদলের রাঁধুনী বামুন এবং পান্নাকে 'আমার মনিব' বলে অন্যের কাছে নিজের পরিচয় দিতেও তাঁর কোনোরকম কুণ্ঠা দেখা যায় না—'নেশা এমন জিনিস।' অর্থ উপার্জনের জন্য পান্না নাচের বায়না নিতে লাগল। কথক ওর সঙ্গে সর্বত্রই যান 'বাইজীর পেছনে সারেঙ্গীওয়ালার মত।' কিন্তু এর জন্য তাঁর 'মনে কোন কষ্ট নেই, কোন খেদ নাই।'

মাস তিন-চার পান্নার সঙ্গে এভাবে জীবন কাটার পর একদিন কথকদের বাসায় পুলিশ এল থানায় পান্নার মা'র অভিযোগের ভিত্তিতে—'নাবালিকা' পান্নাকে 'ওর মায়ের কাছ থেকে নিয়ে পালিয়ে' এসেছেন কথক। পান্না 'নিজের ইচ্ছেয় চলে এসেছে' বললেও পুলিশ কথককে তখনই 'রেহাই দেবে' বলে জানায় যদি পান্না তার মায়ের কাছে ফিরে যেতে রাজি হয়। পান্না কথকের কাছে জানতে চায়, 'তাহ'লে ওরা

তোমাকে কিছু বলবে না?' উত্তরে কথক জানান—'আমায় বলুক,...তোমাকে হয়রানি না করে।' একথা শোনার পর পান্না যেতে রাজি হয়। এখানে একটি বিষয় বোঝা গেল, নিজেকে 'হয়রানি' হতে হবে না জেনে পান্না অনেক বেশি নিশ্চিন্ত হয়, কথকের জন্য তার অতটা ভাবনা নেই, থাকলে সে চলে যেতে রাজি হত না। পান্নার প্রেম যে সাময়িক মোহ, কঠিন বাস্তব পরিস্থিতিতে নিজেকে নিরাপদ রাখতে সেই মোহ ঘুচে যেতে বেশি সময় লাগে না, তা এখানে স্পষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু কথক তাকে সহজে ভুলতে পারেননি, যদিও বুঝতে পেরেছেন নিজের ভুল—'ওসব মেয়ের ওই চরিত্র, কি বোকামি করেছি আমি এতদিন।' তাই শশীপদ সেঁকরা কর্তৃক পান্নার 'মায়াবিনী' বিশেষণ কথক শেষ পর্যন্ত সমর্থন করেছেন।

উপন্যাসের একেবারে শেষ অংশে পূর্বের জীবনেই বোধহয় ফিরে যেতে চেয়েছেন কথক। তাই পূর্ব চেনা সনাতনদাকে শহরে পান্না-বিহীন কথক জিজ্ঞাসা করেন স্ত্রী, ছেলেমেয়ের কথা—'সুরবালা ভালো আছে? ছেলেপিলেরা?' পান্নার প্রতি তাঁর মন যে নেশায় আচ্ছন্ন হয়েছিল, যেখানে স্ত্রী ছেলেমেয়ের কোনো স্থান ছিল না তাঁর ভাবনায় বা ক্রিয়াকলাপে, সেখানে তাঁর এই উপরোক্ত প্রশ্ন, ছেড়ে আসা পূর্বজীবনকে ফিরে পেতে চাওয়ার বাসনা থেকে উৎক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। আর এখানেই উপন্যাসের অসম্পূর্ণ সমাপ্তি ঘটে।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যের একটি বিশিষ্টতা হল, তাঁর কাহিনির চরিত্রেরা ভুল করলেও তা কখনও সেই চরিত্রের প্রতি পাঠককে সোচ্চার প্রতিবাদে কিংবা তীব্র বিরূপতায় উত্তেজিত করে তোলে না। 'অথৈ জল' উপন্যাস সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। তাই যে শশাঙ্ক ডাক্তার সমাজিক কর্তব্য পালনের প্রবল আগ্রহে তথাকথিত অবৈধ প্রণয় সম্পর্ক ভেঙে দিতে প্রয়াসী হন, পরবর্তীক্ষেত্রে তিনিই যখন স্ত্রী-পুত্রের দায়িত্ব পালন না করে তেমনই এক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তখন তাঁর প্রতি পাঠকের রাগ জানা স্বাভাবিক হলেও তা ঘটেনি। এর কারণ বিভূতিভূষণের উপস্থাপন কৌশলের গুণপনা। কথকের ভাবনায় বারবার পাই, পান্নার প্রতি প্রণয়মুগ্ধতা এতটাই তীব্র ছিল যে সে 'নেশা'য় অসহায়ের মতো আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তাঁর আর উপায় ছিল না। কথকের ভাবনায় এই স্বীকারোক্তিও বারংবার উঠে এসেছে যে, পান্নাকে ভালোবাসা তাঁর ভুল হয়েছে। সর্বোপরি পান্না বিরহে তাঁর তীব্র বেদনা এবং স্বাভাবিক সংসারী দায়িত্ববান মানুষের মতো স্ত্রী ছেলেমেয়ের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা—সব মিলিয়ে পাঠক তাঁর প্রতি বিরূপ না হয়ে বরং তাঁর বেদনায় সহমর্মী হয়ে ওঠেন, স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন—

> মনের ব্যাপারই এই। মনের ঠিক অবস্থায় না পড়লে কিছুতেই অন্যের মনের সেই অবস্থা সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা যায় না।[১০]

তাই কথককে শেষ পর্যন্ত আমরা অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে উৎসুক হয়ে উঠি না, বরং তা স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়ে কাহিনির রসাস্বাদন করি।

উৎসের সন্ধানে

১. বিভূতি-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, তৃতীয় মুদ্রণ : পৌষ ১৩৮৬, পৃ. ৩-৪
২. তদেব, পৃ. ৭
৩. তদেব, পৃ. ১০
৪. তদেব, পৃ. ১৬
৫. তদেব, পৃ. ২৮
৬. তদেব, পৃ. ৪৭
৭. তদেব, পৃ. ৬১
৮. তদেব, পৃ. ৬২
৯. তদেব, পৃ. ৮১
১০. তদেব, পৃ. ১২৭

সহায়ক গ্রন্থ

১. 'উপন্যাসের ঘরবাড়ি', জহর সেন মজুমদার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ২০০১।
২. 'কথাশিল্পের নানাদিক', অরুণকুমার বসু, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৬।
৩. 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৩।

‘ইছামতী’ : সহজ গভীর বহমান জীবনধারা

রণজিৎ অধিকারী

গল্প বলবার প্রবণতা ও শুনবার আগ্রহ থেকে যে শিল্পমাধ্যমের সৃষ্টি, তা বিবর্তিত হতে হতে কেমন উৎকর্ষতা ও বৈচিত্র্য লাভ করতে পারে সারা পৃথিবীর আধুনিক উপন্যাস শিল্পের খোঁজখবর নিলে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আরও একটি আশ্চর্যের ব্যাপার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ভাষায় যে শিল্পের জন্ম, মাত্র একশো বছরের মধ্যেই সেই শিল্পমাধ্যম সারা বিশ্বের উপন্যাস শিল্পের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠেছে এবং স্বীকার করতেই হবে যে মূলত ইংরেজি উপন্যাসের প্রভাবে বাংলা উপন্যাস শিল্প গড়ে উঠলেও ধীরে ধীরে এই প্রবল প্রভাব কাটিয়ে উঠে তা স্বতন্ত্র ও ভিন্নমুখী হয়ে উঠেছে।

বাংলা উপন্যাসের ধারায় অসংখ্য পাঠযোগ্য উপন্যাসের তালিকা করা গেলেও শিল্পোত্তীর্ণ ও বিশ্বমানের উপন্যাসের সংখ্যা অতি অল্পই। আবার শিল্পোত্তীর্ণ কিছু উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিল তার আদল বড্ড বেশি বিদেশি। তা ‘কপালকুণ্ডলা’র মতো অসাধারণ কাব্যিক উপন্যাসের কথা মাথায় রেখেও বলছি। ‘চোখের বালি’তে রীতি ভাঙবার একটা প্রবল প্রয়াস সত্ত্বেও তা কেবল কলকাতা শহরের উচ্চবিত্ত জীবনের মননের টানাপোড়েন-এর বিশ্বস্ত ছবি হিসেবেই অনন্য। তখনও পর্যন্ত অবহেলিত থেকে যাচ্ছিল কলকাতার বাইরের সুবিস্তৃত সুবিশাল নানা বৈচিত্র্য ও রঙ্গে ভরা গ্রামবাংলা, তার নদীবহুল রূপ, নানা জাতি-উপজাতি, অশিক্ষা-কুসংস্কারে মোড়া গ্রাম্যজীবন। দারিদ্র্যের কী কুটিল জটিল রূপ সেইসঙ্গে বর্ষায়, শরতে, হেমন্তে, শীতে, বসন্তে বদলে বদলে যাওয়া মাঠ-নদী প্রান্তরের কী অসামান্য রূপবৈচিত্র্য—এসব তখনও উপন্যাসের পটভূমি বা বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেনি (রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো ছোটোগল্প এর ব্যতিক্রম)। সম্ভাবনা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রেও আমরা এর প্রতিফলন দেখতে পাইনি।

এই বিচিত্র গ্রাম্যজীবনের কথারূপ খুঁজে পেতে আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে বিশ শতকের তিনের দশক পর্যন্ত। ‘মঙ্গলকাব্য’গুলিতে মধ্যযুগে আমরা যে জল-জঙ্গলাকীর্ণ বঙ্গদেশকে খুঁজে পাই তাকে আবার যথাযথভাবে খুঁজে পেলাম তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে। বাংলাদেশের সংঘাতহীন

অনাড়ম্বর যে গ্রাম্যজীবন তার যথাযথ রূপায়ণে বিদেশি কাঠামো যে বর্জনীয়, বরং প্রয়োজন সহজ সরল একটি কাঠামো, তা হয়তো অনেকটা অসচেতনভাবেই নির্মাণ করে ফেলেছিলেন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ঔপন্যাসিকেরা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধি আমরা লক্ষ করতে পারি 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'ইছামতী' ইত্যাদি উপন্যাসগুলিতে।

বিভূতিভূষণের একেবারে শুরুর দিকের উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত', শেষ পর্বের লেখা 'ইছামতী'। এজন্যেই এ তথ্যের অবতারণা যে, গঠনশৈলীতে লেখক প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন, ভাষা-সংলাপ রচনাতেও এমন কিছু ভাঙা-গড়া নেই, এমনকি যাঁরা মনে করেন উপন্যাসের প্রধান মেরুদণ্ড সংঘাত, তাঁরা এই লেখকের কোনো উপন্যাসেই প্রায় উল্লিখিত সংঘাতের খোঁজ পান না। অথচ ঐ উপন্যাসগুলি যে আজও বাংলা ভাষার সাধারণ ও মেধাবী দুই ধরনের পাঠকের কাছেই উল্লেখযোগ্য, তার কারণ লেখকের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি, স্বচ্ছ জীবনদর্শন ও সহজ বর্ণনাকৌশল।

'অপরাজিত' উপন্যাসে লেখক ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, তিনি কেবল 'যত লোকের দুঃখের দুর্দশার কাহিনি'ই বলতে চান। এই আলগোছে বলা কথাটির প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর অজস্র গল্প-উপন্যাসে। 'পুঁইমাচা'র ক্ষেন্তি, 'অপরাজিত'র পটু বা আজবলাল ঝা, 'মৌরীফুল' এর নির্যাতিত গৃহবধূ সুশীলা—এমন আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এরা কখনো গল্পের প্রধান অংশ আবার কখনোবা পথচলতি রাস্তার পাশে বিকেলের ম্লান আলোয় ফুটে থাকা নাম না জানা বুনো ফুলের মতো।

এটা একটা খুব মনোযোগ দেওয়ার মতো তথ্য যে, একজন লেখক দুঃখ-দুর্দশার কাহিনি দিয়েই তাঁর উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণ করতে চান, অথচ সেই কাহিনির পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে স্বপ্নিল আশা-আকাঙ্ক্ষা, কল্পনাপ্রবণ অনুভূতিময় জগতের কথা। কোথাও লেখকের চাপিয়ে দেওয়া তত্ত্বের খবরদারি নেই—এক সহজ অকৃত্রিম সুরে সুখ-দুঃখময় জীবনের বহমান কাহিনিমালা, তবু কী গভীর স্পর্শময় সেই সব জগৎ। আবহমান কালের মানুষের অভ্যাস, গুণ-দোষ, প্রকৃতির রূপ-রং-আভাস আর মানুষের চিরকালীন আনন্দ-বেদনা-পিছুটান সব কিছুকে একসঙ্গে ধরতে চেয়েছেন এই লেখক।

প্রকৃতিঘনিষ্ঠ গ্রাম্যজীবনের বিস্তৃতিতে, বহমান জনজীবনকে, দারিদ্র্য-কুসংস্কার, মায়া-মমতায় ভরা জীবনকে সার্থকভাবে যে কয়েকটি উপন্যাসে বিভূতিভূষণ ধরতে পেরেছেন—তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাঁর প্রায় শেষজীবনে লেখা 'ইছামতী' (১৯৪৯) উপন্যাসটি। ইচ্ছামতী নদীর তীরের সাধারণ সরল, সাদাসিধে মানুষগুলি; চণ্ডীমণ্ডপে ভিড় জমানো পরশ্রীকাতর, পরচর্চাকারী লোকগুলি; নদীতে নাইতে যাওয়া সমাজবদ্ধ

নারীচরিত্র— তাদের নানা ছোটোছোটো সুখ-দুঃখ, অনুভূতি—যার কোনো ইতিহাস হয় না। লেখক সেই সব পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনচিত্রগুলিকেই চিরন্তন করে দেবার চেষ্টা করেছেন এই উপন্যাসে।

সময় নির্দিষ্ট করে বললে 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'র পর 'ইছামতী' রচনার মধ্যেকার প্রায় দু'দশক বিভূতিভূষণ আরো অনেকগুলি কাহিনি নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। যেগুলির কাঠামো অতিনির্দিষ্ট, গল্প বলবার টেকনিকও অপরিবর্তিত এবং শেষপর্যন্ত কাহিনিগুলি নিছক কাহিনিই থেকে যায়। বলছি না যে 'ইছামতী'তে সেই কাঙ্ক্ষিত বদল ঘটেছে। এখানেও পটভূমি প্রায় একই, বরং লেখক পিছিয়ে গিয়ে নানা কারণে নীলচাষ বন্ধ হয়ে যাওয়া ও নীলকুঠির প্রতাপের অবসানের সময়কালকে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু কাহিনি এখানে পাঠককে এক অপূর্ব উপলব্ধির জগতে পৌঁছে দিচ্ছে। নীলকুঠির যে সাহেবদের দেখলে একসময় এদেশের গ্রাম্য ভীতু লোকেরা পথ থেকে নেমে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ত, সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাহেবের জন্যও পাঠকের সহানুভূতি জাগিয়ে তুলেছেন লেখক। আর কত সুখ-দুঃখের ছোটোখাটো ঘটনা, অবহেলিত স্বপ্নকে বুনো নাম না-জানা লতাপাতার মতো তাঁর এই উপন্যাসে মহিমান্বিত করে তুলেছেন। কী অপূর্ব এর কথনভঙ্গি ও চরিত্রচিত্রণ। আজ এত বছর পরেও কেন উপন্যাসটি পাঠকের কাছে পুনর্পাঠের আগ্রহ জাগায় তা একটি প্রবন্ধে বুঝিয়ে তোলা অসম্ভব। তবু এই উপন্যাসের বিশিষ্ট দিকগুলি সম্পর্কে একবার নজর দেওয়া যেতেই পারে।

এক। প্রকৃতি পাঠ

সাদা লেখার পেছনে যেমন ব্ল্যাকবোর্ডের কালো, বিভূতিভূষণের অধিকাংশ রচনাতেই মানুষ ও তার পেছনে নিবিড় প্রকৃতি। আর ঐ প্রকৃতিকে তিনি সবচেয়ে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন 'ইছামতী' উপন্যাসে। এর তুলনা খুঁজতে গেলে পাব একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প। যেখানে প্রকৃতি হয়ে যায় জীবনের প্রতিস্পর্ধী—লেখকের আশ্চর্য মায়াবী দক্ষতায়।

আধুনিক কবিরাও প্রকৃতিকে ব্যবহার করেন কবিতার ফ্রেম হিসেবে। কিন্তু বিভূতিভূষণের প্রকৃতি স্বতন্ত্র চরিত্রের মতো কথা বলে ওঠে। মানুষের জীবন পালটায়, নানা বাঁকে এসে পড়ে, আর লেখক একটু স্পেস দিয়ে জানিয়ে দেন 'বিকেল বেলা ফিঙে পাখি বসে আছে বাবলা গাছের ফুলে ভর্তি ডালে।'

নালু পাল নতুন স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে, সেই স্বপ্নপূরণের পথে সে চরম কৃচ্ছ্রসাধনেও রাজি। রাত্রে খাওয়ার পর যখন সে একটা মাদুর দাওয়ায় টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে, লেখক তখন খুব নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ক্যামেরা সরিয়ে রাখলেন

বাইরে—'গ্রীষ্মকাল। আতা ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ বাতাসে। আকাশে সামান্য একটু জ্যোৎস্না উঠেছে কৃষ্ণাতিথির।' ভবানী বাঁড়ুয্যের খোকা হয়েছে। খোকা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে নিজের হাতখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে—যেন কত আশ্চর্য জিনিস। আর ভবানী লেখকের হয়ে তার চোখ রাখে বাইরে— 'বাঁশবনে জোনাকি জ্বলচে। অন্ধকারে পাকা ফুলের গন্ধের সঙ্গে বনমালতী ও ঘেঁটকোল ফুলের গন্ধ। নক্ষত্র উঠেচে এখানে ওখানে আকাশে।' লেখক যেন বোঝাতে চাইছেন এই শিশু আসলে এই বিশাল প্রকৃতিরই ঘনিষ্ঠ অংশ। জীবন এমনই ছড়ানো ছিটানো ও মুগ্ধ বিস্ময়ের।

গ্রন্থের শুরুতে লেখক বলেছিলেন, নদীর ধারে পুরোনো পোড়ো ভিটে আকন্দ ঝোপে ঢাকা, দু একটা উইয়ের ঢিবি, ঐ ভিটেতে কতদিন আগে জড়িয়ে থাকা সেইসব মা ও ছেলে, ভাই ও বোন, তাদের কত সুখ-দুঃখ, সেইসব ইতিহাসই আসল জাতীয় ইতিহাস, মূক জনগণের ইতিহাস, রাজা-রাজড়াদের বিজয় কাহিনি নয়। যথার্থই বলেছিলেন। সে কথা তাঁর চাপানো সাজানো ছিল না— ছিল অন্তঃস্থলের, তার অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে উপন্যাসে। আসলে লেখক এখানে এক নতুন ইতিহাস বলতে চেয়েছেন নতুন আঙ্গিকে। যেমন—'ঐ বর্ষাশেষেই আবার কাশফুল উড়ে উড়ে জলসরা কাদায় পড়ে বীজ পুঁতে পুঁতে কত বাঁশঝাড়ের সৃষ্টি করলো বছরে বছরে। কাশবন কালে সরে গিয়ে শেওড়াবন, সোঁদালি গাছ গজালো—তারপরে এল কত কুমুরে লতা, কাঁটাবাঁশ, বনচালতা। দুললো গুলঞ্চলতা, মটর ফলের লতা, ছোটো গোয়ালে, বড়ো গোয়ালে। সুবাসভরা বসন্ত মূর্তিমান হয়ে উঠলো কতবার ইছামতীর নির্জন চরের ঘেঁটুফুলের দলে...' সেই ফাল্গুন-চৈত্রে আবার কত মহাজনি নৌকা নোঙর করে রেঁধে খেল বনগাছের ছায়ায়,...' ইত্যাদি। এ যে আবহমান প্রকৃতির ইতিহাস, নদীতীরের বিস্তৃত জীবন যাপনের ইতিহাস, জন্ম-মৃত্যুর ইতিহাস। সব কিছুর সাক্ষী ঐ সুন্দর ইছামতী নদী। পড়তে পড়তে ভাবতে ভাবতে আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে বইটির পাতার পর পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাই—যেতে যেতে স্পর্শ পাই নিবিড় লতাপাতার, শুনতে পাই ইছামতীর জলে স্নানরতা কবেকার মেয়েদের কথোপকথন।

দুই। শিপটন সাহেবের মৃত্যু

শিপটন সাহেবের মৃত্যু দিয়ে যদি এই উপন্যাস শেষ হতো তবে বোধ হয় কিছুমাত্র ত্রুটি ঘটত না। নীল চাষ, একটি নীলকুঠির পারিপার্শ্বিক গ্রাম, গ্রামের বিচিত্র মানুষের জীবন, দেওয়ানের অত্যাচার, নীলচাষে বিমুখ কৃষকদের বিদ্রোহ, সবশেষে নীলচাষের লোকসানে নীলকুঠি উঠে যাওয়া— এই ছিল উপন্যাসটির মূল বিষয়। এই আপাত সহজ কাঠামোটি গভীর হয়ে উঠেছে লেখকের দার্শনিকতা ও অপূর্ব লিখন ভঙ্গিমায়।

বিরল চরিত্র মানুষ ছিলেন এই শিপটন সাহেব। বহুদিন আগে নিজের জন্মভূমি ওয়েস্টমোর ল্যান্ডের ক্ষুদ্র পল্লি ছেড়ে এসে, এই হৃদয়বান মানুষটি ভালোবেসে ফেলেছেন অন্ধকারে মোড়া এই অখ্যাত গ্রামকে।

স্রোতের বিপরীতে গিয়ে লেখকও এখানে একটি বিরল মর্মস্পর্শী অংশ রচনা করলেন। যেখানে নীলচাষ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও সাহেব ইংল্যান্ডে তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে যাচ্ছেননা, এতদিন পর কোথায়ই বা যাবেন! কেউ নেই সেখানে। তাই এই অজগাঁয়েই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান নিরুপদ্রবে। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের জ্বরে হঠাৎ বড়ো সাহেব মারা গেলেন। মৃত্যুর সময় তাঁর কানে ভেসে আসছিল অনেকদূরের তাঁদের গ্রামের ছোট্ট গির্জাটার ঘণ্টাধ্বনি। লেখক এই অংশটি এমন মমতা দিয়ে আঁকলেন—ইতিহাসে পড়া অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের ছবি সরিয়ে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন শিপটন সাহেব। কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল।

বিভূতিভূষণের দর্শনে শ্রেণি বৈষম্য কখনোই গুরুত্ব পায়নি। তিনি দেখেছেন সমগ্র মানবজীবনকে একসাথে। নানা ধরনের বিচিত্র সব মানুষকে শোকে, দুঃখে, আনন্দে একটাই পংক্তিতে এনে ফেলেছেন। মানুষকে মহৎ করে দেখবার, ত্রুটিযুক্ত ক্ষুদ্র মানুষেরও ভেতরকার মহত্ত্বকে বের করে এনে দেখাবার অসাধারণ ক্ষমতাটি তাঁর সমকালে একমাত্র তাঁরই ছিল। জীবনের কঠিন রূপটিকে তিনি এড়িয়ে যাননি। তাকেও সহজ করে নিয়েছেন। পাঠকের মনে পড়বে কি একটি ছবির কথা! নীলকুঠি উঠে গিয়ে বড়ো সাহেবের বাংলোর সামনে হয়েছে ব্যবসায়ী নালু পালের ধানের খামার। সাহেবের প্রতাপের সময় যেখানে কারো ঢুকবার অধিকার ছিল না—অনেকদিন পরে সেখানটাতে বসে রজবালি দাদ চুলকোচ্ছে। এখানে আছে বহমান পরিবর্তনশীল সময়ের নিষ্ঠুর চিত্র।

তিন। দুই নারী-গয়ামেম ও নিস্তারিনী

অনন্য সব চরিত্র সৃষ্টিতে বিভূতিভূষণ তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ কথাকার। অজস্র চরিত্র তাঁর গল্পে উপন্যাসে উঁকি মারে, সামনে আসে। লেখক পরম মমতায় সকলকেই যথাযথভাবে অঙ্কন করেন। মনে পড়ে যাবে 'পুঁইমাচা'র ক্ষেন্তির কথা, 'মৌরিফুল'-এর মুখরা গৃহবধূটি, 'পথের পাঁচালী'-এর দুর্গা—এমনি অজস্র। এরা প্রত্যেকেই করুণ, দুঃখী ও অসহায় অথচ সংসারের আবদ্ধ নিয়মের বাইরে চলে যেতে পারে এরা। তাতেই তাদের আনন্দ। 'ইছামতী' উপন্যাসে এমনই দুটি ব্যতিক্রমী চরিত্র নিস্তারিণী ও গয়ামেম।

নিস্তারিণী সাধারণ গৃহবধূ, কিন্তু কোথায় যেন তার অসুখ। ইছামতীর জলে একা একা দুঃসাহসিক সাঁতার দিয়ে সে মুক্তির আনন্দ পায়। লুকিয়ে ঝোপের মধ্যে বসে

পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলে। সুকণ্ঠে গান গায় আবার শাশুড়ির সঙ্গে কলহ করে, স্বামীকে ভালোবাসতে পারে না। আসলে সমাজের যে চিরাচরিত বন্ধন তাতে যেন নিস্তারিণীকে আঁটিয়ে তোলা যাচ্ছে না, ফেটে বেরিয়ে যাচ্ছে—সমাজ তার শৃঙ্খল ভেঙে বাইরে পা বাড়াচ্ছে শামুকের গতিতে। লেখকের আশ্চর্য ক্ষমতায় গৃহবধূটির অতৃপ্তির হাহাকার শুনতে পাচ্ছে পাঠক।

শিপটন সাহেবের রক্ষিতা গয়ামেম। সবাই তাকে ঈর্ষা করে, প্রসন্ন চক্কত্তির মতো কেউ কেউ তার সান্নিধ্য পেতে চায়। সাহেবের মৃত্যুর পর এই গয়ামেমকেই লাঞ্ছিত হতে হয়। সে রক্ষিতা অথচ তার মধ্যে নীচতা কলুষতার স্পর্শটুকুও নেই। যখন সে একা, অসহায়, দরিদ্র, তখনও তার মধ্যে এক অদ্ভুত প্রশান্তি দেখতে পাই। নিজের কথা ভেবে বহু প্ররোচনাতেও সাহেবের কাছে হাত সে পাতেনি। সমস্ত গ্রাম্য অপবাদকে বুকে বয়ে বেড়াতে পারে সে।

প্রসন্ন চক্কত্তিকে কি ভালোবাসতো সে? নাকি তার প্রতি প্রসন্নর এই অসম প্রণয়লিপ্সাকে সে যুগপৎ করুণা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে! লেখক কিন্তু সেই নীরব প্রণয়কে চিরন্তন করে দিলেন উপন্যাসের শেষে এসে। নীলকুঠিতে সাহেবদের সমাধিস্থলে শোকাভিভূতা গয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বৃদ্ধ বিহ্বল প্রসন্নর। অন্ধকারে সাপ খোপের ভয় আর সেই ঝোপে জঙ্গলে ঘেরা সমাধিক্ষেত্রে অভিনীত হয়ে যাচ্ছে সুপ্ত প্রণয়ের এক শেষাঙ্ক। প্রকৃতি জগতের কোনো হেলদোল নেই, সেই তেমনি বহমান। 'ষষ্ঠীর চাঁদ জুনিপার গাছের আড়াল থেকে হেলে পড়েছে মড়িঘাটার বাঁওড়ের দিকে। ঝিঁঝিঁ পোকারা ডাকচে পুরনো নীলকুঠির পুরনো বিস্মৃত সাহেব সুবোদের ভগ্ন সমাধি ক্ষেত্রের বনে জঙ্গলে ঝোপ ঝাড়ের অন্ধকারে।' উপন্যাস শেষ করে এই মহাকালকে স্পর্শ করে নির্বাক হয়ে বসে থাকি।

যা সহজ তার স্বীকৃতি দিতে লজ্জা করে আমাদের। বুঝি এই আমাকে লঘু পাঠক ভেবে নেয় পাঠক সমাজ। কিন্তু সহজ তো সর্বদা লঘু নয়, তার সার্থক রূপায়ণে সে-তো গভীরও হয়ে উঠতে পারে। হতে যে পারে তার প্রমাণ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা, বিভূতিভূষণের অনেক গল্প-উপন্যাস। আরও যে উদাহরণ বাংলা সাহিত্যে ছড়িয়ে নেই তা নয়। উপন্যাসের গঠনরূপটি কেমন হবে, কেমন হবে তার ভাষা-সংলাপ—তারও তো কোনো নিদান দেওয়া নেই কোথাও। আর আজও কি বোধগম্য হলো না আমাদের, যে সহজ মানেই তরল নয়। অন্যদিকে, এই সহজকে সৃষ্টি করতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের কত সহস্র লঘু রম্য সাহিত্য রচিত হলো—যা জঞ্জাল হয়ে ভরিয়ে রাখলো বাংলা সাহিত্যের উঠোন। এর মাঝখানে সহজ অথচ গভীরতার চরম সাহিত্যিক নির্মাণ হিসেবে থেকে গেল 'ইছামতী'—বহমান কাল তার স্থায়িত্ব আরও প্রমাণ করবে।

ইছামতীর তীরে জীবনদর্শী এক মানুষ

নির্মাল্য মণ্ডল

‘ইছামতী’—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসটির মুখবন্ধে লেখক ইছামতীর তীরবর্তী ভূমি ও জনজীবনের একটি সংক্ষিপ্ত স্কেচ এঁকেছেন; সেই প্রসঙ্গে সেখানে তাঁর দুটি মন্তব্য স্মরণীয়—

> ভগবানের একটি অপূর্ব শিল্প এর দুই তীর, বনবনানীতে সবুজ, পক্ষী-কাকলিতে মুখর। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইছামতী, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮২, পৃ.১)

দ্বিতীয় মন্তব্যটি—

> সেই সব বাণী, সেই সব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস। মূক জণগণের ইতিহাস, রাজা-রাজড়াদের বিজয়কাহিনি নয়। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইছামতী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২)

নদীর জলধারা নয়, তার দুই তীর, বনভূমি, পক্ষীকুল, গ্রামের ঘাট, গৃহস্থের ভিটে, আর দিন রাতের বহমান জীবন-স্রোতধারার মতোই প্রবাহিত—এরই কথা উপন্যাসে বিবৃত। ইছামতী ছোটো গ্রাম্য নদী; সুন্দরি-গরানের জঙ্গলের নিভৃতে তারও পরিণাম বঙ্গোপসাগর অভিমুখী। গ্রামীণ নদী-সংলগ্ন জীবনে গঙ্গা, নীলনদ, টাইগ্রিস প্রমুখ ইতিহাসখ্যাত জলধারার পাশে সহস্রকাল ব্যাপ্ত সভ্যতার ধ্রুপদী ঐতিহ্য নেই। কিন্তু ইছামতীর পার্শ্ববর্তী তটভূমিতে ছোটো ছোটো জীবনলীলা আপন মনে বয়ে চলতে চলতে সেই বিরাট সময়ের কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেছে।

ইতিহাস রচনার মতো সচেতন প্রয়াস তার নেই; তবু নিজেদের অজ্ঞাতেই যে ক্ষুদ্র দিনলিপি তারা প্রতিদিন সৃষ্টি করে চলেছে, মহাকালের পাতায় তার অসীম গুরুত্ব ভূয়োদর্শী লেখকের চোখে ধরা পড়েছে। ‘ইছামতী’ সেই প্রাত্যহিক জীবনকথার ঐতিহাসিক দিনলিপির অংশ। এই নদীর উল্লেখ ও ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে এক গুরুত্বের কথা তিনি অন্যত্রও উল্লেখ করছেন—

> আমাদের গ্রামের ইছামতী নদী।...আজ পাঁচশত বছর ধরে কত গৃহস্থ এল, কত হাসিমুখ শিশু মায়ের সঙ্গে নাইতে এল,...কত কত মা, কত ছেলে, কত তরুণ তরুণী

> সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথি বেয়ে।...এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতির রেখা, বিভূতিরচনাবলী, নবম খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৪, পৃ. ১)

কাহিনির সূচনা উনিশ শতকের মধ্যবর্তী পর্বে, সিপাহি বিদ্রোহ পরবর্তী মহারাণীর শাসন সবেমাত্র এদেশে বলবৎ হয়েছে। গ্রামবাংলায় নীলকর সাহেবদের রমরমা; সাধারণ গ্রামীণ মানুষ তখনও বৃহৎ দেশ বিষয়ে অসচেতন। নিজের নিজের গ্রামসীমায় চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডা আর উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত পূর্বপুরুষের জমিজমা নাড়াচাড়া করেই তাদের জীবন একরকম অতিবাহিত হয়ে যেত। সেই সমাজে পঞ্চাশ বছরের কুলীন ভবানী বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে নীলকুঠির দেওয়ান রাজারামের তিনটি বয়স্থা বোনের অনায়াসে বিয়ে হয়ে যেত। সেই বিয়ের স্বপ্নেই তিরিশ বছরের কুলীন কুমারী তিলোত্তমা ছাদে বসে ত্রয়োদশীর চাঁদ ওঠা আকাশের দিকে তাকিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে। জীবন তখন এমনই অনায়াস, স্বল্প স্বপ্নের বৃত্তে ঘেরা, উচ্চাশার পরিমাণও সামান্য—নিস্তরঙ্গ গ্রাম-নদীর তটরেখাচিহ্নিত পরিসরের মতোই সীমাবদ্ধ।

গ্রাম পাঁচপোতা। ইংল্যান্ড থেকে আসা গ্র্যান্টসাহেবের ভারতদর্শন এখানে এসেই পরিপূর্ণ হয়েছে। শিপটন, ডেভিড সাহেবের মতো অনেকেই স্থানীয় জীবনধারার সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে নিয়েছেন। বিজাতীয় ইন্ডিয়ান কর্ক গাছটির অন্যভূমির সঙ্গে আপস করার মতো এঁরা আঞ্চলিক ভাষা-সংস্কৃতির সাথে নিজেদের মাপসই করে তোলেন। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশ, যার উত্তরাধিকার বয়ে চলেছে আধুনিক নগরসভ্যতা চর্চিত রেনেসাঁস-উত্তর নব্য ভারত নয়, শান্ত রসাস্পদ জীবনের আস্বাদন নিয়ে বয়ে চলা গ্রামভূমি। গ্র্যান্টসাহেব সেই দেশ আর দেশীয় মানুষের ছবি নিয়েই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রবহমান নদীস্রোতও বৈচিত্র্যসম্পন্ন। তার প্রতিটি জলবিন্দু, ধূলিকণারও পরিচয় বিভিন্ন। তার আপাত শান্ত-মন্থর গতির অন্তঃস্থলে ভিন্নমুখী স্রোতের টানও দুর্লক্ষ্য নয়। তিলুর দায়িত্বপূর্ণ গৃহিণীপনার পাশাপাশি সদ্য-বিবাহিতা বিলু-নিলুর চাপল্য যেন উদার প্রশান্ত আকাশের মাঝে লঘুভার মেঘখণ্ডের এলোমেলো বিস্তার। আর আছে নালু পাল; পরাশ্রিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিশ্রমী এই যুবকের কঠোর শ্রমের মাধ্যমে একটু একটু করে এগিয়ে চলার, আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা অন্য কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে লেখক বুনে দেন। নদীস্রোতের মতো সময়ের অভিমুখ ধরে জীবন এগিয়ে চলে। সেখানে সীমাবদ্ধ জগতে, সংকীর্ণ ভাগ্য আরোপিত জীবন কাঠামোকে ক্রমশ আঘাত করে কেউ কেউ আপন ভাগ্য নির্মাণ করে চলে। নদীরও চলাচলের ইতিহাসে একটু একটু করে পাড় ভাঙে, গড়ে ওঠে নতুন সীমারেখা। নদী-তীরবর্তী প্রাচীন ঝুরি-নামা

বটের ওপর দূরান্তরের পাখিরা এসে আশ্রয় নেয়; কারোর সাময়িক আশ্রয়, কারোর বা স্থায়ী বাসা, দূরবর্তী মানুষের মতো দেশভ্রমণকারী সন্ন্যাসী ভবানী বা সুদূর দ্বীপরাষ্ট্রের অধিবাসীরাও এভাবেই একত্রিত হয়েছে গ্রামীণ জীবনের তটভূমিতে। আরও প্রাচীন কাল থেকে বহির্দেশীয়ের দল ভারতে এসেছে, পাহাড়-অরণ্য-নদী-প্রান্তর সমন্বিত জনালয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ থেকে গেছে, কেউ হয়তো ফিরে গেছে। কিন্তু সুপ্রাচীন ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনের ঐতিহ্য ওই বটের গুঁড়ির মতোই হয়ে রয়েছে দৃঢ়-গভীর। মহাসময়ের ইতিবৃত্তকে কাহিনিতে আনবার সংকল্প নিয়েই তো ইছামতীর রচনা—

> এই পল্লীগ্রামের যে জীবনযাত্রা, শতাব্দীর পর শতাব্দী এইরকম...কত বনসিম তলার ঘাট, কত গ্রাম্য মেয়ে, কত হাসি-কান্না-প্রেম-বিরহ...এদের নিয়ে একটা উপন্যাস লিখব...মহাকাল যেন এই উপন্যাসের পটভূমি। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎকর্ণ, বিভূতি-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৭)

বাংলাদেশের গ্রাম জীবনের যে ছবি বিভূতিভূষণ এঁকেছেন, সেখানে একই সঙ্গে গতি আর স্থিতির একত্র সমাবেশ। নদী-স্রোতে মিশে থাকে পাড়ভূমির আবর্জনা; নদী সেই সবকিছুকে নিয়েই অগ্রসর হয়ে চলে। মোল্লাহাটির নীল কুঠির দেওয়ান-আমিন-সাহেবদের সঙ্গে স্থানীয় কৃষকদের দ্বন্দ্ব বাধে; উর্বরজমিতে তারা নীল বুনতে নারাজ; অতঃপর বিদ্রোহী প্রজাদের শায়েস্তা করতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ অত্যাচার—এক সময় এরই পরিণামে নীলবিদ্রোহের সূচনা। গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য, বিচারের নামে প্রহসনও সংক্ষুব্ধ প্রজাদের মনে ধিকিধিকি আগুন নেভাতে পারে না।

বিভূতিভূষণ এই সবকিছুকে উপন্যাসে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু ইতিহাসের ধ্বংসাত্মক শক্তিটির উপরেও জীবনের নৈমিত্তিক ছবিটি তাঁর কাছে আরও বড়ো সত্য। অতএব, এই সংঘাতপূর্ণ সময়েও ভবানীর স্বল্প আয়োজনে ঘেরা সংসারেও প্রশান্তিময় সুখ উথলে ওঠে। স্বামীর সংসারে খোড়ো ঘরে খোকাকে নিয়ে দিন কাটানোতে অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে তিলুর কোনো আক্ষেপ থাকে না। বরং কুলীন ঘরের মেয়েদের বেদনাবিদ্ধ জীবনের স্মৃতি ভিড় করে আসে। ইছামতীর স্রোত তার কিছু অংশ বয়ে নিয়ে যায়, কিছু থেকে যায় তটলগ্ন মানুষের স্মৃতিতে। সন্ন্যাস জীবন থেকে সংসারী হওয়া ভবানী এই সংসারের অন্তর্গত সত্যকে সহানুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করেন; জীবনভর অপূর্ণ স্বাদ নিয়ে নির্বাকচিত্তে কাটিয়ে যাওয়া এই মেয়েদের তুলনায় তাঁর ব্যক্তিগত মুক্তির পিপাসা কত সামান্য—

> আজ এই পানকলস ফুলের গন্ধে মাখানো চাঁদের আলোয় তিনিই যেন স্বর্গ থেকে নেমে বললেন—বাবা, আমার যে সাধ পোরেনি, তোমার সামনে যে বসে আছে

> এই মেয়েটির তুমি সে সাধ পুরিও।' (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইছামতী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩)

'ইছামতী'র কাহিনি একটানা বিবৃতির ঢং-এ এগিয়েছে; কিন্তু সময় চিহ্নক, জীবনের পরিবর্তনের অনিবার্য সূত্রগুলি লেখক অনায়াস বর্ণনার মাঝে মাঝে রেখে যান; এই গ্রামে স্বামী-স্ত্রী জনসমক্ষে পরস্পরের সাক্ষাৎ করতে পারে না বলে তিলু সন্ধ্যার আঁধারে স্বামীর সঙ্গে ঘাটে যায়। ভবানী তিলুকে বলেন—

> এসব বদলে যাবে তিলু, থাকবে না, সেদিন আসছে। তোমার আমার দিন চলে যাবে। ওই খোকন যদি বাঁচে, ওর বৌকে নিয়ে ও পাশাপাশি হেঁটে বেড়াবে এ গাঁয়ের পথে—কেউ কিছু মনে করবে না। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইছামতী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬)

পরিবর্তন সবার জীবনেই এসেছে। নালু পাল তার মোল্লাহাটির হাটে মাথায় করে বোঝা নিয়ে যায় না; বড়ো হওয়ার প্রথম ধাপে তার নিজস্ব দোকান হয়; ব্যবসা বুদ্ধি-শ্রম-মমতা আর নিষ্ঠা নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী চিত্তে আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিকে এগিয়ে চলে, এর মধ্যেও তার সারল্য আর বিনয়ের গুণে সে ঠিক ব্যবসা-সর্বস্ব মানুষের প্রতিকৃতি হয়ে ওঠে না।

বিভূতিভূষণ সৃষ্ট বহু চরিত্রেরই বাইরে পরিচয়ের অন্তরঙ্গে একজন নিপাট ভালো মানুষ বিরাজ করে। বৃহৎ জীবনের অনন্ত রহস্যের মাঝখানে ব্যক্তি মানুষের সামান্যতা যেন অশিক্ষিত প্রায় সাধারণ মানুষগুলি নিজের মতো করে বুঝতে পেরেই স্বভাবে এমন কুণ্ঠিত ও সমর্পিত হয়ে থাকে। জীবনের রহস্যময় প্রকাশ অন্যত্রও অন্যভাবে হয়। ভবানীর খোকাটি যখন দন্তহীন মুখে একগাল হাসি হাসে তখন তার বিস্ময়াবিষ্ট আহ্লাদের মধ্যেই ঈশ্বরের পরম সৃষ্টির প্রকাশে ভবানী মুগ্ধ হন—

> এই ফুল, এই অন্ধকার, এই অবোধ শিশু, এই নক্ষত্র-ওঠা আকাশ সবই এক হাতের তৈরি বড়ো ছবি। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইছামতী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭)

ইছামতীর তীরবর্তী কোনো এক প্রত্যন্ত গ্রামীণ জীবনে এক তারা জাগা নিবিড় রাতে কোনো মা আর শিশুর কলহাস্যের মধ্যেই তো সাধক দার্শনিকের দল ক্ষণ-শাশ্বতীতে ধৃত অমরত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন। ইছামতীর স্রোতোধারায় মানবজীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা, পাপ, প্রবৃত্তি ধুয়ে যায়, স্নিগ্ধ চরাচরের ওপর নতুন আশার পত্তন ঘটে। হলা পেকের মতো দুর্দান্ত ডাকাতও প্রৌঢ় বয়সে এসে এক অনাত্মীয় মানবের দন্তহীন মুখের মন ভোলানো হাসি, তার অর্থহীন ধ্বনি-মাধুর্যের বশীভূত হয়ে পড়ে। তার চড়া স্বভাবে যেন ক্ষীণ অনুশোচনা জাগে, পূর্বকৃত অপরাধের কথা আর যেন গর্বিতভাবে উচ্চারণ করে না।

এভাবেই সংসার থেকেও জীবনের অন্তর্লীন দার্শনিকতাকে উপলব্ধি করে মানুষের স্বভাবের উত্তরণ ঘটে; ইছামতী যেমন তার ডান-বাম কোলে মানব সংসারের হাসি-কান্নার বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে ধারণ করেও সেখানেই আবদ্ধ থাকে না—এগিয়ে চলে সাগরের রহস্যময় গভীরে। এইভাবে জীবনের হাসি-কান্না, আলো-আঁধার, বিক্ষোভ-প্রশান্তিকে সমান প্রসন্নতায় আত্মস্থ করে যারা চলতে পারে তারাই যথার্থ জীবন সাধক; ঈশ্বর নামক জীবনশিল্পী এই বৈচিত্র্যকে নিয়েই জীবনের ছন্দোবদ্ধ সংগীত রচনা করে চলেছেন।

বিভূতিভূষণের মানসলোক একই সঙ্গে কবি ও দার্শনিকের যৌথ উপাদানে সৃষ্ট। কবি হিসেবে তিনি জীবনের দিনানুদৈনিক আবর্তনের মধ্যেই সুন্দরকে চিনে নেন, এই জগতের অন্তর্লোকের মাঝে অনন্ত লাভে বিস্ময়াবিষ্ট হন। সন্ন্যাসী গুরু ভাইয়ের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলোচনায় ভবানী ইহলৌকিক জীবন সাধনার মধ্য দিয়ে মহাশক্তির রহস্যকে বোঝানোর কথা বলেছেন—

> তাঁর শরণাগত হয়ে দেখাই যাক না। তাঁর কৃপার দৌড়টা দেখবো বলিচি তো। মায়াশক্তি যত বড়ই হোক, তাদের চেয়ে তাঁর শক্তি কম। মায়াশক্তি কি ভগবান ছাড়া। তাঁর সংসারে সবই তাঁর জিনিস। তিনি ছাড়া আবার মায়া এল কোথা থেকে? (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইছামতী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯)

সৃষ্টির মধ্যে সাধক-দর্শকও অন্তর্ভুক্ত, কাজেই সৃষ্টির রসপিপাসায় আপনাকে ডুবিয়ে রেখেই একে বুঝতে হবে। বলাবাহুল্য, ভবানীর এই দর্শন স্বয়ং লেখকের। 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ' বেশিরভাগ উপন্যাসেই তিনি জীবনের অন্তর্কালীন মহান স্রষ্টাকে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পরিপূর্ণভাবে অবগাহনের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করতে চেয়েছিলেন। জাগতিক জীবনের ছোটো ছোটো অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্তির দ্বারা ক্রমশ জীবনের ভাঁড়ার ভরে উঠতে থাকে। এর সবকটিই যে চিত্তকে আনন্দ ঘন সরস করে তোলে তা নয়, কিন্তু দুঃখ-আঘাত প্রতিকূলতাকে সঙ্গে নিয়েও তাকে ছাপিয়ে ছাড়িয়ে জীবন চলতেই থাকে, সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করে এমন ধারা চলনের মধ্যে মহাকালের নির্লিপ্ত রূপটিই যেন ধরা পড়ে। তবে এই চলনই যদি একমাত্র সত্য হতো, যদি ভেতরের দুর্বলতা-বৈপরীত্য সমন্বিত বৈচিত্র্য ফুটে না উঠতো তাহলে সেই প্রাণহীন গতিতে চিত্তের মুক্তি হয়তো ঘটতো, স্ফূর্তি নয়, সাধারণ মানুষের জীবন থেকে আহরণ করা প্রাণরসের সম্পদকেই অতএব তাঁর সৃষ্টিতে তিনি বিশিষ্টতা দিতে যেন আগ্রহী।

অতিবাহিত সময়ের মাঝে কখনো দেখা যাবে নীলকুঠির সাহেবদের সঙ্গে প্রজাদের দ্বন্দ্ব শুরু হলো, এই সময়ের নীলকুঠির লাঠিয়ালদের হাতে একটি খুনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে নির্ভেজাল, সৎ, দরিদ্র, ভালোমানুষ রামকানাই কবিরাজের ডাক পড়ে। শত

প্রলোভনেও বিনয়ী, ভীত, ত্রস্ত মানুষটি, নিজের সত্যে অবিচল থাকলেন। নীলকুঠির পক্ষে সাক্ষ্য দিতে রাজি হলেন না। দেওয়ান ও সাহেবদের পরিকল্পিত অত্যাচারেও তাঁর বিনম্র দৃঢ়তা ও সততা উজ্জ্বল প্রমাণ স্বরূপ হয়ে রইল; অথচ চরিত্রটি নিতান্ত সাদাসিধে; উপন্যাসে তাঁর উপস্থিতিও স্বল্প। কিন্তু বিভূতিভূষণের কাহিনিতে তুচ্ছ বনজ লতা, ঘাসফুল, ভঙ্গুর ঘাট, দরিদ্র গৃহের মতো সামান্য মানুষও বিশিষ্টতা পায়। তাদের নিতান্ত সাধারণ জীবন কাঠামোর মধ্যে নির্বিশেষ জীবন ও চিরন্তন মানুষের স্বরূপকে তিনি চিনে নিতে পারেন। ইছামতীর তীরবর্তী এই ঘটনাবলি শুধু তো এক বিশেষ পর্বের পাঁচপোতা ও তৎসংলগ্ন গ্রামের সমাজ ইতিহাস ও মানুষের দলিল নয়; তার মধ্যে অনন্তকাল ব্যাপী কোটি কোটি মানবেতিহাসের প্রকরণটিও ধরা পড়েছে। এখানে যা একক, মহাকালের নিরিখে তা-ই খণ্ডরূপের প্রতিচ্ছবি।

গ্রামজীবনের ছোটো পরিসরেও দিন-রাত, জন্ম-মৃত্যু, ষড় ঋতুর নিজস্ব নিয়মে একরকম গতির চিত্র ফুটে ওঠে। বাইরের বিশ্বের বৈচিত্র্যে ঘেরা গতিবিধির সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। বহু বছরের মধ্যে গ্রামেরই দু-একজন ভদ্রব্যক্তি সাহস করে তীর্থযাত্রায় বার হন; বাকিদের জীবনে স্বপ্ন থাকলেও পূরণের ভরসা বা সাহস নেই। রূপচাঁদ মুখুয্যের কথায়—

> আমি তো কুয়োর মধ্যি যেমন ব্যাঙ আছে, তেমনি আছি পড়ে। পয়সা নেই যে বিদেশে যাবো। বাবাজি ভয়ও পাই। কোথাও চিনি নে, গাঁ থেকে বেরুলেই সব বিদেশ-বিভুঁই। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইছামতী', পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭)

ভবানী বা ঈশ্বর সেথোর মুখে গল্প শুনে কোনো একটা অমোঘ আকর্ষণে রূপচাঁদের মতো দরিদ্র ব্রাহ্মণ এককথার সেই বড়ো জীবন দেখতে চাইলেন। অতঃপর জীবনের রহস্যময় ঘনায়মান স্রোতে এক সামান্য নিরীহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত কোণে আবদ্ধ থাকা প্রৌঢ় ভেসে গেলেন। যতক্ষণ স্মৃতি কাজ করছিল, মৃত্যুর পূর্বের সেই শেষ লগ্নে রূপচাঁদের চৈতন্য কোনো আধ্যাত্মিক ভাবনায় ভাবিত হয়নি। মুমূর্ষু বৃদ্ধের চোখের সামনে তাঁর দরিদ্র গৃহ, ভালোমানুষ খোকার মুখ এবং কন্যাসমা তিলুর সেবার ছবিটুকুই ফুটে উঠেছিল, গৃহী মানুষ বারবার গৃহমুক্ত জীবনের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়ে; অথচ গৃহের টান, গৃহস্থ জীবনে পাওয়া আনন্দ-বেদনার বিচিত্র স্পর্শ তার চিত্তে যে আস্বাদ নিয়ে আসে ঈশ্বরলাভের মতোই মহনীয় ও গভীর সেই প্রাপ্তি। ইছামতীর কোলে কোলে এমনই বিচিত্র জীবন কাহিনি বয়ে চলে। নালু পাল ব্রাহ্মণ ভোজনে, তিলু-বিলু-নিলু স্বামী পুত্র নিয়ে সংসার ধর্মে পুণ্যলাভের গৌরব অনুভব করে। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর থেকে মুক্তি চিন্তার এই প্রকৃতি পৃথক হতে পারে, কিন্তু ফললাভ উভয়েরই এক, সন্ন্যাস বাসনা নিয়ে অর্ধেক জীবন কাটানো ভবানীও একদিন

এই ক্ষুদ্র জীবনের ছোটো ছোটো সুখকণার বড়ো জীবনের খণ্ডরূপেই স্বাদ পেয়েছিলেন, স্ত্রীর সেবা, খোকার কলহাস্য, বটগাছের নিভৃত ছায়ামাখা অঞ্চল—আগামী বহু বহু বছর ধরে উত্তরকালের মানুষের মধ্যেও শান্ত রসাস্পদ জীবন এভাবেই বয়ে চলবে—

> তুমি আর আমি এই গাঁয়ের মাটিতে একটা বংশ তৈরি করে রেখে যাবো আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, এই আমাদের বাঁশ বাগানের ভিটেতে পাঁচপুরুষ বাস করবে, ধানের গোলা করবে, লাঙল-খামার করবে, গরুর গোয়াল করবে। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইছামতী', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩)

ভবানীর দৃষ্টি ক্রমশ খুলেছে; সেই দৃষ্টি দিয়ে পরিবর্তমান জগৎ, শাস্ত্রীয় জ্ঞান আর মাটি-ঘেঁষা জীবন—সকলের অন্তরস্থ মাহাত্ম্যকে তিনি সমভাবে অনুভব করেছেন। বিলু-নিলুর ছেলেমানুষি, স্থূল কিন্তু আন্তরিক আচরণেও ক্রমশ তাঁর একরকমের স্নেহ জন্মায়। এই বিষয়ে তাঁর সমালোচক বলছেন—

> বিভূতিভূষণের চিত্তে ক্ষণে ক্ষণে আনন্দময় ভাবলোকের বার্তা এসে পৌঁছলেও তিনি অরূপ জগতের mystic কবি নন। বাস্তবলোকের সুখ-দুঃখের হাসি-কান্নার জগৎ প্রবাল শক্তিতে তাঁকে আকর্ষণ করেছে। তাঁর ভাবলোক বাস্তবলোককে অঙ্গীকার করে, বাস্তবলোককে অগ্রাহ্য করে সে ভাবলোক অস্তিত্বহীন। (তারাপদ মুখোপাধ্যায়, ভূমিকা, 'বিভূতি-রচনাবলী', চতুর্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৭, পৃ. ৩)

মানব-সম্পর্কের অন্তর্গত জটিলতা নিয়ে লেখকের কলম সেভাবে সক্রিয় হয়নি। যিনি যেকোনো সম্পর্কের মধ্যে ভালোলাগার নির্যাসটিকেই সার বলে মেনেছিলেন। যে কারণে বয়স, অবস্থা, পরিবেশের পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষে মানুষে আন্তরিক সৌহার্দ্যের বুনন তাঁর কাহিনিতে অতি সহজে দৃষ্ট হয়। গয়া মেম আর প্রসন্ন চক্কত্তির অবস্থার মধ্যে দূরত্ব ছিল যথেষ্ট; তবু ব্যক্তি জীবনে ব্যর্থ দাম্পত্যে গৃহকাতর প্রসন্নের মধ্যে গয়ার প্রতি আকর্ষণ একপ্রকার কামনাশূন্য প্রেম; কোনো নারীর সস্নেহ মনোযোগের জন্য, সান্নিধ্যলাভের মোহটুকুই প্রসন্নকে গয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে।

শিপটন সাহেবের অনুগ্রহ লাভ করা এই নিম্নজাতের নারীর মধ্যে কোমল হৃদয়বৃত্তি সম্পন্ন একজন মানবীর অবস্থান, গয়া চরিত্রকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে। বহু দরিদ্র বিপদগ্রস্ত প্রজাকেই বড়ো সাহেবের সঙ্গে সম্পর্কের জোরে সে বিপন্মুক্ত করেছে। রামকানাই কবিরাজের ওপর দেওয়ান আর ডেভিড সাহেবের কৃত অন্যায়ের প্রতিরোধও সে এভাবেই করেছে। প্রসন্ন আমীনের তার প্রতি মনোভাবকে সে যে বুঝতো তা নয়; তবু প্রভুর অনুগৃহীতার প্রতি সামান্য কর্মচারীর এমন আচরণকে সে স্পর্ধিত অহঙ্কারে আঘাত করেনি; বরঞ্চ আমীনের নিঃসঙ্গ-চিত্ত সঙ্গকাতর মনের আশ্রয় হয়েই উঠেছে। নিজের লেখায় বিভূতিভূষণ জানাচ্ছেন—

> ইচ্ছে আছে এবার একটা বইয়ে হাত দেবো— নাম দেবো তার ইছামতী। বড় উপন্যাস। তাতে থাকতে ইছামতীর ধারের গ্রামগুলির অপূর্ব জীবন প্রবাহের ইতিহাস—বননিকুঞ্জের বাঁচা মরার ইতিহাস। কত সূর্যোদয়, কত সূর্যাস্তের নিষ্কিঞ্চন, শান্ত ইতিহাস। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হে তরঙ্গ কথা কও, 'বিভূতি রচনাবলী', সপ্তম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৮)

ইছামতীর তীরবর্তী গ্রামগুলির জীবন আপন নিয়মে এগিয়ে চলে, মাঝে মাঝে তিতুমীর, কলে টানা গাড়ি, মেটে তেলের বাতি, রামমোহন রায়—এমন বিচ্ছিন্ন কিছু টুকরো কথা উড়ে আসে; গ্রামের নিস্তরঙ্গ নিয়মিত জীবনে এই ধরনের খবর সাময়িক বিস্ময় জাগায়, চণ্ডীমণ্ডপের আড্ডায় একটু স্বাদ বদল ঘটে। বাকি সময় গ্রামের মানুষ জমি-জমা, হিসাব, দলাদলি, গ্রাম্য সমাজের নানা আচার-রীতির মধ্যে একরকম ভালো থাকে। ওরই মধ্যে দু'একজন ব্যতিক্রমী মানুষ থাকেন; যেমন রামকানাই কবিরাজ। ঈশ্বরের স্বরূপ জানতে আগ্রহী মানুষটির বোধে তিনি অনুর চেয়ে সূক্ষ্ম, আকাশের থেকে বৃহৎ, তিনি সর্বলোকে আছেন, সর্বলোক তাঁর মধ্যে বিরাজমান। ঈশ্বরের মহাস্বরূপ আসলে জীবনের মধ্যেই প্রতিবিম্বিত। এই চেতনা স্বয়ং লেখকের। ঈশ্বর, মানুষ আর জীবনকে তিনি এমন সহজেই এক করে ফেলেছেন, গতিশীল সময় সেই ঐক্যবদ্ধ রূপের ধারক।

নদীর চলনের মতোই সময়ের চলন আর প্রকৃতি একরকম নয়। কখনো সে ধীর গতির সুমিত ছন্দে বাঁধা, কখনো উত্তাল উত্তেজনায় তার ছুটে চলা। কাহিনিতে নীল আন্দোলনের পূর্বাভাস, গ্রামে গ্রামে খুন-হাঙ্গামা-অগ্নিসংযোগের মতো অশান্তি বর্ণনার পরেই লেখক গৃহস্থ ঘরের পারিবারিক জীবনের কথায় দ্রুত প্রত্যাবর্তন করেন। জীবন এমন প্রকৃতিরই। একদিকে হিংসা-দলাদলি-স্বার্থচিন্তা, অন্যদিকে, সহজ জীবনের উত্তাপে মাখা সংসার, দু'য়ের সামঞ্জস্য করে চলাই জীবনের প্রকৃতি। অত্যাচারী কুটিল দেওয়ান রাজারাম রায়ের পারিবারিক জীবনের ভূমিকাটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, দায়িত্বপূর্ণ স্বামী, স্নেহশীল অগ্রজের; খোকার মামারূপে প্রায় পিতৃসুলভ বাৎসল্যে তিনি আবিষ্ট। মানুষের মনোজগতের এমন বিচিত্র ও বিপরীত গতিও জীবনেরই মতো আশ্চর্য, বিস্ময়কর।

ইছামতীর জলরাশির স্বচ্ছতোয়া রূপও কোনো কোনো স্থানে আবিল; শ্যাওলা দামে অবরুদ্ধ গতি। গ্রাম্য নদী সেখানে যেন গ্রামীণ জীবনেরই স্বরূপ নির্দেশক। শিক্ষাহীন, সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজপতিদের সংকীর্ণ চিন্তা গোটা গ্রামের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে চলে। কূপমণ্ডুকের জীবনে নেই কোনো চৈতন্যোদয়, মুক্তি বাসনা, জাগতিক বা পারত্রিক কোনো জীবনেই উন্নতির আকাঙ্ক্ষারহিত পরিবারগুলির ইতিহাস বংশানুক্রমে একই ধারায় বয়ে চলে—

> আলস্য ও নৈষ্কর্ম্য থেকে আসে ব্যর্থতা ও পাপ। পল্লী বাংলার জীবন ধারার মধ্যে

> শেওলার দাম আর ঝাঁজি জমে উঠে জলের স্বচ্ছতা নেই, স্রোতে কলকল্লোল নেই, নেই তার নিজের বক্ষপটে অসীম আকাশের উদার প্রতিচ্ছবি। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইছামতী', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯)

তবে ইছামতীর বুনো লতা দাম আচ্ছন্ন জলস্তরের অন্তরালে বহমান ক্ষীণ স্রোতের মতো বাসনাবিদ্ধ জীবনের অন্তরালে ভিন্ন সুরের ধারাও যুক্ত হয়। দুর্দান্ত ডাকাত সর্দার হলা পেকে যেমন তিলুর খোকার টানে বারবার ফিরে আসে, শিশুর নিষ্পাপ আনন্দ বিস্ময়ে মাখামাখি দৃষ্টিকে ধার করেই লেখক এই জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। আসক্তি ভরা পৃথিবীকে এই শিশুর মতোই সরল আনন্দে তিনি বিশ্বাস করেন—

> আজও পাপপুণ্যের জ্ঞান আছে, ভগবানের নাম বজায় আছে, চাঁদ ওঠে, তারা ফোটে, বনকুসুমের গন্ধে অন্ধকার সুবাসিত হয়। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইছামতী', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭)

লেখক প্রসারিত জীবনের গল্পই প্রবহমান সময়ের প্রেক্ষাপটে আঁকতে চেয়েছিলেন। ছোটো ছোটো চরিত্রদের সামান্য সুখ, দুঃখ, স্বপ্নপূরণ ও স্বপ্নভঙ্গের রূপ সমস্ত কাহিনিতে ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর রচনার দর্শন ব্যাখ্যায় সমালোচক লিখছেন—

> মানুষের সহজ অনুভূতি, ব্যক্তির হৃদয়-মনের চিরদিনকার রহস্য, সরল গৃহস্থ জীবনের প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-মমতা, বিশ্বরহস্যে মগ্ন মানুষের স্বপ্নময় অন্তর্বিচরণ—এসবই তো পৃথিবীর আদিম ও অকৃত্রিম সত্য। করুণ প্রকৃতি ও জীবনের দ্বৈতলীলা মানুষের সমাজ ও সভ্যতার সমস্ত আলোড়ন ও বিলোড়নের থেকে অনেক বেশি প্রাচীন, তাই সনাতন মানুষের জীবনযুদ্ধের অবস্থার ও ব্যবস্থার পরিবর্তন সে তুলনায় সাময়িক ও গৌণ। ইতিহাসব্যাপী মানুষের মহৎ প্রকাশের মধ্যে—বিরাটের সাধনায়—প্রাণলীলার কোনো বিশিষ্টতা বা বিস্ময়করতা নেই। সেই শাশ্বত বৈচিত্র্য আছে বরং নামহীন কীর্তিহীন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায়। (গোপাল হালদার, ভূমিকা, 'বিভূতি রচনাবলী', ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৮, পৃ.৯)

এই দর্শনকে মেনেই যেন লেখক চরিত্রকে বিস্তার অপেক্ষা তাদের জীবন কাহিনির টুকরো টুকরো কথাকেই বেশি উপস্থিত করেছেন। গ্রামের গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক রীতির এক ধাঁচে চলতে অভ্যস্ত মানুষগুলির মধ্যে নিঃসঙ্গ কিছু মানুষের চিত্রও উপস্থিত। পূর্বোক্ত প্রসন্ন, আমীন, গয়া মেমের মতো চরিত্রদের প্রচলিত অর্থে খুব সাধু চরিত্র হয়তো বলা যায় না, কিন্তু এদের সম্পর্কে গভীর করুণাবোধ আছে লেখকের, এদের মধ্যে তিনি অন্য এক ধরনের ভালোমানুষকে প্রত্যক্ষ করেছেন। শিপটনের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল কাটানো গয়ার এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ঝানু ব্যবসায়ী, নীতিহীন স্বভাবের মানুষটির প্রতি একরকম মায়া পড়ে যায়; তাই দুঃসময়ে একাকী শিপটনকে সে ছেড়ে যায় না—

> চিরকাল তোমার কাছে আছি, অনেক খাইয়েচ মাখিয়েচ— আজ তোমার অসময়ে তোমারে ফেলে কনে যাবো? গেলি ধম্মে সইবে সায়েব? (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইছামতী', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮)

প্রসন্ন বা রামকানাইয়ের প্রতি তার যে পক্ষপাত সে-ও একাকী অসহায় মানুষের জন্য সহমর্মিতারই প্রকাশ। এবং শিপটন স্বয়ং। তার স্মৃতিতে কৈশোর-তারুণ্যের ইংল্যান্ড আছে, কিন্তু তার বর্তমান শিকড় ইছামতীর তীরবর্তী বাংলাদেশের মর্মে মর্মে জড়িত। এই দেশীয়-সংস্কৃতি তার জীবনকাঠামোয় একটি অভ্যস্ত রূপ গড়ে দিয়েছে। শিকড়-বিচ্ছিন্ন হওয়া আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু সমস্ত প্রতিপত্তি সম্পদ যখন ছেড়ে গেছে, সুবিধাবাদী অনুগতের দলও অন্তর্হিত তখন শিপটনের একক জীবনের সমাপ্তি পর্বটিতে তাকে আগলে রাখে গয়া মেম। আছে নিস্তারিণী, দরিদ্র ঘরের বিদ্রোহিনী বধূ, সে তার স্বভাবে একক, নিজের ভালো লাগা, মন্দ লাগা সহ নিজস্ব পছন্দের যাপনকে পুরুষালি কর্তৃত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গ্রামসমাজের মধ্যে বাস করেও সে চাপা দিয়ে চলতে রাজি নয়।

ইছামতীর জলে ভরা ভাদ্রের স্রোতকে সঙ্গী করে সে একা একা সাঁতরে চলে যায় বহুদূর; অভাবের সংসারে হাড়ভাঙা শ্রমের পরেও কারোর মন না পাওয়ার অভিমানে অন্য পুরুষের সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে তোলে। উনিশ শতকের প্রতাপশালী গ্রাম্য সমাজপতিদের সে ভয় পায় না; যেমন ভয় পায় না মৃত্যুকেও, অথচ এই নিস্তারিণীরই মধ্যে তিলুর খোকা, তিলুদের অনাড়ম্বর গার্হস্থ্য সুখ আর শ্রীর প্রতি একপ্রকার নির্লোভ আকাঙ্ক্ষা আছে। বিভূতিভূষণ এই জাতীয় চরিত্রদের খুব নিবিড় চিত্তে আঁকতেন। চরিত্রগুলি সামান্য ব্যতিক্রমী। খামখেয়ালি স্বভাব আর স্বাধীন জীবনবৃত্তিতে অভ্যস্ত ছোটো ছোটো চরিত্রদের মধ্যে তিনি মানবস্বভাবের অকৃত্রিম সত্যকে অনুভব করতেন।

জীবনরসের রসিক বিভূতিভূষণের অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে পৃথিবীর নিত্যকালের রূপের নিবিড় যোগ ছিল। প্রকৃতপক্ষে—

> প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মতো ঈশ্বরেরই মহিমা দেখিতেন। শেষজীবনে এই ভক্তি ও বিশ্বাস প্রেমের পরিণত হইয়াছিল। (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকা, 'বিভূতিরচনাবলী', প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৭, পৃ.৫)

চলিষ্ণুতা আর ফুটে ওঠা—বিশ্বপ্রকৃতিতে সৃষ্টির ক্রমবিস্তারী এই লীলা আসলে সৃষ্টিকর্তারই স্বরূপ উন্মোচক। সেই রূপ একদিকে মহৎ আনন্দময়, অন্যদিকে গভীর উদাসীন, সেই মহারহস্যময়ের গভীর শিল্পে কীর্তি 'ফুলে-ফলে, বসন্তে, লক্ষ লক্ষ-জন্ম-মৃত্যুতে, আশায়, স্নেহে, দয়ায়, প্রেমের আবছায়া ধরা পড়ে;' একদিকে তিনি স্থির অথচ অন্যদিকে তাঁর সৃষ্টি অবিচল নয়। ইছামতীর স্রোতের মতোই কোনোকিছুতে তাঁর প্রকাশ আবদ্ধ হয়ে থাকে না—

আজকার এই যে সংগীত, জীবজগতের এই পবিত্র অনাহত ধ্বনি আজ যে সব কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে পাঁচশত কি হাজার বছর পরে সে সব কণ্ঠ কোথায় মিলিয়ে যাবে!' (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইছামতী', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫)

চরাচরব্যাপী নদীর দুই তীরের নিত্যকালীন সুখ এবং দুঃখের প্রবহমানতার অন্তরালে এক মহাপুরুষের আনন্দবার্তার সংকেত মিশে রয়েছে। তার সঙ্গে নৈকট্যবোধেই মানুষের প্রকৃত আধ্যাত্মিক উত্তরণ।

উপন্যাসে একজন বৈষয়িক মানুষকে এনেছেন লেখক, সে পূর্বোক্ত নালু পাল। পানের মোট মাথায় করে হাটে নিয়ে যাওয়া, পরাশ্রয়ে অনাদরে প্রথম জীবন কাটানো নালু পরবর্তীকালে বিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকার নিত্যদিন কারবার করা ধনী মহাজন। ভগ্নপ্রায় নীলকুঠির বিপুল ভূ-সম্পত্তির অধিকারী নালুর এই উন্নতি একদিনে হয়নি; তিলে তিলে বুদ্ধি-শ্রম-দূরদর্শিতা দিয়ে সে এসব গড়ে তুলেছে। জাত-ব্যবসায়ীর আড়ালে একজন খাঁটি মানুষের উপস্থিতিই তার চরিত্রকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। তার নিজস্ব সততা, বিনয়, ব্যক্তিগত জীবনের অনাড়ম্বর ভাবটিকে সে আগাগোড়া বজায় রেখেছে। ব্যবসায়ী নালু পালের আড়ালের মানুষ নালু পালকেই লেখক বিশিষ্টতা দিয়েছেন। আসলে সদা সতর্ক ব্যবসায়ীর ভেতরে থেকে গেছে অতীতের রিক্ত সংগ্রামী মানুষটি। এক মহৎ সৃষ্টির অংশরূপ, তার চরিত্রের ছায়াপাতের ফলেই এই গ্রাম্য ব্যবসাদার সর্বপ্রকার জাগতিক প্রাপ্তির মধ্যেও নিজের বিষয়ে নিরভিমানী, উদাসীন থেকে গেছে।

পল্লিজীবনের শ্রীময়ী সরল আনন্দপূর্ণ জীবনের অন্যদিককে কাহিনির ফাঁকে আনবার সময়ে লেখকের বাস্তববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বাইরের দীনতা নয়, এদের অন্তরের দারিদ্র্যকেই লেখক বেশি তুলে ধরেছেন, ছোটো স্বার্থ, সংকীর্ণ প্রবৃত্তি, জটিল মন এদের মুক্ত উদার মনোবৃত্তির অধিকারী করে না। সেখানে নীলমণি সমাদ্দারের মতো অকর্মণ্য প্রবঞ্চকেরা আপন ব্রাহ্মণত্বকে ভাঙিয়ে শ্রমজীবীর শ্রমের ফলে ভাগ বসায়। শ্যাম গাঙ্গুলী, চন্দ্র চাটুয্যের দল তাদের অতল নৈষ্কর্ম্য নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে বসে ঘোঁট পাকায় আর পরের ঘরের দোষ ত্রুটি কেলেঙ্কারির সন্ধানে অতিবাহিত করে। দারিদ্র্য আর অশিক্ষায় ডুবে থাকা গ্রামজীবনে আলো জ্বলে না। তুলসী মঞ্চের প্রদীপ জ্বলা সন্ধ্যায় শঙ্খধ্বনির স্বপ্নময় মূর্চ্ছনায় গ্রামের আত্মিক রূপ প্রকাশ পায়। কিন্তু বহিরাবরণে যে কলুষতার উপকরণ—লেখকের দৃষ্টি তাকে এড়িয়ে যায়নি।

কাহিনির শেষ পর্বে এসে লেখক যেন ক্রমশ একটি যুগের সমাপ্তির দিকে পাঠককে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, দোর্দণ্ডপ্রতাপ নীলকর সাহেব আর তার ক্ষমতাধর কর্মচারীর দল, প্রতাপশালী লাঠিয়ালরা, ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে এসে হাঁক দিয়ে রক্ত

জল করে দেওয়া দেওয়ান রাজারাম, গ্রাম সমাজকে শাস্ত্রীয় বিধানে সদা ত্রস্ত করে রাখা চন্দ্র চাটুয্যের মহিমা কালের নিয়মেই অন্তর্হিত। পরিবর্তে নতুনকালের নব্য ক্ষমতাধরদের আবির্ভাব। যেমন মোটবাহক নালু পালের জমিদার লালমোহন পাল বলে পরিচিতি লাভ, নীলকুঠির কাছারি আর গুদাম ধানের গোলায় পূর্ণ হয়ে ওঠা, দেওয়ান রাজারামের জায়গায় নায়েব হরকালী সুরের উত্থান, হলা পেকের মতো দুর্দান্ত ডাকাতের দেহেও কালের চিহ্ন জেগে ওঠা। এর মধ্যে এক ও অবিকল্প থেকে যায় ইছামতীর জলধারা, ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির বিচিত্র রূপ বদল, নদী তীরবর্তী বনজ লতা, ফুল, গ্রামের পথ-ঘাট দিয়ে সাধারণ মানুষের নিত্য চলাচল। বদলায় না বটগাছের আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা পাখ-পাখালির জগৎ, তার নীচে গাঁজার ধোঁয়া প্রতি সন্ধ্যায় অন্ধকার করে রাখে খেপীর আখড়া। গ্রামের অতি দীন, সমর্পিত-চিত্ত মানুষগুলির সাদাসিধে জীবনের গতিটিও একইরকম থেকে যায়। সময়ের চালচিত্রে কোনো অহংকৃত কর্তৃত্ব নিয়ে যারা নিজেদের জাহির করতে চায়নি, জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ, আঘাত-আশীর্বাদকে আবশ্যিক জেনে নীরবে গ্রহণ করেছে; তারাই কিন্তু শেষরক্ষা করতে পেরেছে।

দিলীপকুমার রায়কে একটি পত্রে এই প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ লেখেন—

> আমি কোনো বড় ঘটনায় বিশ্বাসবান নই। দৈনন্দিন ছোটোখাটো সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে যে জীবনধারা ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর মত মন্থর বেগে ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ও আনন্দের সঙ্গে চলেছে— আসল জিনিসটা সেখানে। কোনো কৃত্রিম প্লট সাজানো, প্যাঁচ কষা, কৃত্রিম সিচুয়েশন তৈরি করা আমি মানি না। নভেল কেন কৃত্রিম হবে? প্রতিদিনের অমূল্য দানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃত্রিমতার মালা গাঁথা ও তারই বেসাতি— শুধু টেকনিকের বেসাতি হয়ে দাঁড়ায়। কোনো সুস্থ, সতর্ক ও অনলস মনের বিভিন্নমুখী কৌতূহল তাতে চরিতার্থ হয় না। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচয়, ১ম বর্ষ, মাঘ, ১৩৩৮, পৃ. ৪৩৩)

গার্হস্থ্য জীবনাশ্রিত পরিবেশকে বিভূতিভূষণ নির্মাণ করেছেন কাহিনিতে। মহাকালের প্রেক্ষাপটে বহমান গৃহীজীবনের ইতিকথা যার প্রকৃতির সাহচর্যে নিত্য বেড়ে ওঠা— তাকেই তিনি এখানে পরিবেশন করেছেন। কাহিনির শেষাংশে এমন টুকরো টুকরো যাপনের ছবি ধরা পড়ে। নালু পালের দুর্গোৎসব, গয়া মেমের নিঃসঙ্গ জীবনের করুণ সংগ্রাম, বৃদ্ধ প্রসন্ন আমীনের নতুন জমিদারীতে পরের খিদমতগিরি করতে করতে অতীত স্মৃতি রোমন্থন, রামকানাই কবিরাজের দরিদ্র সংসারে দুটি ওলভাতে ভাত খেয়ে কবিরাজি শিক্ষাদানের ফাঁকে ফাঁকে ভাগবৎচর্চা, ভবানীর সংসারে টুলুর একটু একটু করে বড়ো হওয়া। তেঁতুল কোটা, ধান ভানা, ঘাটে

যাওয়া, কচু শাক আর আমড়ার অম্বল রাঁধা, দড়ি পাকানো, দাবার আড্ডা, সালিশি সভা, মাছ কেনা—গ্রামজীবনের পরিচিত ছবিগুলি কাহিনিতে ক্রমাগত উঠে আসতে থাকে, বারবার আসে খাওয়ানোর দৃশ্য, সামান্য তেল মাখা চাল ভাজা থেকে শুরু করে লুচি-চিনির ফলার দরিদ্র সাধারণ মানুষের জীবনে রসনা পরিতৃপ্তিই বিনোদনের একটি বড়ো আয়োজন। লেখকের ব্যক্তি জীবনেও প্রথম পর্বের চরম দারিদ্র্য এবং ভোজনবিলাসী স্বভাব তাঁকে রসনা পরিতৃপ্তির বিষয়ে একটু অতিরিক্ত আগ্রহী করে তুলেছিল। সামান্য খাদ্যোপকরণের আয়োজনেও যে অসীম যত্ন, পরিপাটি নিষ্ঠার ছাপ তার মধ্যেও তিনি জীবনের আনন্দ-রসের সন্ধান পেতেন। প্রেমের প্রকার ও পথ বড়ো বিচিত্র। দরিদ্র গৃহীর আন্তরিক স্পর্শে সাজানো উপকরণের যৎসামান্যতার মধ্যেও তিনি একরকমের জীবন প্রেমের ছবি দেখেছেন।

রামকানাইয়ের সাথে আলাপচারিতায় ভবানী বলেন—

> আমার মনে হয় ফুল, নদী, আকাশ, তারা, শিশু এরা বড়ো ধর্মগ্রন্থ। এদের মধ্যে দিয়ে তাঁর লীলাবিভূতি দর্শন হয় বেশি করে। ...বাইরের প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে। প্রকৃতির তালে তালে চলে তাকে ভালোবেসে সেই প্রকৃতির সাহায্যে প্রকৃতির অন্তরাত্মা সেই মহান শক্তির কাছে পৌঁছতে হবে। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইছামতী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭)

ভবানীর মতো লেখকও ভেবেছিলেন জ্ঞানের থেকেও প্রেমের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছনো সম্ভব। তাই পাপী তাপী সামান্য মানুষও যখন কোনো কিছুকে ভালোবেসে আশ্রয় করে তখন তার চিত্তে একপ্রকার অধ্যাত্মবোধই জন্ম নেয়। বুদ্ধি দিয়ে নয়, সহজ হৃদয়বৃত্তি দিয়েই তাঁকে উপলব্ধি করেছে শত শত বছর ধরে শাস্ত্রজ্ঞান বিবর্জিত সাধারণ মানুষ। তারা মন্ত্র জানেনি, আচরণ শিক্ষা করেনি, অথচ নিজস্ব বিশ্বাসে নিজের মতো করে সৃষ্টির মধ্যে নিহিত মহাশক্তির আরাধনা করে গেছে। তাঁর অস্তিত্বের স্বরূপ নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে চিন্তা করেনি, কিন্তু যে তার চারপাশের জীবন প্রকৃতিকে আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করেছেন সে-ই তাঁর কাছে সহজে পৌঁছতে পেরেছে। তাঁর প্রকৃতিভাবের সঙ্গে এই প্রেমভাব জড়িত। এই বিষয়ে তাঁর অনুভবের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে—

> গ্রাম-বাংলাকে দেহ মনের যুক্ত অঞ্জলিতে গ্রহণ করেছিলেন বিভূতিভূষণ। ...তাঁর প্রেমিকতা সরবে ঘোষিত নয়, কর্মে সক্রিয় নয়, অনুভূতিতে মাত্র সজীব। মৃদু কলভাষে বাংলার মাটির এমন জয়গান আর কোনো ঔপন্যাসিক করেননি। (চিত্তরঞ্জন ঘোষ, বিভূতিভূষণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সং, ১৯৭২, পৃ. ৩৭)

তাঁর প্রকৃতি ও মানুষ একই পরিবারের সদস্যভুক্ত, গ্রামীণ সরল মানুষ, যারা প্রকৃতির কোল-আশ্রিত, স্বাতন্ত্র্যমুক্ত তাদের প্রতিই তাঁর ভালোবাসা দীপ্যমান। এদের মধ্যে দিয়েই তিনি সনাতন জীবনের মূল আশ্রয়টিকে খুঁজে পেয়েছিলেন। বাংলার এক-একটি ছোটো গ্রামে তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের আত্মা ঐতিহ্যরূপ হয়ে ধরা দিয়েছে। কালপ্রবাহ আর জীবনপ্রবাহ এখানে একসাথে মিলে মিশে গেছে; ইছামতীর বহমান ধারার দুই পাশে এই শান্ত সুমিত জীবন ছন্দকেই তিনি প্রত্যক্ষ করে যে জীবন দর্শন তাঁর প্রেমিক মনকে আশ্রয় করেছিল সমালোচক তাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

> শান্ত, সরল, স্তিমিত গতি জীবনের ঐশ্বর্য সন্ধানী তিনি। জীবনের খর আবর্তে প্রীতি নেই তাঁর, প্রশান্তি তাঁর কাম্য। জীবনের সক্রিয়তা নয়, সমাহিত অনুভূতিই তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য। কর্মলোককে প্রায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে মনোলোকের সাধনা তাঁর। (চিত্তরঞ্জন ঘোষ, বিভূতিভূষণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২)

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উল্লেখে জানা যায় যে, 'পথের পাঁচালী'র সময় থেকে পরিকল্পনা করা 'ইছামতী' উপন্যাসটিকে তিনি চার খণ্ডে বিস্তৃত 'এপিক' আকারে লিখতে চেয়েছিলেন। সেই মহাকাব্যের শুরুতে সাধারণ-মানবজীবনের সুখ-দুঃখের অনন্ত ইতিকথাটি বলবার তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। কাহিনির সমাপ্তিতে এসে তিনি অবিরাম কালস্রোতের গহন রহস্যের কথা দিয়ে ইতি টানেন—

> কত যাওয়া-আসার অতীত ইতিহাস মাখানো ঐ সব মাঠ, ঐ সব নির্জন ভিটের ঢিপি—কত লুপ্ত হয়ে যাওয়া মুখের হাসি ওতে অদৃশ্য রেখায় আঁকা। আকাশের প্রথম তারাটি তার খবর রাখে হয়তো। ওদের সকলের সামনে দিয়ে ইছামতীর জলধারা চঞ্চল বেগে বয়ে চলেছে বড়ো লোনা গাঙের দিকে, যেখান থেকে মোহনা পেরিয়ে, রায়মঙ্গল পেরিয়ে, গঙ্গাসাগর পেরিয়ে, মহাসমুদ্রের দিকে। (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইছামতী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৪)

বিভূতিভূষণের কাছে জীবন দেশকাল বিচ্ছিন্ন খণ্ড নয়, বৃহত্তর জীবনের ভগ্নাংশমাত্র, এই অখণ্ড দৃষ্টি দিয়ে তিনি খণ্ড জীবনকে দেখেন বলেই পার্থিব জগতের সমস্ত সংঘাত সংক্ষোভকে তিনি আত্মস্থ চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন। মহাজীবনের প্রেক্ষিতে ক্ষণকালের পরিণামকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকা মানুষের সীমিত জীবন দর্শনের অনেক ঊর্ধ্বে তাঁর বিচরণ। সে কারণেই তিনি শান্ত রসের রসিক। জীবনের সার্থকতার রূপ ব্যাখ্যায় 'তৃণাঙ্কুর'-এ তিনি বলেছিলেন, অর্থোপার্জন, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সাধুবাদ বা ভোগে নয়, জীবনের সাফল্য বিশ্বের রহস্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার আনন্দে। এই বিষয়ে তাঁর সমালোচক বলেছেন—

> বিভূতিভূষণের বিশ্বাস, এই বৃহত্তর জীবনকে মানুষের আয়ুষ্কাল দিয়ে মাপা যায় না। হাজার বাজার বছর এর ব্যাপ্তি এবং এই বিরাট Vision নিয়ে যিনি জীবনকে দেখেছেন তিনিই যথার্থ জীবনকে চিনেছেন। (সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ: 'জীবন ও সাহিত্য, জিজ্ঞাসা', ১৯৭০, পৃ. ২০১)

'ইছামতী' উপন্যাসে ব্যাপ্ত কালচেতনার প্রেক্ষাপটেই সাধারণ মানব জীবনের স্বরূপ নির্মিত হয়েছে।

<u>সহায়ক গ্রন্থ</u>

১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইছামতী', মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮২।
২. 'বিভূতি-রচনাবলী', প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৭।
৩. 'বিভূতি-রচনাবলী', চতুর্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৭।
৪. 'বিভূতি-রচনাবলী', ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৮।
৫. 'বিভূতি-রচনাবলী', সপ্তম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৮।
৬. 'বিভূতি-রচনাবলী', জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, নবম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৪০৪।
৭. চিত্তরঞ্জন ঘোষ, বিভূতিভূষণ, 'সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার', দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৭২।
৮. সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'বিভূতিভূষণ জীবন ও সাহিত্য', জিজ্ঞাসা, ১৯৭০।
৯. 'পরিচয়', প্রথম বর্ষ, মাঘ, ১৩৩৮।

বিভূতিভূষণের 'ইছামতী' : তখন ও এখন

ঋতবৃতা সাহা

জলের অপর নাম জীবন। যুগে যুগে মনুষ্যসভ্যতায় জলের গুরুত্ব এইভাবেই বিবেচিত হয়েছে। নদী, হ্রদ, জলাশয়, পুকুর, খাল, বিল এসবের ধারেই পৃথিবীর আদিমতম মানবসভ্যতার ইতিহাস লেখা হয়েছে। এদের মধ্যে গুরুত্বের বিচারে নদী অগ্রগণ্য। জলের অপর নাম যদি জীবন হয়, প্রাণ হয়, তবে নদী সেই প্রাণের প্রবাহ। সময়ের সাথে সাথে, বা বলা যায় সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে, নদীর গুরুত্ব ক্রমশ কমে যায় মানুষের কাছে। নদী মজে যেতে থাকে, চিরতরে হারিয়ে যায় বা খাল হিসাবে কোনোমতে নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখে। এই মজে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করলে প্রাকৃতিক ও মানবিক উভয়রকম প্রতিচ্ছবিই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

ভারতে গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র—এই বৃহৎ নদী মিলে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ গড়ে তুলেছে। সাহিত্যিকদের বর্ণনার গ্রামবাংলা এই ব-দ্বীপেই অবস্থিত। ব-দ্বীপের নদীব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এখানে নদীর নিম্নগতি প্রবাহ দেখা যায় এবং মূল নদীটি অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়ে সাগরে মেশে। এই শাখাগুলির মধ্যে সবগুলিই যে সমানভাবে প্রবাহযুক্ত তা কিন্তু নয়। কিছু নদী পূর্ণ উদ্যমে তার স্রোতধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখে, আবার কিছু নদী ক্ষীণ হতে হতে একসময় একেবারে শুকিয়ে যায়। আবার এমনও হতে পারে যে কিছু আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে এই মজা নদীগুলিই পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হয় এবং আবার স্রোতচঞ্চল হয়ে ওঠে। তাই প্রাকৃতিক কারণে একটি নদীর মজে যাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। অস্বাভাবিকত্ব তখনই আসে যখন এই প্রক্রিয়াতে মানুষ হস্তক্ষেপ করে। মানুষের কার্যকলাপের কারণে খোদ গঙ্গানদী পর্যন্ত আজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তা অন্য প্রসঙ্গ। এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু অপেক্ষাকৃত ছোটো একটি নদীকে ঘিরে, যার নাম 'ইছামতী'।

বাংলার প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইছামতী নদীটিকে যেভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন সেভাবে আর কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। তাঁর একাধিক রচনায় এই নদীর কথা উল্লেখিত আছে এবং তার একটি

উপন্যাসের নাম ও এই নদীর নামেই নামাঙ্কিত। বিভূতিভূষণের আদি বসতবাড়িটি উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁও শহর সংলগ্ন চালকি-বারাকপুর (অধুনা শ্রীপল্লি বারাকপুর) গ্রামে অবস্থিত যা একেবারে ইছামতীর তীর সংলগ্ন। আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম যেমন মোল্লাহাটি, পাঁচপোতা রাহাতুনপুর, বাজিতপুর ইত্যাদিও ইছামতীর তীর সংলগ্ন। এই গ্রামগুলিতে বিভূতিভূষণের অবাধ বিচরণ ছিল এবং তিনি অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নদী তীরবর্তী এই গ্রামগুলির মানুষের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছেন যা উঠে এসেছে তাঁর লেখা 'ইছামতী' উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে। এই উপন্যাসের শুরুতেই তিনি বলছেন,

> মড়িঘাটা কি বাজিতপুরের ঘাট থেকে নৌকো করে চলে যেও চাঁদুড়িয়ার ঘাট পর্যন্ত দেখতে পাবে দুধারে পল্‌তে মাদার গাছের লাল ফুল, জলজ বন্যেবুড়োর ঝোপ, টোপাপানার দাম, বুনো তিৎপল্লা লতার হল্‌দে ফুলের শোভা কোথাও উঁচু পাড়ে প্রাচীন বট-অশ্বত্থের ছায়াভরা উলুটি-বাঁচড়া- বৈঁচি ঝোপ, বাঁশঝাড়, গাঙশালিখের গর্ত, সুকুমার লতাবিতান। গাঙের পাড়ে লোকের বসতি কম, শুধুই দূর্বাঘাসের সবুজ চরভূমি, শুধু চখা বালির ঘাট, বনকুসুমে ভর্তি ঝোপ, বিহঙ্গ-কাকলী-মুখর বনান্তস্থলী। গ্রামের ঘাটে কোথাও দু'দশখানা ডিঙি নৌকো বাঁধা রয়েচে।

ক্বচিৎ উঁচু শিমুল গাছের আঁকাবাঁকা শুক্‌নো ডালে শকুনি বসে আছে সমাধিস্থ অবস্থায়—ঠিক যেন চীনা চিত্রকরের অঙ্কিত ছবি। কোনো ঘাটে মেয়েরা নাইচে, কাঁখে কলসী ভরে জল নিয়ে ডাঙায় উঠে স্নানরতা সঙ্গিনীর সঙ্গে কথাবার্তা কইচে। এই উপন্যাসের মূল বৈশিষ্ট্য হল যে একটি প্রত্যন্ত গ্রামের অতি সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের সাথে একটি স্বচ্ছতোয়া নদী কীভাবে জড়িয়ে থাকে, অচ্ছেদ্য সেই বন্ধন।

বিভূতিভূষণ লিখিত 'ইছামতী' উপন্যাসে ইছামতী নদীর একটি ছোটো অংশ গৃহীত হয়েছে এবং এই উপন্যাসের পটভূমি 'পাঁচপোতা' নামক অতি ক্ষুদ্র একটি গ্রাম। ইছামতী উৎস থেকে ২৮৪ কিমি অতিক্রম করে মোহনায় গিয়ে সাগরে মিশেছে। এই নদীর কিছুটা অংশ বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত, কিছুটা ভারতের অন্তর্গত এবং কিছুটা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তরেখা নির্দেশ করছে। এই নদীটি পদ্মা নদীর একটি অপ্রধান ব-দ্বীপিয় শাখানদী। পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় পবিত্র গঙ্গা নদী দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে যথা, প্রধান শাখা পদ্মা এবং অপ্রধান শাখা ভাগিরথী। নদীয়া জেলায় শিকারপুরের কাছে মাথাভাঙ্গা নামক পদ্মার একটি শাখানদী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। এই নদীটি আরো দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে মাঝদিয়ার কাছে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি হল চূর্ণী, অন্যটি ইছামতী। আরও দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে চূর্ণী পায়রাডাঙার নিকটে ভাগিরথীর সাথে মিলিত হয়েছে এবং ইছামতী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে। মাঝদিয়া থেকে মুবারকপুর

পর্যন্ত ২০ কিমি প্রবাহিত হয়ে নদীটি বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং আরও ৩৫ কিমি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে দত্তফুলিয়ার কাছে আবার ভারতে ফিরে এসেছে। এইখানেই নদীটি নদীয়া ছেড়ে উত্তর চব্বিশ পরগনায় প্রবেশ করেছে। আরও ৪৬ কিমি প্রবাহপথের পরে, ইছামতী বরাবর ২১ কিমি দীর্ঘ রেখা ধরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তরেখা টানা হয়েছে যা বনগাঁও শহর থেকে বেরিগোপালপুর এবং পরবর্তীতে আরো দক্ষিণে তেঁতুলিয়া, বসিরহাট, টাকী হয়ে হাসনাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। হাসনাবাদ শহরে ইছামতী দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। পশ্চিমের শাখাটি হাসনাবাদ খাল নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে বিদ্যাধরী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এবং মূল শাখাটি হিঙ্গালগঞ্জের উপর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়েছে এবং রায়মঙ্গাল খাঁড়ির মাধ্যমে সাগরে পড়েছে। এই অঞ্চলে কুমীরমারি ও হেমনগর গ্রামের পর ইছামতী-রায়মঙ্গাল নদীটি সনাক্ত করা অসম্ভব কারণ এই অঞ্চলে নদী ও জোয়ার জলে পুষ্ট খাঁড়িগুলি অত্যন্ত জটিল জালকাকার নদীব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। বিভূতিভূষণের ভাষায়,

> দক্ষিণে ইছামতী কুমীর-কামট-হাঙ্গার-সঙ্কুল বিরাট নোনা গাঙে পরিণত হয়ে কোথায় কোন সুন্দরবনে সুন্দরি-গরান গাছের জঙ্গালের আড়ালে বঙ্গোপসাগরে মিশে গিয়েচে, সে খবর যশোর জেলার গ্রাম্য অঞ্চলের কোন লোকই রাখে না।'

প্রবাহপথের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, ইছামতীর সমগ্র প্রবাহপথটিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। উত্তরাংশে উৎস থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনার স্বরূপনগর-গাইঘাটা এলাকা পর্যন্ত নদীর স্রোত কোথাও আংশিকভাবে এবং কোথাও সামগ্রিকভাবে রুদ্ধ। এই অংশে নদী কচুরিপানায় ঢাকা। বিভূতিভূষণ-বর্ণিত ইছামতী এই অংশে সীমাবদ্ধ। বনগাঁও-দত্তফুলিয়া অঞ্চলের উত্তরাংশে নদী একেবারেই স্রোতবিহীন, সংকীর্ণ কচুরিপানায় সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত ও দুর্গন্ধযুক্ত খালের চেহারা নিয়েছে। স্বরূপনগরের দক্ষিণাংশে অবশ্য এর বিপরীত অবস্থা লক্ষ করা যায়। এই অংশে নদী অপেক্ষাকৃত চওড়া ও স্রোতযুক্ত। এই অংশে দক্ষিণের বঙ্গোপসাগর থেকে পলিযুক্ত জোয়ারের জল প্রবেশ করে এবং জোয়ারের জল নদীটিকে স্রোতস্বিনী করে রেখেছে। এই অংশে নদীর জল ঘোলাটে সাদা এবং এখানে জলের গভীরতাও অনেক বেশি।

ব-দ্বীপ অঞ্চলে চলাফেরার মধ্যে একটা পূর্ণতা আসে, তার ফলে কিশোরীবেলার উচ্ছলতা, চঞ্চলতা অর্থাৎ বেগ কমে যায়। এই অংশে নদী ধীর ধীরে প্রবাহিত হয় এবং কোথাও এতটুকু বাধার সম্মুখীন হলে এঁকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। ভূগোলের পরিভাষায় এই বাঁকগুলিকে বলে Meander। অনেকসময় এই বাঁকগুলি মূল নদীখাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় কারণ নদী বিরাট বাঁকের ঘুরপথে প্রবাহিত হওয়ার থেকে সোজাপথে বয়ে যেতে পছন্দ করে। তখন এই বাঁকগুলি নদী থেকে আলাদা হয়ে

বিশাল অর্ধচন্দ্রাকৃতি জলাশয় রূপে পরিত্যক্ত হয়। ঘোড়ার পায়ের ক্ষুরের মতো দেখতে হয় বলে এদের অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বা Oxbow lake বা Meander cut off বলা হয়। গ্রামবাংলায় স্থানীয় ভাবে এদের বলা হয় বাঁওড়। পাঁচপোতা গ্রামে বিভূতিভূষণের বর্ণনায় একাধিক বাঁওড়ের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বাঁওড়টির ধারে তৎকালীন নীলকুঠিটি গড়ে উঠেছিল। বিভূতিভূষণ লিখেছেন,

> ইছামতী থেকে যে বাঁওড় বেরিয়েছে; এটা ইছামতীরই পুরনো খাত ছিল এক সময়ে। এখন সে খাতে আর স্রোত বয়না, টোপাপানার দাস জমেচে। আসলে ইছামতী নদীটি অতি ধীরে ধীরে মজে যাচ্ছে। বাঁওড়ের তুলনায় নদীর সংকীর্ণতা তারই ইঙ্গিত দেয়। এইখানেই ইছামতীর মজে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি নদীর মজে যাওয়ার ইতিহাসে প্রকৃতি ও মানুষ দু'পক্ষেরই দায় থাকে। ইছামতী ও ব্যতিক্রম নয়। প্রাথমিক ভাবে প্রকৃতিই ইছামতীর মজে যাওয়ার পিছনে দায়ী এবং মানুষ মজে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। ইছামতীর শুকিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাকৃতিক কারণগুলিকে পরপর সাজালে কয়েকটি ঘটনা পাওয়া যায়।

প্রথমত, আগে মাথাভাঙ্গা নদীর প্রধান শাখা ছিল ইছামতী অর্থাৎ মাথাভাঙার বেশিরভাগ জল ইছামতীর খাত ধরেই বইত। কিন্তু অনুমান করা হয় যে ১৭০০ সাল নাগাদ স্থানীয়ভাবে চুর্ণী নদীর পার্শ্বস্থ ভূমিভাগ বসে যায় এবং তার ফলে জলপ্রবাহ চুর্ণী নদীর দিকেই প্রবাহিত হতে শুরু করে। ইছামতীতে জলের পরিমাণ কমতে থাকে এবং এইভাবেই নদীটি মজে যেতে শুরু করে।

দ্বিতীয়ত, নদীখাতের উচ্চতা নদীতে জলপ্রবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক। মাথাভাঙার তুলনায় ইছামতীর নদীখাত প্রায় ৪ মিটার উঁচুতে অবস্থিত যেখানে চূর্ণীর খাত মাথাভাঙার তুলনায় ১৫ মিটার নীচুতে অবস্থিত। স্বাভাবিকভাবেই চূর্ণীর তুলনায় ইছামতীতে জল কম প্রবেশ করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিভূতিভূষণ যখন উপন্যাসটি লেখেন ইছামতী তখনই বেশ খানিকটা মজে গিয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির সাপেক্ষে নদীর অবস্থা তখন মোটের ওপর ভালোই। উপন্যাসের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, যে তৎকালীন কলকাতার ছোটোলাট উইলিয়াম গ্রে একবার 'কলের নৌকো'-তে চেপে ইছামতী পরিদর্শনে বেড়িয়েছিলেন। সেই নৌকো নদী বেয়ে উত্তরে অগ্রসর হয়ে চূর্ণীতে পড়ে সেখান থেকে গঙ্গা অর্থাৎ ভাগিরথী-হুগলী নদী বেয়ে কলকাতায় ফিরেছিল। এ থেকে স্পষ্ট যে ইছামতী তখন যথেষ্ট নাব্য। কিন্তু বর্তমানে, বিশেষ করে শুষ্ক ঋতুতে চূর্ণী থেকে ইছামতীতে কোনো জলই প্রবেশ করে না। এই অংশে নদী পুরোপুরি অবরুদ্ধ।

তৃতীয়ত, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের যেসব নদী সমুদ্রের সাথে সরাসরি যুক্ত সেইসব নদীতে জোয়ারভাঁটার সময়-গতি বৈষম্য বা Time-velocity Asymmetry of tides দেখা যায়। এর জন্য জোয়ারের সময় সমুদ্রের দিক থেকে প্রচুর লোনা জলরাশি খুব কম সময়ের মধ্যেই প্রবল বেগে নদীতে প্রবেশ করে এবং নদীর জলের সাথে বয়ে আনা পলি, বালি, কাদা ইত্যাদি সমুদ্রের দিকে বাহিত না হয়ে নদীগর্ভেই সঞ্চিত হয়। কিন্তু, ভাঁটার সময় এই জল যখন সমুদ্রে ফিরে যেতে থাকে তখন জলপ্রবাহের গতি ও শক্তি উভয়েই কমে যায়। ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় বলে নদীর জল সঞ্চিত পলিরাশি সমুদ্রে বয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এইভাবে নদীর নাব্যতা হ্রাস পেতে থাকে এবং অনিবার্য ভাবেই নদীটি শুকিয়ে যায়। স্বরূপনগরের দক্ষিণে ইছামতীতে জোয়ার-ভাঁটার এই সময়-গতি বৈষম্য অত্যন্ত সক্রিয় একটি পদ্ধতিরূপে কাজ করছে। ইছামতীর নাব্যতা হ্রাসের জন্য মনুষ্যসৃষ্ট কার্যাবলিও যথেষ্ট প্রভাবশালী। যেমন—প্রথমত, ১৯৪২ সালে গেদে রেলপথের প্রসারণে ইছামতীর উৎসমুখের উপর একটি রেলব্রিজ নির্মিত হয় যার বড়ো বড়ো থামগুলি জলের গতিকে রুদ্ধ করে দেয়। ১৯৯৯ সালে রাজ্য সেচদপ্তর উৎসমুখটির সংস্কার করলেও অবস্থার উন্নতি হয়নি। এছাড়াও নদীটির উপর বেশ কয়েকটি পাকা সেতু ও বহু বাঁশের সাঁকো নির্মিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রায় সমগ্র নদীটির গতিপথে দুই তীর বরাবর অজস্র ইটভাঁটা গড়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণের রচনায়ও এই ইটভাঁটার উল্লেখ আছে। এই ইটভাঁটাগুলিতে প্রয়োজন মতো নদীর জল ও পলি ব্যবহৃত হয়। পরিবর্তে, নদীর ভাগ্যে জোটে রাশি রাশি পোড়া ছাই এবং দূষিত বর্জ্য পদার্থ।

তৃতীয়ত, সময়ের সাথে সাথে নদীর দুই তীরেই মানুষের বসবাস ক্রমশ বেড়েছে যা নদীর স্বাভাবিকত্বের উপর একটি বাধা রূপে চাপ সৃষ্টি করছে। নদীপাড়ে মানুষের জীবন-জীবিকার সাথে নদীটির নিবিড় সম্পর্ক আছে। কিন্তু নদীর জল ব্যবহারের ধরণটি সবসময় বিজ্ঞানসম্মত নয়। বহু মানুষ পাটা, ঘুর্ণিজাল বা ভেচাল দিয়ে মাছ ধরেন ইছামতীতে। অনেক স্থানেই পাট ভেজানো হয় নদীর জলে। পাটের আঁটিগুলির উপর মাটি দিয়ে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু পাট ছাড়িয়ে নেওয়ার পর মাটি নদীখাতেই জমে থাকে। এছাড়া, দুর্গোৎসবের শেষে নদীতে অজস্র প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। সব মিলিয়েই এখন নদীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

ইছামতীর এইভাবে শুকিয়ে যাওয়ার কারণে নদীতীরবর্তী এলাকাগুলি পরোক্ষভাবে নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ইছামতীর স্রোতবিহীন কচুরীপানায় ঢাকা জল সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত নয়। নদীর এই অংশ যখন একদিকে মশার আঁতুড়ঘর, অন্যদিকে স্রোতবিহীন জল বন্যার সম্ভাবনাকে অনেকাংশেই বাড়িয়ে দেয়। বর্ষার ভারী মৌসুমী

বৃষ্টিপাতেই নদীতীরবর্তী বহু এলাকা বন্যার কবলে পড়তে পারে। ১২৭০ বঙ্গাব্দের বন্যার কথা 'ইছামতী' উপন্যাসে উল্লেখিত আছে। নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও কচুরীপানায় ঢাকা, খালসদৃশ অতি সংকীর্ণ একটি নদী কখনই সৌন্দর্যের পরিচয় দেয় না। পাশাপাশি নদীর জলপ্রবাহের পরিবর্তন নদীর বাস্তুতন্ত্রেও পরিবর্তন আনছে। ইছামতীর জলে আগে উৎকৃষ্ট মানের মুক্তো সহ ঝিনুক পাওয়া যেত। 'ইছামতী' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় 'ইছা' অর্থাৎ ঝিনুক এবং 'মতি' অর্থাৎ মুক্তো। বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'এদিকে গাঁয়ের মধ্যে হুলস্থূল। অমুকের বৌ একশো টাকা দামের মুক্তো পেয়েচে ইছামতীর জলে।' শুধু মুক্তো নয়, কুমীরও পাঁচপোতা গ্রামের ইছামতীতে বর্তমান ছিল। কিন্তু এই সমগ্র বাস্তুতন্ত্রটিও এখন পরিবর্তিত হচ্ছে এবং ক্রমশ দক্ষিণে সাগরের কাছাকাছি অগ্রসর হচ্ছে।

ইছামতীর নাব্যতা হ্রাস আটকাতে সরকারের তরফে কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলি সার্বিকভাবে সফল হয়নি। ১৯৮০-এর দশকে Ichhamati নামক একটি প্রকল্পের প্রস্তাব ওঠে। ১৯৯৩ সালে এই প্রকল্পের আওতাধীন নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর মাত্র ৩০৫ মিটার সংস্কার করা হয় যা নদীটির সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র অংশবিশেষ। প্রকল্পটি ঐখানেই শেষ হয়ে যায়। সম্প্রতি পিপলী-গোগা সীমান্ত অঞ্চলে রাজ্য সেচ এবং জলপরিবহন দপ্তর Dredging অর্থাৎ ইছামতীর খাত থেকে পলি তুলে নেওয়ার কাজ শুরু করেছে। এই অঞ্চলে প্রায় ২০ কিমি নদীপথে Dredging করা হবে এবং নদীটি দুইতীরেই সাত মিটার করে চওড়া করা হবে। এই প্রকল্পের কাজ চলছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হল ২০১২ সালের NREGA অর্থাৎ National Rural Employment Guarantee Act-এর অন্তর্ভুক্ত একটি প্রকল্প যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইছামতীর বুক থেকে কচুরীপানা ও অন্যান্য আগাছা নির্মূল করা। বারাসাত, বনগাঁও ও গাইঘাটা অঞ্চলে স্থানীয় মানুষদের এই প্রকল্পে নিয়োগ করা হয়। এর ফলে এই মানুষগুলির সাময়িকভাবে রোজগারের একটি উৎস তৈরি হয় এবং এই অঞ্চলগুলিতে ইছামতীকে অনেকটাই কচুরীপানা মুক্ত করা সম্ভব হয়। এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই প্রকল্পগুলি ইছামতীকে পুনর্জীবিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ইছামতীকে বাঁচাতে হলে শুধু সরকারই নয়, নদীতীরে বসবাসকারী প্রত্যেকটি মানুষের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নদী সম্পর্কে সচেতনতা অত্যন্ত জরুরী। নদীর জলের অহেতুক অপচয়, যত্রতত্র প্লাস্টিক ও বর্জ্য বস্তু নিক্ষেপ, দুর্গাপুজোয় প্রতিমা নিরঞ্জন এগুলি যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করা ও পারতপক্ষে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। প্রতিমা নিরঞ্জনের বিষয়টির সাথে মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগ জড়িয়ে থাকে তাই এক্ষেত্রে সবথেকে ভালো সমাধান হল প্রতিমা জলে ফেলেই সাথে সাথে তুলে

নেওয়া। একমাত্র তাহলেই প্রতিমা থেকে কোনো পদার্থ জলে মিশবে না। সরকারের তরফ থেকে অতি অবশ্যই নিয়মিতভাবে নদীতে Dredging করা উচিত যদিও এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি পদ্ধতি।

'ইছামতী' উপন্যাসের একেবারে শেষে বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'ইছামতীর জলধারা চঞ্চলবেগে বয়ে চলেচে বড় লোনা গাঙের দিকে, সেখান থেকে মোহনা পেরিয়ে, রায়মঙ্গাল পেরিয়ে, গঙ্গাসাগর পেরিয়ে মহাসমুদ্রের দিকে। ...' ইছামতীর এই চঞ্চলধারা ধীরে ধীরে স্থবির হয়ে আসছে। এই নদীটি এইভাবেই হারিয়ে যাবে না যদি আমরা আরেকটু সচেতন হই, আরেকটু উদ্যমী হই। কারণ নদী কোনো দেশের সীমারেখা মানে না, এই নদী আমাদের সকলের।

‘ইছামতি’ : এক ইচ্ছামতী নদীর আখ্যান

রামকৃষ্ণ মণ্ডল

‘পথের পাঁচালী’ লেখার প্রায় দু’দশক পরে বিভূতিভূষণ লেখেন ‘ইছামতী’। ইছামতী নদী-সংলগ্ন জনজীবনের জীবনালেখ্য লিখতে গিয়ে তাঁর লেখক সত্তার সঙ্গে যেন ঐতিহাসিক ও দার্শনিক সত্তার ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে। তিনি লিখেছেন সুখ-দুঃখের অলিখিত ইতিহাস। নিসর্গপ্রকৃতি এবং মানুষের জীবনপ্রবাহের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন ঈশ্বরের লীলাবিভূতির অকুণ্ঠ প্রকাশ। ১৯২৮ সালে ‘স্মৃতির রেখা’য় লিখেছেন—

> ঐ আমাদের গ্রামের ইছামতী নদী।...গত পাঁচশত বৎসর ধরে কত ফুল ঝরে পড়েছে—কত পাখী কত বনঝোপ আসছে যাচ্ছে। স্নিগ্ধ পাটা-শেওলার গন্ধ বার হয়, জেলেরা জাল ফেলে, ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ী। কত হাসিকান্নার মেলা। আজ পাঁচশত বছর ধরে কত গৃহস্থ এল কত হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল—কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানশয্যা হল ঐ ঠাণ্ডাজলের কিনারাতেই, ঐ বাঁশবনের ঘাটের নীচেই। কত কত মা, কত ছেলে, কত তরুণ তরুণী সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথিপথ বেয়ে। ঐ শান্ত নদীর ধারে ঐ আকন্দ ফুল, ঐ পাটা-শেওলা, বনঝোপ, ছাতিম বন। এদের গল্প লিখব, নাম হবে ইছামতী।[১]

ইছামতী নদী বিভূতিভূষণের বিভিন্ন রচনায় ঘুরে ফিরে এসেছে। তবে কেবলমাত্র এই নদীকে কেন্দ্র করে আস্ত একটা উপন্যাস লেখার বাসনা তাঁর মনে প্রথম থেকেই ছিল। ‘স্মৃতির রেখা’-য় তারই স্বীকারোক্তি। ‘ইছামতী’-র ঘটনাকাল উপন্যাস রচনার প্রায় একশ বছর আগে এবং গল্পের ছক রচিত হয়েছে ইছামতীর পার্শ্ববর্তী পাঁচপোতা গ্রামকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ বহুমুখী। একদিকে নীলকর সাহেব ও দেওয়ান রাজারামের দাপট এবং অন্যদিকে পানের ব্যবসায়ী নালু পালের ধনী হওয়ার স্বপ্ন। দেওয়ান রাজারামের কুলীনগৃহে আবার তিন কুমারী ভগ্নী। এরপর পঞ্চাশ অতিক্রান্ত ভবানীর এই তিন কুমারীর উদ্ধারকর্তা স্বামী হিসাবে আবির্ভাব। শিপটন সাহেব, ছোটো সাহেব বা রাজারামের অত্যাচারের পাশাপাশি দেখানো হয়েছে—তিলু-বিলু-নীলুর জীবনে প্রায় অপ্রত্যাশিত স্বামী ও সংসার যাত্রা। ভবানীর পুত্রসন্তান

লাভ হয় তার প্রিয়তমা পত্নী তিলুর দ্বারা। তার অপত্য স্নেহ, বাল্যকণ্ঠ শ্রবণের নির্মল আনন্দ, স্বপত্নী-ভগিনীকুলের সহজ ঈর্ষা-অভিমান-ভালোবাসা সবকিছু নিয়েই সংসার চলে। সময়ও এগিয়ে চলে। পাঁচপোতা তথা ইছামতী তীরস্থ অন্য গ্রামগুলির জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। দেওয়ান রাজারাম খুন হন। নীলবিদ্রোহ শুরু হয়। জার্মানি থেকে রাসায়নিক নীল আসায় নীলচাষ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। শিপটন সাহেব কুঠি আঁকড়ে পড়ে থাকেন ও একসময় তাঁরও মৃত্যু হয়। ভবানীর তিন পত্নীর মধ্যে মধ্যমা বিলু মারা যায়। পানের ব্যবসায়ী নালু পাল ক্রমশ বড়ো আড়ৎদার হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত নীলকুঠিরও মালিক হয়। এসবের সঙ্গে লেখক দেখিয়েছেন গয়া মেমের আত্মত্যাগ, প্রসন্ন চক্কোত্তির প্রেম এবং এঁকেছেন নিস্তারিণীর মতো আধুনিকা এবং রামকানাই কবিরাজের মতো আদর্শবান চরিত্র।

লেখক বাংলাদেশের গ্রামজীবনের কথা বলতে চেয়েছেন। আর সেই বাংলাদেশের গ্রামজীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি অতীত ইতিহাসের অনুষঙ্গকেও উপেক্ষা করেননি। সে কারণে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলসহ নীলকর সাহেবদের আগমন, নীলচাষের পত্তন আর তার ফলে চাষিদের দুরবস্থা এবং শেষ পর্যন্ত নীলবিদ্রোহের মতো ঘটনাগুলিকে লেখক উপন্যাসে অসাধারণ শৈল্পিক মহিমায় প্রতিস্থাপিত করেছেন। উপন্যাসের শুরুতেই নালু বা লালমোহন পালের মোট নিয়ে যাওয়ার সময় 'মোল্লাহাটি নীল কুটির বড় সাহেব শিপটন' এর সঙ্গে কথোপকথন দৃশ্য রয়েছে। বিভূতিভূষণ নীল বিদ্রোহের পটভূমিকায় প্রধানত 'ইছামতী' উপন্যাসের গতিময়তাকে তৈরী করেছিলেন। একসময় দীনবন্ধু মিত্র নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও নিপীড়নের কাহিনি 'নীলদর্পণ' নাটকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সে সময় দরিদ্র কৃষকদের জোর করে চাষের জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করা হতো। সঙ্গে থাকতো অমানুষিক উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা। বিভূতিভূষণ লিখেছেন—

> জেন বিল্‌স্‌ শিপটন হঠাৎ টেবিলের উপর দুম করে ঘুঁষি মেরে বললে—ওসব শুনিটে চাই না—আই ডোনট উইশ ইউ স্পিন দ্যাট রিগম্যারোল ওভার হিয়ার এগেন—কাজ চাই কাজ। ডুশো বিঘা জমিতে এ বছর নীল বুনিটে হইবে। বুঝিলে? বাজে কঠা শুনিটে চাই না।[২]

আবার অত্যাচারিত মানুষগুলির বিদ্রোহের চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

> নীলবিদ্রোহ তিন জেলায় সমানে দাপটে চললো। সার উইলিয়াম গ্রে সব দেখে গিয়ে যে রিপোর্ট পাঠালেন, নীলকরদের ইতিহাসে সে একখানা বিখ্যাত দলিল। তিন জেলার বহু নীলকুঠি উঠে গেল এর দু-বছরের মধ্যে। বেশীরভাগ নীলকর সাহেব কুঠি বিক্রি করে কিংবা এদেশি কোন বড়লোককে ইজারা দিয়ে সাগর পাড়ি

দিলে। দু-একটা কুঠির কাজ পূর্ববৎ চলতে লাগলো, তবে সে দাপটের সিকিও কোথাও ছিল না।[৩]

কিন্তু এই ঐতিহাসিক পটভূমিকে তিনি উপন্যাসের কেন্দ্রভূমি করে তোলেননি। কারণ তাঁর মনে ছিল আবহমান কালের প্রতিমা। আর সে কারণে তাঁর ইতিহাসবোধ শেষ পর্যন্ত মিশে গেছে অসীম বোধে।

বিভূতিভূষণ মানুষের ইতিহাস রচনা করতে বসেছিলেন। মানুষের আপাততুচ্ছ কিন্তু গভীর খণ্ড খণ্ড ঘটনাবলি তাঁর নজর এড়িয়ে যায়নি। অ্যানাল গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা যেমন ইতিহাসের বাঁকবদল লক্ষ করেন, বিভূতিভূষণও তেমনি লক্ষ করেছেন জীবনের পুনরাবৃত্ত ছন্দ। সমস্ত কিছুর প্রবহমানতা এবং অনিত্যতা তাঁকে এক আধ্যাত্মিক জগতে পৌঁছে দিলেও তিনি রূপময় প্রাতিভাসিক জগৎকে মুহূর্তের জন্য মায়া বলে অস্বীকার করেন না। সে কারণে নির্বেদ ও বৈরাগ্যের পাশাপাশি খণ্ড মুহূর্তগুলির প্রতিও তিনি প্রবল আসক্ত হয়ে পড়েন। ফলে ইতিহাসের তথ্যও তাঁর কাছে হয়ে ওঠে অমূল্য সম্পদ।

মহাজীবনের কল্পপ্রসারী বিভূতিভূষণ দাঁড়িয়ে থাকেন অনাদি অনন্ত কালচেতনার সীমান্তে। তাই তাঁর প্রিয় চরিত্র অপু সমকালে দাঁড়িয়ে যেমন অতীত কালের স্বপ্নে বিভোর, তেমনি ভাবীকালের আহ্বানে উচ্চকিত। তার পথ চলা ফুরোয় না। 'ইছামতী' উপন্যাসেও রয়েছে সেই একই কালচেতনার আবর্তন। এই কালস্রোতে এসে মিলেছে দুটি ধারা—একদিকে বাস্তবলোক, আর অন্যদিকে অনন্ত ভাবলোক। প্রাতিভাসিক জগতের মানুষ তাদের ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি ধর্মীয়বিশ্বাস, সংস্কার—সমস্ত কিছুকে সঙ্গী করে ধূসর অতীত থেকে সমকালে পদচারণা করে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত। অখণ্ড মহাকাল ও মহাজীবনের সম্বন্ধে বিশ্বাসবোধ উপন্যাসের মধ্যে অন্তর্নিহিত।

'ইছামতী' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ তাঁর জন্মের পূর্বের ইছামতী-তীর অধ্যুষিত জনপদজীবনের ইতিহাস, কাহিনি ও কিংবদন্তী সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি যে ইতিহাস খুঁজেছিলেন তা প্রধানত রাজনৈতিক নয়, মূক জনগণের সাধারণ সুখ-দুঃখের কাহিনি তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। রাষ্ট্রিক ইতিহাস বিদ্যুতের মতো গ্রামবাংলার অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনকে ক্ষণিকের জন্য চমকিত করে পরক্ষণেই মিলিয়ে গেছে। সেই কারণে যে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার গ্রামবাসীদের জীবনে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে উপন্যাসের শেষে তাও একদিন নিরাময়ের আনন্দ লাভ করেছে। তাই এখানে কোল্‌স্‌ওয়ারদি গ্রান্ট আবির্ভূত হয়েছেন কবিত্বময় আধ্যাত্মিক অনুভূতি সঙ্গে নিয়ে। হলা পেকের ডাকাতির গল্প শ্রোতাদের করেছে সন্ত্রস্ত। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা বেঁধে ইংরেজের সঙ্গে লড়াইয়ের ইতিবৃত্ত লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে।

তারপর একদিন সবকিছুই কালের স্রোতে ভেসে গেছে। ইছামতী নদীর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যেমন প্রতি বর্ষার জলধারা পুরোনো সবকিছুকে ধুয়ে মুছে সাফ করে নতুন পলিস্তর বিস্তারিত করে, গজিয়ে ওঠে নতুন তৃণগুল্ম তেমনি জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে নতুন কাল, নতুন জীবনধারা।

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যেও রয়েছে নতুন কালের আবির্ভাবের প্রতিধ্বনি। নালু পাল মাত্র সতের টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করে শেষ পর্যন্ত গ্রামের সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী ব্যক্তি ও নীলকুঠির মালিকে পরিণত হয়। এই অবস্থা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে লেখক কৃষি-নির্ভর গ্রামীণ জীবনে বণিকবৃত্তির সূচনার অনিবার্য দিকটিকে চিহ্নিত করেছেন।

নিস্তারিণী যেন আধুনিক নারী। সমাজের অনুশাসনকে উপেক্ষা করে সে নারীর স্বাধীন প্রবৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। ভবানী ও তিলুর জীবন ইছামতীর ধারার মতো স্বচ্ছ ও নির্মল, পুজোর পুষ্পার্ঘ্য ও পূতিগন্ধময় আবর্জনাস্তূপ—সবকিছুকে বয়ে নিয়ে যায় কিন্তু নিজে কলুষিত হয় না বরং অন্যকে পবিত্র করে। ভবানী সংস্কারমুক্ত। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে পারিবারিক জীবনেও তিনি প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বাস্তবতার তাগিদে পুত্র রাজ্যেশ্বরকে ইংরেজী পড়াবার ইচ্ছা করেছেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে ইতিহাস, রাজনীতির পরিবর্তন ও সংস্কার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মানুষের জীবন ও জীবনযাপনের বদল সংঘটিত হয়েছে তিনি তার একটি রূপরেখা তুলে ধরেছেন। গ্রামের মানুষ প্রবল আকর্ষণে ছুটে গেছে নতুন কালের আহ্বানে। নতুনের আহ্বানে মানুষ ছুটে গেছে অজানা তীর্থের সন্ধানে। ফিরবে কি ফিরবে না সে সংশয় বুকে নিয়েও তারা চলে গেছে প্রিয়জনের কাছে বিদায় নিয়ে। বিভূতিভূষণ অসাধারণ শিল্প-সৌন্দর্যে রঞ্জিত করে এই চলমান জীবনকে এঁকেছেন শব্দের মায়াজালে। মোল্লাহাটির পথে শুরু হয়েছিল যে উপন্যাসের কাহিনি তার সমাপ্তিলগ্নে এসে আমরা দেখি বৃদ্ধ প্রসন্ন চক্কোত্তি বিগতযৌবনা গয়া মেমের কাছে পরম আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি পেয়েও অন্ধকার পথে বেড়িয়ে পড়েছে। গয়া মেমের আকুতি তাকে বাঁধতে পারেনি। তাই—

> গয়া অবাক হয়ে বললে—এত রাত্তিরি কোথায় যাবেন খুড়োমশাই?
>
> —পরের ঘোড়া এনিচি। রাত্তিরিই চলে যাবো কাছারীতি। পরের চাকরি করে যখন খাই, তখন তাদের কাজ আগে দেখতি হবে। না যদি আর দেখা হয় মনে রেখো বুড়োটারে। তুমি চলে যাও, অন্ধকারে সাপ খোপের ভয়।
>
> আর মোটেই না দাঁড়িয়ে প্রসন্ন চক্কত্তি ঘোড়া খুলে নিয়ে রেকাবে পা দিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠলো। ঘোড়ার মুখ ফেরাতে ফেরাতে অনেকটা যেন আপন মনেই

> বললে—মুখের কথাডা তো বললে গয়া, এই যথেষ্ট, এই বা কেডা বলে এ দুনিয়ায়, আপনজন ভিন্ন কেডা বলে? বড্ড আপন বলে যে ভাবি তোমারে—[৪]

প্রকৃত প্রেম শুধু ঘরে টানে না, তা পথ চলতেও সাহায্য করে। প্রেমের এমন সুন্দর ও সৌম্য রূপের বর্ণনা বিভূতি সৌন্দর্যের স্বাভাবিক প্রতিফলন।

'ইছামতী' উপন্যাসে চলমান বাস্তবজীবনের সঙ্গে মহাজীবনের দ্যোতনা এসে মিলেছে। আর সেই বিশালতার বোধে একাকার হয়ে গেছে অত্যাচারী ও অত্যাচারিত। তাই রাজারাম যে প্রজাপীড়ক, যে সাহেবের খয়ের খাঁ, যার মৃত্যু প্রজাদের হাতে, তার মানবিক মুহূর্তগুলিও বিভূতিভূষণের কাছে মূল্যবান। নীলকরদের অত্যাচারের পাশে পাশে তাদের জীবনের দুঃখ ও অসহায়তার প্রতিও তিনি সংবেদনশীল। তাঁর চোখে বড়ো হয়ে ধরা দিয়েছে ঘটনার মিছিল, মানুষের মিছিল। সে কারণে 'ইছামতী'র শুরুতে তিনি লিখেছেন—

> এই সব ভিটে দেখে তুমি স্বপ্ন দেখবে অতীত দিনগুলির, স্বপ্ন দেখবে সেই সব মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের, যাদের জীবন ছিল একদিন এইসব বাস্তুভিটের সঙ্গে জড়িয়ে। কত সুখদুঃখের অলিখিত ইতিহাস বর্ষাকালে জলধারাঙ্কিত ক্ষীণ রেখার মত আঁকা হয় শতাব্দীতে শতাব্দীতে এদের বুকে।
>
> সেই সব বাণী, সেই সব ইতিহাস আমাদের আসল জাতীয় ইতিহাস, মূক জনগণের ইতিহাস, রাজা-রাজড়াদের বিজয়কাহিনী নয়।[৫]

আবার উপন্যাসের শেষেও রয়েছে সেই মহাকালের পদধ্বনি। তিনি বলেছেন—

> ওদের সকলের সামনে দিয়ে ইছামতীর জলধারা চঞ্চলবেগে বয়ে চলছে বড় লোনা গাঙের দিকে, সেখান থেকে মোহনা পেরিয়ে, রায়মঙ্গল পেরিয়ে, গঙ্গাসাগর পেরিয়ে মহাসমুদ্রের দিকে।[৬]

ইতিহাসের রসগ্রাহী ছাত্র বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে ইছামতী নদীকে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর কালচেতনা তথা জীবনের প্রবহমানতায় বিশ্বাস উপন্যাসটির ভিত্তি। ইছামতী নদী তাই চলমান অনন্ত জীবনেরই প্রতীক। যে জীবন বয়ে যাবে ইছামতীর মতো বিরাট vision নিয়ে অনন্তের দিকে। মোহনা পেরিয়ে রায়মঙ্গল পেরিয়ে গঙ্গাসাগর পেরিয়ে মহাসমুদ্রের দিকে।

<u>উৎসের সন্ধানে</u>

১. 'বিভূতিভূষণ রচনাবলী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা-৭৩, জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড, ১ম প্রকাশ পৌষ, ১৪০৩, পৃ. ২৫১

২. 'ইছামতী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা-৭৩, ষোড়শ মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৪১৭, পৃ. ৫৭
৩. 'বিভূতিভূষণ রচনাবলী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা-৭৩, জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১২শ খণ্ড, ১ম প্রকাশ পৌষ, ১৪০৩, পৃ. ১৭৪-১৭৫
৪. 'ইছামতী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা-৭৩, ষোড়শ মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৪১৭, পৃ. ২১৯
৫. তদেব, পৃ. ৩
৬. তদেব, পৃ. ২২০

সহায়ক গ্রন্থ

১. 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়', রুশতী সেন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১ম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫।
২. 'বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প', গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দেজ পাবলিশিং, পরিমার্জিত সংস্করণ, মাঘ ১৩৯৫।
৩. 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস', ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, ১ম সংস্করণ ১লা ডিসেম্বর ২০০০।
৪. 'বিভূতিভূষণ', চিত্তরঞ্জন ঘোষ, বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ২৮শে ভাদ্র, ১৩৬৬।
৫. 'মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে', অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দেজ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৪।
৬. 'বিভূতিভূষণ দ্বন্দ্বের বিন্যাস', রুশতী সেন, প্যাপিরাস, ২য় সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৮।

‘অশনি সংকেত’ : জীবনের জলছবি

অরুন্ধতী সুর

বিভূতিভূষণের কর্মজগৎ ও কর্মক্ষেত্র ছিল বহুধাবিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন মানুষের সান্নিধ্য যেমন লাভ করেছেন কর্মসূত্রে তেমনই বিভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছেন। সেইসব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর সাহিত্যের ভাণ্ডার। আমরা পেয়েছি গল্প, উপন্যাস, দিনলিপি-র অসংখ্য উৎকৃষ্ট সম্ভার। দেশ ভ্রমণের নেশা ও সাহিত্য রচনার প্রেরণা বিভূতিভূষণের মজ্জায় ছিল উত্তরাধিকার সূত্রে-ই। ফলে, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে মানসিক পরিসর ও পারিপার্শ্বিকতার সমন্বয় ঘটেছিল সহজেই।

‘অশনি-সংকেত’ উপন্যাসটি ‘মাতৃভূমি’ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মাঘ থেকে ১৩৫২-এর মাঘ (১৯৪৪-এ জানুয়ারি—১৯৪৬-এর জানুয়ারি) পর্যন্ত। কিছুদিন পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এটি লেখক আর শেষ করতে পারেননি বলে জানিয়েছেন ‘বিভূতি প্রকাশন’-এর সম্পাদক চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়। উপন্যাসটি ১৯৫৯-এর অক্টোবরে (ভাদ্র, ১৩৬৬) পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় বিভূতি প্রকাশন থেকে। এর ভূমিকা লিখেছেন রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরে শেষ প্রকাশিত উপন্যাসটি হল ‘অশনি-সংকেত’।

যে সময় লেখক উপন্যাসটি লিখতে ও ‘মাতৃভূমি’তে প্রকাশ করতে শুরু করেন সে সময় বাংলাদেশে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। মন্বন্তরক্লিষ্ট মানুষগুলোর অসহায় অবস্থার বর্ণনা যেমন উপন্যাসটির একদিকে আছে, তেমনই অন্যদিকে রয়েছে গ্রাম-সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থায় মন্বন্তরের অভিঘাতের বাস্তব ও জ্বলন্ত রূপ। গ্রাম-সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মন্বন্তর কীভাবে তার প্রভাব বিস্তার করেছে তারই সকরুণ চিত্র বিধৃত হয়েছে উপন্যাসটিতে। মন্বন্তরের যে বীভৎস রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তা ‘১৯৪৩’-এর দিনলিপিতে বর্ণিত হয়েছে। ১৯৪৩-এর ১ অক্টোবর তিনি লিখেছেন ‘কত রাত পর্যন্ত ভিখারীর ভিড়— সারারাত বলচে— ফেন দাও! চাল দাও!’[১] আবার ২৭ অক্টোবর কলকাতা থেকে ঘাটশিলা ফেরার পথে দেখা অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—

> ওয়াভেল সাহেব কাল কলকাতায় ছদ্মবেশে বেড়িয়ে ক্ষুধার্ত নরনারীদের দেখেছেন শুনলুম। ওদের করুণ আর্তনাদ কলকাতার বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলেছে। কিছু ভালো লাগে না। বাংলার অবস্থা কি করুণ, কি ভীষণ, চোখে না দেখলে তা বোঝানো যাবে না। ঘাটশিলা আসবার সময় প্রত্যেক স্টেশনে উলঙ্গ কঙ্কালসার নরনারীর ভিক্ষার জন্য কাতর প্রার্থনা—এ দৃশ্য আর কতকাল সহ্য করতে হবে? হাহাকারে চারিধার যে পূর্ণ হয়ে উঠলো। মানুষ মরে পাহাড় হয়ে যাচ্ছে।[২]

এই বাস্তব অভিজ্ঞতাই 'অশনি-সংকেত' রচনার প্রেক্ষাপট বলে মনে হয়। স্বল্পদৈর্ঘ্যের উপন্যাসটিতে সমসাময়িক সময়ের একাধিক বাস্তব সমস্যা এবং সমাজস্রোতের নির্বিকল্প পরিণতি তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। মন্বন্তরের করাল দংশন কীভাবে সহজ সরল মানুষগুলোর বিশ্বাসে এনেছে পরিবর্তন, স্বার্থকেন্দ্রিক করেছে মানুষগুলোকে তারই চিত্র রূপায়িত হয়েছে উপন্যাসে। মানবজীবনের এক অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য পরিণতি যা তাদের কল্পনাতীত ছিল তাই ধীরে ধীরে সত্য হয়েছে গ্রামবাসীদের কাছে। ফলে সংশয় ও আতঙ্কের বাতাবরণে গ্রামজীবন কারুণ্যের আবেশ মথিত এক ভয়ংকর পরিণামের দিকে এগিয়ে চলেছে প্রতি পলে পলে—ঔপন্যাসিক তাকেই রূপ দিয়েছেন অসাধারণ দক্ষতায়।

উপন্যাসটির কেন্দ্রে আছে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার। ব্রাহ্মণ পরিবারটির প্রতিষ্ঠা অর্জনের বাস্তবিক প্রয়াস এবং গ্রামজীবনের ব্রাহ্মণ শ্রেণির অবস্থানের চিত্র দিয়েই উপন্যাসের শুরু। স্বামী গঙ্গাচরণ, স্ত্রী অনঙ্গ এবং দুই পুত্র পটল ও বাবুকে নিয়ে বারবার বাসা বদল করে। এই বাসা পরিবর্তন তার অস্থির চিত্তের কিংবা বাউণ্ডুলে স্বভাবের পরিচয় বহন করে না। গঙ্গাচরণ ঘোর বৈষয়িক। 'বড্ড চলাচলতির' কষ্টের জন্যই তাকে গ্রাম পরিবর্তন করতে হয়। পৈত্রিক নিবাস হরিহরপুর। জ্ঞাতিদের প্রতারণায় হরিহরপুর ছেড়ে 'ভাতছালা' গ্রামে বসতিস্থাপন। সেখানেও কিছু অসুবিধা এবং প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন ঘটায় যেতে হয় বাসুদেবপুর। এখানেও তেমন সুবিধা হয় না। তাই আবার গ্রাম পরিবর্তন করে নতুন গাঁ-এ। দশ-বারো বছর আগে কাপালীদের তৈরি এই গ্রাম; কেউ বলে চরপোলতার নতুন পাড়া। গ্রামে কাপালী ও গোয়ালাদের মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবার হল গঙ্গাচরণের পরিবার। একমাত্র ব্রাহ্মণ ঘর, তাই মান্য করে সকলে। গ্রামের অজ্ঞ মানুষগুলোর চেষ্টাতেই গড়ে ওঠে পাঠশালা, আর শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন গঙ্গাচরণ। পূজা-পার্বণও শুরু করেন, কবিরাজি বটিকাও একটু আধটু করে যথাস্থানে কাজে লাগান তিনি। এককথায় গ্রামের মোড়ল বিশ্বাসমশাই-এর পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভের পথ প্রশস্ত হয় শীঘ্রই। সংসারে খাই-খরচের প্রায় সবটাই আসে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। পয়সা খরচ করে কিনতে

হয় না কিছুই—এরকম ঘটনার চিত্র উপন্যাসে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। গঙ্গাচরণের অভিসন্ধি এরকম—

> রও, সব দিক থেকে বেঁধে ফেলতে হবে ব্যাটাদের। চাষা গাঁ, জিনিস বলো, পত্তর বলো, ডাল বলো, মূলো বেগুন বলো—কোনো জিনিসের অভাব হবে না। (পৃ. ৬)

সুযোগ বুঝে শুরু করে দেয় পুরুতগিরি। 'শুদ্দুর-যাজক বামুন' আর না জেনে পূজা করার জন্য, স্ত্রী অনঙ্গর ভীতিতে গঙ্গাচরণ সান্ত্বনা দেয় এভাবে—

> অত ভয় করলে সংসার করা চলে না। পাঁজিতে আজকাল ষষ্ঠীপুজো, মাকালপুজো সব লেখা থাকে—দেখে নিলেই হবে।... কোনো ভয় নেই বৌ—তুমি দেখে নিও, এ ব্যাটাদের সবদিক থেকে বেঁধে ফেললে কোনো ভাবনা হবে না আমাদের সংসারে। (পৃ. ৬)

কেউ কথা ফেলতে পারে না গঙ্গাচরণের। সুযোগ গ্রহণে পটু গঙ্গাচরণ নানা অছিলায় নিজের প্রতিষ্ঠার পথটি সুগম করে নেয় তিলে তিলে এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতেই হয়। গাঁয়ের মোড়ল বিশ্বাস মশাইয়ের একটি গরুর অপমৃত্যু এবং সেই অবধি তার নাতির অসুস্থ থাকার ফলে চিন্তান্বিত পরিবারটি গঙ্গাচরণের কাছে বিধান নিতে আসে। বিশ্বাস মশাইয়ের কাছে বিভিন্নভাবে উপকৃত হলেও গঙ্গাচরণ কিন্তু সুযোগ নিতে ছাড়ে না। জানায় অমাবস্যার দিন স্বস্ত্যয়ন করতে হবে। ফর্দ লেখার অছিলায় স্ত্রীকে ডেকে নেয় ভিতর উঠোনে; জানায় 'বড় খদ্দের', জেনে নেয় সংসারে স্ত্রী-র চাহিদা। এইসব তথ্য থেকেই দাখিল করে স্বস্ত্যয়নের ফর্দ।

> ভালো লালপাড় শাড়ী একখানা, গাওয়া ঘি আধ সের—ওটা—তিন পোয়াই ধরুন, চিনি পাঁচপোয়া, পাকাকলা একছড়া, সন্দেশ পাঁচপোয়া, গামছা দুখানা, পেতলের থালা একখানা, ঘটি একটা, ধুনো একপোয়া...ওঃ ভুলে গিয়েছি মধুপর্কের বাটি একটা, আসন একটা—। (পৃ. ১৪)

খুঁত না রেখে সবকিছু নতুন দেবার ফরমাস করে গঙ্গাচরণ। স্বস্ত্যয়নের পরে কাকতালীয়ভাবে বিশ্বাসমশাইয়ের নাতি সুস্থ হয়ে ওঠে এবং গঙ্গাচরণের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে কামদেবপুর গ্রামে ওলাওঠার প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে গ্রামবন্ধনের জন্য ডাক পড়ে গঙ্গাচরণের। 'গাঁ বন্ধ করা' কথাটি প্রথম শুনলেও মতামত দিতে এতটুকু ইতস্তত করেনি গঙ্গাচরণ। গভীর, গম্ভীর কণ্ঠে জানিয়ে দেয়, 'কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ করতে হবে, বড্ড শক্ত কথা'। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করে ফর্দ তৈরি করলেন—

> আলো চাল দশ সের, পাকা কলা দশ ছড়া, গাওয়া ঘি আড়াই সের, সন্দেশ আড়াই সের—কাপড় চাই তিনখানা শাড়ী, কস্তাপেড়ে, তিন ভৈরবীর, আর প্রমাণ ধূতিচাদর ভৈরবের—আরও ধরো—হোমের তাম্রকুণ্ড। (পৃ. ২১)

কিন্তু স্বামীর প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস নিয়েও গাঁ বন্ধ করার ব্যাপারে অনঙ্গ বৌ শঙ্কিত। গঙ্গাচরণ তাকে আশ্বস্ত করে বলে, 'আমি পাঠশালায় ছেলেদের 'স্বাস্থ্য প্রবেশিকা' বই পড়াই। তাতে লেখা আছে মহামারীর সময় কী কী করা উচিত অনুচিত। আসলে তাতেই গাঁ বন্ধ হবে।' (পৃ. ২১)। এভাবেই ছলে-বলে কৌশলে গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলোর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে গঙ্গাচরণের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামজীবনে ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের অবস্থানের চিত্রটি এভাবেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন অসাধারণ দক্ষতায়।

এই কামদেবপুর গ্রাম থেকেই পূর্বাভাস মিলল মন্বন্তরের। সহজ, সরল, শান্ত, নিস্তরঙ্গ গ্রাম জীবনে যে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছিল তারই সাক্ষী হয়ে রইল কামদেবপুর গ্রাম। তারা শুনল যুদ্ধের জন্য নাকি চাল আক্রা হবে। গ্রামের মানুষগুলো জানল না যুদ্ধ কখন কোথায় বাধল, কেন বাধল এবং তার পরিণাম কী? শুধু জানল চাল, নুন, কেরোসিন তেল, দেশলাই সব আক্রা হচ্ছে। এমনকি দিনের পর দিন বাজারে খাদ্যসামগ্রী অমিল হতে শুরু করল। চালের দাম বাড়তে বাড়তে পঁয়ষট্টি টাকা মন, চিঁড়ে বারো আনা, যা ছিল দু'আনা। একদিন শোনা গেল রাধিকানগরের বাজারে পাঁচু কুণ্ডুর চালের দোকান লুঠ হল। শুরু হল মানুষের খাদ্যের সংগ্রাম। সকলেই খাদ্য মজুত রাখতে চায় ছেলেপুলের সংসারে কিন্তু যোগান না থাকায় একদিন সবই নিঃশেষ হয়ে যায়। শোনা যায় আর্তনাদ, হাহাকার, নেই-নেই-নেই ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়। একটু একটু করে মন্বন্তর ছেয়ে ফেলে গ্রামের পর গ্রাম। মুচিপাড়া, বাগদিপাড়ার মেয়ে-ছেলে, বৌ-ঝি সব সেই বিলের খোলা জলে নেমে চুনো মাছ আর গেঁড়ি গুগলি ধরছে।

> সব ফুরিয়ে শেষ হয়ে গেল। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে ডাঙায় বসে কাঁদছে। ওদের মা কাঁচা গেঁড়ি-গুগলি তুলে ওদের মুখে দিয়ে কান্না থামিয়ে এসে আবার জলে নেমেছে। কত মরে গেল ওই সব খেয়ে। (পৃ. ৫৩)

পেটের অসুখে মৃতের সংখ্যা বাড়তে লাগল দিনের পর দিন। চাল উধাও, গ্রামের পর গ্রাম কলাই সিদ্ধ ডাঁটা-চচ্চড়ি খেয়ে কোনো রকমে দিন গুজরান হয়। কাঁচা গেঁড়ি-গুগলি, শাক, মেটে আলু, কচু কিছুই বাদ যায় না। যেখানে কচু, শুশনি শাক, কলমি শাক, মেটে আলুর সন্ধান পাওয়া যায় সেখানেই গ্রামের মানুষগুলোর সন্ধানী চোখ তদারকি করে ফেরে অহরহ। সংশয়, হতাশা, স্বার্থবোধ গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলোকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে থাকে।

মন্বন্তরের আর এক দৃশ্য দেখে গ্রামের মানুষগুলো। একরাশ হতাশার চিহ্ন নিয়ে অনঙ্গর কাছে এল ভাতছালার মতি মুচিনি। জানা গেল পনেরো-ষোলো দিন ধরে তার আহার্য বস্তুর তালিকায় শুধুই কচু সিদ্ধ আর পুঁইশাক সিদ্ধ। অভুক্ত মতি তাই

মাঝে মাঝে আসে অনঙ্গর কাছে দুটো ভাতের আশায়। কিন্তু এখানেও নিত্য অভাব, তাই বিবেকের তাড়নায় মতি চলেও যায়। আবার কিছুদিন পর অসহায় অবস্থায় জ্বর নিয়ে ফিরে আসে মতি। মৃত্যু হয় তার। এ যেন গ্রামের লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে গেল। একটা মূর্তিমান বিপদের সংকেত-স্বরূপ ওর মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে আমগাছটার তলায়। অনাহারে প্রথম মৃত্যুর অশনি-সংকেত। গ্রামের মানুষগুলো বুঝলো, বিশ্বাস করল 'না খেয়ে তাহলে মানুষ মরতে পারে।' মানুষের পরিণতির এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে, মানুষের পরিণতির এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে গ্রামের মানুষগুলো শিউরে উঠল। ভবিষ্যৎ ভাবনায় তারা শঙ্কিত ও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে মন্বন্তরের পরিণামী সংকেতে।

বিভূতিভূষণের প্রখর পর্যবেক্ষণশক্তি আলো ফেলেছে সমাজের আনাচে-কানাচে। তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি কোনো কিছুই। তাই শুধু মন্বন্তরের কবলে পড়ে মানুষের অসহায় অবস্থার চিত্র নয়, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গনে মন্বন্তরের প্রভাবে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তনের চিত্রও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে উপন্যাসে। মন্বন্তর নারীকে ঠেলে দিয়েছে এক কলঙ্কিত জীবনে। নারী তার সতীত্ব বিক্রি করে আধকাঠা চালের জন্য। শুধু নিজের পেট ভরাতে নয় সংসারের প্রয়োজনেই সে চাল নিয়ে আসে ঘরে। সে চাল দুর্দিনে প্রতিবেশীকে দিতেও সে পিছপা নয়। এ কাজের জন্য সে অনুতপ্তও নয়। তাই শুভাকাক্ষী অনঙ্গ বৌ-এর আপ্তবাক্য মেনে নিতে পারে না কাপালী বৌ ওরফে ছুটকি। বলে, 'আর পারি নে না খেয়ে—না খেয়েই যদি মলাম, তবে কিসের কি? আমি কোনো কথা শুনবো না—চাল বামুনদি, পাপ হয় নরকে পচে মরবো সেও ভালো'(পৃ. ৬৩)। রূপ ও যৌবনবতী নারী যে এই সুযোগে পুরুষের লালসার শিকার হচ্ছে এবং নারী জীবনের এক কলঙ্কময় অধ্যায় সূচিত হতে চলেছে তার ইঙ্গিত ছুটকির মধ্য দিয়েই বিভূতিভূষণ দেখিয়েছেন। যদিও কখনই নারী-জীবনের এই কলঙ্কময় পরিণাম কিংবা সমাজের ভাঙন ঔপন্যাসিক মেনে নিতে পারেননি। বিভূতিভূষণ ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারি, সুস্থ, স্বাভাবিক, সুন্দর জীবন-ই তাঁর প্রত্যাশিত ছিল। তাই শেষপর্যন্ত ছুটকি যদুপোড়ার সঙ্গে গৃহত্যাগের সংকল্প থেকে পিছিয়ে এসেছে। অনঙ্গ বৌ-এর স্নেহের শাসনে পরাভব স্বীকার করেছে ছুটকি; ফিরে এসেছে সমাজের স্বাভাবিক স্রোতে।

লক্ষণীয় বিভূতিভূষণ ছুটকির চরিত্রে কালিমালিপ্ত করেননি; তাকে সকলের কাছে মমতাময়ী, স্নেহশীলা নারীরূপে চিত্রিত করেছেন। প্রথমদিকে সমাজের কেউ কেউ তাকে নেক-নজরে দেখলেও পরবর্তীকালে সকলের কাছেই সে সহানুভূতির পাত্রী হয়ে উঠেছে। তার মানবিক মুখই প্রাধান্য পেয়েছে লেখকের কলমে। এই প্রসঙ্গে লেখকের 'হিঙের কচুরি' ও 'বিপদ' গল্প দুটির কথা মনে পড়ে। দুটি গল্পেই দেহজীবিনী নারীর প্রতি লেখক ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রকাশ করেননি বরং পরম সহানুভূতির প্রলেপে

আমাদের মনের মণিকোঠায় স্থান করে দিয়েছেন। 'বিপদ' গল্পের হাজু সম্পর্কে লেখকের অভিব্যক্তি এইরকম—

> কাল ও ছিল ভিখারিণী, আজ এ পথে আসিয়া ওর অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ি চাহিতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে, নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা-পিরিচে—যার বাবাও কোনোদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া, ছোটো করিয়া নিন্দা করিবার ভাষা আমার যোগাইল না।[৩]

পতিতা নারী সম্পর্কে বিভূতিভূষণের এই অনুভব থেকে শুধু সহমর্মিতা বোধ-ই নয়, উঠে আসে একটি প্রশ্নও—বাঁচার ন্যূনতম অধিকার থেকে যখন মানুষ বঞ্চিত, তখন যদি কেউ দেহকে জীবিকার অবলম্বন করে তোলে তাকে নিন্দা করার অধিকার কি সমাজের আছে? তাই মন্বন্তরে বিপন্ন নারীকে দেখবার চোখ ও বর্ণনার ভাষা বদলে যায় বিভূতিভূষণের অনুভবে।

নারী-জীবনের আর এক অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, যা ঔপন্যাসিকের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে। যে নারীর জীবন ছিল ঘরকন্নার কাজে ব্যাপৃত সেই নারী গৃহকর্মের গ্রন্থি ভেদ করে সংসারের হাল ধরেত আগ্রহী হয়ে উঠছে—এ চিত্রও উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। ঘরমুখী নারী বাইরের জগতে পা রাখল সংসারে খাদ্যের যোগান দিতে। স্বামীর অজান্তে ব্রাহ্মণ বৌ অনঙ্গ ঢেঁকিতে ধান ভানতে যায় সংসারের খাদ্যাভাব মেটাতে। এ কথা জানার পর ব্রাহ্মণের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। বলে, 'ওতে মান থাকে না। ব্রাহ্মণের মেয়ে হয়ে কাপালীদের ধান ভানা? লোকে জানলে কি বলবে বল তো? এত ছোটো নজর তোমার হোল কেমন করে তাই ভাবছি।' (পৃ. ৪০)। অনঙ্গ অপমান বোঝে না, বোঝে প্রয়োজন। বলে, 'লোকে আমায় বলে বলবে, আমার ছেলেপুলে তো দু'মুঠো পেট ভরে খেতে পাবে' (পৃ. ৪০) অর্থাৎ নারী নিজেই সচেষ্ট হয় সংসারের বৃহৎ ভূমিকায়। কাজের বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহে তার আপত্তি নেই। এ জন্য কাজ শিখে নিজেও সে পারঙ্গম। অনড় মনোভাব ও অনায়াস দক্ষতায় নারী সংসারে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আগামী দিনের নারী যে বহির্জগতের অভিমুখী হতে চলেছে এই বার্তা-ই বোধ হয় বিভূতিভূষণ অনঙ্গ বৌ-এর মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন।

আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সবসময়ই উচ্চবর্ণের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। ফলে সমাজের উচ্চসারিতে ব্রাহ্মণের অবস্থান। ব্রাহ্মণও এই সুযোগ নিয়ে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়ে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। বিভূতিভূষণ দেখিয়েছেন মন্বন্তর সমাজের এই বর্ণবৈষম্যের গভীরে আঘাত এনেছে। উপন্যাসের প্রথমে ব্রাহ্মণপুত্র পটলের বেড়াবাঁধা প্রসঙ্গে গঙ্গাচরণকে বলতে শোনা যায়, 'ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে

কী কাপালীর ছেলের মতো দা-কুড়ুল হাতে থাকবি দিনরাত?' (পৃ. ৪)। আর উপন্যাসের শেষে গঙ্গাচরণকে বলতে শোনা যায়, 'এবার যদি নিজের হাতে লাঙ্গল ধরে চাষ করতে হয় তাও করব— একটু জমি পেলে হয়' (পৃ. ৭৯)। গঙ্গাচরণের উপলব্ধি এইরকম, 'জমি না চষে পরের খাবে, এ আর চলবে না। চাষা লাঙ্গল ধরে চাষ করে, আমরা তার উপর বসে খাই, এ ব্যবস্থা ছিল বলেই আজ আমাদের এ দুর্দশা' (পৃ. ৭৯)। অর্থাৎ সমাজের একটা শ্রেণি শুধু ভোগ করবে আর একদল পরিশ্রম করবে—এ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন চলতে পারে না। উপন্যাসের শেষে ভেঙেছে ব্রাহ্মণ্যের অহংকার। যে ব্রাহ্মণ নিম্নজাতির ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতে অভ্যস্ত ছিল, তারাই মতি মুচিনীর মৃতদেহ সৎকার করেছে। দুর্গা ভট্চায, গঙ্গাচরণ আর কাপালিদের ছোটোবৌ মুচিনীর মৃতদেহ সৎকার করেছে নেহাতই মানবিকতার কারণে। ব্রাহ্মণ শূদ্র অচ্ছুত সব একাকার। মন্বন্তর এভাবেই কালান্তর ঘটিয়ে দিয়ে গেছে গ্রামজীবনে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটিতে শুধুমাত্র মন্বন্তরের ধ্বংসাত্মক পরিণতিই দেখাননি। দেখিয়েছেন মানুষের মনুষ্যত্ববোধ, সহমর্মিতাবোধ, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসার মধুর দৃশ্য। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে নারীর সর্বংসহা মাতৃমূর্তির প্রকাশ ঘটেছে বারে বারে, এই উপন্যাসেও তার অন্যথা হয়নি। নারীকে মাতৃরূপে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন ঔপন্যাসিক। নারীকে সেবাময়ী, মঙ্গলময়ী লক্ষ্মীপ্রতিমা রূপেই চিত্রিত করেছেন উপন্যাসে। অনঙ্গ বৌ নিজে খেতে পায় না কিন্তু অপরকে খাওয়াতে পারে হাসিমুখে। আবার নিজের গহনা বাঁধা দিয়ে আক্রার চাল কিনে এনে প্রতিবেশিদের হাতে তুলে দিয়েছে পরম মমতায়। জঙ্গলে মানকচুর মতো তুচ্ছ খাদ্য দিয়ে অতি যত্ন নিয়ে মতি মুচিনীর জন্য পথ্য বানিয়ে দিয়েছে। অভাব-অনটনের মধ্যেও হাসিমুখে সহ্য করেছে দুর্গা ভট্চার্যের চা খাওয়ার আবদার, তার পরিবারকে দিনের পর দিন আহার জুগিয়েছে পরম সমাদরে। মুখের ভাত অপরকে ধরে দিতে সে চিরকাল অভ্যস্ত। তার মতে 'অতিথি নারায়ণ' তাই শত কষ্টেও অতিথিসেবা থেকে সে বঞ্চিত হবে না। অনঙ্গ বৌ যেন গৃহলক্ষ্মীর প্রতীক।

শত দারিদ্র্য সত্ত্বেও গঙ্গাচরণ ও অনঙ্গ-র সংসারে বিরাজ করেছে শান্তি, আনন্দ ও শ্রী। তাদের মধুর দাম্পত্যে ছেদ ঘটেনি কখনো। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের বোঝাপড়া রয়েছে। একে অপরের মন রাখতে যেন বদ্ধপরিকর। তাই গৃহিণী অনঙ্গর মন রাখতে গঙ্গাচরণ মেনে নিয়েছে তার অন্যায় আবদারও। দুমূর্ল্যের বাজারে দুর্গা ভট্চার্যের সপরিবারে তাদের গৃহে অন্নের ভাগ বসানোতে গঙ্গাচরণ সন্তুষ্ট ছিল না, অপ্রসন্ন হলেও মেনে নিয়েছে প্রধানত 'স্ত্রীর ভয়ে'। 'অনঙ্গ-বৌ নিজে খেতে না পেয়ে চিঁচি করচে, অথচ সে কাউকে বাড়ি থেকে তাড়াবে না' (পৃ. ৭৭)। স্বামী-পুত্রকে পেটভরে খাইয়ে নিজে একটু গুড় দিয়ে জল খেয়ে শুয়ে পড়ে রাত্রে।

স্বামী-স্ত্রীর সুখী দাম্পত্য জীবনের নানা চিত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে উপন্যাসে। কখনো স্বামীর আবদার রাখতে দু-জনে একপাতে মুড়িভাজা আর শশাকুচো খেতে খেতে 'ভাতছালার' বিলের ধারে একদিন একবাটি চিঁড়ের ফলার খাওয়ার সুখস্মৃতি রোমন্থন করে। মন্বন্তরের আকালে নিবারণ ঘোষের বাড়িতে মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে গিয়ে গঙ্গাচরণের গলা দিয়ে নামে না, 'হাবুর জন্য দুঃখ নয়, পটলার জন্যেও নয়— দুঃখ হল অনঙ্গ-বৌয়ের জন্যে। সে আজ দুদিন খায়নি।...ওখানে অনঙ্গ-বৌ হয়তো উঠোনের কাঁটানটের শাকের বনে চুবরি নিয়ে ঘুরচে, অখাদ্য কাঁটানটে শাক তুলবার জন্যে'। (পৃ.৬৮) সাপ্লাই অফিসে খাদ্যের তদ্‌বির করতে গিয়ে দোকানে থালায় সাজানো বড়ো বড়ো জোড়া সন্দেশ দেখে তার লোভ হল, 'তার নিজের জন্য নয়, অনঙ্গ-বৌ কতকাল কোনো জিনিস খায়নি। ওর জন্যে যদি দুখানাও নিয়ে যাওয়া যেতো।' (পৃ. ৭৩) স্ত্রীর সুখের জন্য এহেন আকুতি তথা মানসিক যন্ত্রণা বাংলা উপন্যাসে বিরল। মন্বন্তর মানুষের মান, সম্ভ্রম, লজ্জা, সংকোচ, দীর্ঘদিনের সংস্কার, আভিজাত্যবোধ সবকিছু হরণ করেছে কিন্তু চিড় ধরাতে পারেনি এদের দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্যে। শান্ত সুন্দর এই ভালোবাসার জগৎই বিভূতিভূষণের কাম্য ছিল।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে সমসাময়িকতার অভাব দেখেন অনেকেই। 'অশনি সংকেত' উপন্যাসটি তাঁর এই অপবাদ দূর করতে পারবে বলেই মনে হয়। মন্বন্তরের করাল দংশন কীভাবে গ্রামবাসীকে আচ্ছন্ন করল, হাহাকার ও আর্তনাদ কীভাবে গ্রামের পর গ্রাম ছড়িয়ে পড়ল এবং সহজ, সরল গ্রামীণ জীবনকে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত করল তারই চিত্র 'অশনি সংকেত' উপন্যাসে রয়েছে। মন্বন্তর গ্রামের মানুষগুলোকে করেছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় কিন্তু স্বার্থান্বেষী মনোবৃত্তির অধিকারী করে তুলতে পারেনি। তারা ভয়ার্ত ও শঙ্কিত হয়েছে, সংশয় দেখা দিয়েছে কিন্তু পরস্পরের প্রতি ভালোবাসায় চিড় ধরেনি এতটুকুও। তাই কাপালী বৌ পাপের পথে চাল রোজগার করে এনেও প্রতিবেশির দুঃখমোচনে তা দিতে কুণ্ঠিত হলেও কার্পণ্য করেনি। মতি মুচিনীর মৃত্যুতে তারা উদ্বিগ্ন হয়েছে, ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছে কিন্তু ভেঙে পড়েনি। উপন্যাসে খাদ্য সঞ্চয়ের চেষ্টা আছে কিন্তু ছিনিয়ে নিয়ে একটা ভোগ করবার কুটিল ষড়যন্ত্র নেই। এমনকি মন্বন্তরের চরম পরিণামের দৃশ্যটিও এত সহজ সরলভাবে ও ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন যা অকল্পনীয়। সমসাময়িক বাস্তব এক জ্বলন্ত সমস্যা এত নির্বিকার, নির্বিকল্প চিত্তে ও নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা যায় তা 'অশনি-সংকেত' না পড়লে বোঝা যায় না।

আসলে বিভূতিভূষণের সাহিত্যে বিরাজ করে এক অদ্ভুত রকমের প্রশান্তি। সহজ সরল জীবনের রূপকার তিনি। ধ্বংসের বাতাবরণে মানুষকে নিঃশেষ হতে দেন

না, নিয়ে আসেন নতুন জীবনের স্বপ্ন, নব জীবনের মন্ত্রে উজ্জীবিত করেন মানুষকে। তাই উপন্যাসের শেষে প্রতীক ধর্মী বলেই মনে হয় কাপালী বৌ-এর শশা, লাউ, শাঁক-আলুর বীজ বপনের চিত্র। অনঙ্গ বৌ এর আশ্বাসবাণীতে কাপালী বৌ ফিরে আসে কু-পথ থেকে। উপন্যাসের শেষে তাই বিরাজ করে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন; সৃষ্টি হয় বিশ্বাস, আস্থা, ভালোবাসার এক মায়াময় জগৎ।

মানবিক ও সহানুভূতিশীল দ্রষ্টার দৃষ্টিতে তিনি প্রত্যক্ষ করেন জগৎকে। সহজাত আনন্দবোধ, প্রশান্তি, সহজাত আত্মপ্রত্যয় তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর সাহিত্যে থাকে না উগ্রতার হাতছানি, থাকে না মানুষকে উন্মত্ত করবার বা উত্তেজিত করবার প্রয়াসও। জীবনের কদর্যতা বা বীভৎসতা দেখানো তাঁর উদ্দেশ্যও নয়, শুধুমাত্র যেমনটি দেখেন সহজ সরল ভাষায় পাঠকের কাছে তেমনটি উপস্থাপন করাই তাঁর লক্ষ্য। ঘটনার বিবৃতিতেও থাকে একধরনের অনাবিল সরলতা। তাই বিষয়বস্তু মন্বন্তরের হয়েও পরিণামে মন্বন্তর অতিক্রমী আগামী দিনের নবজীবনের বার্তা-ই বহন করে উপন্যাসটি। এভাবেই সমসাময়িকভাবে সঙ্গে চিরন্তনতার মেলবন্ধন ঘটে যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে।

উৎসের সন্ধানে

১. 'বিভূতিভূষণ রচনাবলী', অষ্টম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৪০৪, পৃষ্ঠা-৫০৮
২. তদেব, পৃষ্ঠা-৫১৫
৩. 'বিভূতি গল্পসমগ্র', প্রথম খণ্ড, কামিনী প্রকাশনায়, ২০১১, পৃ. ৫৬৮
'অশনি সংকেত' উপন্যাসের উদ্ধৃতিগুলি মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত বিভূতি-রচনাবলী, দশম খণ্ড, ১৯৯৮ থেকে গৃহীত।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. 'বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য', সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যায়ন, ১৯৯৫।
২. 'জীবনের পাঁচালীকার বিভূতিভূষণ', ড. তারকনাথ ঘোষ, আনন্দধারা, ১৩৭৬।
৩. 'বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প', গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে'জ, ১৯৮৯।
৪. 'বিভূতিভূষণ', চিত্তরঞ্জন ঘোষ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

লোকায়ত পাঠ : বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত'

দীপঙ্কর মল্লিক

আধুনিক কাব্য, নাটক ও কথাসাহিত্যে লোকসংস্কৃতির প্রভাব অনেকখানি। শাস্ত্রবহির্ভূত লোকায়ত দর্শন মুষ্টিমেয় ভারতীয় জীবনকে করেছে প্রভাবিত। এই দর্শনের শিকড় প্রোথিত রয়েছে পল্লির নিভৃত অঞ্চলের মধ্যে। পল্লিবাংলা থেকেই যেমন উত্থিত হয়েছে রূপকথা, উপকথা, লোককথা তেমনই ব্রত, প্রবাদ, আচার-আচরণ, সংস্কার, বিশ্বাস, প্রথা, পূজা—এ সবই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> বাংলা জনপদের মাঝে ছড়া গান কথা আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে তাহাকে কাব্য হিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়; তাহারাই ইহার ভাষা ছন্দ এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে। গ্রাম্যসাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবি, গ্রামের স্মৃতি অপেক্ষা রাখে; সেইজন্যই বাঙালির কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে।...
>
> অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি যদিচ রাজসভা-ধনীসভার কবি, যদিচ তাঁহারা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশী দূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই।...
>
> কবিকঙ্কন চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা, সমস্তই গ্রাম্যকাহিনি অবলম্বনে রচিত।[১]

'গ্রাম্যসাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবি'। 'গ্রামের স্মৃতি' সেখানে মুখ্য। 'বাঙালির কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে।'—এ ধরনের বক্তব্যগুলি বিভূতিভূষণ সম্পর্কে আরও বেশি সত্য। পল্লিবাংলার সঙ্গে বিভূতিভূষণের আত্মিক সম্পর্ক। পল্লিবাংলার মধ্যেই দেশীয় ঐতিহ্য সর্বাঙ্গীন বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজেকে মেলে ধরে। আশৈশব গ্রাম-বাংলার সঙ্গে পথ চলা। বনগাঁ, ব্যারাকপুর আর অবশেষ জীবনের গোধূলিতে ঘাটশিলা বিভূতিভূষণের বিচরণের ক্ষেত্র। নিঃসর্গ প্রকৃতি, প্রকৃতিলালিত বাংলা আর বাংলাদেশের আবহমানকালের মানুষ বিভূতিভূষণের উপন্যাসের লক্ষ্যভূমি। যে কারণে তাঁর উপন্যাসের পাতায় পাতায় বিলীয়মান গ্রামবাংলার লোকজীবনের ধূসর-রঙীন জীবনের সামগ্রিক ছবি চকিতে হয় উল্লসিত।

সমষ্টির মর্মবাণী লোকসংস্কৃতির মধ্যে থাকে জাগ্রত। লোকসংস্কৃতি তাই সমষ্টি মানুষের জীবনচর্যা ও মানসচর্চার পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি। এই সংস্কৃতি সহসা পরিবর্তনশীল নয়। তবে ঐতিহ্যানুসারী। সজীব ও সচল। সামাজিক ঐতিহ্য বা social tradition-এর মূল গতিপ্রবাহ। এই গতিপ্রবাহের সুদৃশ্য ফেনপুঞ্জ হল লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্য তাই লোকসমাজের মানসচর্চা সম্পর্কিত বহমান ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি। অর্থাৎ এ সাহিত্য হল Literature of the people। আরও প্রত্যক্ষ বচনে 'Literature of the folk-society'।

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অন্বেষণে একালের প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং বিবেকমান, সংবেদনশীল লোকসংস্কৃতিবিদ্ দুলাল চৌধুরীর কয়েকটি বক্তব্য ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক—

১. সাহিত্য সমাজের তথ্যচিত্র এবং সামাজিক বাস্তবতার উপর সাহিত্যের ইমারত গড়ে উঠেছে।[২]
২. কোনো নির্দিষ্ট কালসীমায় লোকায়ত জীবনচর্যাকে বেঁধে দেওয়া চলে না।[৩]
৩. লোকসমাজ সংহত। সমষ্টি চেতনা ঋদ্ধ।[৪]
৪. যে সমাজজীবনকে আশ্রয় করে বাংলার লোকসংস্কৃতি সাহিত্য পত্রপুষ্পে বিকশিত হয়েছিল তার ভিত্তি বাংলার কৃষিসমাজ।[৫]

এই কৃষিসমাজ থেকেই এসেছে লোকসমাজ। অর্থাৎ লোকসমাজের জননী হল কৃষিসমাজ। এ সমাজের স্মরণীয় তিনটি বৈশিষ্ট্য হল—

এক ।। Traditional
দুই ।। Spontenious
তিন ।। Uncritical[৬]

কথাসাহিত্যে কৃষিজীবনকে কেন্দ্র করে আখ্যান বা প্লট নির্মিত হলে সেখানে লোকসংস্কৃতির পাঠ নেওয়া একটি আবশ্যক কর্তব্য। কারণ পল্লিজীবনসম্পৃক্ত কথাসাহিত্যে মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। আর এই মাটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে 'Folk' তথা লোক ও তাদের বিচিত্র সংস্কৃতি। এককথায় 'লোক'-এর সংস্কৃতি—লোকসংস্কৃতি পল্লিজীবনাশ্রয়ী কথাসাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের অশনি-সংকেত পল্লিজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস। কৃষক ও কৃষিজীবন এবং কৃষিজীবনের মূল ধারক ও বাহক কপালী সম্প্রদায়ের নিজস্ব জীবন-সংস্কৃতি ও অশনি-সংকেতে অন্যান্য অনগ্রসর ও অগ্রসর জাতির সংস্কৃতি হল এর মূল প্রতিপাদ্য।

Encyclopaedia Britanica অনুযায়ী 'Folk' শব্দে সাধারণ পল্লিবাংলার মানুষ কিংবা নগরসভ্যতা থেকে দূরে কোনো স্বতন্ত্র অঞ্চলের মানুষকে নির্দেশ করে। সেখানে বলা হয়েছে—

> It is narrowed down to include only those who are mainly outside the currents of urban culture and systematic education, the unlettered or little litered in habitants of village or countryside.[৭]

শিক্ষার আলোকশিখা থেকে বঞ্চিত, রাষ্ট্রচিন্তার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে দূরস্থিত, মার্জিত সংস্কৃতি থেকে পৃথক অবস্থানে অবস্থিত সেই মানবসমাজ চিহ্নিত হয় 'লোক' বা 'Folk' বলে। সুতরাং 'লোক' হল তারা, যারা—

১. নিজস্ব সংস্কার ও রীতি-নীতিতে আশ্বস্ত।
২. ধর্ম-কর্ম ও বিশ্বাসে অবৈজ্ঞানিক চেতনাপ্রসূত।
৩. কৃষি, ক্ষুদ্র হস্তশিল্প, মৎস শিকার, কাষ্ঠ আহরণ-এর মতো স্বল্প পরিশ্রমের সঙ্গে যুক্ত।
৪. মুখ্যত পল্লি ও প্রকৃতি ঘনিষ্ঠ।
৫. সমষ্টিগত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত।

'লোক' কারা, কোন্ বৈশিষ্ট্যেই বা তারা লোক সে সম্পর্কে একাধিক অমীমাংসিত সংজ্ঞার গুরুত্বপূর্ণ তিনটি সংজ্ঞা হল—

i) Folk, a group of associated people; a primitive kind of post-tribal social organization; the lower classes or common people of an area.[৮]
ii) Folk in ethnology the common people who share a basic store of old tradition.[৯]
iii) Folk would be any group of people who share atleast on common factor (for example common occupation, religion of ethnicity.)[১০]

'Folk' বা 'লোক' যে সমাজে বাস করে অথবা তারা যে সমাজ গঠন করে, তাকে বলে লোকসমাজ। আদিম সমাজ ও সভ্য নাগরিক সভ্যতার মধ্যবর্তী অবস্থানভূমিতে লোকসমাজের কল্পনা করা হয়—

> A Folk society as opposed to a primitive tribe on the one hand and modern civilization on the other.[১১]

Modern industrial culture এর মধ্যে গণনাতীত যে শহুরে নাগরিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত মানুষ, তার সম্পূর্ণ বিপরীত সীমান্তে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলিই হল 'লোকসমাজ' (Folk-society) এবং তাদের সংস্কৃতিই হল 'লোকসংস্কৃতি' (Folk-culture)। Mac Edward Leach-এর বক্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক বলে উদ্ধৃত হল—

> Folklore is the generic term to designate the customs, belief, traditions, tales, magical practices, proverbs, songs etc; in short the accumulated knowledge of a homogeneous unsophisticated people.[১২]

Mac Edward Leach বর্ণিত লোকসংস্কৃতির বহুবিধ বৈচিত্র্যময় উপাদান 'অশনি সংকেত'-এর সর্বত্র পরিলক্ষিত। যদিও এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় দুটি চরিত্র গঙ্গাচরণ ও অনঙ্গের জীবনাচরণ 'unsophisticated people'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তথাপি পল্লিসমাজের মধ্যে তাদের বাস। তাই পল্লির সংস্কৃতি তাদের মধ্যে বহমান। কাপালী সমাজ এই উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবস্থান করায় এই সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতির বহমান উত্তরাধিকার সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। বলতে দ্বিধা নেই যে, এই সংস্কৃতির উচ্ছ্বাসময় স্রোতে অনঙ্গ-বৌ ডুব দিয়েছে সব থেকে বেশি।

লোকসংস্কৃতির সপ্তরঙ্গ বিভাজন লক্ষ করা যায়। যথা—

ক. বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
খ. অঙ্গভঙ্গকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
গ. আচার-ব্যবহারকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
ঘ. ক্রীড়াকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
ঙ. বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
চ. লিখনকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি
ছ. শিল্পবস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

'অশনি সংকেত'-এ মূলত আচার-ব্যবহারকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উপস্থিতি লক্ষণীয়। এই উপন্যাসে লোকসংস্কৃতির যে উপাদানগুলির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেগুলি হল—

১.

<u>**প্রবাদ**</u>

সংক্ষিপ্ত, অর্থবহ ও রসসিক্ত প্রবাদের সম্পর্কে বহুল প্রচলিত মন্তব্যটি হল এমন 'A proverb is a short sentence based on long experience.' জীবনের 'Long experience' প্রকাশিত হয় বাস্তব জীবনধর্মী অনুভূতির মধ্যে। 'অশনি সংকেত'-এর ব্যবহৃত প্রবাদগুলি মূলত ঘটনাকেন্দ্রিক। যেমন—

১.১ বিশ্বাস মশায়ের বাড়িতে শঙ্খে ফুঁ পড়তেই গঙ্গাচরণ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এই ব্যস্ততার কারণস্বরূপ বলেন, 'এবার সন্দে-আহ্নিক করতে হবে কিনা?' লেখক বলেছেন—এটা আসলে গঙ্গাচরণের অজুহাত। লেখক জানিয়েছেন 'আসল কথা, স্ত্রীর বুনো শুওর সংক্রান্ত সতর্কবাণী তার মনে পড়েচে।' নতুন গাঁ। আশেপাশে

'এখনও যথেষ্ট বনজঙ্গল'। সুতরাং অন্ধকারে চলাফেরা না করাই ভাল।' সেই প্রসঙ্গে ব্যবহৃত প্রবাদ হল—

সাবধানের মার নেই।[১৩]

১.২ গঙ্গাচরণ টাটকা-ভাজা মুড়ি, গাওয়া ঘি ও তার সঙ্গে শসা কুচানো দিয়ে মাখিয়ে পরম তৃপ্তিতে খাচ্ছেন। হাবু বাড়ি নেই। ঘরে তারা দু'জন ছাড়া তৃতীয় কেউ নেই। গঙ্গাচরণ স্ত্রীকে পরম যত্নে মুড়ি মাখা খেতে বললেন। অনঙ্গ বৌ তখন সলজ্জ ভঙ্গিতে হেসে বলেছেন—

রস যে উথলে উঠচে।[১৪]

প্রবাদের মধ্যে বলা এই উক্তির কারণ 'আজ বাদে কাল যে ছেলের বৌ ঘরে আনতে হবে।' সুতরাং বয়সোচিত খেয়াল করে চলতে হবে যে। এখানে নারীর সম্ভ্রমবোধ সম্পর্কে অনঙ্গা বৌ কতখানি সচেতন তা এখানে প্রমাণিত।

১.৩ ধান ও চালের প্রসিদ্ধ হাট 'নরহরিপুরের হাট' খালি পড়ে আছে—এক কোণে বসে শুধু একজন বৃদ্ধা সামান্য কিছু চাল বিক্রি করছেন। গঙ্গাচরণ চালের নাম জানতে চাইলে, তিনি বলেন 'খুব ভালো চাল কেলে ধানের।' বৃদ্ধা কেলে ধানকে জাতে তুলতে অতঃপর প্রবাদের দ্বারস্থ হয়েছেন—

ধানের মধ্যে কেলে, মানুষের মধ্যে ছেলে—[১৫]

১.৪ খাদ্য সংকটের দিনে অনঙ্গ-বৌ এক বোষ্টমের জন্যে 'মাসে একটা টাকা আর এক কাঠা চালের একটা সিধে দিতে' সম্মত হয়। বোষ্টমীর প্রভাতী সুর তার বড়ো ভালো লেগেছে। সুন্দর গায় সে। রোজ সকালে ভগবানের নাম শোনা পুণ্যির কাজ। কিন্তু বোষ্টমীকে এই দুর্দিনে অনঙ্গ ভিক্ষা দেবে কোথা থেকে। সেই প্রসঙ্গে গঙ্গাচরণের মন্তব্য প্রবাদের মধ্যে এভাবে প্রকাশিত হয়—

নিজে খেতে জায়গা পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।[১৬]

১.৫ 'নোনাতলার জোল গ্রামের পেছন দিকের বাঁশবন আমতলার পেছনে ঘন ঝোপে ঘেরা জায়গায় 'নতুন সুষনি শাক এক রাশ গজিয়েচে দেখে অনঙ্গ-বৌয়ের মুখে হাসি ধরে না।' অনঙ্গ-বৌ এই কচি শাক দেখে আনন্দে আপ্লুত। কিন্তু এই শাক অন্য কেউ দেখতে পেলে তুলে নেবে, তাছাড়া এ আর অনেক কোথায়? কাপালী-বৌ তাই হাসতে হাসতে বলে—

একেই বলে কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখানো![১৭]

১.৬ নিষ্কর্মা ও সুবিধাভোগী দুর্গা ভট্টাচার্য তার স্ত্রী, মেয়েটা, আর দুটি ছেলে—সর্বমোট ছ'জনকে সঙ্গে নিয়ে 'অন্নপুন্নো মা' অনঙ্গের কাছে উপস্থিত।

সদলবলে তাদের আগমনের কথা শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় গঙ্গাচরণের বক্তব্য প্রকাশিত হয় প্রবাদের মধ্যে—

> সর্বনাশের মাথায় পা।[১৮]

লোকসাহিত্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ। বিভূতিভূষণ 'অশনি সংকেত'-এ প্রবাদের ব্যবহার করে চরিত্রের মনোভাবকে, বুদ্ধিমত্তাকে, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। প্রবাদ ও উপন্যাসে লেখক চাপিয়ে দেননি, প্রবাদ এসেছে উপন্যাসের শরীরে আলংকারিক সৌন্দর্য পরিস্ফুরণে।

২.

<u>লৌকিক দেব-দেবী</u>

বাঙালির ধর্মের উৎসমুখ সন্ধানে ড. নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেন—

> বাঙালির ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হইতেছে রাঢ়, পুণ্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কোমের এক কথায় বাংলার আদিবাসিদেরই পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস।[১৯]

রাঢ়ের আঞ্চলিক বা লৌকিক দেব-দেবী উঠে এসেছে তারাশঙ্করের উপন্যাসে। বঙ্গের লৌকিক দেব-দেবী বিভূতিভূষণের উপন্যাসে এসেছে। 'Same people live in the same place' হলে তারা নিজস্ব একটি 'Tradition' নির্মাণে সক্ষম হন এমন কথা শুনিয়েছেন প্রাবন্ধিক এলিয়ট।[২০] 'অশনি সংকেতে'র ভূগোলের অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে বসিরহাট থেকে বনগাঁ অঞ্চল। এই অঞ্চলের মধ্যেই মূলত কৃষিপ্রধান জীবিকা কাপালী সম্প্রদায়ের বাস। এদের বিশ্বাস, সংস্কার, আচার, অনুষ্ঠান মূলত এক। কাপালীদের অধিকাংশ এখনও পর্যন্ত শিক্ষার উন্মুক্ত আলো পায়নি। যে কারণে তাদের চিন্তা-চেতনার কালিক প্রবাহ থেকে একাধিক লৌকিক দেব-দেবী এসেছেন, যাদের অধিকাংশই অনঙ্গ বৌয়ের ভাষায় 'কাঁচা-খেকো দেবতা।'

প্রাক-তুর্কি যুগে উচ্চবর্ণের থেকে যোজন দূরে ছিল ব্রাত্য, অন্ত্যজ, মন্ত্রবর্জিতরা। এরা তথাকথিত মার্জিত শ্রেণির কাছ থেকে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি লাভ করেনি। যে কারণে নিজস্ব বিশ্বাসের ভুবনে দাঁড়িয়ে মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ধর্ম-ঠাকুরের পূজা করতে শুরু করেন। অনার্য দেবী মনসা হলেন প্রজনন শক্তির দেবী। চণ্ডী ব্যাধদের শিকারের দেবী। মেয়েরা কখনো গৃহস্থালীর মধ্যে, কখনো নির্জনে বনের প্রান্তে এই দেবীর উপাসনা করতেন। ব্রত করতেন। উদ্দেশ্য ছিল হারানো বস্তু প্রাপ্তি ও সাংসারিক সমৃদ্ধি। সন্তান কামনায় ধর্মঠাকুরের পূজা ও গাজন প্রচলিত। মুকুন্দ চক্রবর্তীর

চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় উপাখ্যানে (ধনপতির উপাখ্যান) এবং শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসে মন্দিরের পূজারী যোড়শীর বক্তব্যে চণ্ডীর ব্রত ও ধর্মের গাজন উল্লেখিত। সন্তানের মঙ্গলকামনা ও রোগমুক্তির জন্যে গুপ্তবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে শীতলা ও ওলাইচণ্ডীর উত্থান। ড. ক্ষেত্র গুপ্তের মূল্যায়নে আমি সহমত পোষণ করি, যেখানে এইসব মৌলিক দেবদেবীদের উত্থানের প্রসঙ্গে তিনি লেখেন—

> পার্থিব অভাব-অভিযোগ দূর করা, ভয়ভীতি নিবারণ করা, বাস্তব কামনাবাসনা চরিতার্থ করায় এই দেবতাদের সার্থকতা।[২১]

এই দেবতারা রুষ্ট হলে রক্ষা নেই। অন্তঃপুরবাসিনী মেয়েরা কুলাচার মেনেই তাদের তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। এদের কোপে পড়লে কলেরায় গাঁ উজাড় হতে পারে। সর্পাঘাতে প্রাণ বিপন্ন হতে পারে। বস্তুত, 'আর্দ্রভূমির দেশ বাংলা—এখানে ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর এবং সর্বত্র সাপ। সুতরাং মনসার বন্দনা করিলে সর্পাঘাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে, চণ্ডীর উপাসনা করিলে সমস্ত আপদ কাটিয়া যাইবে, দক্ষিণরায়-কালুরায়ের পূজা শিরনি দিলে ভক্তকে আর বাঘ-কুমীরের আক্রমণে প্রাণ হারাইতে হইবে না। এমন করিয়া উপদ্রুত অসহায়, কৃষিসমাজ, নিম্নবর্ণ এবং স্ত্রীমণ্ডল ভয়ে ভক্তিতে মনসার ভাসান গাহিয়াছে, চণ্ডীর মঙ্গলগান বাঁধিয়াছে। রঞ্জাবতী-লাউসেন-কানাড়া-কলিঙ্গার অদ্ভুত কাহিনি শুনিয়াছে।'[২২]

মূলত কাপালী এবং অংশত জেলে, গোয়ালা, 'অশনি সংকেত'-এর জনগণনায় এসেছে। কৃষিপ্রধান 'অশনি সংকেত'-এর নতুন চড়া পাড়া গ্রামটিকে নেহাৎ 'চাষা গাঁ' মনে হয়েছে গঙ্গাচরণের। যেহেতু 'এ গাঁয়ে পুরুত নেই', সেহেতু লক্ষ্মীপুজো, মনসা পুজো সবই গঙ্গাচরণ একাই করতে পারেন। কিন্তু পূজা-পার্বণ অত সহজ নয়। শঙ্কিতা অনঙ্গের প্রশ্ন—

> কিন্তু ঠাকুরপুজো জানো? না জেনে পুজো-আচ্চা করা—ওসব কাঁচা-খেকো দেবতা, বড্ড ভয় হয়। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করা।[২৩]

সংস্কারাবদ্ধ ও অশিক্ষিত মানুষের পূজার্চনার কাজ করে দেওয়ার জন্যে অবশ্য সংস্কৃত পণ্ডিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। তাছাড়া একটু ঝুঁকি তো নিতেই হয়। সুতরাং—

> অত ভয় করলে সংসার করা চলে না। পাঁজিতে আজকাল ষষ্ঠিপুজো, মাকালপুজো সব লেখা থাকে—দেখে নিলেই হয়।

'মনসা' ও 'ষষ্ঠী' দু'জনেই লৌকিক দেবী। 'অশনি সংকেত'-এ কৃষিজীবী মানুষের জীবিকা, প্রজনন, সন্তানাদি, মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্নে এই লৌকিক দেবীদের গুরুত্ব এসেই যায়।

৩.

ব্রত

ব্রতের স্বরূপ প্রসঙ্গে গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য লিখেছেন—

> স্মরণাতীত কাল হইতে বঙ্গের প্রতি পল্লীতে, প্রতি হিন্দু-গৃহে বিভিন্ন ব্রতের অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। এই সকল নিত্যানুষ্ঠিত পুণ্য কর্মের যবনিকার অন্তরালে সুন্দর সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ...এই দেবীমূর্তির পদতলে মঙ্গল লক্ষ্মীরূপিণী আমাদের মাতা, জেঠীমাতা, খুড়ীমাতা ও পিসিমাতারা আজিও সেই শব্দাড়ম্বর ও অলংকার বিলাসবিহীন ভাষায় গার্হস্থ্য জীবনের সুখ, শান্তি, দুঃখ দৈন্য এবং ঐশ্বর্য ও বেদনার পুরাতন কাহিনি কীর্তন করিয়া আপন আপন গৃহকে শান্তির ও সুখের আদর্শ করিয়া তুলিতে চাহেন।[২৪]

'পার্থিব কামনা ও দেবতার বিরূপতা থেকে মুক্তি বাসনা' থেকে উদ্ভূত যে ব্রত তার জন্ম গোষ্ঠীজীবন সম্পৃক্ত ধ্যান-ধারণা থেকে।[২৫] বন জঙ্গল পরিবৃত মানুষ সবসময় নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও আচার অনুষ্ঠানের প্রকাশ করে ব্রতের মধ্যে, এই ব্রত থেকে প্রাগাধুনিক বাংলার জীবনজিজ্ঞাসা ও সমাজবাস্তবতার বহু তথ্য পাওয়া যায়।

'অশনি সংকেত'-এ একাদশী পালনের কথা আছে। একাদশীর সঙ্গে রয়েছে ব্রতপাঠ। এটি অশাস্ত্রীয় বা লৌকিক ব্রত। নারীই মূলত এই ব্রত করেন। আবার বিধবা নারীরাই এই ব্রতের সঙ্গে বেশি সংযুক্ত থাকেন। তবে একাদশী ব্রত বহু প্রচলিত। ব্রাহ্মণরাও এই ব্রত পালন করে থাকেন। তাই একে নারী ও পুরুষের অধিকার সম্বলিত যৌথ ব্রত বলা যায়। মালিপোতা নিবাসী একজন বৃদ্ধ গঙ্গাচরণের সঙ্গে কথোপকথনে এবং গঙ্গাচরণের প্রশ্নের জবাবে জানান—

> কিছু খাবার নেই ঘরে। আমার বিধবা পিসি ঘরে, তাঁর একাদশী আসচে। দশমীর দিন রাত্তিরে দুখানা রুটি করেও তো খাবেন। তাই আটা নিতে এসেচি।[২৬]

লক্ষণীয় যে 'নারীরাই ব্রত পালন করে বেশি। ব্রতগুলিকে নারীমনের কামনার মুকুর বলা হয়। কারণ ব্রত হল কামনার প্রতীক। নারীরা ব্রতচারণ বিস্মৃত হননি বলেই কুমারী, সধবা ও বিধবা নারীরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নানান ব্রত পালন করেন। তাই আজও প্রতি মাসের নির্দিষ্ট দিন, বার বা তিথিতে নারীরা তাঁদের আপন মনের কামনা জানিয়ে ব্রত পালন করে চলেছেন।'[২৭]

৪.

লোকবিশ্বাস

নগর সভ্যতা থেকে বহুদূরে মূলত যারা বিজ্ঞান চেতনা বহির্ভূত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত তারা এমন কতকগুলি বিশ্বাসের ভুবন রচনা করে অনেক ক্ষেত্রেই যা কার্যকারণ সম্পর্করহিত। প্রবোধকুমার ভৌমিক 'লোকসমাজ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের 'উপসংহারে' লিখেছেন—

> মানুষের কেন্দ্রকে যদি এক ত্রিভুজ করা হয়, তখন তার তিন বাহু যথাক্রমে নীচের বাহুর যোগ প্রকৃতি পরিবেশে, ...পরের বাহুটি হল তার পারিপার্শ্বিক গোষ্ঠী নিচয়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত আর তৃতীয় বাহুটি অতি প্রাকৃত শক্তি (Supernatural)-র সঙ্গে এক অভিযোজন করছে দেখা যাবে।[২৮]

লোকবিশ্বাস হল প্রবোধকুমার কথিত অতিপ্রাকৃত প্রবণতাজাত সহজ বিশ্বাস। গোষ্ঠীচেতনা থেকেই লোকবিশ্বাসের জন্ম। এই লোকবিশ্বাস থেকেই অনঙ্গ বৌ বলে—

> লক্ষ্মীর কৃপা যদি হয়ই, মুখে তা নিয়ে বড়াই করতে নেই। তাতে লক্ষ্মী রাগ করেন।[২৯]

পল্লি-মানুষের মনে এ ভ্রান্তির ঘোর কাটেনি যে, ব্রাহ্মণের পদধূলিতে সংসার পরিজন সবাই ধন্য হয়ে যাবে। বিশ্বাসমশায় সেই দৃষ্টিকোণ থেকে গঙ্গাচরণকে তার ঘরে 'সন্দে-আহ্নিক' করবার জন্যে অনুরোধ করে 'ব্রাহ্মণের সন্দে-আহ্নিক হোলে এ বাড়িতে, বাড়ি আমার পবিত্র হয়ে যাবে।'[২৯] এ বিশ্বাস নিতান্তই ভ্রান্ত লোকবিশ্বাস।

কাপালীদের অর্থের অভাব না থাকলেও শিক্ষার অভাব আছে। বিশ্বাস মশাই সংস্কৃত জানেন না। তার ধারণা সংস্কৃত ও শাস্ত্র জানা গঙ্গাচরণ সব কাজেই দক্ষ। এমনকি তার নীতির ধারাবাহিক সর্দি-জ্বরও সারাতে পারবেন তিনি। নাতির জ্বরের কারণ দড়ি গলায় আটকে একটা গাইগরুর অপমৃত্যুর কারণে যে পাপ হয়েছে তারই প্রতিক্রিয়া। সুযোগ বুঝে দরিদ্র শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দীর্ঘ ফর্দ করতে ব্যস্ত হলেন এবং বিষয়টি যে রীতিমত গুরুতর তা স্মরণ করিয়ে বললেন 'আপনার নাতির অসুখ সারা না সারা এর ওপর নির্ভর করেছে।'[৩০] বিশ্বাস মশায়ের ভীতিবোধের কারণে গঙ্গাচরণ তার ওপর লৌকিক বিশ্বাসের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন।

চালের সন্ধানে বিপন্ন গঙ্গাচরণ কুলেখালিতে এক গোয়ালাবাড়িতে উপস্থিত হন। গোয়ালাবাড়িতে চাল আছে, কিন্তু দেওয়া যাবে না। গঙ্গাচরণের সামনে ভূস্বামী বলেন, তিন মণ চাল আছে তার বাড়িতে, কিন্তু দেওয়া সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণকে শুধু হাতে ফিরিয়ে দিলে চরম অমঙ্গল হওয়ার আশঙ্কা। এই লোকবিশ্বাস থেকে গৃহস্বামীর বক্তব্য—

> আপনি দেবতা।...রাগ করবেন না, অভিসম্পাত দেবেন না বাবাঠাকুর। দিতি পারলি দিতাম। ওই কটা চাল ছাড়া আমার কোনো সম্বল নেই। ব্রাহ্মণের পায়ে হাত দিয়ে বলচি।[৩১]

৫.

ভূত-প্রেতে বিশ্বাস

'অশনি সংকেত' উপন্যাসের পল্লি আম, জাম, বট, বাঁশ, শিমুলগাছে ঘেরা। সুতরাং অন্ধকার পরিবৃত জলা-জঙ্গলে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস থেকে যায়। লোকসমাজ দেবতা ও অপদেবতা, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক শক্তিতে বিশ্বাস করে। এ নিয়ে মেয়েদের মধ্যে অনেক Totem ও Tabu প্রচলিত। যেমন—চুল ছেড়ে খেতে নেই, গায়ে হলুদের বছরে একা বের হতে নেই। এহেন বিশ্বাসে ও সংস্কারে চাঁদনী রাতেও 'টেমি' নিয়ে আসে এগারো বছর বয়সের বিধবা কালী। কালী এত যত্ন করে, সন্তর্পণে টেমিটা বাঁচিয়ে আনছে, তার কারণ 'ওই মুচি পাড়ার বাঁশবাগান দিয়ে আসতে গা ছম ছম করে এত রাত্তিরে।' কৌতূহলী অনঙ্গের প্রশ্ন ছিল 'কেন রে? ভূতে তোর ঘাড় মটকাবে?' এর উত্তরে কালীর যে বক্তব্য তা ভূত-প্রেত সম্পর্কে গ্রাম্যভীতির পরিচায়ক। স্মরণ করা যাক সেই প্রসঙ্গটুকু—

> কালী হেসে বললে—ওসব নাম কোরো না রাত্তির বেলা। তুমি ডাকাত মেয়েমানুষ বাবা—[৩২]

সুকুমার রায়ের ছড়াতে আছে এমন ভূতের কথা—'পরশু রাতে স্পষ্ট চোখে/দেখনু বিনা চশমাতে/পান্থ ভূতের জ্যান্ত ছানা/করছে খেলা জ্যোৎস্নাতে।' ভূত-প্রেতর সঙ্গে অশরীরী আত্মার সম্পর্ক এবং তার সঙ্গে Fantacy-র অসাধারণ শৈল্পিক বিন্যাস রবীন্দ্রনাথের 'মনিহারা', 'কঙ্কাল' গল্পের শরীর গঠন করেছে।

৬.

গুপ্তবিদ্যা

অশুভ শক্তি (evil power)-কে নিয়ন্ত্রণে আনতে বদ্ধপরিকর মানুষ কতকগুলি কলা-কৌশলের ওপর ভিত্তি করে যে দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণ করে এবং বিশ্বাসী মানুষের হাতে-গলায়-কোমরে মাদুলি, কবজ, লোক-ঔষধ পরিয়ে দেয়; সেই প্রক্রিয়ায় সামগ্রিক আরোগ্য ব্যবস্থাকে গুপ্তবিদ্যা বলে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন—

> The primitive society had its foundation on the magic is slow degrees and introduced a religious foundation; magic gradually gave way to religion.[৩৩]

লোকায়ত দর্শনে বিশ্বাসী মানুষ যাদুবিদ্যাকে দু'ভাগে ব্যবহার করেন—নিজের ইষ্ট করতে এবং অপরের অনিষ্ট করতে। নিজের ইষ্ট করতে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মন্ত্রপ্রয়োগ ও তুকতাক ইত্যাদি করা হয়। অপরের অনিষ্ট করতে একই বিদ্যা বিপরীত কর্মে (একে 'Black magic Power' বলতে আপত্তি থাকে না) প্রয়োগ করা হয়। 'অশনি সংকেত'-এ ব্যক্তিগত আক্রোশে গুপ্তবিদ্যা প্রয়োগ করা হয়নি। 'চর পোলতার নতুন পাড়া' থেকে তিন কোশ দূরে কামদেবপুরে 'ওলাওঠার ব্যায়রাম' চলছে। তাকে প্রতিরোধ করার জন্যে গুপ্তবিদ্যার প্রয়োজন এবং এ কাজ পারে একমাত্র মন্ত্রোচ্চারণকারী ব্যক্তি। কেননা, গুপ্তবিদ্যার সঙ্গে তন্ত্র-মন্ত্রের ওতপ্রোত সম্পর্ক। কামদেবপুর থেকে গঙ্গাচরণকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তার জন্য যত অর্থ প্রয়োজন তা কামদেবপুরের হিন্দু-মুসুলমান মিলে চাঁদা তুলে দেওয়া হবে। ওলাওঠার জন্য 'গাঁ বন্ধ' করতে হবে। এর অর্থ বিশ্লেষণে বিভূতিভূষণ লিখেছেন—

> তাদের গ্রামে যাতে ওলাওঠার অসুখ না ঢোকে, এজন্যে মন্ত্র পড়ে গ্রামের চারিদিক গণ্ডি টেনে দিয়ে মহামারীর আগমন বন্ধ করতে হবে।[৩৪]

তন্ত্রের সঙ্গে মন্ত্রের সুগভীর সম্পর্ক। তাই 'অশনি সংকেত'-এ গুপ্তবিদ্যার অঙ্গ হিসেবে তন্ত্রের প্রসঙ্গ চলে আসে।—'কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ করতে হবে, বড্ড শক্ত কথা।' গুপ্তবিদ্যার সঙ্গে আরও কতকগুলি গোপনীয় বিষয়বস্তু জড়িয়ে আছে যেগুলি 'অশনি সংকেত' উপন্যাসে আছে। যেমন—'সিঁদুর দিয়ে চিত্রিত', 'তিনটি মাটির কলসী', 'গাবকাঠের পুতুল', 'নিষ্কালি সরা দু'খানা আর শ্বেত আকন্দের জল দুটো।' এগুলি জোগাড় করা কঠিন। তথাপি এমন আজগুবি ফরমাশ করতে হয়। কেননা 'এসব অজ পাড়াগাঁ।' সুতরাং 'সে যত বিদঘুটে ফরমাশ করে, গ্রামের লোকের তত শ্রদ্ধা বেড়ে যায় তার ওপরে।' এগুলি ঠিকমত একত্রিত করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারলেই প্রমাণিত হয়ে যায়, 'এ খাঁটি লোক বাবা।' 'ঠিক দুপুরবেলা', 'ঈশান কোণে নিমগাছ' ইত্যাদি বিষয়গুলি 'অশনি সংকেত'-এ ব্যবহৃত গুপ্তবিদ্যাকে বিশ্বাস্য রূপ দান করেছে।

৭.

অদৃষ্ট বা নিয়তিবাদ

নৈরাশ্য ও জীবনবিমুখতা থেকে মানুষ নিয়তির ওপর আস্থাশীল হয়ে ওঠে। যে মুহূর্তেই লৌকিক ঘটনা মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনা বহির্ভূত বিস্ময় বিমূঢ় সম্ভ্রমবোধের উদ্রেক করে ঠিক তখনই নিয়তির প্রসঙ্গ উঠে আসে। নিয়তি বা অদৃষ্টের মধ্যে লুকিয়ে থাকে জন্মান্তরবাদের বিষয়। 'অশনি সংকেত'-এ খাদ্য সংকটে বিপন্ন মানুষ বারেবারেই অদৃষ্টের বাণী উত্থাপন করেছেন। যেমন—

১. বৈকালিক জলযোগ অনেকদিন অদৃষ্টে ঘটেনি।[৩৫]

২. সাধু কপালী খেয়ে উঠে বলে—এতও অদেষ্টে ছিল পণ্ডিতমশাই।[৩৬]

'অদৃষ্ট' নামক বিমূর্ত কোনো এক সত্তা 'অশনি সংকেত'-এর সরল সাদামাটা মানুষগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। আর মানুষগুলি সেই নিয়ন্ত্রণরেখা ধরে পথ হাঁটতে বাধ্য হয়, প্রতিবাদের ভাষা পায় না। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায়ক রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে; বিভূতিভূষণের নায়ক তা পারে না।

৮.

লোক-ঔষধ

বৈষয়িক বুদ্ধির অধিকারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গঙ্গাচরণ ছাত্র পড়ানোর পাশাপাশি কবিরাজিটাও করেন। এর জন্যে তার অসুবিধা হয় না। 'স্বাস্থ্য প্রবেশিকা' বই আর উপস্থিত বুদ্ধি থেকে তিনি সব সমস্যার অতি দ্রুত সমাধান করেন। এজন্যে অবশ্য চক্রবর্তীমশায়ের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। রুগীকে ধমক দিয়ে, ভয় দেখিয়ে তিনি হাতের মুঠোয় আনেন। বোঝানোর চেষ্টা করেন 'ডাক্তার-বদ্দির কাজ' অতো সহজ নয়, 'বড্ড ঠাণ্ডা মাথায় করতে হয়।' গঙ্গাচরণ চেহারা দেখে অনুমান করতে পারেন রোগটা কোন্ প্রকৃতির—'আগন্তুক ম্যালেরিয়া রোগী, তার চেহারা দেখেই তা বোঝা যায়।' তার ওষুধ অ্যালোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথি নয়। তিনি জানেন, কৃষি এলাকায় দামী ওষুধ চলবে না। সুতরাং গঙ্গাচরণের প্রেসক্রিপশন কবিরাজীর দিকে চলে—

> শিউলি পাতার রস আর মধু দিয়ে খেও, দ্যাখো কেমন থাকো।[৩৭]

লোকসমাজে ব্যবহৃত এই ঔষধকে চিহ্নিত করা যায় 'লোক ঔষধ' বা 'Folk-medicine' রূপে। কবিরাজ মূলত গাছপালা, ছাল, শিকড়, রস, পাতা, ফুলের নির্যাস থেকে এমন 'Folk-medicine' তৈরি করেন। বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'গঙ্গাচরণ এ অঞ্চলে কবিরাজিও করে।' বলতে দ্বিধা নেই বিভূতিভূষণের এই নায়ক উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি। তিনি লোকায়ত লোকসমাজ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। এই সমাজ যেহেতু হাজারতর সংস্কারের জীর্ণতায় আবদ্ধ; তাই সুবিধাভোগী, চতুর ও বুদ্ধিজীবী এই মানুষটি কখনও শিক্ষকতা, কখনও কবিরাজী, কখনও গুপ্তবিদ্যা প্রয়োগ করতেও দ্বিধান্বিত হন না। জীবন-জীবিকা নির্বাহের তাগিদে প্রয়োজনমতো বৃত্তিবদল করেন—তাই বৃত্তি ও বিত্ত তাঁর জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে।

লক্ষণীয় যে, তারাশঙ্করের মতো লোকজীবন নিয়ে মহাকাব্যোপম উপন্যাস লেখেননি বিভূতিভূষণ। কিংবা মানিকের মতো আঞ্চলিক জীবনের সংগ্রামও লেখেননি। তিনি পল্লি অঞ্চলের লোকায়ত রূপকে তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসের

ক্যানভাসে। কিন্তু পল্লিমানুষ তো বিচ্ছিন্ন কোনো সত্তা নয়। তাদের ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কার, ঐতিহ্য সবই আছে। সেই চাক্ষুষ উপকরণকে বাদ দিয়ে চরিত্রের অন্তর্দহন বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে সব কথা নয়। বরং তা অনেকখানি 'এহো বাহ্য'র মতো রক্তশূন্য দেখায়। সুতরাং সমাজদেহসমেত গোটা মানুষের মানে চাই। আর 'অশনি সংকেত'-এ সেই কর্মটি সম্পাদন করতে গিয়ে লেখক লোকসংস্কৃতির বিচিত্র উপকরণকে গ্রহণ করেছেন। তবে এগুলির পৃথক কোনো গুরুত্ব নেই। উপন্যাসের বাস্তবায়নের প্রশ্নে, চরিত্রের বিশ্বস্ততার সাফল্য নির্ধারণে এদের আনয়ন। বলাবাহুল্য, লেখকের সুকৌশলী প্রয়োগে এই উপকরণগুলি ভিন্নমাত্রা পেয়েছে।

<u>তথ্যসূত্র</u>

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *লোকসাহিত্য, গ্রামসাহিত্য,* প্রবন্ধ সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, বিকাশ গ্রন্থ ভবন, ২০০৩, পৃ. ২৬৭
২. ড. দুলাল চৌধুরী : *বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি*, লোকায়ত প্রকাশন, আশ্বিন ১৩৭৬, পৃ. ৮১
৩. ঐ, পৃ. ৮২
৪. ঐ, পৃ. ৮৪
৫. ঐ, পৃ. ৮৭
৬. *International Dictionary of Regional European–Ethnology and Folklore* : Vol : I (Copenhagen; 1960)
৭. *Encyclopaedia Britanica*, Vol. IV, 1929, p. 444
৮. *Dictionary of Anthropology,* 1956 USA, p. 217 Charles Wirck
৯. *International Dictionary of Regional European Ethnology and Folk* I, 1960, p. 126
১০. *Encychoclopadia of Anthropology*, USA 1976, p. 173, Ed. Devid E. Hunter and Phillip Whiten
১১. *Profiles in Ethonologies*, 1971, USA, p. 390, Elman R. Service
১২. *The Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legends,* Vol. I. Mac Edward Leach
১৩. *বিভূতি রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ, আষাঢ় ১৪১৪, পৃ. ২০৩
১৪. তদেব, পৃ. ২২৫
১৫. তদেব, পৃ. ২৫০
১৬. তদেব, পৃ. ২৫৩

১৭. তদেব, পৃ. ২৬১
১৮. তদেব, পৃ. ২৯০
১৯. ড. নীহাররঞ্জন রায় : *বাঙালির ইতিহাস*, ১৩৬৫, পৃ. ৫৭৫
২০. T.S. Eliot : *After Strange Gods*, 1934, Selected Prose
২১. ড. ক্ষেত্র গুপ্ত : *বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস*, গ্রন্থ নিলয়, জুলাই ২০০১, পৃ. ৬৯
২২. ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৮৩, পৃ. ৬৪
২৩. দ্র. ১৩, পৃ. ২০০
২৪. প্রতিভা, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ ১৩১৮
২৫. ড. শীলা বসাক : *বাংলা ব্রতপার্বণ*, পুস্তক বিপণি, মে ১৯৯৮, আনন্দ, পৃ. ৫
২৬. দ্র. ১৩, পৃ. ২৮৪
২৭. দ্র. ২৫, পৃ. ৫৩
২৮. দ্র. ১৩, পৃ. ২০২
২৯. তদেব, পৃ. ২০৪
৩০. তদেব, পৃ. ২১০
৩১. তদেব, পৃ. ২৬৫
৩২. তদেব, পৃ. ২১৩
৩৩. Haraprasad Sastri : *Lokayata and Vratiya Gobesena Kendra*, p. 47
৩৪. দ্র. ১৩, পৃ. ২১৯
৩৫. তদেব, পৃ. ২০২
৩৬. তদেব, পৃ. ২৬৬
৩৭. তদেব, পৃ. ২০০

‘দম্পতি’ : কামনার অভিঘাতে ব্যর্থ দাম্পত্যের বৃত্তান্ত

কৌশিক ঘোষ

বিভূতিভূষণ এক অনন্য কথাকার। তাঁর মন-আত্মা-শিল্পচেতনা এক ভিন্ন মেজাজে রাঙানো। প্রকৃতি বর্ণনা, অধ্যাত্ম-চিন্তা কিংবা নিরন্ন সাধারণ মানুষের জীবনবোধকে কেন্দ্র করে তাঁর যে জীবন-জিজ্ঞাসা, তা ফুটে উঠেছে ‘পথের পাঁচালী’ (১৯২৯), ‘অপরাজিত’ (১৯৩২), ‘আরণ্যক’ (১৯৩৯), ‘দেবযান’ (১৯৪৪) কিংবা ‘ইছামতী’-র (১৯৫০) মতো কালজয়ী উপন্যাসগুলির মধ্যে দিয়ে। সেই তুলনায় তাঁর শেষদিকের কয়েকটি উপন্যাস যথা— ‘দুইবাড়ী’ (১৯৪১), ‘বিপিনের সংসার’ (১৯৪১), ‘অথৈ জল’ (১৯৪৭) এবং ‘দম্পতি’ একটু বেমানানই বটে। মূলত, অবৈধ প্রেমই এইসব উপন্যাসের আশ্রয়। তবু সার্থক স্রষ্টা যখন তাঁর উপন্যাসের ঘর-বাড়ি নির্মাণ করেন তখন তাঁকে অস্বীকার করা যায় না।

কেননা, মানব-জীবনের বিচিত্র চিন্তা-ভাবনাকে আশ্রয় করেই তো তিনি গড়ে তোলেন তাঁর সৃষ্টি সম্ভার। লেডি কীন কলেজের মার্জিত রুচিশীল অধ্যাপিকা সুপ্রভা চৌধুরির (দত্ত) সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং চাওয়া-পাওয়ার মাঝে যে অতৃপ্ত পরিণামহীন ইতিবৃত্ত, তাই হয়তো রয়ে গেছে শেষদিকের এইসব উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের আড়ালে। বিশেষত, বিপিন ও মানী এবং নিধিরাম ও মঞ্জুর সম্পর্কের মধ্যে এই অকথিত আখ্যান যে সুস্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে তা সচেতন সমালোচক মাত্রই স্বীকার করে থাকেন। ‘দম্পতি’ উপন্যাসে নায়ক গদাধরের আত্মভাবনার মধ্য দিয়ে পুরুষ-মনের নারীসক্ত কামনা-বাসনার দ্বন্দ্বমুখর এক আখ্যান-বৃত্তান্ত নির্মিত হয়েছে।

পুরুষ যেমন ঘরে পতিব্রতা নারীকে চায় তেমনি লালসার বহ্নি জ্বালিয়ে কামনায় উদ্দীপ্ত করে যে নারী তাকেও তো সংগোপনে একান্ত করে পেতে চায়। সমস্ত পিছুটান উপেক্ষা করে ঈপ্সিত কামনার নারীকে পাওয়ার যে সুতীব্র ইচ্ছা—তাই যেন গদাধরের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। একান্ত ফরমায়েশি রচনা হলেও বিভূতিভূষণের বিচিত্র ভাবনার মনোজগৎকে বুঝে নিতে ‘দম্পতি’ উপন্যাসের গুরুত্ব কম নয়।

১.

'দম্পতি উপন্যাসের কাহিনির সূত্রপাত যশোর জেলার চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার পথে কাঁইপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত বসু পরিবারের সন্তান গদাধর বসুর জীবনবৃত্তান্তকে কেন্দ্র করে। গদাধরের বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ। বেশ কর্মঠ, 'ম্যালেরিয়াগ্রস্ত চেহারা, রং শ্যামবর্ণ, তবে বসু বংশের দৈহিক ধারা অনুযায়ী বেশ দীর্ঘাকৃতি।' মূলত, আশে-পাশে বিভিন্ন গ্রাম থেকে কম দামে পাট কিনে তা বাড়তি দামে মাড়োয়ারি মহাজনদের কাছে বিক্রি করেন। এতে তাঁর আয়ও বেশ ঈর্ষণীয়। গ্রামের বাইরে তিনি ব্যবসার জন্য নির্মাণ করেছেন একটি 'প্রকাণ্ড' আড়ত। এই আড়তটি গ্রামের বেশ সুবিধাজনক জায়াগায় অর্থাৎ দু'টি বড়ো রাস্তার সংযোগস্থলে অবস্থিত। একটি চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার ডিস্ট্রিক বোর্ডের বড়ো রাস্তা এবং অপরটি লোকাল বোর্ডের কাঁচা রাস্তা যেটা বার্ণপুর থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত বিস্তৃত। গদাধরের পৈতৃক বাড়ি প্রকাণ্ড হলেও বর্তমানে তার হাল বেশ খারাপ। বট-অশ্বত্থ গাছ গজিয়ে, খিলান-কার্ণিশ ভেঙে গেছে কোথাওবা নষ্ট হয়ে গেছে। তবু বাড়ি সারাই বা নতুন করে গৃহ নির্মাণে তাঁর প্রবল অনীহা। অনাবশ্যক অর্থ খরচ তাঁর পছন্দ নয়। ব্যবসার কাজে পুরাতন মুহুরী ভড়মশায় তাঁর অত্যন্ত কাছের মানুষ। গদাধর ক্রমে ব্যবসায় মুনাফা লাভ করে একজন সম্ভ্রান্ত মানুষ হিসেবে পরিচিত। একদিন তাঁর আড়তে হঠাৎ একজন পাঞ্জাবি সাধু এসে ভাগ্য গণনা ক'রে বলে যান—'ইনসাল্ ইয়ানে দুসর্ সাল সে বহুৎ কুছ্ গড়বড় হো যায়গা।' নাস্তিক গদাধর এ কথায় কোনো পাত্তা দেননি বরং দক্ষিণা বাবদ এক টাকা চলে যাওয়ায় নিজের উপর বিরক্ত হন। গদাধরের স্ত্রী অনঙ্গমোহিনী স্বামীর কাছ থেকে একথা জানতে পেরে বেশ বিমর্ষ হন। স্বামীর নাস্তিক মানসিকতা তাঁর পছন্দ নয়। অনঙ্গের প্রতি গদাধরের প্রেম, কর্তব্য যেমন আছে গদাধরের প্রতিও অনঙ্গের ভালোবাসা, কর্তব্য সমানভাবে অটুট। গদাধরের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে অনঙ্গ সর্বদা সতর্ক—যে জন্য দু'পেয়ালার বেশি চা তিনি কখনো তাঁকে দেন না। গদাধর যখন তাঁদের পৈতৃক আমলের তালুক 'আমপাড়া-ঢবঢবি'র উদ্দেশ্যে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন অনঙ্গের কাতর প্রার্থনা ছিল—'আমপাড়া-ঢবঢবি শুনেছি অতি অজ-পাড়াগাঁ। খাবে-দাবে কি? থাকবে কোথায়?' যাইহোক, এরপর গদাধর ঢবঢবির কাছারি বাড়িতে যান এবং প্রায় দেড় হাজার টাকা সেখান থেকে আদায় হয়।

গদাধরের গ্রামের বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি নির্মল। নির্মল গদাধরের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নেয়, কিন্তু ফেরৎ দেয় না। নির্মলের স্বভাব-চরিত্রের প্রতি অনঙ্গা বিরক্ত। স্বামীকে স্পষ্টতই তিনি জানান—'নির্ম্মলবাবুর সঙ্গে তোমাকে মিশতে দেবো না আমি'। কিন্তু গদাধর তবু নির্মলকে গোপনে টাকা দেন। কলকাতা থেকে নানা জাতের পায়রা কিনে এনে গদাধরকে দেন। তাছাড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে কিছু কাজ পাওয়ার আশায় গদাধর

নির্মলকে লুকিয়ে পাঁচশ টাকা দেন। কেননা, গদাধর জানে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে নির্মলের প্রচুর জানাশোনা আছে। যদিও এই ঘুষের উপযুক্ত কাজের অর্ডার তিনি পাননি। অনঙ্গের বড়দা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। একদিন অনঙ্গের কাছ থেকে দেড়শত টাকা নিয়ে যান। গদাধর পঞ্চাশটাকা পাঠিয়ে দিলেও অনঙ্গ অতিরিক্ত একশত টাকা দেওয়ায় স্ত্রীর উপর রেগে যান। বড়ো শালাকে তিনি গুণ্ডা, বদমাইশ বলে সম্বোধন করেন। স্ত্রীকে দু'চার কথা শোনান। তাছাড়া লক্ষ্মী নামে এক অপরিচিতা নারীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসায় তিনি আরও বেশি বিরক্ত হন। অনঙ্গও বিষয়টিকে ভালোভাবে নেননি। তবু দাদার সম্মান রক্ষার্থে তিনি এইরূপ করেছেন। এদিকে নির্মলের কাছ থেকে গদাধর জানতে পারেন 'মঙ্গলগঞ্জের কুঠী' বিক্রি হবে। কেনার আগ্রহ থাকলেও নির্জন এলাকায় এত প্রকাণ্ড কুঠীবাড়ি তিনি কিনতে চাননি। নির্মল কুঠীবাড়ি থেকে ফেরার পথে গদাধরকে বিদ্রূপের ছলে বলে—'ব্যবসা তাহলে কলকাতায় উঠিয়ে নিয়ে চলো। সেখানে বাড়ী করো—ভাড়া হবে, থাকাও চলবে।' উচ্চাকাঙ্ক্ষী গদাধরের কথাটি মনে ধরে। বলা যায়, নির্মলের এই কথাটাই গদাধরের জীবন ওলট-পালট করে দেয়। প্রথমে অনঙ্গ রাজি হননি। বিশ্বস্ত মুহুরী ভড়মশায়ও বারণ করেছিলেন। কিন্তু গদাধর অবিচল। ব্যবসায় ছয় হাজার টাকা নিট লাভ হওয়া সত্ত্বেও, কলকাতায় যাওয়ার জন্য তাঁর মন অস্থির হয়ে ওঠে। নির্মলকে টাকা দিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন বাড়ি বায়না করার জন্য। দ্রুত ব্যবসা উঠিয়ে স্ত্রী-পুত্র সংসার নিয়ে গ্রাম থেকে শহরে হাজির হলেন গদাধর বসু।

কলকাতায় এসে গদাধর সস্ত্রীক কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর দেখে কাটালেন। নতুন আসবাবপত্র দিয়ে অনঙ্গ ঘর সাজালেন। ছেলেদের কাছের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। একদিন নির্মল এসে তাঁকে বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে যায়। বাংলা ছবি 'প্রতিদান'—গদাধরের মন্দ লাগেনি। বায়োস্কোপ শেষ হলে নির্মল গদাধরকে না জানিয়েই জ্যাঠতুতো ভাই শচীন (যাকে গদাধর বখাটে উচ্ছৃঙ্খল বলে তার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল)-এর কাছে নিয়ে আসে। শচীন 'প্রতিদান' চলচ্চিত্রের নায়িকা সুন্দরী শোভারাণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেয়। শোভারাণীর অপরূপ সৌন্দর্য, কথা বলার ধরন গদাধরকে মুগ্ধ করে দেয়। গদাধরের শোভারাণীকে দেখে মনে হয়—

> কি সুন্দর মুখশ্রী, অপূর্ব্ব লাবণ্য ভরা ভঙ্গি ঠোঁটের নীচের অংশের! গদাধরের সারা দেহ নিজের অজ্ঞাতে শিহরিয়া উঠিল। নামজাদা অভিনেত্রী শোভারাণী মিত্র... তাঁহাকে—গদাধর বসুকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছে! বিশ্বাস করা শক্ত!

চা-পর্ব মেটার পর সিনেমা নিয়ে গদাধর তাঁর মতামত দেন এবং তাঁর অনুরোধে শোভারাণী অনিচ্ছা সত্ত্বেও গান করেন। গান-শেষে তিনি প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে বলেন—'চমৎকার'। বাড়ি ফিরে গদাধর স্ত্রীর কাছে এইসব ঘটনা বলবেন মনে করেও

চেপে যান। বরং তাঁর মন অনঙ্গের রূপের সঙ্গে শোভারাণীর সৌন্দর্যের তুলনায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে—

> গদাধর হঠাৎ অনঙ্গের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। অনঙ্গও মেয়েমানুষ—দেখিতেও মন্দ নয়, কিন্তু কি ঠকাই ঠকিয়াছেন এতদিন। সত্যিকার মেয়েমানুষ বলিতে যা বোঝায়, তা তিনি এতদিন দেখেন নাই। আজই অন্যত্র তাহা দেখিয়া আসিলেন এইমাত্র।

স্ত্রীর সঙ্গে সেইরাত্রে কথা বলতে নিরুৎসাহ বোধ করলেন। অনঙ্গও লক্ষ করলেন স্বামীর এই উদাসীনতাকে—যা তাঁর অচেনা। অনঙ্গ ঘুমিয়ে পড়লেও গদাধর শোভারাণীর কথা ভাবেন এবং চিন্তা করেন—'জীবনটা তাঁর বৃথায় গেল! মেকি লইয়া কাটাইলেন, আসল নারী কি বস্তু, তাহা কোনো দিন চিনিলেন না!' ক্রমে শোভারাণীর বাড়ি গদাধরের যাতায়াত বাড়ে। শচীন এমন সময় একদিন তাঁকে পরামর্শ দেয় ফিল্মের ব্যবসায় নামতে। সামান্য পুঁজিতে বিশ-পঁচিশ লাখ টাকার নিট লাভ। গদাধর একথা শুনে ভাবেন—'কারবার ব্যবসা-লাভ-শুধু তা নয়, এমন মধুর সংসর্গ।' ফলত গদাধর কোনো চিন্তা না করে ফিল্মে ব্যবসায় টাকা ঢালতে প্রস্তুত হন। শোভারাণী তাঁকে বারণ করেন—'আপনার টাকা আপনি খরচ করবেন, তাতে আমার কি বলার থাকতে পারে! কিন্তু আপনি যে কাজ জনেন না, সে কাজে না নামাই আপনার উচিত ছিল।' অনঙ্গ, ভড়মশায় সবাইকে লুকিয়ে গদাধর এ কাজ করেন। শোভারাণীকে গদাধর তাঁর 'ভারতী ফিল্ম স্টুডিও' কোম্পানিতে নায়িকা হিসাবে নিতে চান। কিন্তু শোভারাণী তাঁর সেই প্রস্তাবে বলেন 'বেঙ্গল ন্যাশনাল ফিল্ম স্টুডিও' থেকে তার আসা সম্ভব নয়—

> এদের স্টুডিওতে আমার এখনও এক-বছরের কন্ট্রাক্ট রয়েছে। তাছাড়া আমি একটা নিশ্চিত জিনিস ছেড়ে অনিশ্চিতের পেছনে ছুটবো, এত বোকা আমায় ঠাউরেছেন?

শেষপর্যন্ত ছবি তৈরি হল; কিন্তু লাভ হল না। ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে লোকসান হল তেইশ হাজার টাকা। পাওনাদারদের টাকা ও পুনরায় সিনেমা তৈরির জন্য অগ্রিম টাকা মেটাতে পড়লেন ঋণের বোঝায়। ধার করলেন শোভারাণীর কাছ থেকে। পাটের ব্যবসার প্রায় সমস্ত টাকা ঢাললেন। একদিন হঠাৎ শোভারাণী 'ভারতী ফিল্ম স্টুডিও'তে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু গদাধর চিঠি লিখে জানিয়ে দেন যে তাঁকে নেওয়া সম্ভব নয়। এদিকে গদাধর টাকার জন্য পাগলের মতো হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগলেন। স্ত্রীর অলংকার বেচার টাকা—যা ব্যবসার কাজে লাগবার কথা, গদাধর সেই টাকা স্ত্রীর কাছ থেকে ভুলিয়ে নিয়ে যান। ভাড়া দিতে না পারায় আদালতের নির্দেশে বেলিফ বাড়ি সিল করে দিলে, অনঙ্গ সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা গ্রামের বাড়ি ফিরে যাবেন। লোকলজ্জার ভয় উপেক্ষা করে অবশেষে অনঙ্গ সন্তানদের নিয়ে গ্রামে ফিরে আসেন। ব্যবসা কোনোরকমে ভড়মশায় চালান, কিন্তু অর্থের

ভীষণ অভাব। অনঙ্গ হলুদ গুঁড়োর ব্যবসা শুরু করেন। দু-এক পয়সা লাভও হয়। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। স্বামীবঞ্চিতা নারীর জীবনে অভাবের মাঝখানে এসে জোটে ম্যালেরিয়ার অভিঘাত। ভড়মশায় ডাক্তার দেখিয়ে নিজের বিধবা ভাইঝিকে আনিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। এতকিছুর মধ্যেও অনঙ্গের স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি অবিচল থাকে। ইতিমধ্যে শেষ সম্বল থেকে একশ টাকা স্বামীর জন্যে পাঠিয়েছিলেন তিনি কিন্তু ভড়মশায় মনিব গদাধরের কাছ থেকে জানতে পারেন তাঁর জেল হওয়ার উপক্রম। হাজার তিনেক টাকা প্রয়োজন। যোগাড় করা অসম্ভব জেনে ভড়মশায় পঞ্চাশ টাকা ফিরিয়ে নিয়ে যান। অনঙ্গ স্বামীর চিন্তায় অস্থির হয়। পুনরায় ভড়মশায় অনঙ্গের আদেশ উপেক্ষা না করে আবার চললেন কলকাতায়। সঙ্গে নিলেন অনঙ্গের দেওয়া একটি পোঁটলা। তিনি দেখলেন—

> তাহার মধ্যে হেন জিনিস নাই যা নাই। গোটাকতক কাঁচা পেঁপে, এমনকি একটা মানকচু পর্যন্ত। তাছাড়া গাছের বরবটি, আমসত্ত্ব, পুরানো তেঁতুল, পোস্তদানার বড়ি...ভড়মশাই মনে মনে হাসিলেন, মুখে কিছু বলিলেন না। অনঙ্গ আঁচল হইতে খুলিয়া আরও তিনটে টাকা বাহির করিয়া বলিল—ভাড়া বাদে একটা টাকা নিয়ে যান, যাবার সময় হরি ময়রার দোকান থেকে নতুন গুড়ের সন্দেশ সের দুই নিয়ে যাবেন।

কিন্তু ভড়মশায় কলকাতায় গিয়ে জানলেন বাবুর অবস্থা এখন ফিরেছে এবং সচক্ষে দেখলেন মোটর গাড়ি থেকে শোভারাণী ও মনিব গদাধর একসঙ্গে নামছেন। একসঙ্গে দু'জনে এখন থাকেন। ভড়মশায় চিৎকার করে বাবুকে ডাকলেও তার কণ্ঠস্বর তাঁর কানে পৌঁছায় না। 'ভড়মশায় হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।' এক কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ভড়মশায়ের মতো পাঠককে দাঁড় করিয়ে, অনঙ্গকে সীমাহীন দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত করে ঔপন্যাসিক কাহিনিতে ইতি টেনেছেন।

২.

'দম্পতি' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র গদাধর বসু। এছাড়া ভড়মশায়, নির্মল ও শচীন চরিত্র উল্লেখযোগ্য। গদাধর চরিত্রকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে অর্থাৎ গ্রাম জীবনে গদাধর একজন নিষ্ঠাবান ব্যবসাদার। সারাদিন ব্যবসার পিছনে সময়-পরিশ্রম ব্যয় করেন। অনর্থক অর্থ খরচে তাঁর আপত্তি। বাড়ি জীর্ণ, ভাঙা-চোরা থাকলেও তিনি তা সারান না বা নতুন করে তৈরি করেন না। এই টাকা ব্যবসায় খরচ করাই শ্রেয় মনে করেন তিনি। কর্মচারী নিধুসাকে পাট শুকনো না ভিজে তা দেখে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। অজগ্রাম আমপাড়া ঢবঢবির কাছারিবাড়িতে প্রচণ্ড শীতে কষ্ট হবে জেনেও একাকী গিয়েছেন অর্থ আদায়ে। প্রায় দেড় হাজার টাকা সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া কোথা থেকে কোন্ সময়ে কম দামে পাট সংগ্রহ করে তা সুযোগ

বুঝে বাজারে মাড়োয়ারি মহাজনদের কাছে চালান করতে হবে, তা তিনি ভালোভাবেই জানেন। ভড়মশায় যে বিশ্বস্ত তা তাঁর অজানা নয়, তাই সবকিছু নির্দ্বিধায় তাঁর হাতে সঁপে দেন। লোক চেনেন তিনি। কাজের অর্ডার আদায়ে প্রয়োজনে ঘুষও দেন। বন্ধু নির্মলকে পাঁচশত টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অর্ডার ধরার আশায়। মাঝে-মধ্যে ম্যালেরিয়ায় ভুগলেও গদাধর কর্মঠ। উদ্যমী, সাহসী ব্যক্তি। বাড়িতে ডাকাত পড়লে ভয় না পেয়ে—'হাঁকডাক করিয়া লোকজন জড়ো করিয়া, নিজে রামদা হাতে লইয়া হৈ হৈ শব্দে গ্রাম মাতাইয়া ছুটিয়া ছিলেন।' গদাধর শৌখিন পুরুষ। নির্মলকে টাকা দিয়ে কলকাতা থেকে রং-বেরঙের পায়রা কিনে আনেন। নির্মলকে ধারের নাম করে অর্থ সাহায্য করেন। কারণ জানেন এ টাকা নির্মল আর দেবে না। গদাধর নাস্তিক। পাঞ্জাবি সাধু হাত দেখে তাঁর বিপদের কথা জানালে তিনি বিশ্বাস করেননি, বরং দক্ষিণাবাবদ একটাকা চলে যাওয়ায় আফশোস করেছেন। গদাধর দায়িত্ববান, কর্তব্যপরায়ণ পত্নীপ্রেমিক পুরুষ। উপন্যাসের প্রথমে দেখা যায় তাঁদের বাড়িতে যে পিসিমা থাকেন তাঁর অসুখ করলে তিনি ডাক্তার দেখানোর জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছেন। স্ত্রী অনঙ্গকে গদাধর ভালোবাসেন। নিজের সব কথা স্ত্রীকে না বলে থাকতে পারেন না। তাঁদের দাম্পত্যে আছে রসিকতার ছোঁয়া— 'গদাধরের দোষ এই, স্ত্রীর কাছে গম্ভীর হইয়া থাকিতে পারেন না। অনঙ্গর কাণ্ড দেখিয়া হাসি চাপিয়া রাখা গদাধরের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল।'

ঔপন্যাসিক তাঁদের মিষ্টি দাম্পত্য জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন— 'দু'জনে কেহ কখনও কাহাকে ফেলিয়া দীর্ঘদিন থাকে নাই, থাকিতে অভ্যস্ত নয়— নিতান্ত ঘরকোণা গৃহস্থ বলিয়া—পাঁচদিনের অদর্শন ইহাদের পরস্পরের পক্ষে পাঁচ মাসের সমান!' সন্তানদের প্রতি তাঁর মমত্বের কথা উপন্যাসে দুই একবার উল্লেখ আছে। ঢবঢবির কাছারিবাড়িতে রাত্রি যাপনের সময় তাঁর মনে হয়েছে—'অনঙ্গ কাছে নাই। ছেলে-মেয়ের কথা মনে পড়িয়া বিশেষ করিয়া কষ্ট হইতে লাগিল।' কিংবা সেখান থেকে ফিরে তাঁর উপলব্ধি—

> পাঁচদিন মাত্র বাহিরে ছিলেন—যেন কতকাল বাড়ী ছাড়িয়াছেন, যেন কতকাল দেখেন নাই স্ত্রী-পুত্রকে! ছোটো ছেলে টিপুকে দেখিয়া কাছে বসাইয়া আদর করিয়া তবে মনে হইল, নিজের বাড়িতে আসিয়াছেন বটে—কতকাল পরে যেন।

এই পর্বে দেখা যায় গদাধর রুচিশীল পুরুষ। উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রতি তাঁর প্রবল ঘৃণা। যে কারণে জ্যাঠতুতো ভাই শচীন সম্বন্ধে তাঁর বিরূপ মনোভাব। অনঙ্গের দাদার বেহিসেবী বাউণ্ডুলে জীবন তিনি পছন্দ করেন না। স্ত্রী তাঁকে টাকা দিলে তিনি বিরক্ত হয়েছেন—'আমি এসব পছন্দ করিনে। সৎকাজে টাকা ব্যয় করতে পারা যায়—তা বলে এইসব জুয়োচোর আর গুণ্ডাকে...'। আবার অনঙ্গের দাদার সঙ্গে লক্ষ্মী নামে একটি অপরিচিত মেয়ে ছিল। অনঙ্গের কথায়—

> সঙ্গে কে একজন মাগী ছিল, আমি তাকে চিনিনে।...তবে আমার মনে হলো, টাকাটা ওই মাগীকেই দিতে হবে দাদার। ভাবে তাই মনে হলো। দাদা দেনদার, মাগী পাওনাদার—দাদার মুখ দেখে মনে হলো, টাকা না দিলে তাকে অপমান হতে হবে।

প্রত্যুত্তরে গদাধর জানান—'ও সব ঢং অনেক দেখেছি। ছিছি, আমার বাড়িতে এইসব কাণ্ড।' কী অদ্ভুত! নিয়তির পরিহাসে গদাধরের পরবর্তী জীবন এমন সব মেয়েদের সংসর্গেই অতিবাহিত হয়েছে।

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ শহর কলকাতায় যে গদাধরকে আমরা দেখি সেখানে তাঁর চরিত্রের সব গুণ প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছে। এই পর্বে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা সন্তানদের প্রতি কর্তব্য ক্রমে নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে তিনি মিথ্যাচারী, অমিতব্যয়ী, অপরিণামদর্শী, নারীলোলুপ-ভোগী-কামনাসক্ত হৃদয়হীন উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষ হিসেবে প্রতিভাত। গদাধর চরিত্রের মধ্যে সুন্দরী নারীর প্রতি যে তীব্র আসক্তি ছিল তা বোঝা যায় অভিনেত্রী শোভারাণীর সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে। গদাধর সুন্দরী শোভার রূপে মুগ্ধ। ইতিপূর্বে এমনভাবে নারীকে তিনি আবিষ্কার করেননি। নিজের সারাজীবনের সমস্ত কর্ম-যাপনকে তাঁর ব্যর্থ বলে মনে হয়—'জীবনটা তাঁর বৃথায় গেল। মেকি লইয়া কাটাইলেন, আসল নারী কি বস্তু তাহা কোনোদিন চিনিলেন না।' স্ত্রী অনঙ্গের রূপ তাঁর কাছে বিস্বাদ ঠেকে। স্ত্রীর সাহচর্য তাঁর কাছে অসহ্য মনে হতে থাকে। নির্মলের ধার নেওয়া টাকা শোভারাণীকে শোধ করতে গিয়েছিলেন যেচে, এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শোভার সাহচর্য পাওয়া। ভোগী পুরুষের অন্তরাত্মা তাঁর অন্তরে যে লুকিয়েছিল তা তাঁর একটি স্বগতোক্তির মধ্যেই পড়ে—

> সংসার হঠাৎ তাঁহার কাছে নিতান্ত বিস্বাদ মনে হইল। অনঙ্গ আধ-ময়লা একখানা শাড়ী পরিয়া আছে, মাথার চুল এখনও বাঁধে নাই, কেমন যেন অগোছালো ভাব—তাছাড়া ওর মুখ দেখিলেই মনে হয় এই বয়সে বুড়ি হইয়া পড়িয়াছে যেন। কিসের জন্য তিনি এসব করিয়া মরিতেছেন? কাহার জন্য পাটের দালালি আর দুপুরের রোদে রোদে মোকামে-মোকামে ঘুরিয়া পাটের কেনা-বেচা! সত্যিকার জীবনের আমোদ কি তিনি একদিনও পাইয়াছেন? পুরুষ-মানুষের মন যা চায় নারীর কাছে—অনঙ্গ কেন, কোনো মেয়ের কাছেই কি এতদিন তা পাইয়াছেন? জীবনে তিনি কি দেখিলেন, কি-বা পাইলেন! এই কলতলায় এঁটো বাসনের স্তূপ। ওই আধ ময়লা ভিজে কাপড়ের রাশি, ওই কয়লা-কাঠের গাদা, আলু-বেগুনের চুবড়িটা—এই সংসার? এই জীবন? ইহাই তিনি চিরকাল দেখিবেন ও জানিবেন? শচীনকে গ্রামের লোক নিন্দা করে, কিন্তু শচীন তাঁহার চেয়ে ভালো। সে জীবনকে ভোগ করিয়াছে। তিনি কি করিয়াছেন? কিছুই করেন নাই।

শুধু তাই নয় কলকাতায় শচীনের সংস্পর্শে আরও কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলে তাঁর মন ভরে ওঠে। কেবল তাঁর মনে হয়—'এতকাল গ্রামে পাটের বস্তা

লইয়া কি করিয়াই না দিন কাটাইয়াছেন। যৌবনের দিনগুলো একেবারে নষ্ট হইয়াছে।' গদাধরের চরিত্রের এই দিকটি বিপথগামী চতুর শচীন বুঝতে পারে। তাঁকে টোপ দেয় ফিল্মের ব্যবসায় নেমে পড়তে। গদাধর তার স্বভাবগত পরিবর্তনের কারণেই শচীনের কথাকে মান্যতা দেয়। অথচ এই শচীনের চারিত্রিক ত্রুটি নিয়েই গ্রামে তাঁদের অন্য তরফের সঙ্গে একদিন তিনি ঝগড়া করেছিলেন। গদাধরের ব্যবসা এবং লাভ এসব থেকেও যেটির জন্য ফিল্মের জগৎ ভালো লাগে সেটি হল—'এমন মধুর সংসর্গ' পাওয়া। শোভারাণীর গান—'বসন্ত চলে গেল হায় রে,/চেয়ে দেখিনি তার পানে।' এ গান শুনে—'গদাধরের কেবলি মনে হয়—ও গান তাঁহারি মনের কথা। জীবনের কতখানি কাটিয়া গেল...পৃথিবীতে এমন রূপ-রস-গন্ধ-তার কোনো পরিচয় তিনি পাইলেন না।' ফিল্ম জগতের অন্য স্টার অভিনেত্রীদের মনে হয়—'তাহারা যেন অন্য লোকের জীব। গান ও সুরা দিয়ে তৈরি।' এই ব্যবসায় নামা নিয়ে তাঁর কোনো দ্বিধা নেই—জ্যোৎস্নারাত্রে নৃত্যরতা তরুণী রেখার লাস্যভঙ্গি দেখে গদাধর ভাবলেন—'টাকা সার্থক হয় এই ব্যবসায়। খরচ করেও সুখ, লাভ যদি না পাই তাতেও সুখ! যে বয়সের যা—আমার বয়েস তো চলে যায়নি এসবের।'

গদাধরের এই পরিবর্তন এবং স্ত্রী-পুত্রের প্রতি তীব্র ঔদাসীন্য ও কর্তব্যহীনতা আমাদের বিস্মিত করে। নারীলিপ্সাই তাঁর চরিত্রে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। ছলনা করে স্ত্রীকে ভুলিয়ে গহনা বেচার অর্থ নিয়ে দ্রুত প্রস্থান করেছেন। একবারও ভাবেননি, তাঁদের সংসার কীভাবে চলছে। অনঙ্গের অনুরোধে ভড়মশায় যখন বাড়ির সংবাদ নিয়ে তাঁর মেসে উপস্থিত হয়েছেন তখন কোনোরকম খবর নেওয়া তো দূরে থাক, অনঙ্গের দেওয়া টাকা নিয়ে বলেছেন—'অন্তত যে ক'দিন জেলের বাইরে থাকি মেস খরচটা চলে যাবে।' স্ত্রী অনঙ্গ যে গ্রামের বাড়িতে দুটি সন্তান নিয়ে কীভাবে দিন যাপন করছেন তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। গদাধর এক স্বার্থপর কামুক চরিত্র। উপন্যাসের শুরুতে শচীন ও অনঙ্গের দাদার উচ্ছৃঙ্খল জীবন নিয়ে যে ব্যঙ্গ ও ভর্ৎসনা তিনি করেছেন অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে আজ তাঁর জীবন সকলের চোখে ঠিক সেই রকমই। পাঞ্জাবি সাধুবাবার ভাগ্য গণনা আজ সত্য হয়ে তার জীবনে দেখা দিল। আসলে বিভূতিভূষণের আধিদৈবিক ঘটনার প্রতি চূড়ান্ত একটি বিশ্বাস ছিল— এ তারই আখ্যান। পিতা হিসেবে তিনি নিষ্ঠুর-ব্যর্থ, পিতার কোনো দায়িত্ব তিনি পালন করেননি। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের উচ্ছৃঙ্খল নারীসক্ত পুরুষ হিসেবে তিনি শেষ পর্যন্ত প্রতিভাত হন। ঔপন্যাসিক গদাধর চরিত্রের সাযুজ্য তথা ক্রম পরিণতি যথার্থভাবে তুলে ধরতে পারেননি। চরিত্রের অধঃপতনের বীজ প্রথমাংশে অনুপস্থিত। শুরু থেকে যেভাবে নির্মাণ করলে গদাধর চরিত্রের সাযুজ্য পূর্বাপর রক্ষা পেত এখানে তা নেই। গদাধর চরিত্রের অধঃপতন অনেকটা আরোপিত মনে হয়।

ভড়মশায় বিপত্নীক বুদ্ধিমান মানুষ। উপন্যাসে গদাধরের বিশ্বস্ত মুহুরি হিসাবে তাঁকে দেখা যায়। মনিব গদাধর তাঁকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন। তাঁর চরিত্রের ঔচিত্যবোধ ও কর্তব্যবোধ আমাদের সম্ভ্রম জাগায়। নিধু কয়ালের প্রতি গদাধর বিরক্ত হয়ে যখন বলেন—

> ভড়মশায়, নিধেটা দিন-দিন বড় বেয়াদব হয়ে উঠেচে— মুখোমুখি তর্ক করে! ভড়মহাশয় তাহার উত্তরে মৃদু হাস্য করিলেন মাত্র, কোনো কথা বলিলেন না। ইহার কারণ, গদাধরের চণ্ডালের মতো রাগে ইন্ধন যোগাইলে, এখুনি চটিয়া লাল হইয়া নিধু কয়ালকে বরখাস্তও করিতে পারেন তিনি। কিন্তু ভড়মহাশয় জানেন, নিধু সা চোর বটে, তবে সত্যই কয়ালী কাজে ঝুনা লোক—গেলে অমনটি হঠাৎ জুটানো কঠিন।

আবার অনঙ্গ যখন একশ টাকা দিয়ে তাঁকে মনিব গদাধরের কাছে পাঠান তখন ঔচিত্য বুঝে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন। বাকি টাকা অনঙ্গকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। গদাধরের যখন জেলে যাওয়ার অবস্থা—বিবেচনা করে সেই খবর অনঙ্গের কাছে লুকিয়েছেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছে—

> এ-কথা শুনিলে বৌ ঠাকরুণ কি স্থির থাকিতে পারিবেন! এই মেসেই ছুটিয়া আসিবেন দেখা করিতে হয়তো। সুতরাং এ-কথা সেখানে গিয়া উত্থাপন না করাই ভালো। তিন হাজার টাকার যোগাড় করিতে না পারিলে যদি জেলে যাওয়ার মীমাংসা না হয়, তবে চুপ করিয়া থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ সে টাকা কোনো রকমেই এখন সংগ্রহ করা যাইতে পারে না।

গোপনে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছেন গদাধর ফিল্মের কোম্পানি খুলেছেন এবং তার জন্যই তাঁর এত টাকার প্রয়োজন। তাঁর মনে হয়েছে—

> মনিব পাটের গদির ক্যাশ ভাঙিয়া ছবি তৈরির ব্যবসায় লাগিয়াছেন, এ ভালো লক্ষণ নয়। সে নাকি যত নটী লইয়া কারবার, তাহাতে মানুষের চরিত্র ভালো থাকে না, থাকিতে পারে না কখনও।

অনঙ্গকে এসব কথা প্রথমে না জানালেও পরে উপায় না দেখে সব জানিয়েছেন। আড়তে পাওনাদাররা এলে তাদের উপযুক্ত উত্তর দিয়ে তাড়িয়ে দিতে সফল হয়েছেন। বিপত্নীক ভড়মশায় অনঙ্গ অসুস্থ হলে ডাক্তার দেখিয়েছেন এবং নিজের বিধবা ভাইঝিকে আনিয়ে তাঁর সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছেন। অনঙ্গের হলুদ গুঁড়োর ব্যবসার কাজে তিনি যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন। স্বামী বঞ্চিতা অসহায় নারী অনঙ্গের পাশে থেকে অভিভাবক রূপে তাঁর আন্তরিক সাহায্য পাঠকের শ্রদ্ধা আদায় করে।

নির্মল মুখুয্যে কাঁইপুর গ্রামের হরি গাঙ্গুলির জামাই। শ্বশুরকুলের কেউ না থাকাতে শ্বশুরের সম্পত্তি ভোগদখল করে বসবাস করছে। 'লোকটি সর্বদাই অভাবগ্রস্ত, একথাও ঠিক—কারণ আয়ের অনুপাতে তাহার ব্যয় বেশি।' নির্মল

অকর্মণ্য। গ্রামের সবার কাছ থেকে সে টাকা ধার নেয় কিন্তু শোধ করে না। অনঙ্গ এ ব্যাপারে গদাধরকে সাবধান করেছেন। মিশতে বারণ করেন। কিন্তু 'গদাধর জেদী লোক—যাহাকে লইয়া ঘরে-বাহিরে তাঁর উৎপীড়ন, তাহাকে তিনি কখনই ত্যাগ করিতে পারেন না—করিবেনও না।' বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা থাকা সত্ত্বেও ঘরের কোনো কাজ করে না। সে বাউণ্ডুলে। তার স্ত্রী তার উপর অপ্রসন্ন। গদাধরকে কথায় কথায় একদিন তার স্ত্রী সুধা জানিয়েছে—

> সংসারের কাজ নিয়ে সকাল থেকে সন্দে পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলতে পারিনে। শাশুড়ি মরে গিয়ে অবধি দেখবার লোক নেই আর কেউ। আপনার বন্ধুটি তো উঁকি মেরে দেখেন না, সংসারের কেউ বাঁচলো না মলো।

এ থেকে স্পষ্ট সে কতটা দায়িত্বহীন অকর্মণ্য মানুষ। পায়রার কেনা-বেচার সে 'প্রধান দালাল'। গদাধরকে কলকাতা থেকে নানা জাতের নানা রঙের পায়রা সে কিনে এনে দেয়। অনঙ্গ এসব পছন্দ করেন না। গদাধরকে 'মঙ্গলগঞ্জের কুঠীবাড়ী' কেনার প্রলোভন সে দেখিয়েছে। কলকাতায় ব্যবসা উঠিয়ে আনার কথা সে-ই বলেছে। সেখানে বায়োস্কোপ দেখে ফেরার পথে শচীন ও অভিনেত্রী শোভারাণীর সঙ্গে সে-ই পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এরপর থেকেই গদাধরের জীবন অন্যধারায় প্রবাহিত হয়েছে। ফিল্ম অভিনেত্রীদের সঙ্গে মেলামেশায় চারিত্রিক শুচিতা নাও থাকতে পার এমন সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও জেনেশুনে সে গদাধরকে এই জগতের মধ্যে প্রবেশে ইন্ধন যুগিয়েছে। অনঙ্গ যখন শহর থেকে গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন, স্বামীর চিন্তায় উদ্বেল তখন নির্মলের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে নির্মলের হৃদয়হীন খল দুষ্ট প্রকৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝে নিতে কষ্ট হয় না, সে নির্দ্বিধায় শোভারাণীর সঙ্গে গদাধরের মেলামেশার কথা হেসে রসিয়ে অনঙ্গকে জানায়। একবারও তার মনে হয়নি স্বামীর দুরবস্থার কথা শুনে অনঙ্গের কত খারাপ লাগবে। অথচ সে-ই শোভারাণীর সঙ্গে গদাধরকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। সে অকৃতজ্ঞ। গদাধর ও অনঙ্গের দাম্পত্য জীবনে দুষ্টগ্রহের মতো তার আবির্ভাব তাদের সুখের জীবনকে ছারখার করে দিয়েছে।

শচীন উচ্ছৃঙ্খল, অধঃপতিত ছেলে। বাড়ি থেকে কলকাতায় গিয়ে সে বাউণ্ডুলে জীবন-যাপন করে। বাড়ির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। গদাধরকে স্টুডিও করে ফিল্ম-এর ব্যবসায় নামতে সে প্রলোভিত করেছে—

> পাটের কারাবার তো করেচো—পয়সা পিটছো খুবই। চালু কারবার—পাকা মুহুরি গোমস্তা আছে—সে কাজ তারা অনায়াসে দেখতে পারে—আমি বলি কি ফিল্মের ব্যবসায় যদি নেমে যাও—এ ব্যবসায় সারা পৃথিবী কি-টাকাটা অনায়াসে রোজগার করছে। এ কারবারে লোকসানের কোনো ভয় নাই, শুধু লাভ আর লাভ! তাছাড়া এইসব মেয়ে—তোমাকে একেবারে...।

জ্ঞাতিভাই, তবু সে তাঁর ভালো চায়নি। ফিল্মের জগতের মেয়েদের সঙ্গে মিশলে চরিত্র নষ্ট হতে পারে—এসব জেনে-বুঝেই সে গদাধরকে বিপথে চালিত করেছে। তার কথাতেই ফিল্মের ব্যবসায় নেমে গদাধরের লোকসান হয়েছে; অথচ সে-ই শোভারাণীর কাছে তাঁর দুরাবস্থার কথা আনন্দের সঙ্গে রসিয়ে বলেছে—

> সেই বাড়িতেই আছে। তবে শুনছি বাড়ি বন্ধক। বাড়ি থাকবে না, যতদূর মনে হচ্চে।—বড্ড চাল বাড়িয়েছিল, এবার একেবারে ধনে-প্রাণে গেল। মানে, তুই ছিলি বাবু পাটের আড়তদার, করতে গেলি ফিল্মের ব্যবসা, যাকে যা না সাজে...।

শচীনের এই কথাতেই তার হৃদয়হীন-নীচ-অবিবেকী মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'দম্পতি' উপন্যাসে মূলত পুরুষ চরিত্রের অবৈধ প্রেম ও নিষিদ্ধ নারীসঙ্গ লাভের বৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে। পুরুষ জানেও না উপযুক্ত পরিবেশ পেলে সে তার দীর্ঘদিনের লালিত সংস্কার ভুলে লাস্যময়ী নারীর প্রেমে কখন কীভাবে ধরা দিয়ে দেবে। পুরুষের অন্তর্লোকের এই চাওয়া-পাওয়ারই কাহিনি 'দম্পতি'।

৩.

'দম্পতি' উপন্যাসে দুই শ্রেণির নারী লক্ষণীয়। একটি ভক্তিমতী কর্তব্যপরায়ণা নারী। অপরটি লাস্যময়ী ছলনাময়ী দেহবিলাসিনী নারী। প্রথম শ্রেণিতে অনঙ্গ এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে শোভারাণী, রেখা-সহ অন্যান্য নারীরা। এই দুই শ্রেণির নারীই পুরুষের স্বপ্নে ও মননে কীভাবে বিরাজমান, কীভাবে উভয়ই তার জীবনে কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছে তা উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে।

অনঙ্গ এই উপন্যাসের আদর্শ সতী-সাধ্বী বাঙালি সর্বংসহা পল্লিবধূ। উপন্যাসে তাঁকে 'ভক্তিমতী স্বামীগতপ্রাণা গৃহকর্মে নিপুণা, পূজা-আর্চা, দান-ধ্যান ও গরিব-দুঃখী সকলের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্না' নারী হিসাবে দেখা যায়। বিধাতা তাঁর জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে দিয়েও তা কেড়ে নিয়েছেন। উপন্যাসের শেষপর্যন্ত স্বামীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও ভক্তি অবিচল। স্বামী যে ফি-বছর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ভোগেন তা তিনি জানেন—তাই দু'পেয়ালার বেশি চা চাইলেও দেন না। সংসারের সমস্ত কাজ তিনি হাসিমুখে করেন। স্বামী যখন ঢবঢবির কাছারিবাড়ি যেতে চেয়েছেন তখন তিনি উতলা হয়েছেন।

সংসারের সবকিছু ফেলে তাঁর পক্ষে কোথায় যাওয়া সম্ভব নয়, তবু এসব ভুলে তিনি স্বামী গদাধরের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। স্বামীর সমস্ত খাবার যত্ন করে তিনি সেই যাত্রায় গুছিয়ে দিয়েছেন। অনঙ্গ কর্তব্যপরায়ণা নারী। সংসারে অশান্তি হবে জেনেও তিনি নিজের দাদাকে অতিরিক্ত পয়সা দিয়েছেন। বাসন্তীপূজায় গ্রামের কাঙালী-ভোজন করানোর ইচ্ছা প্রকাশ, মুনাফা হলে গ্রাম থেকে শহরে চলে আসার সময় বিধবাদের ভোজন করানো কিংবা সদ্য বিবাহিতা কুলনারী অনঙ্গ

যেদিন দুটি ভিক্ষুক আসে তাদের বাড়িতে, তখন তাঁর শাশুড়ি কিছু নেই বলে তাদের তাড়িয়ে দিতে চাইলে অনঙ্গের হৃদয়ে বাজে—

> আমার ভাত এখনও রয়েচে। মাথাটা বড্ড ধরেচে, আমি আর এবেলা খাবো না ভাবচি, ওই ভাত ওদেরকেই দিয়ে দিন না?

শাশুড়ি 'ওবেলা' খেয়ে নিতে বললে অনঙ্গ বিনীতভাবে জানান— 'তা হোক মা, আপনার পায়ে পড়ি, ওদের দিয়ে দিই। আমার খিদে নেই—সত্যি'। এসব অনঙ্গের সহৃদয় মানবিকতার পরিচয় বহন করে।

অনঙ্গ স্বামীকে অসৎ নির্মলের সঙ্গে মিশতে দিতে চাননি। তিনি জানেন, ভবঘুরে অভাবগ্রস্ত, বিপথগামী, সংসারের প্রতি উদাসীন, অকর্মণ্য নির্মলের সংসর্গ স্বামীর জীবনে কোনো ভালো বার্তা বহন করে আনবে না। তবু স্বামীর সর্বকাজে তিনি বাধা দান করেননি। স্বামীকে বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারেননি। অবশেষে অসহায় এই নারী কোনো উপায় না দেখে গ্রামে ফিরে গিয়েছেন একরাশ লজ্জা মাথায় করে। যে স্বামীর কারণে তাঁর এই অবমাননা—তাঁকে কিন্তু তিনি কখনো ভোলেননি। নির্মলের কাছ থেকে যখন জানতে পেরেছেন ঋণগ্রস্ত স্বামীর হাজতবাসের অবস্থা, তখন শেষ সম্বল গহনা-স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বেচে সেই দেনা মেটানোর কথা বলেছেন, কিংবা যেটুকু সামান্য টাকা হাতে অবশিষ্ট ছিল তা ভড়মশায়ের হাতে দিয়ে স্বামীর নিকট পাঠিয়েছিলেন। তবে অনঙ্গের এই পতিভক্তির পাশাপাশি তাঁর মাতৃচরিত্রের দিকটি উপন্যাসে অনুপস্থিত। অনঙ্গ বুদ্ধিমতী নারী। তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় হলুদ গুঁড়োর ব্যবসায় নামা কিংবা গহনা বিক্রি করে পাটের ব্যবসা চালানোর মধ্য দিয়ে।

> বৌ ঠাকরণের বুদ্ধিমত্তার উপর ভড়মশায়ের শ্রদ্ধা জন্মাইল। টাকা বসিয়া থাকে না, অনঙ্গ নানা বুদ্ধি করিয়া এটা-ওটার ব্যবসায়ে খাটাইয়া যতই সামান্য হউক, তবুও কিছু কিছু আয় করে।

উপন্যাসের শেষাংশে অনঙ্গের জীবনযুদ্ধে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে রুগ্ন শরীরে দুটি সন্তানকে নিয়ে স্বামীর প্রত্যাশায় অপেক্ষমান অবস্থার যে চিত্র ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন তা বড়োই করুণ। অথচ যখন কিনা তাঁর স্বামী আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে পেয়েও তাঁদের ভুলে দিব্যি নারীসুখ-সাগরে বিরাজমান, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে অনঙ্গের জীবন বেদনায় ভরে গেল। ব্যঙ্গ টিট্‌কিরি হতাশার মধ্যে গ্রামের নিভৃতে দুটি সন্তানকে নিয়ে অনঙ্গের অসহায়তার উপাখ্যান এক ট্রাজিক নারীর বৃত্তান্ত হয়ে উঠেছে। নারী জীবনের সব কিছুর বিনিময়ে ভালোবাসার মানুষটিকে কাছে পাওয়ার যে আকুল আর্তি তা অনঙ্গ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়েছে। অনঙ্গের এই প্রচেষ্টা—তীব্র প্রতীক্ষা পাঠকের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়।

শোভারাণী বিখ্যাত অভিনেত্রী। তাঁর চরিত্রে অন্যান্য অভিনেত্রীদের মতো রুচিশীলতার অভাব লক্ষ করা যায় না। তিনি যথেষ্ট রুচিশীল নারী। ঔচিত্য ও বিবেকবোধ তাঁর আছে, যে কারণে অপরিচিত গদাধরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই ইচ্ছা না থাকলেও তাঁর অনুরোধে গান গেয়েছেন, গদাধরকে টাকা দিয়েছেন এবং যথেষ্ট সময়ও দিয়েছিলেন। আবার গদাধর নির্মলের টাকা শোধ করতে এলে তিনি তা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছেন—'আপনার বন্ধু নিয়ে গেল টাকা আমার কাছ থেকে ঠকিয়ে—আপনি কেন দণ্ড দেবেন? গেল, যাক্‌গে, আমারই গেল।' শোভা গ্রাম্য গদাধরকে বারণ করেছিলেন সিনেমার ব্যবসায় নামতে। কারণ ফিল্মজগতের নিয়মকানুন না জানলে যে লোকসান অনিবার্য তা তিনি জানতেন। তবে যে শোভা প্রাপ্য চারহাজার টাকার জন্য পুলিশে নালিশ করেছিলেন সেই-ই আবার কীভাবে তাঁকে ভালোবেসে ফেললেন তা উপন্যাসে যুক্তিযুক্তভাবে বিশ্লেষিত হয়নি। যদিও গদাধরের চরিত্রে যে আলাদা জেদি শৌখিন এক সত্তা আছে তা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি, যে কারণে তিনি বলেছেন—'আপনি যে রকম মানুষ, তাতে পাটের আড়তদার হওয়া উচিত ছিল না, উচিত ছিল কবি হওয়া।' তাছাড়া তাঁর চরিত্রের মধ্যে গদাধরের মতো পুরুষের প্রতি যে একটা আকর্ষণ ছিল তা বোঝা যায় তাঁর এই ভাবনার মধ্য দিয়ে—

> লোকটির (গদাধরের) মধ্যে তেজ আছে, সাহস আছে—বেশিরভাগ পুরুষই তাহার কাছে আসিয়া কেমন যেন হইয়া যায়; মেরুদণ্ডহীন মোমের পুতুলদের দুদণ্ড চালানো যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আনন্দ নাই, জয়ের গর্ব সেখানে বড়ই ক্ষণস্থায়ী। শাণিত ছোরার আগার সাহায্যে কচুগাছের ডগা কাটা। ছোরার অপমান হয় না তাতে।

এ প্রসঙ্গে সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন—

> গদাধরের ফিল্ম করার সংকল্পের মধ্যে শোভারাণী যে কী পৌরুষের সন্ধান পেলে এবং তাই তাকে জয়ের যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করলে তা পাঠকের দুর্বোধ্য লাগে।

গদাধরের সংসার আছে জেনেও কিন্তু শোভারাণী তাঁকে ফিরিয়ে দেননি। এ ব্যাপারে শোভারাণী যথেষ্ট উদাসীন এবং স্বার্থপর। তবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষ গদাধরের লোকসানের পরও তাঁকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে তাঁর সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। গদাধরের স্বপ্নকে তিনি সার্থক করে তুলেছেন।

৪.

'দম্পতি' উপন্যাসে গদাধর ও অনঙ্গের দাম্পত্য জীবন কীভাবে নির্মল ও শচীনের সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে গেল তা বর্ণিত হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের করুণ

কাহিনিই-এর উপজীব্য বিষয়—তাই এই নামকরণ জীবনের করুণ কাহিনিই-এর উপজীব্য বিষয়—তাই এই নামকরণ সুপ্রযুক্ত। দশটি অধ্যায়ে বা পরিচ্ছেদে উপন্যাসটি বর্ণিত হয়েছে। গ্রাম ও শহরের জীবন-সংস্কার পরিবেশ প্লট হিসেবে উঠে এসেছে। কাহিনিতে চিঠিপত্রের ব্যবহার, গ্রাম্য পরিবেশ বর্ণনা, নটীসহ বাগান বাড়িতে জলসার বর্ণনা, আড়তের বর্ণনা, ফ্লিম স্টুডিও'র বর্ণনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্লটের নির্মাণ করা হয়েছে। তবে গৈবি নামে একটি নেপালি ছেলে যে গদাধরের বাড়িতে তাঁর বাবার আমল থেকে থাকে উপন্যাসের প্রথমে, তাকে এবং পিসিমা নামে একটি চরিত্রকে অবতারণা করা হয়েছে—অথচ এই দুইজনকে আর দেখা যায় না। বিভূতিভূষণ গদাধরের সন্তান হিসেবে কখনো বলেছেন—'দুটি ছেলে' কখনো বা 'দুটি ছেলে-মেয়ে' আবার ঔপন্যাসের শেষ অংশে ঔপন্যাসিক জানাচ্ছেন 'ন্যাশনাল ফিল্ম স্টুডিও' ছেড়ে শোভারাণী গদাধরের ভারতী ফিল্ম স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন। অথচ উপন্যাসের শেষ অংশে অর্থাৎ দশম পরিচ্ছেদে যে স্টুডিওয় শোভারাণী ও গদাধরকে ঢুকতে দেখা যায় সেটি 'ন্যাশনাল ফিল্ম স্টুডিও'। এখানে প্রশ্ন এই যে, কাহিনি অনুযায়ী সম্পর্ক ছিন্ন করার পরও সেখানে অভিনয় করা তাঁদের পক্ষে কী করে সম্ভব?—অনঙ্গ ঢবঢবির কাছারি বাড়ি সম্পর্কে বলেছেন—'আমপাড়া ঢবঢবি শুনেচি অতি অজ-পাড়াগাঁ। খাবে দাবে কি? থাকবে কোথায়?' একথা শুনে মনে হয় অনঙ্গ ঢবঢবির কাছারি বাড়ি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না। অথচ বিবাহের পর দু'বছর আগেই গদাধর একবার এসেছিলেন। তাই তাঁর না জানার কথা নয়—কাহিনি নির্মাণে তথা প্লট নির্মাণে এইসব দুই একটি ত্রুটি সচেতন পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায় না।

সবশেষে বলা যায়— চল্লিশোর্ধ্ব পুরুষের কামনা বাসনা নিয়ে বিভূতিভূষণ ভাবনা চিন্তা করেছেন। পুরুষের 'ঘর ও বাহির' জীবনের অভিপ্সার অন্তর্লোকে উঁকি দিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন, তাদের মনের আঁতের কথা। ঘরের গৃহকর্মে নিপুণা সতীসাধ্বী স্ত্রীর ভালোবাসায় প্রেমে যে সুখ সেই সুখে যেমন তৃপ্তি আছে তেমনি বাহির জগতের যে লাস্যময়ী নারী যৌনতার চরম আস্বাদন দিতে পারে সেই কামনার অপ্সরাকেও প্রয়োজন। মনোবিশ্লেষণের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে বিভূতিভূষণ পুরুষের এই দুই জগৎকেই শেষ দিকের উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছেন। 'অথৈজল'-এর নায়ক নীতিবাদী, শিক্ষিত সৎ ডাক্তার শশাঙ্ক গৃহে স্ত্রী সন্তানাদি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করে বারনারী খেমটাউলী কিশোরী পান্নার প্রেমে ধরা দিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন তা-ই বর্ণিত হয়েছে। মুজরোজীবিনী পান্নার অনুরাগে শশাঙ্ক ভাবেন—

> এমন মন আমার তা কখনো আমি জানতে পারিনি। এ মন কোথায় এতদিন ঘুমিয়েছিল আমারই মধ্যে, সুরবালা এ ঘুম ভাঙাতে পারেনি—ভাঙিয়েছে পান্নার সোনার কাঠি।

পরনারীতে এই যে, হঠাৎ আসক্তি তা গদাধরের মধ্যে দেখা যায় বটে, তবে গদাধর অর্থের বিনিময়ে নারীকে পেয়েছেন। শশাঙ্কের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছে পান্না। সে কোনোদিন চায়নি শশাঙ্ক উপার্জন করে তাকে খাওয়াক-পরাক। শশাঙ্কের ভারবহনে তার কোনো দুঃখ নেই, বরং সুখই আছে। শশাঙ্ক পান্নার মধ্যে দেহাতীত প্রেমের সন্ধান করেছে। 'বিপিনের সংসার'-এ নায়ক বিপিনের গৃহে স্ত্রী মনোরমা থাকলেও তাঁর জীবনে অবৈধ প্রেমের হাতছানি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে 'মানী' ও 'শান্তি' নামে দুই নারী। তবে নিষিদ্ধ প্রেমে যে দুর্বার হৃদয়াবেগ, সংস্কার, পিছুটান, উত্তেজনা, শিহরণ থাকে তা বিভূতিভূষণের এইসব কাহিনিতে অনুপস্থিত। তিনি কল্লোল, কালিকলম-এর প্রগতিবাদী আধুনিক সাহিত্যের অবৈধ প্রেমের যে অনুষঙ্গ তাকে হয়তো বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তবে অবৈধ প্রেমের পেছনে প্রেমের যে মৌলিক স্বভাব তা তাঁর (বিভূতিভূষণেরই) দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী গঠিত।

বৈধতা-অবৈধতা সবই বিভূতিভূষণের কাছে প্রেমের মঙ্গলময় রূপ হিসাবে অবশেষে ধরা দিয়েছে। কোনো কোনো সমালোচক লেডি কীন কলেজের অধ্যাপিকা সুপ্রভা দত্তের সঙ্গে তাঁর না হয়ে ওঠা অকথিত প্রেমের সুপ্ত কথা এইসব উপন্যাসের নায়কের নানা ভাবনা-চিন্তার মধ্যে অনুসন্ধান করে থাকেন। 'দুইবাড়ী' উপন্যাসে অপূর্ণপ্রেমের যে কাহিনি তাতে নায়ক নিধিরাম ও জজসাহেব লালবিহারী চাটুজ্যের মেয়ে মঞ্জুর মধ্যে যে প্রেম এবং অপ্রাপ্তির বেদনা তাতে হয়তো সুপ্রভা দত্তের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের (যা ধরা আছে নানান চিঠিপত্রে) একটি স্পষ্ট ছাপ আছে। যাইহোক সমালোচক সুনীল চট্টোপাধ্যায় 'দম্পতি'কে 'ফরমায়েশি' লেখা বলে চিহ্নিত করলেও বিভূতিভূষণের অন্যান্য কালজয়ী সৃষ্টির পাশে এটি একটি বিশেষ অবস্থায় পুরুষ চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের কাহিনির উদাহরণ হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে যে বিরাজ করবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সহায়ক গ্রন্থ

১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বিভূতি রচনাবলী' (একাদশ খণ্ড), চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৯২, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।
২. সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় : 'বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য', ২য় সংস্করণ, জুন ১৯৮১, জিজ্ঞাসা, কলকাতা।
৩. রুশতী সেন : 'বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস', ২য় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৮, প্যাপিরাস, কলকাতা।
৪. গোপিকানাথ রায়চৌধুরি : 'বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প', চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪, দে'জ কলকাতা।

গল্প নিয়ে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প-গ্রন্থ : 'মেঘমল্লার'

বিজিত ঘোষ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প-সংকলন 'মেঘমল্লার'। মোট ১০টি গল্প আছে এই সংকলনে। 'অভিশপ্ত' গল্পটির অতিপ্রাকৃত পরিবেশ গল্পকারের কথকতার গুণে বিশ্বস্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অতিপ্রাকৃত রস নয়, ঐতিহাসিক কাহিনিই এ গল্পের মূল ভিত্তি। লম্পট, অত্যাচারী এক দুর্ধর্ষ জমিদার ছিলেন কীর্তি রায়। তাছাড়া তিনি নিজে ছিলেন জলদস্যু। আশপাশের জমিদারি এমনকি নিজের জমিদারির মধ্যেও সম্পত্তিশালী গৃহস্থের ধনরত্ন, স্ত্রী-কন্যা লুঠপাট করা রূপ মহৎ কার্যে তিনি সর্বদাই ব্যস্ত থাকতেন। কীর্তি রায়ের পাশের জমিদারী ছিল তাঁর এক বন্ধুর। বন্ধু মারা গেলে তাঁর তরুণ বয়স্ক পুত্র নরনারায়ণ রায় পিতার জমিদারীর ভার পান। কীর্তি রায়ের পুত্র চঞ্চল রায়ের সমবয়সি বন্ধুও ছিল নরনারায়ণ।

একবার কীর্তি রায়ের নিমন্ত্রণে কয়েকদিনের জন্য তাঁর বাড়িতে বেড়াতে আসেন নরনারায়ণ। বন্ধু, বিশেষ করে সরলা বন্ধু-পত্নীর সবিশেষ যত্নে কিছুদিন কাটে তার। ইতিমধ্যে কী এক বিশেষ কাজে পুত্রকে কীর্তি রায় অন্যত্র পাঠান। নরনারায়ণও বন্ধু না থাকায় দু-একদিন পরেই ফিরে আসার জন্য বজরায় ওঠেন। 'নরনারায়ণ রায়ের বজরা রায়মঙ্গলের মোহানা ছাড়িয়ে যাবার একটু পরেই জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলো।' শেষপর্যন্ত বন্দি নরনারায়ণকে গোপনে মুক্তি দেন তাঁর বন্ধুপত্নী লক্ষ্মীদেবী। কেননা, এ কীর্তি স্বয়ং তাঁর শ্বশুরের। কিন্তু শ্বশুর সব জানতে পেরে পুত্রবধূকে 'গুপ্ত সুরঙ্গের দু-ধারের মুখ বন্ধ করে কীর্তি রায় তাঁর...শ্বাসরোধ করে তাঁকে হত্যা' করেন।

এরপর নরনারায়ণ প্রস্তুত হয়েই এসে কীর্তি রায়কে আক্রমণ করেন। কিন্তু নরনারায়ণের হাতে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই 'কীর্তি রায় তাঁর পরিবার বর্গ এবং ধনরত্ন নিয়ে মাটির নীচে, এক গুপ্তস্থানে আশ্রয়' নেন। সে আমলে সকল জমিদার গৃহেই এমন গুপ্তগৃহ থাকত। কিন্তু এর ব্যবস্থা এমন ছিল যে বাইরে থেকে কেউ সে দ্বার খুলে না দিলে নিজে থেকে বেরুনোর উপায় ছিল না। কীর্তি রায়ের লোকজন

সকলের মৃত্যু হওয়ায় কীর্তি রায় ও তাঁর পরিবারবর্গ নিভৃত ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে অনাহারে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। সেই থেকে জনশ্রুতি, কীর্তি রায়ের প্রাসাদের পাশ দিয়ে বহমান নদীতে নৌকা যাওয়ার সময় নৌকাযাত্রী, মাঝিরা অনেকেই শুনেছে অসহায় মানুষের উদ্ধারের জন্য সকরুণ প্রার্থনা ধ্বনি।

লেখকের কথকতার ভঙ্গিটি চমৎকার, সুন্দর। বলার আন্তরিকতায়, উপস্থাপন-রীতির বিশ্বস্ততায় এ গল্পের শৈলী আমাদের মনে দাগ কাটে। আমরাও যেন নিশুতি রাতে শুনতে পাই সেই আর্তস্বরের চিৎকার—'ওগো পথযাত্রীরা, ওগো নৌকাযাত্রীরা...আমরা যে এখানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেলাম...দয়া করে আমাদের তোলো—ওগো আমাদের তোলো...।'

'নাস্তিক' গল্পে লোকনাথের ভাবনাসূত্রে গভীর দর্শনের কথা আমাদের শুনিয়েছেন বিভূতিভূষণ। 'উমারানী' বাৎসল্য রসের একটি চমৎকার গল্প। তবে কাহিনি-বিন্যাস একটু শিথিল। কিছুটা এলায়িত। অকারণ বিস্তৃত। সতীশ-উমারানীর মধুর-করুণ কাহিনি অপু- দুর্গার স্রষ্টাকে মনে পড়ায়। উমারানীর মৃত্যুর পর গল্প কথক সতীশের ভাবনায়, উমারানী আর প্রকৃতির মেলামেশায় করুণ, বেদনাবিধুর বর্ণনাটি অত্যন্তই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে পড়ে, পরবর্তীকালে লেখা অনন্যসাধারণ 'পুঁইমাচা' গল্পটির কথা।

'বউ-চণ্ডীর মাঠ' একটি অতিপ্রাকৃত রসের গল্প। তবে কাহিনি, পরিবেশ বা আবহ গল্পটিতে ঠিক জমেনি। দানা বাঁধেনি। 'নব-বৃন্দাবন' গল্পে স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুতে সংসার বিবাগী হয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে কর্ণপুর। এক বাড়িতে মহামারিতে একজন শিশু ভিন্ন সকলের মৃত্যু হয়। অগত্যা সেই শিশুকে তুলে এনে সংসারত্যাগী কর্ণপুর সংসারী হন। বালকের নাম দেন নীলমণি। নীলমণির পালকপিতা কর্ণপুরের কৃষ্ণ-দর্শনের অলৌকিকতায় গল্পটির সমাপ্তি ঘটে।

'খুকীর কাণ্ড' দীর্ঘ শিথিল বিন্যাসের এক অতি সাধারণ মানের গল্প। 'উপেক্ষিতা' স্নেহরসের নিছক আবেগপ্রবণ একটি গল্প। 'ঠেলাগাড়ি' বাৎসল্য রসের এক করুণ কাহিনি। এখানে নরুর অকালমৃত্যুর ছবিটি মর্মান্তিক। 'পথের পাঁচালী'র দুর্গার মৃত্যুরই কি পূর্বাভাস, এই প্রথম গল্প-সংকলনের একাধিক গল্পে বালিকা ও নারীদের মৃত্যু? 'উমারানী'-তে উমার মৃত্যু, 'ঠেলাগাড়ি'-তে নরুর মৃত্যু, 'পুঁইমাচা'-য় ক্ষেন্তির মৃত্যু, 'বউ-চণ্ডীর মাঠ'-এ পতিত পবন চৌধুরীর তৃতীয় পক্ষের বউটির মৃত্যু, 'অভিশপ্ত' গল্পে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু, 'উপেক্ষিতা'য় বিমলের দুই বোনের মৃত্যু—এ যেন মৃত্যুর মিছিল।

'পুঁইমাচা' এক অনন্য সাধারণ নির্মাণ। মানব জীবনের চিরন্তন অনুভূতির এই একান্ত করুণ রসাশ্রিত অনবদ্য কাহিনিটি বাংলা ছোটোগল্প ধারার এক বিশিষ্ট সম্পদ। হৃদয়ানুভবের এমন গম্ভীর করুণ রসের প্রথম শ্রেণির গল্প বাংলা সাহিত্যে খুব কমই লেখা হয়েছে। বিশ্বসাহিত্যের দরবারেও এ গল্পের স্থান একেবারে প্রথম সারিতে।

বাঙালির কালজয়ী মহাকাব্য 'পথের পাঁচালী'রই ক্ষুদ্র সফল সংস্করণ বলা যেতে পারে 'পুঁইমাচা' গল্পটিকে। লেখকের গভীর আন্তরিকতার ছোঁয়ায়, স্নেহ-মায়া-মমতায় গড়া 'পুঁইমাচা'র চরিত্রগুলি আমাদের বিশেষ পরিচিত। খুবই চেনা-জানা। এরা সকলেই আমাদের নিতান্ত কাছের মানুষ। একান্ত আপনার জনও।

নামের মধ্যেই কী করুণ নাট্যশ্লেষ লুকিয়ে। প্রিয়তম সন্তানদের দু-বেলা দু-মুঠো অন্ন জোগাতে পারেন না যিনি, তাঁরই নাম অন্নপূর্ণা। আর প্রাণপ্রিয় সন্ততিদেরও সহায় হওয়ার সামর্থ্য নেই যাঁর, তিনি সহায়হরি।

ছোটো ছোটো ইচ্ছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শপথ, একটু আধটু লোভ আর অতি সাধারণ কিছু বাসনা নিয়ে নিরীহ, শান্ত, সরল এই চরিত্রগুলি সহজেই আমাদের হৃদয়ের গভীরে স্থান পেয়ে যায়।

ভয়ংকর দারিদ্র্যের চিত্রও যে কী করুণ মধুর ও ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠতে পারে, তা বিভূতিভূষণের লেখা না পড়লে সারাজীবনেও এভাবে বোঝা যেত না। চূড়ান্ত অভাব-অনটনের চিত্র চোখের জলের ধারার মাঝেও যে অনন্ত আনন্দানুভূতি জাগ্রত করতে পারে, তা মরমি বিভূতিভূষণের কলম বারে বারে দেখিয়েছে।

বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় 'মেঘমল্লার' একেবারেই ভিন্ন গোত্রের এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। এমন অনবদ্য শিল্পসফল অ-লৌকিক রসের বিশ্বস্ত কাহিনি এর আগে-পরে লেখা হয়নি। কেবল বিভূতিভূষণের বিশিষ্ট মানসিকতাতেই এমন গল্পসৃষ্টি সম্ভব।

সেকালের বিশিষ্ট গায়ক ইন্দ্রদ্যুম্নের ছেলে প্রদ্যুম্ন। তরুণ প্রদ্যুম্নও শিল্প রসিক। অসাধারণ বাঁশি বাজায় সে। বিশেষ করে বাঁশিতে মেঘমল্লারের আলাপে সে সিদ্ধপুরুষ। কিন্তু তার বহুদিনের ইচ্ছে বীণা শেখবার। তাই সে দশ পারমিতার মন্দিরে আসে। সেখানে অবন্তী থেকে একজন বড়ো বীণা বাজিয়ে আসবেন শুনেই প্রদ্যুম্নের আসা। অনেক সন্ধানের পর সেই বিশিষ্ট গায়ক ও বীণাবাদকের দেখা পায় প্রদ্যুম্ন। তার নাম সুরদাস।

সুরদাসের আহ্বানে নদীর ধারের এক ভাঙা মন্দিরে প্রদ্যুম্ন তার সঙ্গে দেখা করে। প্রদ্যুম্নকে সুরদাস শোনায় এক অদ্ভুত কাহিনি।

> নদীর ঐ বড় বাঁকে যে ঢিবিটা আছে...ওই ঢিবিটায় বহু প্রাচীনকালে সরস্বতী দেবীর মন্দির ছিল;...ঐ ঢিবিতে বসে আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে মেঘ-মল্লার নিখুঁতভাবে আলাপ করলে সরস্বতীদেবী স্বয়ং গায়কের কাছে আবির্ভূতা হন।...তাঁর বরে সঙ্গীত সংক্রান্ত কোনো বিষয় তখন গায়কের কাছে অজ্ঞাত থাকে না। তবে একটা কথা আছে, যে গায়ক বর প্রার্থনা করবে সে অবিবাহিত হওয়া চাই...।

প্রদ্যুম্ন অবিবাহিত সত্য। কিন্তু তবু তার বাগদত্তা প্রাণপ্রিয়, মিষ্টি সুনন্দার কথা বারবার মনে হয় প্রদ্যুম্নের। তবু কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সে সম্মতি জানায়। আষাঢ়ী

পূর্ণিমার রাতে প্রদ্যুম্ন সুরদাসের সঙ্গে নদীর ধারের সেই মাঠটিতে আসে। প্রদ্যুম্নের বাঁশিতে মেঘমল্লারের আলাপে মুগ্ধ হয়ে সত্যই দেবী সরস্বতী তাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হন। সে এক অপূর্ব, অভূতপূর্ব অনুভূতি।

সব শুনে বৌদ্ধ দর্শনের অধ্যাপক আচার্য পুনর্বর্দ্ধন প্রদ্যুম্নকে শোনালেন এক ভয়ঙ্কর সত্য কাহিনি।

> তুমি যাকে সুরদাস বলছ, তার নাম সুরদাস নয়,...সে হচ্ছে প্রসিদ্ধ কাপালিক গুণাঢ্য...এই গুণাঢ্য একবার অবন্তীর প্রসিদ্ধ গায়ক সুরদাসের সঙ্গে ওই টিবিতে উপস্থিত ছিল। সুরদাস মেঘমল্লারে সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর গানে নাকি সরস্বতী দেবী তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে তাকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। সুরদাস প্রার্থনা করেন, তিনি যেন দেশের সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হন। সরস্বতী দেবী তাঁকে সেই বরই দেন।...কিন্তু গুণাঢ্য দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকেই প্রার্থনা করে বসে।...সরস্বতী দেবী অন্তর্হিত হওয়ার পর মূর্খ গুণাঢ্যের মোহ আরও বেড়ে যায়।...সে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবলে দেবীকে বন্দিনী করবার জন্যে উপযুক্ত তান্ত্রিক গুরু খুঁজতে থাকে।
>
> সে গুরু পেয়ে যায় গুণাঢ্য। তারপর প্রদ্যুম্নের সহায়তায় সরস্বতীকে বন্দি করে দুষ্ট গুণাঢ্য।

অনিচ্ছাকৃত এই অন্যায় কর্মের জন্য অপরাধবোধে ভুগতে থাকে প্রদ্যুম্ন। সন্ধানে বার হয় গুণাঢ্যের। বহুদিন ধরে বহু স্থানে খুঁজেও কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। অবশেষে দীর্ঘ এক বছর পর উরুবিল্ব গ্রামে প্রদ্যুম্ন হঠাৎ দেখা পেয়ে যায় গুণাঢ্যের। সত্যই সে তার কুটিরে বন্দি করে রেখেছে স্বয়ং সরস্বতীকে। প্রদ্যুম্নের সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভণ্ড সাধক তাকে জানায়, সে আজীবক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে মন্ত্রপুত জল এনেছে। দেবীর গায়ে তা ছিটিয়ে দিলেই তার বন্ধনদশার মুক্তি ঘটবে। কিন্তু যে এই জল ছেটাবে সে চিরকালের জন্য পাষাণ হয়ে যাবে। এই ভয়ঙ্কর প্রস্তাবেও, নিজের জীবনের বিনিময়েই দেবীকে মুক্ত করতে স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে সম্মত হয় প্রদ্যুম্ন। প্রদ্যুম্নের আত্মত্যাগে দেবীর বন্ধন দশা ঘোচে। পাষাণ হয়ে যায় প্রদ্যুম্ন। অন্যদিকে, অবিবাহিতা সুনন্দা প্রতীক্ষার প্রহর গোনে প্রদ্যুম্নের।

> পাষাণ হওয়ার আগে গুণাঢ্যকে নিয়ে এক অদ্ভুত ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছিল প্রদ্যুম্ন। ভোর রাত্রে শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে স্বপ্ন দেখলে—ভদ্রাবতীর গভীর কালো জলের তলায় রাতের অন্ধকারে কে এক দেবী পথ হারিয়ে ফেলেছেন;...নদীর মাছগুলো তাঁর কোমল পা দুখানি ঠুকরে ঠুকরে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে...ব্যথিতদেহা, বিপন্না, বেপথুমতী দেবীর দুঃখ দেখে একটা বড়ো মাছ দাঁত বার করে হিংস্র হাসি হাসছে, মাছটার মুখ গায়ক সুরদাসের মতো!

এই স্বপ্নদর্শনের মনস্তাত্ত্বিক যৌক্তিকতার অনিবার্যতা আমাদের চমকে দেয়। এই

জাতীয় স্বপ্নদর্শন কি বঙ্কিমের উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছেন বিভূতিভূষণ? 'বিষবৃক্ষ'-এ কুন্দনন্দিনী স্বপ্নে হীরা ও নগেন্দ্রকে দেখেছিল। 'চন্দ্রশেখর'-এ শৈবলিনী স্বপ্নে ফস্টরকে দেখেছিল সাদা শূকরের মূর্তিতে। যেমন এখানে প্রদ্যুম্ন গুণাঢ্যকে দেখেছে হিংস্র দাঁতাল মাছের মূর্তিতে।

এ গল্পে প্রদ্যুম্নের প্রেমিকা প্রতীক্ষারতা সুনন্দার ট্র্যাজেডি আমাদের বুকে পাষাণের ভারের মতো চেপে বসে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মৃত্যুতেই ট্র্যাজেডি নহে।' এর থেকে বড়ো সত্য আর কি হতে পারে? যে মরেই গেল, তার আর ট্র্যাজেডি কীসের? কিন্তু বেঁচে থেকে, অনুক্ষণ হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের স্মৃতিটুকু সম্বল করে যার দিন কাটে, তার বেদনার তীব্রতা সীমাহীন।

হিরণ্যনগরের ধনবান শ্রেষ্ঠী শ্রীমন্তদাসের মেয়ে সুনন্দা, প্রদ্যুম্ন ফিরে না আসায় অন্যত্র বিয়ে করেনি। অত্যন্ত তরুণ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছে সে। গল্পের শেষে সুনন্দার জীবনব্যাপী গভীরতম বেদনা আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে।

> ...প্রতি সকালে সে কার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইত, সকাল কেটে গেলে ভাবত বিকালে আসবে, বিকাল কেটে গেলে ভাবত সন্ধ্যায় আসবে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এরকম কত সকাল-সন্ধ্যা কেটে গেল—কেউ এল না...তবু মেয়েটি ভাবত আসবে...আসবে...।

এক এক রাত্রে সে বড়ো অদ্ভুত স্বপ্ন দেখত। কোথাকার যেন কোনো এক পাহাড়ের ঘন বেতের জঙ্গল আর বাঁশের বনের মধ্যে লুকানো এক অর্ধভগ্ন পাষাণমূর্তি। নিঝুম রাতে সে পাহাড়ের বেতগাছ হাওয়ায় দুলছে, বাঁশবনে শির্ শির্ শব্দ হচ্ছে, দীর্ঘ দীর্ঘ বেতডাঁটার ছায়ায় পাষাণ মূর্তিটির মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। সে অন্ধকার অর্ধরাত্রে জনহীন পাহাড়টার বাঁশগুলোর মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে কেবলই বাজছে মেঘমল্লার।

অসাধারণ নির্মাণ। অপূর্ব। এ এক অলৌকিক মায়ার জগৎ। আমাদের প্রতিদিনকার চেনা পরিচিত লৌকিক জীবনের গাথা এ নয়। কিন্তু তবু বিভূতিভূষণের অনন্য উপস্থাপনার গুণে চতুর্দিকে কেমন যেন একটা বিশ্বাস্য আবহ তৈরি হয়ে যায়।

আমাদের সমস্ত লোমকূপ শিহরিত হয়ে ওঠে। এই অলৌকিক মায়ার জগতের সঙ্গে লৌকিক আমরাও কেমন একটা নৈকট্য অনুভব করি। একাত্ম হয়ে যাই। আর এখানেই বিভূতিভূষণের চূড়ান্ত সার্থকতা। এ গল্প একমাত্র 'দেবযান' এর স্রষ্টা, যিনি কিনা নিজেই স্বচক্ষে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পান নিজেরই 'শব', কেবলমাত্র তাঁর পক্ষেই লেখা সম্ভব। 'মেঘমল্লার' তাই গভীর মায়ায় মেশানো অলৌকিক জগতের এক অনবদ্য কবিতা।

‘তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প’ : অলৌকিকতা ও পরাবাস্তবতা

দীপায়ন পাল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালপর্বে যখন বাংলা কথাসাহিত্য প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন ক্ষতির খতিয়ানকেই মূল উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেছে—তখন তারই মাঝে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় ব্যতিক্রমীভাবেই ভিন্ন পথের অভিযাত্রী। নৈরাজ্য আর ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণুতায় বিপন্ন সারস্বত ভূমিকে তিনি যথার্থ অর্থেই প্রদান করতে পেরেছিলেন প্রগাঢ় প্রশান্তির দীর্ঘ স্নিগ্ধ ছায়া। তাঁর রচনার মধ্যে এমন এক মধুময় অনুভূতি বিকীর্ণ হয়ে আছে, যে তার অতল গভীরে নিশ্চিন্তে নিমগ্ন হয়ে থাকা যায়।

বিভূতিভূষণ সহজ মানুষের সহজ জীবনের রূপকার। অনাড়ম্বর মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি তাঁর অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছেন, বিকশিত করে তুলেছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহকে। আলোচ্য ‘তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প’ রচনাটি বিভূতিভূষণের ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘জন্ম ও মৃত্যু’ গ্রন্থের অন্তর্গত। অলৌকিকের প্রতি রচয়িতার সহজাত বিশ্বাসের ভূমি থেকেই উৎসারিত হয়েছে এই গল্পের আখ্যান। যে বিভূতিভূষণ রচনা করেছেন ‘দেবযান’-এর মতো উপন্যাস, সৃজন করেছেন ‘কুশল পাহাড়ি’ বা ‘পরশপাথর’-এর মতো গল্প—জীবনের অন্তিম বেলায় রহস্য ঘন পার্বত্য পরিবেশে যিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নিজেরই শবদেহ—সেই অতিপ্রাকৃতে আস্থাশীল বিভূতিভূষণই জন্ম দিয়েছেন ‘কামিনী’ এবং ‘তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প’-এর, যদিও নিরপেক্ষ মানসিকতার বশবর্তী হয়েই নিজের বিশ্বাসকে পাঠকের ওপর আরোপিত করেননি তিনি। শুনিয়েছেন কৌতূহলোদ্দীপক চিত্তাকর্ষক কাহিনি এবং পরিশেষে তার সত্যাসত্য নির্ধারণের ভার ছেড়ে দিয়েছেন পাঠকের ওপরেই। স্পষ্টতই ঘোষণা করেছেন—

> তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ইহার আমি কোনও জবাব দিব না।

বন্ধু কিশোরী সেনের সঙ্গে যখন লেখক বা কাহিনি কথক তারানাথ জ্যোতির্বিনোদের কাছে ভাগ্যবিচার করতে গেলেন—তখন থেকেই লৌকিক-অলৌকিক, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব কাহিনির মধ্যে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। তারানাথকে দেখে রচয়িতার মনে হয়েছে যে, একজন প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয় সম্পন্ন মানুষ নিজের ওপর

কিছুটা আস্থা হারালে তার যে অভিব্যক্তি হয়—তারানাথের মুখের ভাব ও শরীরী ভাষায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারানাথ নিবিষ্ট মনে লেখকের হস্তরেখা পর্যবেক্ষণ করে তার জন্ম ও বিবাহের সাল-তারিখ এবং তার বর্তমান অবস্থার কথা সুনির্দিষ্টভাবে জ্ঞাপন করেছে। লেখকের অতীতের ফাঁড়া এবং বর্তমানে তাঁর স্ত্রীর শারীরিক সংকটের কথাও অনায়াসে বলে দিতে পেরেছে ঐ তান্ত্রিক। তারানাথের এই ক্ষমতা প্রদর্শন করে রচয়িতা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—

> লোকটার কিছু ক্ষমতা আছে দেখিতেছি।

আর সেই অলৌকিক ক্ষমতার আকর্ষণে রচয়িতা শুরু করেন তারানাথের কাছে নিত্য যাতায়াত। উভয়ের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

পরবর্তী পর্যায়ে তারানাথই একদিন অন্য এক তান্ত্রিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান লেখককে সঙ্গে নিয়ে। ভালো সাধু-সন্ন্যাসীর অন্বেষণ করে বেড়ানোতে ছিল ওই মানুষটির বিপুল আগ্রহ। আর তাই রচয়িতাকে সে জানিয়েছে—

> চল বেলেঘাটাতে একজন বড়ো সাধু এসেছেন দেখা করে আসি। খুবভাল তান্ত্রিক শুনেছি।

সাধুটি লেখকের রুমালে বেলফুলের গন্ধ সৃষ্টি করায় লেখকের মনে ওই মানুষটি সম্পর্কে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারানাথ জানায়—লোকটি দু'একটি সামান্য শক্তির অধিকারি; যা তার নিম্নশ্রেণির তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে লব্ধ হয়েছে।

রচয়িতা যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে ওই গন্ধ সৃষ্টির রহস্যকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। রুমালে ফুলের গন্ধের উদ্ভবের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন 'প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক অসম্ভাব্যতা।' তাঁর মতে—

> কন্টাক্ট অ্যাট আ ডিসটেন্স-এর মোটা সমস্যাই ওর মধ্যে জড়ানো।

আর এই প্রসঙ্গেই এসেছে 'ব্ল্যাক ম্যাজিক'-এর অস্তিত্ব বা স্বরূপ সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনার অবকাশ। এই কালো যাদুর শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে বিষপান করেও তা অনায়াসে হজম করে ফেলা সম্ভব হয়। আর এখান থেকেই তারানাথের জীবন-অভিজ্ঞতাকে লেখকের সামনে বিবৃত করার যথোচিত পরিবেশ নির্মিত হয়।

তারানাথ এরপর ক্রমান্বয়ে তিনজন সাধক ও সাধিকার সাধনশক্তির পরিচয় প্রদান করেছেন। উচ্চশ্রেণির তান্ত্রিক হয়ে ওঠার প্রলোভনে কৈশোরকাল থেকে সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করেছে তারানাথ। তার এই বাসনারও সূত্রপাত ঘটেছিল একজন সাধুর সান্নিধ্য লাভ করে। কাহিনি কথকের নিজের দেশ বাঁকুড়ায় অবস্থান করতেন এক শক্তিমান সাধু, কাহিনি কথকের খুড়িমা যাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ

করেছিলেন। রচয়িতা তাঁর কাছে ছিলেন পরম স্নেহের পাত্র এবং তিনি লেখককে শিখিয়েছিলেন কীভাবে অন্তরস্থ-শক্তির স্বরূপ এক অলৌকিক জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ করতে হয়। দেহসাধনার পথই তান্ত্রিকদের মুখ্য অবলম্বন। কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করার প্রয়াস—তাই তাদের কাছে অপরিহার্য।

খুড়িমার গুরু এবং তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ ওই মানুষটি তারানাথকে জানিয়েছে—

> দুই চোখের মাঝখানে ভ্রূ থেকে একটি জ্যোতি আছে, ভাল করে চেয়ে দেখিস, দেখতে পাবি।

মাস দুই তিনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার পর উক্ত জ্যোতি দর্শন সম্ভব হয়েছে তারানাথের পক্ষে, নীল বিদ্যুৎশিখার মতো ওই জ্যোতির উদ্ভব হয়েছে—তারানাথকে আরও বেশি করে তন্ত্র-সাধনা ও তান্ত্রিকদের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছে। আর তাই একদিন ঠাকুমার বাক্স ভেঙে কিছু টাকা নিয়ে অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয় সে। বেনারসে গমন করে একদিন অহল্যা ঘাটে বসেছিল তারানাথ। সেখানেই সে দর্শন পেল আর এক সাধু বাবাজির—

> তার সারা দেহে এমন কিছু একটা ছিল, যা আমাকে আর অন্য দিকে চোখ ফেরাতে দিলে না।

ঘটনা পরম্পরায় জানা গেছে যে, ওই সন্ন্যাসী তারানাথের গ্রামেরই এক অবস্থাপন্ন পরিবারের পূর্বপুরুষ। তন্ত্র-সাধনার শক্তিতে সাধারণ জৈবিক বিধানকে অতিক্রম করে তিনি দেড়শো বছর বেঁচে আছেন। সাধুটি তাঁর সুদূর স্মৃতিকে সম্বল করে যে খেয়া-ঘাটের উল্লেখ করেছেন, শিবমন্দিরের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন—তার অস্তিত্ব বর্তমানে প্রায় বিলীন। রুদ্রপুরের নদী মজে গেছে বহুকাল আগে—তাই স্বভাবতই খেয়াঘাটের কোনো অস্তিত্ব আর সেখানে নেই। আর প্রাচীন জীর্ণ শিবমন্দিরটিকেও বর্তমানে প্রত্যক্ষ করা গেছে জঙ্গলাবৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে। গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমেই তারানাথ যা অবগত হয়েছে, তা থেকেই তার স্থির সিদ্ধান্ত—এই বংশের চার-পাঁচ পুরুষ আগে অবস্থানরত যে রামরূপ সান্যাল নদীর ধারে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তারই অবিবাহিত ও গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী অগ্রজ রামনিধিই হলেন কাশীর সেই সন্ন্যাসী। যৌগিক শক্তির মহিমা তাকে এমন অত্যাশ্চর্যভাবে দীর্ঘজীবী করে রেখেছে।

এই দুই সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য লাভই—তারানাথের অন্তঃস্থ আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করে তোলে। বাড়ি পরিত্যাগ করে আবার সন্ন্যাসীর সন্ধানে পথে পাড়ি দেয় সে। আর এই পর্যায়েই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনীর। আপাত উন্মাদিনী ওই বৃদ্ধা নারীই তারানাথের জীবনকে প্রবলভাবে আবর্তিত করে তোলে। তারানাথের মধ্যে যে জাগতিক সত্তা আছে, তাকে বিনষ্ট করার কথা বলে পাগলি। বস্তুত, জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিলিপ্ত না হলে সাধনার প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ হওয়া যায়

না। তারানাথও সেই প্রাথমিক স্তরে পৌঁছেতেই পারেনি। গুরুর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও পূর্ণ আত্মসমর্পণ ব্যতীত সেই সিদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। কিন্তু তারানাথ পাগলিকে সর্বাঙ্গীনভাবে বিশ্বাস করতে পারে না।

তন্ত্রে কথিত ডাকিনী-শাঁখিনীর অস্তিত্বে সে সন্দিগ্ধ হয়। হাঁকিনী মন্ত্রে সিদ্ধ হওয়ার বিষয়টিও তাকে কৌতূহলী করে তোলে এবং পাগলিকে সে প্রশ্নও করে—

> তুমি তাহলে হাঁকিনী মন্ত্রে সিদ্ধ না?

পাগলি নিরুত্তর থাকায় তারানাথ নিজেই তার চারপাশের পরিবেশের মানদণ্ডে উক্ত নারীর উক্তিগুলিকে justify করার চেষ্টা করেছে।

এর পরবর্তী পর্যায়ে শুরু হয় চোখের সামনে তার প্রহেলিকা দর্শন। পাগলির ষোড়শী বালিকাতে রূপান্তর এবং অব্যবহিত পরেই আবার স্বরূপে প্রত্যাবর্তন, শব সাধনার জন্য মড়া সংগ্রহ করার পর বিস্মিত চিত্তে সেই পূর্ব কথিত ষোড়শী বালিকারই নিস্পন্দ অবয়ব দর্শন—এ সমস্ত কিছুই তারানাথকে বিভ্রান্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে।

শব সাধনায় বসার পরও নানা অদ্ভুত অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়েছে তার। মহাভামরী ভৈরবীর সাধনা করতে গিয়ে যে ষোড়শী বালিকাকে সে আবির্ভূত হতে দেখে, যে আবির্ভূত মূর্তি নিজেকে মহাবিদ্যাদের অন্যতম ষোড়শী বলেই অভিহিত করে—তারানাথের তাকে শ্মশানের পাগলির মায়ারূপ বলেই মনে হয়। কঙ্কালের নৃত্য, শেয়ালের চিৎকার, পিশাচীর আবির্ভাব, ভীত-সন্ত্রস্ত তারানাথের শবাসন পরিত্যাগ করে পলায়ন—এ সমস্ত কিছুই এক বিচিত্র কল্পলোকে পাঠককে টেনে নিয়ে যায়। জুগুপ্সা থেকে সৃষ্টি হয় বীভৎস রস। তারানাথের নিজের বিশ্বাস ও তন্ত্রের বিশ্বাসের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণেই—সাধনার পথ পরিত্যাগ করতে হয় তাকে। তাই আলোচ্য কাহিনিটি তন্ত্র সাধনার গল্প নয়; তন্ত্রসাধনা থেকে স্খলিত এক মানুষের গল্প। কাহিনির অন্তিমে তারানাথ তার অভিজ্ঞতা প্রসূত সিদ্ধান্তের কথা বলে—

> পাগলি সাধারণ মানবী নয়।...লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্য চিরজন্ম শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়াতো—তুমি আমি মানুষে তার কি বুঝবো?

এই বোঝা না বোঝার দোলাচলতাই এই গল্পের সর্বাংশ জুড়ে বিদ্যমান। কাহিনির অন্তিমেও সেই রহস্যের যবনিকাপাত ঘটে না; মোচন হয় না সংশয়ের কুয়াশা।

<u>সহায়ক গ্রন্থ</u>

১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অলৌকিক গল্পসম্ভার, কলকাতা, দীপায়ন ২০১২।

২. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ভূতে বিশ্বাস করতেন (নিবন্ধ), কলকাতা, সুখী গৃহকোণ ভৌতিক সংখ্যা, (অষ্টাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা), ২০১৭।

প্রাত্যহিকতার শিল্পিত রূপ :
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দিনলিপি'

নাজিমুল হক

বহির্জীবন এবং অন্তর্জীবন—এই দুই বৃত্তের সঠিক সমন্বয়ে রচিত হয় সাহিত্যশিল্পীর যথার্থ জীবনী। সৃষ্টিকর্মের পাশাপাশি এই দুই বৃত্তের পর্যাপ্ত উপাদান নিহিত থাকে শিল্পীর লেখা চিঠিপত্রে এবং দিনলিপির পাতায়। আবার এই দুটি ক্ষেত্রের মাত্রাগত প্রভেদ-মূল্য নির্ণয় করতে হলে এগিয়ে রাখতে হবে দিনলিপিকে। কেননা, চিঠিপত্রগুলি কারোর না কারোর উদ্দেশ্যে লেখা হয়, কিন্তু দিনলিপি নিতান্তই লেখকের ব্যক্তিমনের ব্যক্তিগত রচনা। সমকালীন নানা ঘটনার অভিঘাত, বিভিন্ন মানসিক অবস্থা এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিশ্বস্ত দলিল এই দিনলিপি। যাপিত জীবনের বিভিন্ন খণ্ডচিত্রে, নানা কথাসূত্রে সাহিত্যিকের ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পীসত্তার সন্ধান পাওয়া সহজ হয়।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন— 'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।' কবির সমকাল, তাঁর ব্যক্তিজীবন ও মানসলোকের পরিচয় ইত্যাদি বিষয়গুলি পাঠককে কবির কাব্যলোকে উপনীত হতে সাহায্য করে। এই ধারণারই ফলশ্রুতি পাশ্চাত্যের 'Biographical Criticism' বা জীবনমূলক সমালোচনা। সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর দাবি—

> কবিমনকে বুঝিবার জন্যই কবির সম্পূর্ণ মনকে জানা প্রয়োজন—এবং এই সম্পূর্ণ মনকে জানিতে হইলে একই কালে লিখিত কাব্যের সঙ্গে পরিপূরকভাবে প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও জীবনী মিলাইয়া আলোচনা করা আবশ্যক।

কবির জীবনী রচনায় আস্থা ছিল না রবীন্দ্রনাথের। তাঁর মতে, তথ্য-নির্ভর বহির্জীবন হল কবির ব্যক্তিগত জীবন। এই জীবনের সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিকর্মের কোনোও যোগ নেই। সেই যোগ নিহিত আছে তাঁর অন্তর্জীবনের সঙ্গে। আর এই অন্তর্জীবনের অনেক রহস্য কবির নিজের কাছেও অজ্ঞাত থেকে যায়। ফলে সেই জীবনের জীবনী

লেখা কীভাবে সম্ভব? তাই তিনি মনে করেন—'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে'। এমনকি, 'জীবনস্মৃতি' লিখতে বসেও তাঁর মনে হয়েছে—

> স্মৃতির পটে জীবের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহাকিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি-অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড়ো করিয়া তোলে।... এইরূপে জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে, আর ভিতরে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। দুয়ের মধ্যে যোগ আছে, অথচ দুই ঠিক এক নহে।

আসলে, শিল্পীর জীবন শিল্প-বিচ্ছিন্ন হয় না। শিল্পকর্মের ভেতর দিয়েই তাঁর অন্তর্জীবনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী স্পষ্টভাবে বলেছেন—

> আমি তো মনে করি কবির কাব্য রচনা ও জীবন রচনা একই রচনার অন্তর্গত, জীবনটাই কাব্যে আপনাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে; সেইজন্য জীবনের ভিতর হইতে কাব্যকে যদি দেখি, অথবা কাব্যের ভিতর হইতে যদি জীবনকে দেখি, তাহাতে কবিতার ব্যক্তিগত দিকটার উপরেই বেশি ঝোঁক দেওয়া হইবে না। কারণ কবিতা জিনিসটাই ব্যক্তিগত নহে, এবং কবির যথার্থ জীবনও তাঁহার আপনার একলার জিনিস নহে। তিনি যেন সচ্ছিদ্র বংশখণ্ডের মত, অন্য জিনিসে যে ছিদ্র কাজের পক্ষে ব্যাঘাতকর হয়, বংশখণ্ডে সেই ছিদ্রেই বিশ্বসংগীত প্রচার করিয়া থাকে।

বলাবাহুল্য, সাহিত্যশিল্পীর কলমে লেখা চিঠিপত্র এবং দিনলিপিতেও তাঁর অন্তর্লোকের সংলাপ উচ্চারিত হয়, এও যেন সেই বংশখণ্ডের ছিদ্র নিঃসৃত 'বিশ্বসংগীত'।

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, একজন সাহিত্যিকের লেখা ডায়েরি বা দিনলিপিতে তিনটি স্তর থাকতে পারে—

১. লেখকের ব্যক্তিমনের পরিচয়।
২. তাঁর সাহিত্যকর্মের সঙ্গে অন্তর্লীন যোগসূত্র।
৩. সাহিত্যকর্ম হিসেবে তার নিজস্ব শিল্পমূল্য।

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা দিনলিপির পাতাগুলিতে এই ত্রিমাত্রিক তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়।

কবির ব্যক্তিত্বকে চিনে নেওয়ার ক্ষেত্রে যতখানি দুরূহতা এবং সংশয়ের অবকাশ থাকে কথাসাহিত্যিকের বেলায় ততখানি থাকে না। কেননা, সংরূপগত দিক থেকে কবিতা রূপক ও ইঙ্গিতধর্মিতার ভেতর দিয়ে হয়ে ওঠে আলো-আঁধারির শিল্প। কিন্তু কথাসাহিত্য সে তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্টতর শিল্পকর্ম। এ বিষয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য—

> কবিতা, ছবি এবং গান—শিল্প হিসেবে এরা যতটা আত্মলীন ও ভাবকেন্দ্রিক, কথাসাহিত্য তা নয়। এমনকি, নাটকেও এযুগে যতটা ভাবাশ্রয়িতা চোখে পড়ে... উপন্যাসে তা সম্ভব নয়। উপন্যাস রূপক হতে পারে... কিন্তু উপন্যাসের সাংকেতিক হওয়া একেবারে অসম্ভব কিনা জানি না—তবে সহজ যে নয়, একথা ঠিক। ...ছবি, কবিতা কিংবা গান (এমনকি নাটকও) স্বস্থানে স্বমহিম। এরা দৈনন্দিন লোক-ব্যবহারের জন্যে নয়—মন, মেজাজ এবং অবসর নিয়ে এদের কাছে পৌঁছুতে হয়, এদের প্রয়োজনের রূপ যতখানি তার চাইতে বেশি প্রসাধনের রূপ। উপন্যাস পথের মানুষ কাছের লোক, দিনযাত্রায় সম্পর্কিত। এহেন অন্তরঙ্গ প্রতিবেশীদের পৃথক করে আমরা সহজেই চিনে নিতে পারি। একান্ত প্রতিভাদৈন্যের যুগেও যে-কোনো অন্য শিল্পের চাইতে উপন্যাসের ব্যক্তিত্ব সুনির্দিষ্ট।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনাভিজ্ঞতা ও সৃজনশীলতা একে অপরের পরিপূরক। তাঁর সাহিত্য যেন তাঁরই জীবনের পদাবলী, তাঁর পরিচিত পরিমণ্ডলের পাঁচালী। 'স্মৃতির রেখা', 'উৎকর্ণ', 'অপ্রকাশিত দিনলিপি' ইত্যাদির পাতায় পাতায় তার অজস্র নজির ছড়িয়ে রয়েছে। 'স্মৃতির রেখা'য় তিনি নিজেই লিখেছেন—

> সাহিত্য শিল্পীদের জীবনের প্রতিবিম্ব। যে যুগে তাঁরা জন্মেছেন, তাঁদের চেষ্টা হয় সকল দিক থেকে সে যুগের একটা স্থায়ী ইতিহাস লিখে রেখে যাওয়া। এই বর্তমান যুগে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁরা এই সময়ের একটা কাহিনী লিখবেন। অন্তরের এক মুহূর্তের কথা, তবুও জগতের ভাণ্ডারে থেকে যাবে। ...প্রত্যেক মানুষই নতুন চোখে দেখে—প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন। তাই সকলেরই কথা কৌতূহল জাগায়। সাহিত্য শুধু জগৎটাকে কে কি চোখে দেখেছে, তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। বর্ণিত নায়ক-নায়িকার পিছনে শিল্পী তাঁর আবাল্য দীর্ঘ জীবনের সকল সুখদুঃখ, হাসিকান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। ...তাই এই যুগে জন্মে আমি সকল রকম বিচিত্র জীবনধারার অভিজ্ঞতা চয়ন করে তার কাহিনি লিখে রেখে যাবো। আমি জগৎকে কি রকম দেখলাম? আমার শৈশব কি রকম কাটল? কোন্ কোন্ সাথীকে আমি আনন্দ মুহূর্তে দেখলাম? কাদের চোখের হাসি আমার মনকে অমৃতরসে স্নিগ্ধ করল? গতিশীল পলাতক অনন্তের প্রবাহ থেকে তাদের উদ্ধার করে লেখার জালে তাদের বেঁধে রেখে যাবো—সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ ধরে ভবিষ্যৎ-বংশধরেরা তাদের কাহিনি জানবে। আর হয়তো এ পথে আসবো না, হয়তো আবার যুগযুগান্ত পরে ফিরে আসবো—কে জানে?

কলকাতার মেসবাড়ি থেকে ইছামতী তীরবর্তী ভিটেভূমি, ঘাটশিলা থেকে পাটনা-ভাগলপুর-পূর্ণিয়া ইত্যাদি অঞ্চল, শিক্ষকতা থেকে জমিদারিকাজ প্রভৃতি পেশার ভিতর দিয়ে বিভূতিভূষণের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণতা পেয়েছে। আর দিনলিপির পাতায় তিনি সেই ভাণ্ডারকে উজাড় করে দিয়েছেন। 'স্মৃতির রেখা'য় এসেছে মূলত বিহারের ছোটোনাগপুর-সিংভূম অঞ্চলের কথা। কর্মসূত্রে সেই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ, সেখানকার বিচিত্র জনজীবন, বিস্তীর্ণ প্রকৃতির মন

কেমন করা রূপ ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে এসেছে লেখকের একেবারেই ব্যক্তিগত সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা। ইসলামপুর থেকে ভাগলপুর যাওয়ার পথে শূয়রমারীর খেয়াঘাটে ছেঁড়াখোড়া হলদে রঙের বই-পড়া মাঝিদের কথা, নৌকোয় বসে থাকা সেই গ্রাম্য মেয়েটির কথা, যে কিনা নদীতে নেমে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে কোনো কুটুম্ববাড়িতে নেমতন্ন খেতে যায়। অথবা রাসবিহারী সিংহের সঙ্গে বেরিয়ে হঠাৎ বৃষ্টির মধ্যে পড়া এবং ঘোড়া ছুটিয়ে সহদেব সিংহের বাংলোতে আশ্রয় নেওয়া, যতীনবাবুর দোকান থেকে হেমন্তবাবুর সঙ্গে ম্যাচ দেখতে যাওয়া, অম্বিকাবাবু-বনোয়ারীবাবুদের সঙ্গে সারাদিন যপন—এসব এসেছে কজের সূত্র ধরে খানিকটা যেন কেজো-কথা হয়ে।

'অপ্রকাশিত দিনলিপি'তেও এমন নিতান্ত ব্যক্তিগত সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা অজস্র। কলকাতায় উপভোগ্য আড্ডার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

> অনেক আড্ডা জুটে গিয়েচে—স্কুল, বঙ্গশ্রী, আপিস,...Imperial Library,...নীরদ চৌধুরির বাসা...নানা ধরনের atmosphere...সেখানে গেলেই আনন্দ পাই এই শরতের রোদের মাঝখানে।

আবার কলকাতার সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করে লিখেছেন—

> সাহিত্যক্ষেত্রে পরস্পর যে হিংসা, দ্বেষ, সংকীর্ণতা দেখতে পাই আজকাল, ওতে আমার মন আর সায় দিচ্ছে না। এক্ষেত্রে ক্রমেই কলকাতাতেই অতি বিষময় শস্যের বীজ উপ্ত হচ্চে—আমি ভাবচি দেশে চলে যাব। দেশে থেকে আমি দেশের যা সেবা করতে পারবো এমন আর কোথাও নয়। পরিশ্রম, সেবা—সবদিক থেকে। এখানকার এ শৌখিন জীবন যাপন করে পরস্পরকে হিংসা-দ্বেষ করে কি হবে?

তেমনি আবার ১৯৩৩ সালের ৫ই এপ্রিল, বুধবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের দিনটিও তাঁর লেখায় ধরা আছে—

> তাড়াতাড়ি স্নান সেরে কাপড় পরে তৈরী হলুম...রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে...মোটরে বেরুনো গেল প্রশান্তবাবুর বরানগরের বাগান বাড়ীতে।...প্রশান্তবাবুর স্ত্রী আমাদের জন্য খাবার আনলেন। তারপর এল আইসক্রীম। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন— আরে still they come ...বল্লেন পরিচয়-এ আমার 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে লিখেছেন, এ মাসে বার হবে।

অবোধ শিশুর অকারণ হাসি সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন—

> সকালে পত্রে সংবাদ পেলুম জাহ্নবীর ছোট খুকী মারা গিয়েচে। ও যে মারা যাবে তা জানতাম। তবুও মনে পড়ে কেমন হাসতো সম্পূর্ণ অকারণে—সবাই তার হাসির জন্যে বকতো।

একান্তই ব্যক্তিগত স্মৃতির কথায় অনেকগুলো পাতা মেদুর রয়েছে। ১৯২৭ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর শরৎসন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে তাঁর মনে পড়েছে বারিদপুর নিবাসী মণির কথা—'মণি বড় হয়েছে—বোধ হয় বিয়েও হয়ে গিয়ে থাকবে।' ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭ সালে রজৌন থানা সংলগ্ন পদ্ম-ফোটা পুকুরের ধারে লিখতে বসে তাঁর মনে পড়ে যায় ছোটোবেলার দিনগুলো—

> সেই—সেই সময় পাকাটি হাতে শিবাজীর মতো যুদ্ধ-যাত্রা মনে পড়ে—সেই মার তালের বড়া ভাজা, কলকাতা থেকে এসে খাওয়া—বাবার দেশভ্রমণের বাতিক—সেই বড়দিনের সময় আমবনের কাছে বেড়ানো...কত পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে।...সেই সোনারপুরে এমন সময়ে মা মারা যাওয়ার দিনটি...সেই কিশোরীবাবুর বাড়ি, জ্যোৎস্নাময় পূর্ণিমার কথা মনে পড়ে।

আবার ১৯২৭ সালের ৭ই নভেম্বর রাত ন'টা নগাদ পাটনায় ফিরার পথে তাঁর মনে হয়েছে—

> কোথায় বাড়িঘর আর কোথায় সারণ জেলা, পাটনা জেলা, গয়া জেলা ক'রে কত দিনটা কাটলো। সেই আদিনাথ পাহাড়, আগরতলা, কুমিল্লা, উজীরপুর, সেই রাত্রে খালে বেড়ানো, ইসলামকাটি, সেই জয়পুর ডাকবাংলা—চানন নদী, শালবন। পাটনা ল প্রেসের কাছে এসে কল্পনায় আমাদের গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেলাম।
>
> —ও মা—মা?
>
> দোর খুলে গেল। 'কে বিভূতি?'
>
> মণি এল, জাফরি এল, নুটু এল। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কালী বাড়ী আছে?'
>
> ওধারে নেড়ার বাবা কাশছে। বাড়ী—বাড়ী, কতদিন পরে নিজের পুরোনো ভিটাতে মার কাছে গিয়েছি!

বলাবাহুল্য, বিভূতিভূষণের এই সকল অভিজ্ঞতা আবেগ, অনুভূতি আর চেনা মানুষগুলো তাঁর গল্প-উপন্যাসে মিশে রয়েছে। ছোটোনাগপুর—সিংভূম অঞ্চলের অভিজ্ঞতা—সেখানকার মানুষ ও প্রকৃতির অকৃত্রিম এবং অকৃপণ রূপ, অকারণে হাসতে থাকা এবং হাসির কারণে বকুনি খেতে খেতে অকালে হারিয়ে যায় ছোট্ট মেয়েটি, পাকাটি হাতে যোদ্ধা বালক—মায়ের জন্য তার আকুতি, 'গ্রামের পাঁচজনের ঝাঁটালাথি খেয়ে কিছুদিন আগে ঘরে ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে জল অভাবে মৃত্যুতৃষ্ণা নিবারণ করতে না পেরে' মরে গিয়েছে যে বুড়িটা—এসবই তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত। তিনি জীবন থেকেই তাঁর রচনার বীজ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর দিনলিপি যেন সেই সকল বীজের সংগ্রহশালা। যেমন তিনি লিখে রাখছেন—'A novel on forest। ওতে নির্জনতার কথা থাকবে। গাছপালার কথা থাকবে। অরণ্যানী-খাড়া উঁচু পাথরের স্তর। ধাতুপ্রস্তর। রঙিন যা ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে নেমে আসচে। পাহাড়ের মাথায় রাঙা রোদ। শিউলি বন।...দাবানল।...টাঁড়বারো। অনেকে দেখেছে-গভীর

রাত্রের অন্ধকারে খাদানের কাছে দাঁড়িয়ে মহিষের পালকে সতর্ক করচে।' 'আরণ্যকে'র পাঠকের কাছে এই প্রসঙ্গ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সেই অরণ্য অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর লেখা এই ভাবনা-সূত্রটি আমাদের কাছে খুব চেনা—'যীশুকে যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ করে মারা হল বা অশোক যেদিন রাজা হলেন, সেদিনও সামনের পাহাড়টা অমনি দাঁড়িয়ে ছিল—তখনকার লোক অমনি জঙ্গলে কাঠ কাটতো। কে খবর রাখতো সুদূর খাইবার গিরিবর্ত্ম দিয়ে কোনো নতুন বিজেতার দল ভারতবর্ষে প্রবেশ করল কিনা? সুবর্ণরেখা তখনও এমনি নিঃসঙ্গ নির্বিকারভাবে বেয়ে চলতো—এইসব পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।' ১৯২৮ সালের ১লা মার্চ কমলাকুণ্ডের ঠান্ডা জলে স্নান করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে—'ঐ আমাদের গ্রামে ইছামতী নদী।...ইছামতীর দু'পাড় ভরে ঝোপে ঝোপে কত বনকুসুম, কত ফুলে ভরা ঘেঁটুবন, গাছপালা, গাঙশালিকের বাসা, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট, আকন্দ ফুল।...ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ি। কত হাসি-কান্নার মেলা। আজ পাঁচশত বছর ধরে কত গৃহস্থ এল, কত হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল কতবৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানশয্যা হল ঐ ঠাণ্ডা জলের কিনারাতেই, ঐ বাঁশবনের ঘাটের নীচেই।...এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী।'

'ইছামতীর ভবানী বাঁড়ুজ্জে, টুলু, রামকানাই কবিরাজ, নীলকুঠির সহেব-গোমস্তা-মুচি—সকলেই বিভূতিভূষণের চেনা-পরিচিত মানুষের আদলে সৃষ্টি। তিলু, বিলু আর নিলুর মধ্যে মিলেমিশে রয়েছে তাঁর জীবনের তিন নারী—খুকু, সুপ্রভা এবং কল্যানীর চরিত্র-ছায়া। 'উৎকর্ণে'র উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেছেন—

> জীবনের যাত্রাপথে যাঁরা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, সাহিত্য রচনায় দিয়েছে প্রেরণা, অভিষিক্ত করেছে আনন্দ রসধারায়—অথচ দাবি করেনি কিছু—তাদের কথা আজ স্মরণ করলাম।

স্বগ্রাম নিবাসী ভবানী বাঁড়ুজ্জেকে তিনি নিজ অভিজ্ঞতা আর আত্মদর্শন দিয়ে নির্মাণ করেছেন। বল্লরী রায়চৌধুরি এ বিষয়ে যথার্থই বলেছেন—

> বিভূতিভূষণের নিজস্ব মহাকালের ধারণা, নক্ষত্রবিশ্বের চেতনা, খুব তুচ্ছ জিনিসের মধ্যে দিয়ে অসীমকে উপলব্ধি করার প্রবণতা—এ সমস্তই ভবানীর মধ্যে লক্ষ করি। ভবানী তাঁর সন্তানের মধ্যে দিয়ে অনাগত কালের দূতকে প্রত্যক্ষ করেছেন; খোকার অপরিস্ফুট বুলি, অজানা বিস্ময়, তাঁর প্রতি অটুট নির্ভরতা করে তাকে তিনি ঈশ্বরের অপরিমিত উপহার বলে মনে করেছেন। যে আগামী পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে বহন করে আনছে নতুন কালের মধ্যে দিয়ে। আমরা মনে করব, দিনলিপিতে লেখকের একটি রচনাংশকে। এই স্বপ্ন-চিত্রের মধ্যে নীল অকূল থেকে পৃথিবীতে নেমে আসা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা হাতে মশাল নিয়ে অপেক্ষা

> করছে সেই 'প্রেমিক মশালচী'-র জন্য, যে তাদের মশাল জ্বালিয়ে দেবে। সেই মশাল নিয়ে অন্য কোনো অনাগত বংশধরদের উদ্দেশ্যে তারা নিত্যকালের মশালচী হয়ে যাত্রা করবে। তাই ভবানীর বোধিতে-আত্মদর্শনে প্রচ্ছন্ন আছেন স্বয়ং বিভূতিভূষণ।

জগৎ ও জীবনের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি ও ক্ষমাশীলতা তাঁর লেখনীকে মায়া-মমতায় সিক্ত করে তুলেছে। মার্টিন লুথারের জীবনী পড়তে পড়তে তাঁর মনে হয়েছে—

> কাউকে ঘৃণা করতে হবে না। এ জগতে যারা হিংসুক, স্বার্থান্ধ নীচমনা তাদের যেন ঘৃণা না করি... শুধু উচ্চ জীবনানন্দ তাদের দেবার কেউ নেই বলেই তারা ঐ রকম হয়ে আছে। কোন মুক্ত পুরুষ অনন্ত অধিকারের বার্তা তাদের উপেক্ষিত বুভুক্ষাশীর্ণ ঘ্রাণে পৌঁছে দেবে?

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বিষাদ—এসবকে একেবারে পিঠোপিঠি দেখা যায়। একে অপরে যেন অবিচ্ছিন্ন, দুয়ে মিলে যেন নিরবচ্ছিন্ন; জগৎ ও জীবনের যাবতীয় গূঢ় রহস্য যেন এই দুয়ের সমন্বয়ের ভেতর দিয়ে ব্যক্ত। ১৯২৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তিনি দিনলিপিতে লিখেছেন তাঁর নিজস্ব দর্শনের কথা—

> চোখের জলেই এ বিশ্বসৃষ্টি ধন্য হয়েছে। চোখের জল, কান্না, অত্যাচার না থাকলে বিশ্বের সৌন্দর্য থাকতো না। সব সুখ, সব পরিপূর্ণতা, সব ঐশ্বর্য, সব সন্তোষ, শান্তি, কেমন মরুভূমির মতো ভয়ানক খাঁ খাঁ করতো— মাঝে মাঝে আর্তদের চোখের জলের শ্যামকান্তিভরা ওয়েসিস আছে বলেই তা করুণ মধুর হয়েছে।

এজন্য তাঁর প্রার্থনা—

> আবার যদি জন্মই হয় তবে যেন ঐরকম দীনহীনের পর্ণকুটিরে অভাব অনটনের মধ্যে, পল্লীর স্বচ্ছতায় গ্রাম্যনদী গাছপালা নিবিড় মাটির গন্ধ অপূর্ব সন্ধ্যা মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়।

লেখকের এই প্রার্থনা সেই দেবতার উদ্দেশ্যে, যাঁর সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

> আমি স্বপ্ন দেখি সেই দেবতার—যিনি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, যুগযুগান্তের পর্বতশিখরে নীরব চিন্তামগ্ন। কত শত জন্মের স্মৃতি, হাজার বৎসরের হাসিকান্নার কাহিনি, নির্জন গ্রহের নির্জন পর্বতে, যুগ যুগ অক্ষয় তরুণ দেবতার কথা মনে পড়ে—ধীর, নির্জন, নীরব ধ্যান শুধু অতীতের। সম্মুখে তার বিশাল অজানা বিশ্ব। দেবতা হয়েও সব জানেনি, সকলের সীমা পায়নি গ্রহে, শত প্রেমকাহিনির জালে জালে জড়ানো তরুণ সুন্দর মূর্তি তার। নিস্তব্ধ অন্ধরাতে বসে বসে শুধু সে একমনে অপরূপ জীবন-রহস্য ভাবে।

সাহিত্য এমন এক সোনার তরী যা এক কালের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নাকে চিরকাল বহন করে চলে, রচয়িতার মনের সামগ্রীকে পাঠকচিত্তের সম্পদ করে তোলে। সেদিক থেকে দেখলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপি সাহিত্যগুণে গুণান্বিত। সাহিত্যের বীজকে দিনলিপিতে সংরক্ষণ করতে গিয়ে তিনি দিনলিপির অধিকাংশ পাতায় সাহিত্যের স্বাদ সৃষ্টি করেছেন। ওপরের উদ্ধৃত অংশগুলোর মধ্যেই তার পর্যাপ্ত আস্বাদ পাওয়া গেছে। বিভূতিভূষণের স্বভাবসিদ্ধ অপার কৌতূহল, অসীম কল্পনা, অনন্য দার্শনিকতা ও মগ্ন ভাবুকতায় জগৎ ও জীবন, প্রকৃতি ও মানুষ দিনলিপির সমকালীনতাকে অতিক্রম করে চিরন্তনতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কখনো অতীত স্মৃতির চারণে, কখনো বর্তমানের বর্ণনে, কখনো বা ভাবীকালের ভাবুকতায় সতেজ হয়ে রয়েছে চিরন্তন মানব সংরাগ। যেমন, বিহারের আরা কিংবা ছাপরা জেলার গ্রাম জনপদ ঘুরে লেখকের মনে ভেসে ওঠে তাঁর অতীত স্মৃতি—

> এই শীতের অপরাহ্ন, রাঙা রোদ যখন বাবলা বনে লেগে থাকে তখন শৈশবে কতদিন শ্যামছায়া ঘনিয়ে আসা ইছামতীর তীরে নির্জনে বসে বর্ষার ভাঙ্গনের শিমূলতলার দিকে চেয়ে জীবনের মরণের পারের এক রহস্যময় অজানা অনন্তলোকের স্বপ্ন আবছায়া ভাবে মনে আসতো—কতদিন চেয়ে থাকতাম শিমূলতলার নীচে, লক্ষণ জেলের শাওড়ি, ক্ষুদে গোয়ালা যখন মারা গেল, তাদের পোড়ানোর জায়গার দিকে—কেমন যেন উদাস উদাস ভাব, দিগন্তবিস্তৃত মাধবপুরের উলুখড়ের মাঠটার বহুদূর পার থেকে কে যেন হাতছানি দিত।

আবার, সামনের উপস্থিত প্রকৃতি সম্পর্কে নিজের মুগ্ধতা পাঠকের মনে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি লিখেছেন—

> বৈকালে ঘোড়া চড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম ভীমদাসটোলার নীচেকার আলটায় অত্যন্ত জল বেড়েছে...ওপরের বটেশ্বরের পাহাড়টা কি অপূর্ব নীল রং দেখাচ্ছে। ডান দিকে লাল রংয়ের অস্ত-আকাশ—উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে একা। সীমাহীন প্রান্তর, ফুলেভরা সবুজ কাশবন, অস্ত-আকাশে রক্ত মেঘ, নীল পাহাড়, ঢালু দূর্বাঘাসের মাঠ, ধুতরা ফুলের ঝোপ, উলুখড়ের ঝোপ, বড়ো পাকুর গাছটার তলায় হলুদ-রঙা, জরদা রং-এর সন্ধ্যামণি ফুলের বন, এদিকে ওদিকে পাখী ডাকছে, ক্ষেতে গরু চরছে— বাঁধের নীচে জলের ধারে বকের দল বসে আছে, স্নিগ্ধ খোলা মাঠের সান্ধ্যবায়ু—মনটা যেন এই অপূর্ব সীমাহীনতার মধ্যে, দূরপ্রসারী শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে ছড়িয়ে গেল।

কল্পনা ও ভাবুকতায় পাঠকমনকে ভরিয়ে দিতে তিনি লেখেন—

> হঠাৎ মনে হল হাজার বছর আগে যেসব পাখী বনে বনে গান গেয়ে চলে গিয়েছে, আজ এই ছায়াভরা সন্ধ্যায় তারাই যেন আবার কোথা থেকে গেয়ে উঠলো। যেসব ছেলেমেয়েরা হাজার বছর আগে মা-বাপের কোলে মিষ্টি হাসি হেসে কতদিন

> হল ছেলেবেলায় দেখা স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, আজ সন্ধ্যায় সেই সব অস্পষ্ট দূর অতীতের ছেলে-পিলের মিলিয়ে যাওয়া হাসিরাশি-নদীর ধারে বনে বনে মাঠে—ঝোপে ঝোপে—ফুল হয়ে ফুটে গোধূলির আঁধার আলো করে আছে।

এমন অজস্র নজির ছড়িয়ে আছে তাঁর দিনলিপির পাতায় পাতায়। সেই তুচ্ছ-সাধারণের মধ্যে অতুচ্চ-অসাধারণ আস্বাদ, আনন্দের পরতে পরতে জড়ানো মায়াঘন বিষাদ—সব মিলে বিভূতিভূষণের সাহিত্যের চিরপরিচিত বর্ণ-গন্ধ। 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

> পথের পাঁচালীর আখ্যানটি অত্যন্ত দেশি। কিন্তু কাছের জিনিষেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। পথের পাঁচালি যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়।...এই গল্পে গাছপালা, পথঘাট, মেয়ে-পুরুষ, সুখ-দুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েচে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিসের মতো সে সুস্পষ্ট। ('পরিচয়', বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৪০)

বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাস-ভ্রমণকাহিনির মতো তাঁর দিনলিপির ক্ষেত্রেও একথা সমান সত্য। তাই তাঁর দিনলিপি ব্যক্তিগত রচনা হয়েও সাহিত্যগুণে তা সকল পাঠকের সম্পদ।

<u>সহায়ক গ্রন্থ</u>

১. যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত : 'বঙ্কিম রচনাবলী', সাহিত্য সংসদ।
২. অজিতকুমার চক্রবর্তী:'রবীন্দ্রনাথ ও কাব্যপরিক্রমা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.।
৩. প্রমথনাথ বিশী : 'রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.।
৪. বিভূতি রচনাবলী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।
৫. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক', বাক্ সাহিত্য প্রা. লি.।
৬. অলোক রায় : 'ছোটোগল্পে স্বদেশ স্বজন', অক্ষর প্রকাশনী।
৮. কোরক সাহিত্য পত্রিকা, 'বাংলা আত্মজীবনী', স্মৃতিকথা, বইমেলা, ২০১৪।

সামগ্রিক ভাবনা

বিভূতিভূষণের জীয়ন-কাঠি

গোপাল হালদার

"২রা অক্টোবর, ১৯২৯, বুধবার, মহালয়া"—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হয়। বিভূতিভূষণ তাঁর ডায়েরিতে লিখছেন ('তৃণাঙ্কুর', ২য় সংস্করণ, পৃ. ৮) :

"আজ বই বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ করেছে দেখে আজ আমি আনন্দিত।"

"আজ এই নির্জন নীরব রাত্রিতে বহু দূরবর্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হল যে, তার প্রতি সন্ধ্যা প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্না-মাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো, ছায়া, বন, নদী—বিশ বৎসর পূর্বের সেই অতীত জীবনের কত হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, কত অপূর্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টির মূলে তাহাদেরই প্রেরণা, তাহাদেরই সুর।"

"আজ বিশ বৎসরের দূর জীবনের পার হতে আমি আমার সেই পাখীডাকা, তেলাকুচা-ফুলফোটা, ছায়াভরা মাটির ভিটাকে অভিনন্দন করে জানাতে চাই—"

"ভুলি নি! ভুলি নি! যেখানেই থাকি ভুলি নি।...তোমারই কথা লিখে রেখে যাবো— সুদীর্ঘ অনাগত দিনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সুর-মধ্যে তোমার মেঠো একতারার উদার, অনাহত, ঝঙ্কারটুকু যেন অক্ষুণ্ণ সংযোগের থাকে!"

'পথের পাঁচালী' এই নিশ্চিন্দিপুরের কাব্য-কথা। ইং ১৯২৪ সন থেকে এ বই-এর ভাবনা বিভূতিভূষণকে পেয়ে বসে, 'অপরাজিত'-এ এসে তা শেষ হয় ১৯৩২ এর মার্চ মাসে (তৃণাঙ্কুর, ২য় সং, পৃ. ৬৭-৬৮)। চব্বিশ বৎসর পরে ৩৪ বৎসরের অপু আবার তার গ্রাম নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে এল—পল্লিদেবীর কাছে সেদিনও তার প্রার্থনা, "অন্য কিছু চাইনে, এ গাঁয়ের বন-ঝোপ, নদী, মাঠ, বাঁশ-বাগানের ছায়ার অবোধ উদ্‌গ্রীব স্বপ্নময় আমার যে সেই দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি তাকে আর একটিবার ফিরিয়ে দেবে, দেবী?" ('অপরাজিত', ২৬শ পরিচ্ছেদ, ৬ষ্ঠ সং)।

'অপরাজিত জীবন-রহস্য' তখন অপু থেকে তার পুত্র কাজলের মধ্যে অপূর্ব মহিমাতেই আবার আত্মপ্রকাশ করছে।

১৯২৬ থেকে ১৯৩২-এর মার্চ এই সময়ের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বক্তব্যটি বাংলা-সাহিত্যে শিল্পিত করে তোলেন তা এই—বহিঃপ্রকৃতি এক পরম শ্রীময়ী শক্তি; তুচ্ছ, ক্ষুদ্র সাধারণ জীবনও শ্রীহীন নয়; আর জীবন অপরাজেয়! বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—কাহারও মহত্বই খর্ব না করে বলা যায়—বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের এই দান—অপূর্ব ও অপরূপ।

'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভূতিভূষণ বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ সমাদর ও সম্বর্ধনা লাভ করেন। আর কোনো বাঙালি লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এমন শুভকামনা ও অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিলেন কিনা সন্দেহ। 'অপরাজিত'ও সেই জয়ধ্বনির মধ্যেই শেষ হয়—সে গ্রন্থ তখন ভালো করে যাচাই করবার মত অবসরও ছিল না মুগ্ধ বাঙালি পাঠকের। তারপর বিশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। বিভূতিভূষণের ছোটো বড়ো নানা গল্প ও উপন্যাস বাঙালির চিত্তভূমিকে এই দীর্ঘদিন ধরে সরস করে এসেছে। বিভূতিভূষণের যে পরিচিতি 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' মারফত বাঙালি মনে স্থাপিত হয়েছিল, তার দুই-একটি দিক আরও পরিস্ফুট হয়েছে 'আরণ্যকে', 'দৃষ্টি-প্রদীপে' আর একেবারে 'ইছামতীতে'—নিরাশ হননি কোনো পাঠক শেষ দিনও তাঁর গল্পের রসে। কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র পরে বিভূতিভূষণের সেই পরিচয় আর নতুন হয়ে ওঠেনি, বাঙালি পাঠকের মনের আর কোনো নতুন তার স্পর্শ করেননি বিভূতিভূষণ। সেই একতারাটিতেই নতুন আঙুলে তার করুণ মধুর নতুন গৎ ফুটিয়ে তুলেছেন বার বার—বারে বারে একটি কথাই বলে গিয়েছেন—'ভুলি নি' 'ভুলি নি'; বারে বারে একটি বিস্ময়ে ও বিশ্বাসেই অভিভূত হয়েছেন, 'যুগে যুগে অপরাজিত জীবনরহস্য কি অপূর্ব মহিমাতেই আবার আত্মপ্রকাশ করে।'—অপুর পুনরাবৃত্তি হয় কাজলে। বারে বারে একটি একটি কথাই জানিয়েছেন—তা সেই ৩৪ বৎসরের অপুর উপলব্ধি—"জীবন খুব বড় একটা রোমান্স্—বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্স। অতি তুচ্ছতম, হীনতম, একঘেয়ে জীবনও রোমান্স।" (অপরাজিত, পৃ. ৪৩৫)

রোমান্সের এ জাতীয় চেতনা ওয়ার্ডসওয়ার্থের দিন থেকেই সুপরিচিত। আমাদের সাহিত্যেও তা অজানা ছিল না। ছোটোগল্পের (প্রাক্-সবুজপত্র যুগের) রবীন্দ্রনাথ ও 'ক্ষণিকার' রবীন্দ্রনাথ জীবনের সাধারণ তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেও এই বিস্ময় আবিষ্কার করেছিলেন, প্রকাশও করেছিলেন। এ আবিষ্কার বিশেষ করে কবি-প্রতিভারই, সাধনা। সেই শেওলা-ধরা পাথরের পার্শ্বেকার ছোট্ট প্রিমরোজটির মধ্যে চিন্তার অশ্রু-উৎস যে অফুরন্ত হয়ে আছে, তা কবিদৃষ্টির অজ্ঞাত নয়। এই জাতীয় কবিদৃষ্টিতেই 'short

and simple annals of the poor' আপনার অনাড়ম্বর সত্যে মহিমান্বিত ; যা সামান্য তাও অসামান্য। কিন্তু কথা-সাহিত্যে এ দৃষ্টি বড় সহজে স্বচ্ছন্দ বোধ করতে পারে না। কারণ, কথা-সাহিত্যের আশ্রয় বাস্তব পৃথিবী। আর এ পৃথিবী দ্বন্দ্বে-কোলাহলে জটিল। দারিদ্র্যও সত্যই নির্মম। the poor যেমন হোক, the poor middle class বা নিম্নবিত্তের জীবন আরও জটিল এবং আরও দ্বন্দ্বময়—সব হারিয়েও সে 'সর্বহারা' নয়, 'সব পেয়েছির দেশের' সুরঙ্গ-সন্ধানী। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই বাংলা সাহিত্যে এই বোধ নির্দয়রূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল—'গল্পগুচ্ছের' বাংলাদেশে গল্পই শুধু। হয়তো সে সময়টা না মনে রাখলে 'পথের পাঁচালী'র বিশেষ আবির্ভাব-ক্ষণ ও বাংলা সাহিত্যে তার তাৎপর্যটা সম্পূর্ণ বোঝা যায় না।

বাংলা শহুরে সাহিত্য

যে বাংলা সাহিত্য উনিশ শতকে নবজন্ম লাভ করে তার জন্ম ইংরেজি শিক্ষা-সভ্যতা ও সাহিত্যের যাদুস্পর্শে। এ সাহিত্যের সৃষ্টি ইংরেজের শহর কলিকাতায়, কলিকাতার বাহিরে পদার্পণ করিতেও সে কুণ্ঠিত ছিল। অথচ বাংলা দেশের শতকরা ৮০টি লোক পল্লিবাসী, ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির তুলনায় বাঙালি পল্লি-সমাজে অধিকতর বিসারিত। এ বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ এ পল্লি-সমাজেরই অঙ্গ, আর শিক্ষিত মধ্যবিত্তই আবার এই নতুন বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা। এই শিক্ষিত মধ্যেবিত্তের সাহিত্যাদর্শও ইংরেজির মারফত প্রাপ্ত, তা শহুরে-বণিক সভ্যতার দ্বারা উদ্ভাবিত। জীবিকার ক্ষেত্রেও এই বাঙালি মধ্যবিত্ত সেই বণিক-ধনিক সভ্যতার টানেই শহরমুখী, কিন্তু জীবনের শত সম্পর্কে 'কালোনির' এই মধ্যবিত্ত বাঁধা ভূমির সঙ্গে কৃষি-সভ্যতার সঙ্গে, একটা ভাঙন-মুখী পল্লিসভ্যতার সঙ্গে। সাম্রাজ্যবাদী-আওতায় কাল্চারের একটা পরিহাস এই সাহিত্যজীবীরা। যারা শহরমুখো, জীবন ও ঐতিহ্যে তারাই আবার পল্লিকেন্দ্রিত। সে মধ্যযুগের নিয়মে ও ঐতিহ্যে চালিত পল্লি-সমাজে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নতুন-স্বাতন্ত্র্যবোধ, ব্যক্তি-চেতনা, সভ্যজীবন-যাত্রার কোনো অবকাশ নেই। অথচ, বাস্তবজীবনে যে বাঁধা সেই কৃষি-সভ্যতারই নিগড়ে, সাম্রাজ্যবাদী দাপটে শিল্পে-বাণিজ্যে যার প্রবেশ নিষেধ, শিল্প-বাণিজ্যবাহী সভ্যতার আদর্শকে সেই কলোনির মধ্যবিত্ত গ্রহণ করবেই বা কীরূপে? জীবনাদর্শে তাই বাঙালি মধ্যবিত্তের একটা দ্বন্দ্ব থেকেই যায়, আর একটা অবাস্তব ভাবালুতাও এ কারণে প্রশ্রয় পায়। একই কালে বাঙালি মধ্যবিত্তের মনে মমতা ও ক্ষোভ, দু'ই থাকে তার পল্লি-সমাজের জন্য। দু'ই অনিশ্চিত, দু'ই একটু অগভীর; একই কালে তা 'গল্পগুচ্ছের' বাংলা দেশ, আবার শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'। সেখানেই শ্রী, সরলতা,

সৌন্দর্য, মাধুর্য; আবার সেখানেই ম্যালেরিয়া ও কুসংস্কারের ডিপো। এই পল্লিসভ্যতাই আমাদের রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ'; অথচ সে সভ্যতা, সে সমাজকে আর কিছুতেই 'আদর্শ' বলে ভাবা চলে না। তাই তার প্রতি অনুরাগ ও বিরাগ পর্যায় ক্রমে দেখা দেয় বাংলা সাহিত্যিকেরও মনে।

'গল্পগুচ্ছের' যুগ ছাড়িয়ে যখন রবীন্দ্রনাথ 'সবুজ পত্রের' যুগ পেরিয়ে যাচ্ছেন, 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে'র ভূমিকা শেষ করে শরৎচন্দ্র যখন তাঁর 'পল্লীসমাজের' যুগের মধ্যপথে, তখন প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী নিরাবরণতাকে স্বাগত করে বাংলা সাহিত্যে উপস্থিত হলেন—প্রথম শৈলজানন্দ, পরে 'কল্লোল', 'কালি-কলম' ও 'প্রগতির' 'অতি আধুনিক' লেখকেরা। সৃষ্টির দিক থেকে 'কালি-কলমই' বেশি উল্লেখযোগ্য, যদিও হুজুগের হিসাবে 'কল্লোলই' বেশি উল্লেখিত হয়। বাস্তববাদ মানে অবশ্য নিরাবরণতাবাদ নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র-শৈলজানন্দের দৃষ্টি অনুসরণ করে বাঙালি লেখকের চোখ বাস্তবের দিকে ফিরল। রোমান্স-এ তাদের অশ্রদ্ধা এসেছিল, তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিও তারা সেদিন বিমুখ (অবশ্য তার অর্থ রোমান্সের প্রতি বিমুখতা নয়; একটা বর্ণচোরা রোমান্স-পিপাসাই ছিল তারও মূল)। কিন্তু চোখ অন্যদিকে ফিরলেও তাঁদের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়নি। তাঁরা বাস্তবকে দেখছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের ধার-করা ধারালো দৃষ্টিতে। তাই সেই পুঁথি-পড়া বাস্তবকে তাঁরা পাশ্চাত্য ধারায় খুঁজছিলেন বাংলা দেশের শহরে, বস্তিতে, খনির অপরিচিত অস্পষ্টতায়;—কদাচিৎ অস্পষ্ট 'পল্লীসমাজে'। যে বাংলার শতকরা ৯০ ভাগ জীবন পল্লি-কেন্দ্রিত সেখানে শতকরা ৯০ ভাগ বাস্তব-সাহিত্য শহর-কেন্দ্রিত; প্রয়াসেও শতকরা ততো ভাগই হল মূল্যহীন। কিন্তু তা আরও মূল্যহীন হয় 'অতি-আধুনিকদের' উদ্ভট ভাবনা ও অবাস্তব-চরিত্র পরিকল্পনার জন্য। তাই বাংলা কথাসাহিত্যের মোড় বাস্তবের দিকে ঘুরতে না ঘুরতেই অবাস্তবের চোরাবালিতে তখন আটকে গেল। তার কারণ এই যে, ইংরেজ আমলের বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার মূলেই মাটি ছিল কম, মোটামুটি একশত বৎসর (১৮১৭-১৯১৮) তবু চলেছিল; তারপরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সঙ্কট ঘনিয়ে ওঠে।

এমনি নৈরাজ্য ও বিভ্রান্তির সময়ে—'যোগাযোগ' শেষ হয়েছে 'বিচিত্রায়', 'শেষের কবিতা' শেষ হয়েছে 'প্রবাসীতে',—'পথের পাঁচালী' আরম্ভ হল 'বিচিত্রায়'। বাঙালি পাঠকের মন এক নতুন রসে অভিষিক্ত হল। আরও দুই বৎসর পরে 'বিচিত্রার' পাতা থেকে বেশ খানিকটা ঝাড়াই-বাছাই হয়ে প্রকাশিত হল বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'। স্মরণ করবার মতো কথা তারপরে বাংলা দেশের পাঠক সমাজের সমস্বরে বিভূতিভূষণের স্বাগতীকরণ।

বেচু চ্যাটার্জ্জি স্ট্রিটে 'সাহিত্য সেবক সমিতির' অনুষ্ঠিত 'পথের পাঁচালী' সম্বর্ধনা সভায় ব্যারিস্টার, অধ্যাপক ও বিদগ্ধজনের অভাব ছিল না। কথারও অভাব হয়নি। কিন্তু অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটু সলজ্জ সংকোচে জানান—

> আমি চিরদিনের কলকাতার মানুষ। বাঙলার-পল্লী প্রকৃতি ও পল্লীজীবনের সঙ্গে এমন আজন্ম পরিচয়ের দাবি করিতে পারি না। কিন্তু বেশ একটা মমতা বোধ করি তার জন্য তাতে ভুল নেই। আর 'পথের পাঁচালীর' অপুর সঙ্গে অনুভব করি বাঙালী শিশুর অভিন্নতা।

চিরদিনের কলকাতার মানুষ হলেও কলকাতারই যে ইংরেজের—এখন হয়তো আবার মাড়োয়াড়ী-ভাটিয়ারও। বাংলার পল্লির জন্য তাই একটা অশ্রু-সজল মমত্ব-বোধ— nostalgia—এই কলকাতার মানুষদেরও মনে জমা আছে, পল্লিত্যাগী শহরমুখো শিক্ষিতের মনে রয়েছে সেই স্মৃতি। ম্যালেরিয়া ডিপো এই এঁদো-পুকুর ও বাঁশঝাড়ের গ্রাম, তা ঠিক। দলাদলি, কুঁড়েমি ও গোঁড়ামিতে তা উচ্ছন্ন যেতে বসেছে, তাও সত্য। কিন্তু 'আরও সত্য' একটা আছে তাও বুঝতাম। 'গল্পগুচ্ছের' রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রলোকের ওপার থেকে এই পল্লির উপরে তাঁর কবি-দৃষ্টির কিরণ রেখাটি পাত করে আমাদের সেই সত্য জানিয়েছিলেন। তবু জানতাম সে দেখা কাব্য-চন্দ্রিকার কাক-জ্যোৎস্নায় দেখা বাংলার পল্লিপ্রকৃতি ও পল্লিজীবন। তাই সেই দর্শনে একটা অর্ধ অবিশ্বাসও জাগ্রত থেকে যায়। কিন্তু 'পথের পাঁচালী'তে এখন আমরা সেই পল্লিপ্রকৃতিকে দেখলাম—ঠিক চন্দ্রলোকের মানুষের চোখে নয়। বরং অপরিচিত এই বাংলা দেশের গ্রাম থেকেই সেই গ্রাম্য পথ-রেখাটি চন্দ্রলোকের দিকে উঠে গিয়েছে : তিত্তিরাজ গাছের তলা দিয়ে সে পথ—মোটা মোটা গুলঞ্চ-লতা দুলানো থলো থলো বন-চালতার ফল চারধারে; আমবাগানে এসে শেষ হয়েও শেষ হয়নি। আবার এ-গাছের ও-গাছের তলা দিয়ে চলে কুঠির মাঠের ধার বেয়ে—সোনা ডাঙার রাস্তাও শুধু নয়, মাধবপুর-দশঘরা হয়ে ধলচিতার খেয়াঘাটে তা থামেনি—গিয়েছে আরও অনেক দূরে—রামায়ণ—মহাভারতের দেশে (পৃ. ৬৪), ঐ অশ্বত্থ গাছটায় ওপারে আকাশের তলে, অনেক দূরে কোথায় এখনো মাটি হতে রথের চাকা দু'হাতে প্রাণপণে টেনে তুলছে—রোজই তোলে—মহাবীর, কিন্তু চিরদিনের কৃপার পাত্র, কর্ণ। (পৃ. ৩৪)

কিন্তু সে পথ সেই আকাশেই শুধু উঠে যায়নি—গল্পগুচ্ছের পথ যেখানে নেমে এসেছে নদীর ধারের, শ্যামল বনে। এই "সুড়ি পথটা একটা আমবাগানে আসিয়া শেষ হয়, আবার এ-গাছের ও-গাছের তলা দিয়া বনকলমী, নাটা-কাঁটা, ময়না-ঝোপের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে কোথায় কোন্ দিকে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে, শুধুই বন-ধুধুলের লতা কোথায় কোন ত্রিশূন্যে দোলে, প্রাচীন শিরীষ গাছের শেওলা-ধরা ডালের গায়ে পর-গাছার নজরে আনে।" (পৃ. ৮৮)

পল্লির পুনরাবিষ্কার

না, এ পথ সেই পৃথিবী-ছাড়া রোমান্সের পথ নয়—কল্পলোকের নাম-না-জানা গাছে লতায়-পাতায় যা ছায়াচ্ছন্ন। প্রত্যেকটি গাছ লতা আর ফুল এখানে আপন স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবীতে নাম নিয়ে উপস্থিত—কোনো ফুল, কোনো গাছ, কোনো লতা শুধু 'নাম-না-জানা' ফুল বলে গাছ বলে, লতা বলে—একাকার হয়ে যায়নি। বাংলার পল্লিপ্রকৃতি প্রকৃতি-বিজ্ঞানের গবেষণার বা শুধু বোটানির বইতেই আর আবদ্ধ রইল না। বিভূতিভূষণের সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে প্রত্যেকেই তার বিচিত্র সত্তা আর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এই প্রথম বাংলা সাহিত্যে জন্মলাভ করল। তাই চিরদিনের কলকাতার মানুষ বা চিরদিনের পল্লি-কেন্দ্রিক শহরমুখো বাঙালির চেতনায় তাদের অস্তিত্ব উদ্‌ঘাটিত হল। বিভূতিভূষণের আন্তরিক অনুরাগের ও রোমান্টিক বিস্ময়-রসের কায়া-কাজল মেখে। প্রকৃতি বলে একটা কিছু যে আছে—আর তা আছে শুধু 'ডেজি', 'ডেফো-ডিল', 'প্রিমরোজে' নয়, শুধু পাহাড়ে পর্বতে সমুদ্রে-নদীসৈকতে নয়, সাঁওতাল পরগায় বা দার্জিলিংয়েও নয়,—আছে তা আমাদের ঘরের দুয়ারে—ঝোপে-ঝাড়ে বনে-জঙ্গলে এঁদো পুকুরের পাশে, আশ্‌শ্যাওড়ার বনে, তেলাকুচার, ঘেঁটু ফুলের বিশিষ্ট গন্ধে—সেদিন আমাদের হয়ে আমাদের এই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন বিভূতিভূষণ। বাংলা পল্লিপ্রকৃতির প্রতি যে মমতা আমাদের ছিল তা এক মুহূর্তে এইখানে আত্মোপলব্ধি করলেন। আর শহুরে সভ্যতায় আমাদের কোনো সৃষ্টি সার্থকতা নেই বলেই এই শহর-ত্যাগী পল্লি-প্রশান্তিতে আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করলাম আরও বেশি—হোন্ তিনি কলকাতার মানুষ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বা কলকাতা-প্রবাসী ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জের নীরদচন্দ্র চৌধুরী।

এইরূপ দ্বিতীয় এক আবিষ্কার—আমাদের ঘুমন্ত চেতনার নতুন জাগরণ—সেই নিশ্চিন্দিপুরের অপু-দুর্গার সঙ্গে পরিচয়। অপু 'রামের সুমতি'র রামের মত নয়, অথচ তেমনি সত্য। বৈশাখের ঝড়ে সে দিদির সঙ্গে আম কুড়োতে ছোটে, নোনাফল পেড়ে খেয়ে অপার তৃপ্তি লাভ করে, দু'জনায় পানফল তুলতে গিয়ে দিদিকে টেনে ধরে—ভালো ফলারের নামে সহজেই লুব্ধ হয় তার দরিদ্র বাসনা, সহজেই তেমনি ছাঁদা বেঁধে আনে লুচি আর খাবার। চুরি করে আনে পুঁতির মালা তার বোন, চুরি করে আনে তেমনি সহজ লোভে সিন্দুরের সোনার কৌটা। দিদি আর মায়ের সহজ মমতায় অপুর জীবন যখন ঘেরা, তখন নিশ্চিন্দিপুরের বন ঝোপ এই শিশুকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যায় নব নব বিস্ময় ও অনুভূতির দিকে—সে ডাইনী বুড়ীর ভয়ে ছুটে পালায়, সন্ধ্যার অন্ধকারে তার বড় ভয়, রেলপথের সিধা লোহা দুটোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে আর ঠিকানা পায় না এ পৃথিবীর, সীতার বনবাসের' সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণ-গিরির, (পৃ. ৬৪) ঝঙ্কার-জড়ানো শব্দ-সংগীতে আর

বারোয়ারী তলায় যাত্রার কাহিনিতে মানব-কল্পনার অন্তর্লক্ষ্মীর দেহোদ্ভাস সে দেখতে পায়। বাঙালি শিশু মনের এ রহস্য সত্য,—শহর-পালিত বাঙালি বালকের পক্ষেও সত্য, আর গ্রামে-মানুষ বাঙালি বালকের পক্ষেও সত্য। কিন্তু বিভূতিভূষণের সৃষ্টি-চমৎকারিত্বেই এক মুহূর্তে এই সত্য আমরা বাঙালি পাঠকেরা আবিষ্কার করলাম। ইতরতা, নিষ্ঠুরতা, ছেঁচড়ামো, কাঙালপনা, vulgarityই যে বাঙালি পল্লি-সমাজের একমাত্র সত্য নয়, এ কথা অবশ্য আমরা জানতাম। শরৎচন্দ্রও এই কথা দিয়েই তাঁর সাহিত্যের ভূমিকা রচনা করেছিলেন। (‘রামের সুমতি’, ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘নিষ্কৃতি’ পর্যন্ত)। কিন্তু সর্বজয়া-অপু-দুর্গার সংসারের মধ্যে—short and simple annals of the poor নয় শুধু, poor middle class এর সমস্ত দারিদ্রের মধ্যেও—কতখানি অশ্রুসজল মাধুর্য ও মমতা, মানবিক মায়া ও রোমান্সের বিস্ময় যে সর্বদাই সঞ্চিত—এই বিস্ময়রসের সত্যটা বিভূতিভূষণের মতো এমন করে আজ পর্যন্ত কেউ বাংলা কথা-সাহিত্যে আবিষ্কার করতে পারেননি। ‘গল্পগুচ্ছের’ রবীন্দ্রনাথও বোট আর কাছারি-বাড়ি থেকেই এই বিস্ময়ের আভাস দিয়েছেন। সর্বজয়ার সংসারের মাঝখানে বসে আমকুড়োন, কাঙালপনা, হ্যাংলামো প্রভৃতি প্রতিদিনের পল্লি-জীবনের অতিপরিচিত তুচ্ছতাকে এমন খুঁটে খুঁটে প্রকাশ করতে তিনি সাহসী হননি; হয়তো তা তাঁর জানাও ছিল না। এই অতি-পরিচিত তুচ্ছতা জানা থাকলেও তার এই অন্তর্নিহিত সত্যে শরৎচন্দ্রের প্রয়োজন ছিল না; এই সকরুণ বিস্ময়েও তাঁর প্রবৃত্তি ছিল না। কারণ, শরৎচন্দ্র বাস্তব চেতনায় অনুভাবিত কথাকার আর বিভূতিভূষণ বিস্ময়বোধের কথাকার; শরৎচন্দ্রের প্রধান বক্তব্য—সামাজিক সম্পর্কে মানুষের রূপ; আর বিভূতিভূষণের প্রধান বক্তব্য—সামান্যের মধ্যে অসামান্যের অনুভূতি।

জীবন-প্রীতি ও জীবন-ভীতি

‘পথের পাঁচালী’ বাস্তব-বিমুখ মধ্যবিত্ত বাঙালির এই রোমান্সে-পিপাসী তারটিই স্পর্শ করল। কিন্তু তার বিশেষত্ব এই যে, শরৎচন্দ্রের বাস্তব-সাক্ষ্যকেও তা একেবারে অস্বীকার করল না। রোমান্সের প্রধান কথা—বিস্ময়ের বোধন। কিন্তু সে বিস্ময় অসম্ভব দেশের অসম্ভব কথাকে আশ্রয় করে রচিত করা আর আবশ্যক নেই। ‘পথের পাঁচালী’র বিস্ময় পরিচিতের মধ্যে অপরিচিতের আবিষ্কারে; সহজের মধ্যে স্বপ্নময়তার সঞ্চারে; আর সামান্যের মধ্য থেকে অসামান্যের উদ্‌ঘাটনে। এই বিস্ময়বোধন বিশেষ করে সার্থক হল এই জন্য যে, ‘পথের পাঁচালী’ নিশ্চিন্দিপুরের কথা—আর বিস্ময় শিশু-মনেরই প্রধান রস, প্রায় তার নিজস্ব ধর্ম। তাই ‘পথের পাঁচালী’ আসলে পল্লিসমাজের কথা নয়—মাত্র একটি পল্লিগৃহের কথা; এবং মূলত অপু-দুর্গার মতো অনুভূতি-প্রবণ কল্পনা-কুশল শিশুলীলারই কাব্য-কথা। শরৎচন্দ্রের ‘পল্লি-সমাজের’

সত্যকে অস্বীকার সে করে না, তার পাশ কাটিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় পল্লিজীবনের ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের তেমনি সত্যনিষ্ঠ, অথচ রোমান্সের মায়া-মাখানো আর একটি রূপ। শরৎচন্দ্রকে অসত্য বলতে পারব না। কিন্তু সাধ্য কি বলব—এই শিশু-নয়নের দৃষ্টিতে নিশ্চিন্দিপুরের যতটুকু দেখেছি তা মিথ্যা? কি করে বলব, বাংলাদেশে এই নিশ্চিন্দিপুর আর তার অপু-দুর্গা শুধু কাল্পনিক? মিথ্যা আমাদের এই বিস্ময়বোধ?

কিন্তু এই বিস্ময়-বোধ যে কতখানি কাল্পনিকতাকে আশ্রয় করে দাঁড়াতে চায় তার পরিচয় পাওয়া গেল এর পর। 'অপরাজিত' 'পথের পাঁচালী'রই পরিণতি। প্রথম যখন তা প্রকাশিত হয় (১৯৩২) তখন তার বিচার সম্ভব ছিল না। বরং একটা নিঃশ্বাস ফেলে আরাম উপভোগ করলেন পাঠকেরা যখন ২৪ বৎসর পর অপু উপলব্ধি করলে নিশ্চিন্দিপুরেই তার নিজ বাসভূমি। অবশ্য 'অপরাজিত' জীবন-রহস্য তাকে টেনে নিয়েছিল দূরে—শহরে, গ্রামে, অরণ্যে—আর পরম বিস্ময়কর মানুষের জগতে। এই মানুষের জগতেই জীবনের সত্য পরিচয় আর জীবনের সত্য পরিণতি। যা 'পথের পাঁচালী' তা সেখানে দাশু রায়ের ছড়া ছেড়ে পরিণত হয় মহাকাব্যের মহিমায়। 'অপরাজিত জীবনরহস্য' সেখানে 'আত্মপ্রকাশ' করে জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে অপরাজয়ের সৃষ্টির সঙ্কেতে। তাও বিস্ময়, বরং তা'ই পরম বিস্ময়। কিন্তু এ পরম বিস্ময় শিশুর বিমুগ্ধ-বিস্ময় নয়; দ্বন্দ্ব-বিরোধ-মথিত মানব-সৃষ্টির মহান্ বিস্ময়। অথচ মানুষের এই জগতে অপু বয়সে বাড়ে, বাড়ে না জীবনবোধ; তাই বাড়ে না তার বিস্ময়-বোধও। এ সমালোচনা তাই অতি সত্য 'অপরাজিতের' অপু অপরাজিত নয়, 'তাহার সারা জীবনই তো অপরিণত।' (নীরেন্দ্রনাথ রায়, পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৩৯, পৃ. ৩২৮) অপু অনেক কিছুই বলে, অনেক ভাবে, অনেক কল্পনা করে—কিন্তু করে না জীবনের বিকাশ। তার চারদিকে মানুষ, চারিদিকে জটিলতা, চারিদিকে সেই চক্রব্যূহের অক্ষৌহিণী। কিন্তু মানুষের এই পৃথিবীতে সেই সব দ্বন্দ্বের পাশ কাটিয়েই অপু চায় জীবন। অথচ 'জীবন দ্বন্দ্বময়'। তাই সম্মুখের জীবনকেই পাশ কাটিয়ে অপু ফিরে যায় অতীত জীবনে—স্মৃতিতে। ৩৪ বৎসরের ক্রমবর্ধিত যৌবনেও সে পেতে চায় সেই শিশুতীর্থের আশ্রয়,—বাহ্যত তা নিশ্চিন্দিপুর, কিংবা বহিঃপ্রকৃতির অন্য কোনো কোল—যেমন, অমর-কণ্টকের বিপুল অরণ্যানী। প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগটা অপুর আন্তরিক, তাই অরণ্যেও সে স্বচ্ছন্দ;—সভ্যতার শৈশবে অরণ্যই তো ছিল মানুষের মাতৃক্রোড়। অমরকণ্টক তাই চির-অপরিণত অপুর সেই আত্ম-নিবদেনের সুরে গাঁথা এক মহান্ অরণ্য স্তব—(পৃ. ৩৬৪)। 'আরণ্যকে' তারই রোমন্থন চল্‌ল পাতার পর পাতা। দু'খানেই আছে সভ্যতার শৈশবের সেই শিশু-মানবের বিস্ময় ও গাম্ভীর্য; আছে পরিণত সভ্যতার মানুষের পক্ষে সেই বিস্ময়-বোধন, আশ্রয়-অন্বেষণ।

জীবনের বিপুল স্রোত অপুকে সামনেও টানছে—টানছে প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের বোঝাপড়ায়। অথচ চিরশিশু অপু আঁকড়ে ধরে এই তার আশ্রয়ভূমিকে। অপু শিশুই থাকতে চায়; দ্বন্দ্বময় জীবনকে সে চায় না, সম্ভবত চিনেও না। তার শিশুমন শেষ পর্যন্ত তাই শুধু স্মৃতিমন্থনেও আশ্রয় পায় না; আশ্রয় খোঁজে তখন অতি-প্রাকৃতিক স্বপ্নে, ভাববিলাসে। বিস্ময়-সন্ধানী দৃষ্টি তখন চায় 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'দেবযান'।

দ্বন্দ্বভীত মানুষ আসলে জীবন-ভীত মানুষ। আপনার শিশুজীবনকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারেনি বিভূতিভূষণের সাহিত্যজীবন। 'পথের পাঁচালী'র কীর্তিকে তাই তার ছাড়িয়ে যেতে পারেনি বিভূতিভূষণের কোনো কৃতিত্ব।

বিভূতিভূষণের কৃতিত্ব

কোনো লেখকের কীর্তি কী, সেইটাই বড় কথা। কী তাঁর অনায়ত্ত বা অসাধ্য, তা তত বড় কথা নয়। কিন্তু যা তার সাহিত্য-জীবনের পরিচয়কে স্পষ্টতর করে তা সর্বক্ষণই স্মরণ করা চলে। এ কথা মনে রাখা তাই অন্যায় নয়—বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-অনুরাগে ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় গাম্ভীর্য ও মহিমার সন্ধান করা চলে না; সেই awe amd adoration বিভূতিভূষণের নেই—প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর সেই ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় ঐকান্তিকতা নেই। আর 'পল্লী বনাম শহরের' প্রশ্নে বিভূতিভূষণের যে আবেগ-উচ্ছ্বাস, অনেকটাই তা আবেগ-মমতা। কারণ, এ প্রশ্ন বাঙালি জীবনে ওঠেইনি এখনো। শিল্পোন্নত সমাজ 'পল্লী বনাম শহর' এই প্রশ্নের সমাধান করছে নতুন বিজ্ঞানসম্মত সমাজতান্ত্রিক শিল্পাঙ্গিক বিন্যাসে। কিন্তু পল্লিপ্রকৃতি বা অরণ্যপ্রকৃতি যারই কোলে বিভূতিভূষণের আশ্রয় গ্রহণ করুন তিনি যে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন মাতৃক্রোড় ছাড়তে চান না বলে; জীবনের জটিলতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি বিমুখ। তাই তিনি মানুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতাদ্বৈত লীলার কবি হতে পারেননি; হয়েছেন গোষ্ঠলীলার কবি। আর এরূপ দ্বন্দ্ব-শঙ্কিত বলেই তাঁর বাংলার পল্লি চিত্রেও নেই কৃষক চরিত্র। কৃষি ক্ষেত্রেরও চিহ্ন তাতে নেই, আছে পড়ে ভিটে আর ঝোপ-ঝাড়। এইজন্যই তিনি নিম্ন মধ্যবিত্ত মনের ক্ষোভ-বেদনা-বিদ্রোহেও নির্বাক—অথচ এই বিস্ময়রসের অপেক্ষা তাদের জীবনের সেই রৌদ্র-বীভৎস রসও কম সত্য নয়। সেই ক্ষোভ থেকে তাঁর মতে নিস্তারের পথ 'দৃষ্টিপ্রদীপ'—অপস্মার, জীবন-সংগ্রাম নয়, সমাজের বিপ্লবী বিকাশ নয়।

দ্বন্দ্বেই যে ভীত, দ্বন্দ্বময় মানবপ্রকৃতি ও দ্বন্দ্বময়ী বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রহস্যকেই বা সে তবে উপলব্ধি করেছে কতখানি? বিভূতিভূষণের জীবনবোধ শিশুর জীবন-বোধ। শুধু তাই নয়। বিভূতিভূষণ 'অপরাজিত জীবন রহস্যের যে 'আত্মপ্রকাশ' দেখে মুগ্ধ, তাঁর দৃষ্টিতে সেই জীবন রসহ্য বা Life Force শুধুই অপু থেকে কাজলে

আবার 'আত্মপ্রকাশ' করে। কিন্তু নব নব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যে এই জীবন রসহ্য শুধু 'আত্মপ্রকাশ' করে না, আত্মবিকাশ করে, এ সত্যও বিভূতিভূষণের উপলব্ধিতে সুস্পষ্ট নয়। 'পথের পাঁচালী'-র পথটা তাই একটা জীবন চক্রের বৃত্তখণ্ড মাত্র। পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে তা ক্রমোদ্‌গতি লাভ করে না। জীবন সেখানে পাক খায়, এগোয় না। তাই বিভূতিভূষণ কখনো মানুষকে দেখেন না স্রষ্টা হিসাবে—যে মানুষ বহিঃপ্রকৃতিকে পরিবর্তিত করে, আর পরিবর্তিত হয় সঙ্গে সঙ্গে যার অন্তঃপ্রকৃতিও; যে শুধু বিমুগ্ধ শিশু নয়, সচেতন স্রষ্টাও। এ যুগের মানব-সভ্যতার এই বৃহত্তম আবিষ্কার ও জীবনের এই বিরাট রোমান্স বিভূতিভূষণের অগোচর।

জীবনের তবু যে পরিচয়খানি বিভূতিভূষণ লাভ করেছিলেন তা 'পথের পাঁচালী'-র পরেও দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরে বহু উপন্যাসে ও ডায়েরির অজস্র লেখায় তিনি উৎসারিত করে দিয়েছেন। তাতে কতো মানুষ, কতো ঘটনা, কতো অলৌলিক তত্ত্ব, আর কতো প্রতিদিনের সত্য পরিচিতি! বাংলা সাহিত্যে তাঁর সেই গল্প উপন্যাস ডায়েরীর পাতা—একটা কৃতিত্ব। অবশ্য যে বিস্ময় 'পথের পাঁচালী'-তে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তারপর আর কোনো নূতন বিস্ময় বা নতুন সত্যের তিনি সন্ধান দিতে পারেননি। সেই 'মেঠো একতারার উদার, অনাহত ঝঙ্কারই' বিভিন্ন বিচিত্র সুর-সংযোগেই মধ্যেও বরাবরই অক্ষুণ্ণ থাকবে, এই প্রতিশ্রুতি সত্যই তিনি পালন করেছেন। বারে বারে স্মৃতিমন্থনে বা জীবনাবর্তনে ফিরে ফিরে এসেছে সেই নিশ্চিন্দিপুরের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু জীবন তো পুনরুক্তি করে না আর সাহিত্যও এরূপ পুনরুক্তি একটা অভ্যাসের যান্ত্রিকতা, কিংবা আত্মগত দুর্বলতা। জীবনের সুনিবিড় পরিচয়ের প্রমাণ এ নয়; শিল্প হিসাবেও তা সীমাবদ্ধতার প্রমাণ।

সে সব অসংখ্য পুনরাবৃত্তি বাক্‌-বাহুল্য, গঠন-শিথিল ও জীবন সংগ্রামে বিমুখিতা সত্ত্বেও বিভূতিভূষণের পরবর্তী প্রত্যেকখানি গ্রন্থকে আমরা সাদরে গ্রহণ করেছি—এমনি তাঁর লিপিকুশলতা ও কলাকুশলতা; এমনি মাধুর্য তাঁর কল্পনাকুশল কবিমনের; এমনি অক্লান্ত তাঁর চিন্তা আর অফুরন্ত তাঁর চরিত্রসৃষ্টি—ক্ষোভহীন, গ্লানিহীন এক মানবীয় মমতায় অভিষিক্ত তাঁর পরিচিত জগৎ। তাঁর সাহিত্য একটি বড় সত্যের স্বাক্ষর—এই সত্যই সে সাহিত্যের জীবন কাঠি। "অতি হীনতম তুচ্ছতম একঘেয়ে জীবনও রোমান্স।" কারণ, তা জীবন, আর তাই সৃষ্টিময়। এবং জীবনের চরম বিস্ময় সেখানে হীনতাকে তুচ্ছতাকে একঘেয়েমিকে সে মেনে না নিয়ে, সদর্পে তা অপসারিত করে সকল মানুষের এই সৃষ্টিশক্তিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করে; কোনো জীবনকেই হীন, তুচ্ছ থাকতে দেয় না।

পুনর্মুদ্রিত
অগ্রহায়ণ ১৩৫৭

বিভূতিভূষণ : এক অনন্য আধুনিক

দেবারতি মল্লিক

১৮৯৪ থেকে ১৯৫০—ছাপান্ন বছরের জীবনে চোদ্দটি উপন্যাস লিখেছেন বিভূতিভূষণ। বহু খ্যাতি, নিন্দা, প্রশংসা, সমালোচনা কুড়িয়েছেন বাইশ বছরের ঔপন্যাসিক জীবনে। ১৯২৯ এ প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাসেই বাজিমাৎ ; অন্য উপন্যাসে দুর্বল, এমন বলতে অবশ্য রাজি নই। তবে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর মধ্যে যেমন মধুসূদনের কবিপ্রতিভা চিহ্নিত, 'পথের পাঁচালী'র জন্যে তেমন বিভূতিভূষণ। 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে ১৩৪০ বঙ্গাব্দে মন্তব্য করেন রবীন্দ্রনাথ—

> বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে।...এই গল্পে গাছপালা পথঘাট মেয়েপুরুষ সুখ দুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েছে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিস পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জগতের মত সুস্পষ্ট।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যসৃষ্টির অভিনবত্ব কোথায় তার রহস্য উন্মোচন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি, বৃহত্তর পল্লিবাংলার চিরপরিচিত ছবি, প্রকৃতির স্নেহাঞ্চলে ফিরে আসার আহ্বান বিভূতিভূষণের কথাশিল্পে বক্ষ্যমান। বিশ শতকের তিনের দশকে যারা লিখেছিলেন মূলত তাঁদের লেখায় নৈরাশ্য, হতাশা, অবক্ষয়, বিষাদ, সংস্কার, অস্থিরতা প্রাধান্য পেয়েছেন। এই সময়ে লিখছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীশ ঘটক, গোকুল নাগ, দীনেশ দাস, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ। এঁরা কল্লোল-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। নতুন যুগের বাণীবহন করতে চেয়েছেন কল্লোলের পাশ্চাত্য শিক্ষাদীপ্ত লেখকেরা। তাঁদের সম্পর্কে এমনটি লিখেছেন 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—

> কল্লোল-পর্বের তরুণ লেখকদের রচনায় প্রথম সমরোত্তর সংশয় ও অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ও নাগরিক মনোভাব, নেতিবাদী ও নাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গী, রোমান্টিক বিদ্রোহ ও দেশজ সংস্কৃতির অস্বীকৃতিমূলক মনোভাব প্রাধান্য পেয়েছিল। এরই প্রতিক্রিয়ায় ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে দেখা দিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর।[১]

ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকলেও ব্যবধান অনেকখানি। মানিক পুরোদস্তুর বামপন্থী লেখক। তারাশঙ্কর ডানপন্থী। বিভূতিভূষণ বাম ও ডান কোনো পন্থী নন—তিনি মানবপন্থী। মানুষ তাঁর কথাসাহিত্যে বিচিত্র জীবনবোধ নিয়ে উপস্থিত। এ মানুষ আবার পল্লিমানুষ। সম্ভবত পল্লিজীবন ও মৃত্তিকা ঘনিষ্ঠ বলেই তারা অধ্যাত্মবিশ্বাসী।

বিশ শতকের তিন থেকে পাঁচের দশক অর্থাৎ ১৯২১ থেকে ১৯৫০—এই ত্রিশ বছর বাংলা সাহিত্যের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাল। ইওরোপের মানচিত্রের ক্রমিক ভাঙন, সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার প্রসার, ভেদ-বৈষম্য সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন, ঈশ্বর-প্রকৃতি-লোকায়তদর্শনের ওপর আলোকপাত, নাগরিক চেতনা ও নগরায়ণের ক্রমাগ্রসরতা, মনোবিকলন ও মানবমনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উন্মোচন, সুস্থিরতার বিপরীতপ্রান্তে ঘোরতর অস্থিরতা ও নাস্তিচেতনার অসংখ্য কালো কালো ছাপ, যৌনচেতনা ও অপরাধ প্রবণতা, এই সময়ের চলচ্চিত্র-নাটক-তুলির টানের মধ্যে সংকেতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োগ, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, ঈশ্বরের পরিবর্তে ব্যক্তি আমির প্রবল আধিপত্য, ভোগ-বিলাস-পণ্যের অবিশ্বাস্য বাহার—এসব নিয়ে ১৯২১ থেকে ১৯৫০ কালপর্বের বিচিত্র বর্ণরূপ চমকিত করে। উপনিবেশ 'জীবনের চূড়ান্ত বিফলতাবোধ সঞ্জাত' অস্থিরতা ও দেহাশ্রয়ী নগ্ন বাস্তবতা, অশ্লীলতা, নাগরিক চেতনা, শাশ্বত নীতি ও জীবন দর্শন থেকে বেরিয়ে আসা, মননশীলতার বিচিত্র প্রয়োগ, সংকটের বহুমাত্রিক রং এই ঊনত্রিশ বছরের উপন্যাসে এসেছে। এই সময়কালের কথাসাহিত্যে লক্ষ করা গিয়েছে কতকগুলি একমুখীন বৈশিষ্ট্য, যেমন—

১

ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের দশকের নায়কেরা মৃত্তিকা-ঘনিষ্ঠ। যারা নাগরিক জীবনের জাতক তারা যোদ্ধা, নাগরিক ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন ও চিন্তাশীল। এদের অনেকেই বেশ অন্তর্মুখীন, এরা উদ্‌ভ্রান্ত নয়। সার্বিক-সংকটের মুখে পরেও বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে আলোর বলয়ে। তবে তাদের মধ্যে প্রবল মানসিক দ্বন্দ্ব, হৃদয়ে গভীর গহন জটিলতা আছে। আছে জীবন সম্পর্কে সুগভীর প্রত্যয় এবং কোনো দর্শন ধরে এগিয়ে যাওয়া ও সেই দর্শনে অন্যকেও প্রভাবিত করা।

২

উপন্যাসের শৈলীতে এসেছে পরিবর্তন। নাটকীয়তা, চিত্রধর্মিতা, আঞ্চলিকতা এসেছে। গতানুগতিক গল্পধারার পরিবর্তে টুকরো সংলাপ, কখনও সংগীত, কোথাও বা ভাষার কাব্যিকতা, কোথাও আবার কোনো বিশেষ চরিত্রের একাধিপত্য লক্ষ করা গিয়েছে।

৩

চরিত্রের প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব, আশাভঙ্গের চূড়ান্ত ব্যর্থতা ও কান্না, ক্লান্তি ও বিষাদ, কর্মবিমুখ ও বুদ্ধিসর্বস্ব মধ্যবিত্তের চূড়ান্ত বিপর্যয়, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে গ্রাম থেকে শহরে যাত্রা এবং শহরের আধুনিক চালচিত্র গ্রামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে গ্রামের স্বতন্ত্রতা নষ্ট করা—এসবই বিশ শতকের তিন থেকে পাঁচের দশকের ঔপন্যাসিকদের লেখার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৪

নব্য-নগরায়ণের একশত এক দুষ্টু সন্তানরূপে বিক্ষোভ, সংশয়, নৈরাশ্য, অস্থিরতা, ছন্নছাড়া মনোভাব, 'নোঙর-ছাড়া প্রেমের অভিযান', ব্যক্তিজীবনের ভাঙাগড়া ইত্যাদি দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। ঔপনিবেশিক কালপর্বে সাহিত্যে তার প্রভাব যথেষ্ট।

৫

রুচিবিকার ও বিকারগ্রস্ত মনের অতৃপ্তি, বিচার-বিবেচনাহীন যৌনসম্ভোগ, মানুষের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে লুকিয়ে থাকা 'রক্তের দোষ' বা ধাতুপ্রবৃত্তি ১৯২১ থেকে '৫০'-এর সাহিত্যে এসেছে।

৬

দেশবিভাগ, দাঙ্গা, মহামন্বন্তর, যুদ্ধ ও সাইরেনের তীব্র আর্তনাদ, খাদ্যসংকট, মৃত্যুর নীরব মিছিল এই সময়ের উপন্যাসে এসেছে।

৭

রোমান্টিকতাবর্জিত, ভাবালুতামুক্ত, নির্মোহ জীবনদৃষ্টির অধিকারী হতে চেয়েছিলেন ১৯২১ থেকে পঞ্চাশের কথাসাহিত্যিকরা। তাঁদের মতই সাহিত্যের পৃষ্ঠায় উদ্ভাসিত চরিত্ররা 'মেধাবী, সাহসী, জেদী এবং প্রখর আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন।' অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে অভ্রান্ত জীবনবোধে উপনীত হতে চেয়েছেন এই কালপর্বের কথাসাহিত্যিকরা।

৮

তীক্ষ্ণাগ্র ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষা, বিকারজর্জরিত ব্যর্থ দাম্পত্যজীবন, অবদমিত 'ইদ' ও 'লিবিডো'র অন্তর্গূঢ় জটিলতা, সেক্স ও ভায়োলেন্স-এর পারস্পরিক সখ্যতা ও

সাহিত্যের পৃষ্ঠায় তার উপস্থিতি, কুটিল মনের গোপন হিংসা উঠে এসেছে কথাসাহিত্যে।

৯

নীচুতলার মানুষের ক্লেদ-পঙ্কিল জীবন তথা অন্ত্যজ, ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিতদের 'তুচ্ছতর সুখ-দুঃখ আকাঙ্ক্ষার' কথা শুনিয়েছেন লেখকরা। প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, লোকাচার, আচার-প্রথা, সংস্কার, রীতি-নীতি, পূজা-পার্বণ যা মূলত নিম্নবর্গের জীবন-সম্পৃক্ত তা উঠে এসেছে সাহিত্যে। অর্থাৎ লোকজীবন, লোকসমাজ, লোকসংস্কৃতি, লোকায়ত দর্শন সাহিত্যে আলোকিত হয়েছে।

১০

জেমস জয়স, ভার্জিনিয়া উলফ্, অলডাস হাক্স্লি, মার্সেল প্রুস্ত, ডরোথি রিচার্ডসন ইতিমধ্যে বাংলা উপন্যাসের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে রচিত কথাসাহিত্যে ডারউইনের যোগ্যতমের উদ্বর্তন, অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ, মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, রুশবিপ্লব ও দুনিয়াব্যাপী মেহনতী মানুষের একাধিপত্য নতুন আলো ফেলেছে। বস্তুত, পাশ্চাত্যের নানামুখী সাহিত্যান্দোলন ও আন্তর্জাতিক ঘাত-অভিঘাত এই সময় কথাসাহিত্যের চেতনাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সমুদ্রসৈকতে দাঁড়ালে দেখা যায়, অস্থির সমুদ্রের অসংখ্য ঢেউ আছড়ে পড়ছে, তটভূমিকে ভিজিয়ে দিচ্ছে, আবার ফিরে যাচ্ছে। বিশ শতকের তিন থেকে পাঁচের দশকে সাহিত্যিকদের চিন্তার তটভূমিতে হাজারো দেশ-কাল-আন্তর্জাতিক চিন্তা-চেতনার ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। ইতিমধ্যে সমগ্র ইওরোপে মানচিত্রের দ্রুত বদল হয়েছে দেশের মধ্যেও তখন চলছে স্বাধীনতা আন্দোলন। ১৯১৭'র রুশ বিপ্লবের পর ভাবা গিয়েছিল বিকল্প শক্তি পাওয়া গিয়েছে। বিপদমুক্ত হতে চলেছে বিশ্বের সাধারণ মানুষ। সাম্যের সুখান্তি বাতাসের সেদিন কি কদর! কিন্তু এই সুখ শেষ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন স্বস্তির বার্তা বহনে ব্যর্থ হয়।

১৯২৩-এর নভেম্বরে হিটলার ক্ষমতায় এলেন জাত্যাভিমানের বীজমন্ত্র সম্বল করে। মুসোলিনি পৌঁছে গেলেন ইতালির শাসনযন্ত্রের কেন্দ্রে। ১৯২৯-এ অর্থনৈতিক মন্দা ও বিশ্বরাজনীতিতে তার প্রভাব পড়ে। ১৯৩১-এ জাপানি হামলা হয় মাঞ্চুরিয়াতে। এই ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দেই ইতালি দখল করে নেয় ইথিওপিয়াকে। ১৯৩৬, শুরু হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধ এবং ফ্যাসিস্ট ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে আপোষহীন সশস্ত্র সংগ্রাম। অবশেষে ১৯৩৯, সেপ্টেম্বরের এক তারিখে পোল্যান্ডের ওপর জার্মানির আক্রমণে

শুরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অনেক কিছু হারিয়ে যখন তৃতীয় বিশ্বে আমরা এলাম তখন দেখলাম আমার বিচ্ছিন্ন, নিঃসম্বল, আত্মদুর্গে নির্বাসিত বাস্তবিকই। সত্যি কথা বলতে কি দয়াহীন নির্মম যন্ত্রপীড়িত পৃথিবীতে আমরা নিতান্ত অসহায়।

W. H. Auden এঁর 'September 1st, 1939' কবিতায়, পাবলো পিকাসোর আঁকা বিষণ্ণতার ছবি 'গোর্নিকা'তে, T. S. Elliot এর 'The waste Land' কাব্যে রক্তের ছোপ, বিষাদের বহুমাত্রিক কোণ চিত্রিত হয়েছে।(২) ১৯২৯—৫০-এর সময়কালে 'বৈশ্বিক বিনাশের পাশাপাশি স্বদেশের নানামুখী সংকট' কথাসাহিত্যিকদের চেতনায় ধাক্কা দিয়েছিল। ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ ও তার বিরুদ্ধে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন, ১৯০৮-এ বালক ক্ষুদিরামের ফাঁসি, ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগের গণহত্যা, ১৯৪২-এ আগস্ট আন্দোলন ও মেদিনীপুরে বিধ্বংসী সাইক্লোনসহ বন্যা, ১৯৪৩-এ মহামন্বন্তর, ১৯৪৬-এ দাঙ্গা ও নৌবিদ্রোহ, ১৯৪৭-এ দেশস্বাধীন হল ঠিকই; কিন্তু তার এক হাতে দ্বিখণ্ডিত স্বদেশ আর অন্য হাতে উদ্বাস্তু সমস্যা। 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশকাল থেকে বিভূতিভূষণের মৃত্যু—এই একুশ বছরের শেষ দশটি বছর সম্পর্কে লিখেছেন অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—

> এই দশ বছরে (১৯৪১—৫০) বাঙালির জন্মান্তর হলো, শত প্রয়াসেও আর আমরা তিরিশের দশকের শান্তি, স্বস্তি ও মন্থরগতি জীবনে ফিরে যেতে পারি না। শরৎচন্দ্রীয় রোমান্টিক যুগের অবসান, কল্লোলীয় বোহেমিয়ান পালার অবসান, বিভূতিভূষণের প্রকৃতিমুগ্ধতার অবসান।(৩)

১৯৪১ থেকে ৫০-এর সাহিত্যের তিনটি বিষয়ের অবসান হয়েছিল— রোমান্টিকতা, উন্মাদনা ও প্রকৃতিমুগ্ধতা।

১৯২৮—২৯ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'পথের পাঁচালী' রচিত হওয়ার সময় 'যোগাযোগ' (১৯২৭-২৮) উপন্যাসটিও রচিত হচ্ছিল ধারাবাহিকভাবে। ১৯২৯-এ প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' ছাড়া আরও একটি উপন্যাস 'শেষের কবিতা'। ইতিপূর্বে ১৯২৭-এ শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের আকাশ-ছোঁওয়া জনপ্রিয়তার মধ্যে বিভূতিভূষণ উপস্থিত হলেন ভিন্ন স্বাদ নিয়ে। চেষ্টাকৃত শৈলী নিয়ে তিনি চিন্তিত নয়। দারিদ্র্যের বঞ্চনা ও যন্ত্রণা নিয়ে বহুস্বর শোনানোর ইচ্ছেও তাঁর নেই। রাষ্ট্রযন্ত্র নিয়েও তাঁর মাথাব্যথা নেই। 'কোনো যুগবিক্ষোভ ও সাময়িক চাঞ্চল্যে তিনি উত্তেজিত হননি।'

নিসর্গ, অধ্যাত্ম ও মানব নিয়ে তাঁর ভাবনা অনন্ত। সাহিত্যতত্ত্ব, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আন্দোলন ও সাহিত্যে তার প্রভাব ও প্রয়োগ নিয়ে কোনো আগ্রহ ছিল না। বিপ্লবের প্রেরণা ও মেহনতী মানুষের গণ-অভ্যুত্থানের হাতিয়ার হিসেবে সাহিত্য

কাজ করুক—এমন দায়বদ্ধতা নিয়ে ভাবিত ছিলেন না। তাই তাঁর সৃষ্টি চরিত্র কারাবাসের মধ্যে আত্মতৃপ্ত হয় না, বিদ্রোহের জন্যে প্ররোচনা দেয় না। প্রচারসর্বস্ব সাহিত্যের বিপরীতে বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্য তাই 'দেশের সত্যিকার মাটিতে শিকর চালিয়ে', প্রাণের তৃপ্ত রস সংগ্রহ করে। যে কারণে নদীমাতৃক ও কৃষিভিত্তিক পল্লিজীবন তাঁর অন্বিষ্ট। আবার পল্লির কূটৈষণা, জিঘাংসা ও জটিলতা তাঁর কাঙ্ক্ষিত নয়। বিভূতিভূষণের প্রত্যাশিত পল্লি নিসর্গ-সৌন্দর্যে উজ্জ্বল। সেখানে থাকে নির্জনতা—'যে দিকে চাই, কোন দিকে কাউকে চোখে পড়ে না।' থাকবে গাছপালার সমাবেশ—'বনে, ঝোপে, পাতায়, লতায়, ফুলে, ফলে, খড়ে, ঘাসে অযত্ন সজ্জিত প্রকৃতির পরিস্ফুট বন্যসৌন্দর্য।'

বিভূতিভূষণ সেই 'দিবাবসান'কে হৃদিপদ্মে বসাতে চাইতেন যেখানে নদী-গাছ-পালা-ঝোপ-ঝাড়, যেখানে দিনের রবি রাতের চাঁদ মাখামাখি করে আছে। বিভূতিভূষণ সেই গাছপালা দেখতে চাইতেন যা 'সম্পূর্ণ বনজ, একেবারে খাঁটি নিঁখুত বনজ।' বিভূতিভূষণের প্রার্থিত পল্লির মধ্যে থাকে অন্তত 'কটা বড় সাঁইবাবলা গাছ, তলায় আধ-শুকনো উলুখড়, কাঁটাওয়ালা বৈঁচি গাছ, আসশেওড়া, ভাঁট, কচু, ওল, বিছুটি লতা' ইত্যাদি। এর মধ্যে বিভূতিভূষণ লাভ করেন 'কি আরাম'! অনুভব করেন অনাবিল শান্তি—'এমন শান্তি অনেকদিন অনুভব করিনি—চারিদিকে চেয়ে শান্তি—কেউ কোন দিকে নেই।'

বিপুল বিশ্বের তাবৎ জীব-জড়বস্তুর মধ্যে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেন বিভূতিভূষণ। তারা অনুভবে জেগে ওঠে বস্তুবিশ্বের মধ্যে 'কি আশ্চর্য নাড়ীর যোগ!' 'কি বিপুল রহস্যে ভরা তাদের এই পরস্পরনির্ভরতা!' বিভূতিভূষণের এই অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও পরিদৃশ্যমান; যা 'বসুন্ধরা' কবিতায়, 'ছিন্নপত্রে'র বিশ্বানুভূতিতে ধরা পড়েছে। বিভূতিভূষণ লিখছেন—

> এই পাখী, এই প্রজাপতিটা, এই ফুল, এই তুচ্ছ কি গাছটা, এই লতা, এই আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, ঐ যে উজ্জ্বল হয়ে আসছে ঐ চাঁদটা, এই চারিধার, এই প্রাণী-জগৎ, ঐ লক্ষ মাইল দূরের সূর্য, ঐ অনন্ত মহাব্যোম, এই বিপুল বিশাল অচিন্তনীয় অসীমতা— সবগুলোর মধ্যে পারস্পরিক কি আশ্চর্য নাড়ীর যোগ! কি বিপুল রহস্যে ভরা তাদের এই পরস্পরনির্ভরতা।[(৪)]

নগর নিয়ে সাহিত্যে যখন মাতামাতির অন্ত নেই, তখন জটিল ও দুর্বোধ্য নাগরিক সমাজ বিভূতিভূষণের মনের দর্পণে কোনো প্রতিবিম্ব তুলতে পারেনি। বিভূতিভূষণের থেকে পাঁচ বছরের কনিষ্ঠ কবি জীবনানন্দও (১৮৯৯—১৯৫৪) দেখেছেন মৃত নগরের অবাক নির্জনতাকে—

নগরীর সিঁড়ি প্রায় নীলিমার গায়ে লেগে আছে;
অথচ নগরী মৃত।
সে-সিঁড়ির আশ্চর্য নির্জন
দিগন্তরে এক মহীয়সী,
আর তার শিশু
তবু কেউ নেই।[৫]

উনিশ শতকের শেষ দশকের চাঞ্চল্যকর মুহূর্ত থেকে বিশ শতকের পাঁচের দশকের যে অস্থির কালপর্বে বিভূতিভূষণের আয়ুষ্কাল, সেই কালপরিধিতে গণনাতীত বিপন্ন বিস্ময়, সীমাহীন যন্ত্রণা এবং বেদনাবহ বিনষ্টির ইতিহাস চলেছে। সংঘবদ্ধ জীবন থেকে যোজন দূরে দাঁড়িয়ে 'We are always in error/Lost sin the wood.' অপূর্ণতা তখন ছায়ার মতো ঘুরছে মানুষের পেছনে—প্রেতাত্মার মতো। নিরন্তর আত্মক্ষয়ী আমরা তখন। শেকস্‌পিয়ারের ম্যাকবেথের অনুভূতি ছিল আমাদের অনুভূতি—

To-morrow, and to-morrow and to-morrow
Creeps on this petty pace from day to day.
To the last syallable of recorded time,
And all our yesterdays have lighted foots
The way to dusty death.

সার্ত্র-এঁর 'waiting for the next' বা অনন্ত প্রতীক্ষা ও অতৃপ্ত প্রত্যাশার ভুবন রচনার কাজ চলছিল মানুষের মনে, সাহিত্যের পৃষ্ঠায়। সব থাকতেও 'তবু কেন এমন একাকী' হয়ে পড়েছিলাম আমরা, এই যখন আত্মজিজ্ঞাসা; তখন বিভূতিভূষণ আমাদের মুক্তি দিলেন নষ্টচিন্তা থেকে। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি আমাদেরকে স্বপ্নদূতির হাত ধরে কল্পনার রাস্তা ও বাস্তবের কাঠিন্যমুক্ত অবন্তী, বিদিশা, শ্রাবস্তীর কাছে নিলেন না ঠিকই; কিন্তু স্বপ্নভরা জগতে নিয়ে গেলেন। যেখানে আছে মুক্ত বিশ্ব, নিশ্চিত জীবন, ধোঁয়ামুক্ত নিঃশ্বাস আর মাটির তাজা রোদে পোড়া গন্ধ। সেখানে ঘুঘু ডাকে, চাঁদনী জ্যোৎস্না ভিজিয়ে দেয় বসুন্ধরার এলোচুলকে। এই মেদুর নিসর্গ, বৈকালের রোদ গায়ে জড়ান শান্তশ্রী গ্রাম, আর নির্লোভ 'ছেঁড়া কাপড় গেরো দিয়ে পরা' পল্লিমানুষ বিভূতিভূষণের অতিপ্রিয়। এদের কথাই তিনি বলতে ভালোবাসেন। এর মধ্যেই যে রয়েছে সমাজ-ইতিহাসের পরিচয়। পরিণত অপু লিখতে চায়। কিন্তু তার লেখায় কাদের কথা থাকবে? অপুর মনোলোকের কথা, বিভূতিভূষণের ভাষ্যে ধরা পড়ে এভাবে—

> কত লোকের কথা। গরীবের কথা। ওদের কথা ছাড়া লিখিতে ইচ্ছা হয় না। পথেঘাটে, হাটে, গ্রামে, শহরে, রেলে কত অদ্ভুত ধরনের লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়াছে জীবনে—কত সাধু-সন্ন্যাসী, দোকানী, মাস্টার, ভিখারী, গায়ক, পুতুল-নাচওয়ালা, আমপাড়ানি, ফেরিওয়ালা, লেখক, কবি, ছেলেমেয়ে—এদের কথা। এই বিষয়গুলিই বিভূতিভূষণের গল্পে-উপন্যাসে এসেছে। তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা গোপন অশ্রু-জলের কাহিনি, দারিদ্র্যের সকরুণ ছবি, হাসি-কান্না-পুলক উঠে এসেছে সাহিত্যে।

অপু লিখতে চেয়েছিল, কাদের নিয়ে লিখবে তাও জানিয়েছিল, কিন্তু অপুর লেখা আমরা পড়িনি; তার মনের পরিধিকে চিনে নিয়েছি আমরা। কিন্তু তার স্রষ্টা বিভূতিভূষণের সাহিত্য পড়েছি। তাঁর সাহিত্যে কোন্ বিষয়গুলি রূপায়িত হবে তাও জেনেছি। 'আমাদের মত পরাধীন দরিদ্র দেশের সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে কথাসাহিত্যের উপাদান তেমন মেলে না।'— মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া এমন আংশিক-সত্য বক্তব্যের বাইরে বিভূতিভূষণের নিজেরও কিছু বলার থাকতে পারে—

> বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক—বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যাসকাল, আকাশ-বাতাস, ফলফুল— বাঁশবনের, আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনে ফুল বিছানো পথের ধারে যেসব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখদুঃখকে রূপ দিতে হবে।[৬]

বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্যে মানুষের 'গোপন সুখ-দুঃখ' এর দেখা মেলে। তাই 'স্বপ্নবিলাসী, বাস্তববিমুখ, সংসার উদাসীন, ভ্রাম্যমান কথক' হরিহর সহায়সম্বলহীনা ইন্দিরঠাকরুণ, অশ্রুমুখী সর্বজয়া, দরিদ্র রাজা দোবরু, অসহায়া রাজকন্যা ভানুমতী, যুগলপ্রসাদ, রাজু পাঁড়ে, মঞ্চী, কুন্তী তারই দৃষ্টান্ত।

আবহমানকালের পল্লিবাংলার আদর্শায়িতরূপ বিভূতিভূষণের রচনা থেকে উঠে আসে। বাংলাদেশ বলতে তিনি সামান্য শৌখীন সংস্কৃতিঘেরা কোনো ভৌগোলিক চিত্র বুঝতেন না। তাঁর বাংলাদেশ আসলে বিশ্বনীড়ের সংক্ষিপ্ত রূপ। কবি অমিয় চক্রবর্তীর বাংলাদেশও এমন সুন্দর। আসলে সে বাংলাদেশ আদুরে জননী-জন্মভূমি। সেখানে ছিল 'সহস্রের একটি কাহিনি'। তাই এখানে কান পাতলে শোনা যায় 'গাঙে স্রোত, ভাটিয়ালী, কীর্তন'; দেখা যায় 'লণ্ঠন-ঝোলান গোরুর গাড়ি/ছায়ায় ছায়া আঁকি চলে।' বিভূতিভূষণের দেখা ও চেনা গ্রামের সঙ্গে আমাদের তিনি পরিচয় করিয়ে দেন—

> মাঠের সামনে গ্রাম পড়ল।...অন্ধকার ঝুপসী বাঁশ-বাগানের মধ্যে ডোবার ধারে বসে একজন পল্লীবধূ বাসন মাজছে—তাদের তরুণ জীবনও সেই বাঁশ-বাগানের মধ্যেকার আসন্ন শীত সন্ধ্যার মতই ঘুলঘুলি অন্ধকার। সামনে এক বাড়ীর দোর খুলে আর একটি বধূ এ-হাতে একটি ঘড়া ও-হাতে আর একটি নিয়ে বার হয়েই হঠাৎ আমায় সামনে দেখে ঘড়াসুদ্ধ ডান হাতটা তাড়াতাড়ি খানিকটা উঠিয়ে এবং মাথাটা খানিকটা নুইয়ে হাতের কাছে নিয়ে গিয়ে ঘোমটা টেনে দিলেন। একটি বাড়ির মধ্যে উঁচু মেয়েলী কণ্ঠের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে—'আমি জানি নে খুড়িমা, মায়ের ঘরেই তো ছিল, কে নিয়েছে আমি জানি নে!' জন-চার-পাঁচ ছেলে মেয়ে দাঁড়িয়ে—তাদের মধ্যে একজন একটা কঞ্চি হাতে উঠানের একটা কুলগাছ থেকে কাঁচা সবুজ কুল পাড়ছে।(৭)

গ্রাম বাংলার এই রূপ নিঃসন্দেহে আদর্শ গ্রামের মডেল কেমন হতে পারে, বা কেমন হওয়া উচিত তাকে যেন চিনিয়ে দেয়।

'প্রাচীন সাহিত্যে'র "মেঘদূত" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিরহী যক্ষের মতো আমাদের প্রাচীন তপোবনীয় আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন ও নির্বাসিত হওয়া শাপগ্রস্ত অসহায় মানবরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। 'কল্পনা' কাব্যের "স্বপ্ন" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বজন্মের প্রথম পিয়াসীর হাতে হাত রেখেছিলেন, অতীতের দ্বীপভূমিতে ক্ষণিকের জন্যে পা রেখেছিলেন। এই অতীতমুখীনতা বিভূতিভূষণের সাহিত্যে রয়েছে। অতীতমুখীনতার কারণে তাঁর রচনায় একাধিকবার স্মৃতি চলে আসে। এমনকি সুদূরের রহস্যানুসন্ধান; যা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি জাগ্রত করে তার সুরও বিভূতি-সাহিত্যে পাওয়া যায়—

> কে জানে সতের বছর আগে হয়তো এই জীর্ণ পরিত্যক্ত আবাসে কোন নববধূ তার মেথিতে ভেজানো সুগন্ধ নারকেল তেলের পাথরবাটি ঐ কুলঙ্গিতে রেখে দিত! ঐ ঘরের মধ্যেই কত বছর আগেরকারের তাদের ফুলশয্যার প্রথম প্রণয়ের মধুরাত্রি কেটে গিয়েছে!
>
> কোথায় আজ আশি বৎসর আগেকার সে সব প্রথম প্রণয়-হর্ষাকুলা তরুণী নববধূ? কোথায় তাদের প্রিয়জনেরা? কোন্ দূর অতীতে কতদিন হল ছায়ার মত মিশে গিয়েছে, কে আজ তাদের সন্ধান দিতে পারে!(৮)

জীবনকে উপলব্ধি করা, অতীতকে ফিরে পাওয়ার ব্যাকুল আহ্বান বিভূতিভূষণের মতো আর কে এমন করে ধ্বনিত করতে পেরেছিলেন—

> অন্য কিছু চাই নে, এ গাঁয়ের বন, ঝোপ, নদী, মাঠ, বাঁশবাগানের ছায়ায়, অবোধ, উদগ্রীব স্বপ্নময় আমার সেই যে দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি তাকে আর একটিবার ফিরিয়ে দেবে দেবী?

'অপরাজিত' উপন্যাসের সেই প্রশ্ন অত্যন্ত মর্মভেদী। 'দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি' ফিরে পেতে চেয়েছিল 'অপরাজিত'র পঁয়ত্রিশ বছরের অপু।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সমগ্র বিশ্ব জুড়েই তাঁর বিচরণের নীড় তৈরি থাকুক—'যত্র বিশ্ব ভবত্যেক নীড়হম্'। 'পথের পাঁচালী', 'ইছামতী', 'অপরাজিত' এমনকি যাকে প্রক্ষিপ্ত রচনা বলা হয় সেই 'অশনি সংকেত'-এ বিভূতিভূষণ শুধু মানুষ সন্ধান করেছেন; যে মানুষ শত বিপর্যয়েও মুখের হাসি ভোলে না। পৃথিবীর যা কিছু আনন্দময় তাকে বুঝতে চেয়েছেন। কোনো তত্ত্ববিশ্বে বা রাজনীতির তাত্ত্বিকতায় নিজেকে মিশিয়ে দেননি। অসীম অনন্ত কৌতূহলে বিশ্বকে দেখতে চেয়েছেন তিনি। অপু তাই লিখতে চেয়েছে আফ্রিকার এক মরুবেষ্টিত পল্লি কুঠিরের ক্রীতদাস হওয়া নিগ্রো পিতৃ-মাতৃহীন সন্তানের অনাদর লাঞ্ছিত জীবনকথা। এই ধরনের বঞ্চিত জীবনকথা রচনায় অপুকে 'আফ্রিকার নীরব নৈশ আকাশ প্রেরণা দিত।' এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, জীবনের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ থেকেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ লেখেন—

> Thanks to the human heart its which we live.
> Thanks to its tenderness its joys and fears.[৯]

ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো বিভূতিভূষণও বলতে পারতেন 'My theme/No other than the very heart of man.' বিভূতিভূষণ মানবপ্রেম থেকে পৌঁছে যান অধ্যাত্মপ্রেমে। আর সেই প্রগাঢ় অধ্যাত্মপ্রেম থেকে বিভূতিভূষণ উচ্চারণ করতে পারেন এমন প্রার্থনাবাক্য—

> ভগবান আমি তোমার অন্য স্বর্গ চাই না—তোমার দেবলোক পিতৃলোক বিষ্ণুলোক—তোমার বিশাল অনন্ত নক্ষত্রজগৎ তুমি পুণ্যাত্মা মহাপুরুষদের জন্যে রেখে দিও। যুগে যুগে তুমি এই মাটির পৃথিবীতে আমাকে নিয়ে এস।[১০]

মাটির পৃথিবী তাঁকে টেনেছিল বড় কাছ থেকে, যার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করি অপুর মধ্যে 'অপু মাটি দেখিতে না পাইলে থাকিতে পারে না।'

বিশ শতকের তিন থেকে পাঁচের দশকের যে অস্থির ধ্বংসাত্মক ঝড় বিশ্বভুবনকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল; সেই ঝড়ের মধ্যে 'ঘরভোলা মুগ্ধদৃষ্টি কিশোরে'র মতো নিজস্ব এক স্বতন্ত্র বলয় নির্মাণ করে শান্ত ও স্থিতধী প্রজ্ঞায় অপেক্ষমান ছিলেন বিভূতিভূষণ। সমকালের কোনো লেখকের সঙ্গে তিনি তুলনীয় নন। মানিকের সঙ্গে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ বা তারাশঙ্করের মতো গান্ধিবাদী মনোভাব তাঁর ছিল না। বাম বা ডান—কোনো দিকে ঝুঁকে থাকেন না। বস্তুত তিনি মানবপন্থী। মাটির পৃথিবীর সুখে-দুঃখে থাকা মানুষই তাঁর অন্বিষ্ট। মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি তাঁর মতো করে এমন ফটোগ্রাফিক ফ্রেমে আরে কে ধরে রাখার বিরল ক্ষমতা

অর্জন করেছেন। পরিবেশবাদীরা যখন তত্ত্ববিশ্ব সন্ধান করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্যে হাজার সেমিনার শেষেও কোনো সুফল সূর্যোদয় দেখতে পান না; তখন বিভূতিভূষণ কী রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী হিসেবে উচ্চারণ করেছিলেন 'ফিরে চল মাটির টানে।' মাটি তো বস্তুখণ্ডমাত্র নয়; মাটি তো মানুষের জীবন-মরণের সাথী—তাই নাগরিক কলকাতায় বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে পায় না বিভূতিভূষণের অপু। আজ এজন্যে কোনো বিকল্প তত্ত্ববিশ্ব দাঁড় করিয়ে বা পাশ্চাত্যের কোনো তাত্ত্বিক ফ্রেমে বিচার করা যাবে না আমাদের বিভূতিভূষণকে। তিনি সর্বার্থে এক অনন্য আধুনিক।

<u>উৎসের সন্ধানে</u>

১. *কালের পুত্তলিকা*, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ, এপ্রিল ২০০৪, পৃ. ২১৮
২. *বিষণ্ণতাবোধ ও আধুনিক বাংলা কবিতা*, হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্চ ১৯৯৯; দ্র. 'বিষণ্ণতাবোধ : বিশ্বপটভূমি'।
৩. *কালের প্রতিমা*, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ. ২১৪
৪. *বিভূতি রচনাবলী*, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ, নবম খণ্ড, পৌষ ১৪০৪, 'দিবাবসান', পৃ. ৪৩৫
৫. *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ভারবি, জুন ২০০১, বেলা অবেলা কালবেলা, মানুষের মৃত্যু হলে, পৃ. ১২৩
৬. *সাহিত্যের কথা*, পরিশিষ্ট—*স্মৃতির রেখা*।
৭. দ্র. ৪, পৃ. ৪৩৬
৮. তদেব, পৃ. ৪৩৫
৯. Intimations of Immortality
১০. স্মৃতির রেখা।

সতীন ভাবনার অফ্‌রোডে বিভূতিভূষণ

শৌভিক চট্টোপাধ্যায়

অসথ কেটে বসত করি
সতীন কেটে আলতা পরি।[১]

সতীন সম্পর্ক যে বাংলায় কতখানি দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ ছিল তার ঝুড়িঝুড়ি নমুনা মেলে। শুধুমাত্র লৌকিক ছড়ায় নয়, মধ্যযুগের শিষ্ট সাহিত্য অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও সতীন কথায় কুরুক্ষেত্রই লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত, আমাদের মনে পড়বে মুকুন্দের 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ স্বর্ণগোধিকার বেশধারী দেবী চণ্ডী যখন নারী মূর্তি ধারণ করেছেন আর সেই দেখে ফুল্লরা তাঁকে সতীন ভেবে (কালকেতুর দ্বিতীয় পক্ষ) প্রথম পর্যায়ে তাঁকে নিরস্ত্র করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হাটের মাঝে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেছে। আর তখনই কালকেতুর সেই বিড়ম্বনাজনিত সরস সংলাপ—

সাসুড়ি ননদি নাঞি নাঞি তোর সতা
কা সনে কন্দল করি চক্ষু কৈলে রাতা।[২]

মনসার ক্ষেত্রে তো ব্যাপারটা আরো সাংঘাতিক, তাকে তো চণ্ডী সতীন সন্দেহে একেবারে...। যেখানে অ্যাটেম্‌ড টু মার্ডার হতে পারতো, সেখানে কেসটাই ডিসমিস করে দেওয়া হলো। আর মা গঙ্গা নেহাত একটু বেশিমাত্রায় সহনশীল, শিবের মাথায় থাকতে গিয়ে কি কম কথা শুনতে হয়েছে পার্বতীর কাছে!

এতো গেল আদি-মধ্য যুগের সাহিত্যের কথা। দেশে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিয়ে এল ইংরেজ। ইংরেজকুলের বাংলা শেখার কৌশলে বাংলাসাহিত্য গদ্য পেল ফোর্ট উইলিয়ামের সৌজন্যে। সেই গদ্য সাবালক হয়ে উঠল বিদ্যাসাগরের হাতে। পাশাপাশি সমাজ-সংস্কারও গতি পেল। রামমোহন করলেন 'সতীদাহ প্রথা' রদ (১৮২৯) আর তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে আইনি হলো 'বিধবাবিবাহ' (১৮৫৬)। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার বাবু কালচারের সাথে জড়িয়ে পড়ল বহুবিবাহের ভিন্ন এক রূপ। প্রচারের আলোয় আসতে তৎকালীন উচ্চবিত্তের সমাজে স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ধনবান ব্যক্তিরা পুনরায় বিবাহ করে এক ধরনের মেকি সমাজসেবায় নেচে উঠল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন, 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। সেখানেও

দেখা গেল সতীন সম্পর্কের সাতকাহন। কুন্দর জন্যে যখন সূর্যমুখী সিঁদুর কৌটা এগিয়ে দিচ্ছে—তা কি মন থেকে? আর ভ্রমর যদি আর একটু মুখরা হতো তবে নিঃসন্দেহে রোহিণীর সাথে চুলোচুলিতে মেতে উঠতো। রবি ঠাকুর নেহাত অন্য পথের পথিক তাই বিনোদিনী ও আশালতাকে খেউরে নামতে দেননি। মনে রাখতে হবে তাও তো তারা সমাজে স্বীকৃত নয়, মনোজগতের সতীন মাত্র। দৈব পুত্তলি থেকে 'ক্ষীরের পুতুল' সব ক্ষেত্রেই সতীন সম্পর্ক—'অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ' ঢালো।

কিন্তু আপনারা যদি মনে করেন পরিচিত এই পুরোনো কাসুন্দি কেন ঘাঁটছি? তবে বলব এতো সব সাত-সতেরোর কারণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হ্যাঁ বিভূতিভূষণই বাংলা সাহিত্যে সতীন সম্পর্ককে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখালেন তাঁর 'আরণ্যক' (১৯৩৯) ও 'ইছামতী' (১৯৫০) উপন্যাসে। যদিও মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত 'ইছামতী' পরে প্রকাশ পায়, কিন্তু তার কাহিনি 'আরণ্যক' এর তুলনায় বেশিদিন পূর্বের। তাই আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা প্রথমে নামব 'ইছামতী'তে। কাহিনির নায়ক ভবানী বাড়ুয্যে না হলেও 'ইছামতী'র যে সে মুখ্য পুরুষ চরিত্র; এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। গ্রামজ্যেষ্ঠ চন্দ্র চাটুজ্যের দূর সম্পর্কের এই ভাগ্নেটি 'সন্নিসি হয়ে গিইছিল। বেশ সুপুরুষ।'[৩] নীলকুঠির দেওয়ান ডাকসাইটে রাজারাম এহেন ভবানীর গ্রামে ফেরার খবর পেয়ে চন্দ্র খুড়োর মধ্যস্থতায় তার তিন বোন তিলোত্তমা, স্বরবালা আর নীলনয়না সংক্ষেপে তিলু, বিলু ও নীলুর বিয়ের সম্বন্ধ পেড়ে বসল। আর অন্যদিকে 'তিনজনকে এক ক্ষুরে মাথা মুড়তে হবে'[৪] জেনেও তিলু, বিলু বা নীলু কেউই আপত্তি করল না। আর কি-ই বা করতো তারা—

> তিলু কত রাত পর্যন্ত ছাদে বসে ভাবলে। ত্রিশ বছর তার বয়স হয়েচে। স্বামীর মুখ দেখা ছিল অস্বপনের স্বপন। এখনো বিশ্বাস হয় না; সত্যিই তার বিয়ে হবে? স্বামীর ঘরে সে যাবে? বোনেদের সঙ্গে, তাই কি? ঘরে ঘরে তো অমন হয়েই থাকে। বিয়ের দিন কবে ঠিক করেচে দাদা কে জানে। বরের বয়স পঞ্চাশ তাই কি, সে নিজে কি আর খুকি আছে এখন? উৎসাহে পড়ে রাত্রে তিলুর ঘুম এল না চক্ষে।[৫]

এরপর 'ইছামতী'র বুকে ভবানী ও তার তিন ঘরণীর দাম্পত্য কাহিনি দীর্ঘ পরিসরে বর্ণিত হয়েছে। 'ইছামতী'র পাঠকেরা হয়তো বলবেন ভবানী একটু একচোখামিই দেখিয়েছে। বিলু, নীলুর চেয়ে তার প্রেম বড়োবোন তিলোত্তমার প্রতিই বেশি ধরা পড়েছে। অভিযোগটি অবশ্য নেহাত ভিত্তিহীন নয়। লেখকের ভাষায়—

> তিলু সত্যিই বড় ভালো গৃহিণী, ভবানী ওর কথা চিন্তা করলেই আনন্দ পান। তাঁকে যেন ও দশ হাত বাড়িয়ে ঘিরে রেখেচে জগদ্ধাত্রীর মতো। এতটুকু অনিয়ম, এতটুকু অসুবিধে হবার জো নেই।[৬]

এই অবস্থায় যখন নারীর একাধিপত্যসুলভ ঈর্ষা থেকে তিন বোনের সতীন কলহ বেধে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল, তখনো বিভূতিভূষণ কিছু বিপরীতই দেখান। অল্পবিস্তর

রঙ্গ-তামাশা তিন বোনে ছিল বটে, কিন্তু বিবাদ! নৈব নৈব চঃ। এই ঠাট্টা তামাশাগুলোই যেন তিন বোনের সম্পর্ককে আরো নিবিড় করে রেখেছিল।

> ভবানী নদীর ধার থেকে সন্দের পর ফিরে আসতেই নীলু বললে—শুনুন, আপনাকে আর দিদিকে জোড়ে যেতি হবে ও বাড়ি—বৌদিদির হুকুম—
> —আর তুমি আর বিলু?
> —আমাদের কে পোঁছে? নাগর-নাগরী গেলেই হোল।[৭]

এখানেই শেষ নয়। তথাকথিত সভ্য জনচিত্তে যা অশোভন বলে বিবেচিত হতে পারতো সেইক্ষেত্রেও বিভূতিভূষণের চরিত্রেরা যেন কত সহজ, সরল, স্বাভাবিক—

> তিলুকে হঠাৎ চলে যেতে উদ্যত দেখে ভবানী বললেন—চলে যাচ্ছ যে? খোকা কই? তিলু হেসে বলল—আহা, আজ তো নীলুর দিন। বুধবার আজ যে মনে নেই? খোকা নীলুর কাছে। নীলু আনবে।
> —না, আজ তুমি থাকো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।
> —বা রে, তা কখনো নয়। নীলু কত শখের সঙ্গে ঢাকাই শাড়ীখানা পরে খোকাকে কোলে করে বসে আছে।
> —তুমি থাকলে ভালো হোত তিলু। আচ্ছা বেশ। খোকনকে নিয়ে আসতে বলো।[৮]

কিংবা;

> আজ বিলুর পালা। রাত অনেক হয়েছে। তিলু লালপাড় শাড়ি পরে পান সেজে দিয়ে গেল ভবানীকে। বললে—শিওরের জানলা বন্ধ করে দিয়ে যাবো? বড়ো হাওয়া দিচ্চে বাদলার—
> —তুমি আজ আসবে না?
> —না, আজ বিলু থাকবে।[৯]

কী বলবেন একে! অসম্ভব, অবাস্তব নাকি বাস্তবতার এ এক অন্যদিক যা এতদিন বাঙালি পাঠকদের কাছে অপ্রত্যক্ষ ছিল? রামায়ণে কৈকেয়ী নিজের ছেলেকে অযোধ্যার যুবরাজ করতে চেয়ে যেখানে মন্থরার প্ররোচনায় হীন চক্রান্ত করেছিল, সেখানে দেখি ভবানী আর তিলুর সন্তান খোকা (টুলু)-র ঘটা করে অন্নপ্রাশন দেবার জন্য তিলু, বিলু ও নীলু একযোগে আর্জি জানিয়েছে ভবানীর কাছে।

> তিলু রাগভরে ঘাড় বাঁকিয়ে বললে—আমি শুনবো না, দিতিই হবে খোকার ভাত।
> নিলু কোথা থেকে এসে বললে—দেবেন না ভাত? তবে বিয়ে করবার শখ হয়েছিল কেন?
> ভবানী তিরস্কারের সুরে বললেন—তুমি কেন এখানে? আমাদের কথা হচ্ছে—
> নিলু বললে—আমারও বুঝি ছেলে নয়?
> —বেশ। তাই কি?
> —তাই এই—খোকনের ভাত দিতে হবে সামনের দিনে।[১০]

যদিও বিভূতিভূষণ একেবারে কাহিনির প্রাথমিক পর্বে লিখছেন—'বিলুর স্বভাব অনেক বদলেচে, দু'এক মাস পরে তারও ছেলেপুলে হবে।'[১১] কিন্তু সেই সন্তানের কোনো আগমনবার্তা উপন্যাসে নেই। আষাঢ়ের বৃষ্টিবাদলের দিনে জ্বর বিকার নিয়ে স্বামীর কোলে মাথা রেখে খোকনের নাম করতে করতে সে বিদায় নিল আখ্যানের বিশ্বলোক থেকে। তবুও ভবানী ও টুলুকে নিয়ে তিলু এবং নীলুর মধুর দাম্পত্য অক্ষুণ্ণই রইল।

এবার আসা যাক 'আরণ্যক'-এর কথায়। উপন্যাসের প্রথমেই ঔপন্যাসিক লিখেছেন —'পনের-ষোল বছর আগেকার কথা।'[১২] অর্থাৎ পত্রিকায় প্রকাশ (১৯৩৭-৩৯)-এর হিসেবে 'আরণ্যক'-এর ঘটনা বিগত শতাব্দীর দু-এর দশকের গোড়ার দিকের। বিভূতিভূষণ নিজের জঙ্গল জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করলেন ম্যানেজার সত্যচরণের মধ্য দিয়ে, আর সেই রোমাঞ্চকর বর্ণনায় আপামর বাঙালি পাঠক ড্রয়িং অ্যাডভেঞ্চার করতে লাগলেন সত্যচরণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে। প্রতিবার পাঠক নিজে সত্যচরণ হন, খুঁজে পান নিসর্গের রহস্য, বুনো তেউড়ির গন্ধ। উপলব্ধি করেন টাঁড়বারোকে, তথাকথিত অনার্য রাজকন্যা ভানুমতির সরল প্রেম আর না বলা উচ্চারণকে। মঞ্চীকেও নিশ্চয় পাঠকেরা ভোলেননি। সত্যচরণ নিজেই যেখানে ভুলতে না পেরে উপন্যাসের একেবারে অন্তিমে লিখেছেন—

> আর মনে হয় মাঝে মাঝে মঞ্চীর কথা। অনুতপ্তা মঞ্চী কি আবার স্বামীর কাছে ফিরিয়াছে, না আসামের চা-বাগানের চায়ের পাতা তুলিতেছে আজও।[১৩]

সেই মঞ্চীর পরিবারের সঙ্গে সত্যচরণের প্রথম পরিচয়টা পাঠকের কাছে যতটা মজার, সত্যচরণের কাছে ততটাই ছিল বিস্ময়কর—

> মঞ্চী যে নক্‌ছেদীর কে হয় তাহা এতদিন জিজ্ঞাসা করি নাই, যদিও ভাবতাম বৃদ্ধের মেয়েই হইবে। আজ ওর কথায় আমার আর কোনো সন্দেহ রইল না।
>
> বলিলাম—তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছ কোথায়?
>
> নক্‌ছেদী আশ্চর্য হইয়া বলিল—আমার মেয়ে! কোথায় আমার মেয়ে হুজুর?
>
> —কেন এই মঞ্চী তোমার মেয়ে নয়?
>
> আমার কথায় সকলের আগে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল মঞ্চী। নক্‌ছেদীর প্রৌঢ়া স্ত্রীও মুখে আঁচল চাপা দিয়া খুপরির ভিতর ঢুকিল।
>
> নক্‌ছেদী অপমানিত হবার সুরে বলিল—মেয়ে কি হুজুর! ও যে আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী!
>
> বলিলাম—ও!
>
> অতঃপর খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। আমি তো এমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম যে, কথা খুঁজিয়া পাই না।[১৪]

ঝর্ণার মতো মঞ্চীর স্বভাব অচিরেই সত্যচরণকে আকর্ষিত করেছিল। সে প্রসঙ্গ ভিন্ন আমরা বরং মঞ্চীর নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনাকেই প্রাধান্য দেব। এক মাঘী

বসন্তে শিশু সন্তানটি মরল, বসন্তের ছোঁয়াছুঁয়ির বিচারে খাসমহল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো নক্‌ছেদীদের। সেই রাতেই নিরুদ্দিষ্ট হল মঞ্চী। ঔপন্যাসিক লিখছেন—

> সন্ধ্যার সময় নক্‌ছেদীর খুপরিতে গিয়ে দেখিলাম তুলসী তাহার ছেলেমেয়ে লইয়া চীনার দানা ছাড়াইতেছে। আমায় দেখিয়া তুলসী কাঁদিয়া উঠিল। দেখিলাম মঞ্চী চলিয়া যাওয়াতে সেও যথেষ্ট দুঃখিত। বলিল—হুজুর, সব ঐ বুড়োর দোষ। গোরমিন্টের লোক মাঠে সব টিকে দিতে এল, বুড়ো তাকে চার আনা পয়সা দিয়ে তাড়ালে। কাউকে টিকে দিতে দিলে না। বললে, টিকে নিলে বসন্ত হবে। হুজুর তিন দিন গেল না, মঞ্চীর ছেলেটার বসন্ত হল, মারাও গেল। তার শোকে সে পাগলের মতো হয়ে গেল—খায় না, শুধু কাঁদে।[১৫]

ভাবতে অবাক লাগে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে একদিকে যেখানে লহনা খুল্লনার রূপ সৌন্দর্যের ওপর আক্রোশ দেখিয়ে তাকে দিয়ে ছাগল চরিয়েছে, তার শরীরকে আকর্ষণহীন করে দিয়ে স্বামী সোহাগ থেকে তাকে বঞ্চিত করে দেওয়ার কূটকৌশল চালিয়েছে, সেখানে বিভূতিভূষণের অরণ্যজীবী কাটুনি গাঙ্গোতা নক্‌ছেদী ভকতের প্রথমা স্ত্রী তুলসী তার সতীনের নিরুদ্দেশ যাত্রায় দুঃখ পেয়ে চোখের জল ফেলেছে।

'আরণ্যক'-এর সেই দক্ষিণ-বিহারের রেলস্টেশনের কাছে বসত গড়া সেই বাঙালি ব্রাহ্মণ পরিবার। তিন মেয়ে (ধ্রুবা, জবা ও ছোটোটির নাম অনুল্লিখিত) ও এক ছেলে। তাদের বাবা প্রথমে ডাক্তারি করত। তার মারা যাওয়ার পরে পরিবারটির অর্থনৈতিক অবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। সত্যচরণ বলেছেন—

> বড়ছেলে একেবারে হিন্দুস্থানী—চাষবাস দেখাশোনা করিত, বয়স্থা ভগ্নীদের বিবাহের জোগাড় সে চেষ্টা করিয়াও করিতে পারে নাই—বিশেষত পণ দিবার ক্ষমতা তাদের আদৌ ছিল না জানি।
>
> তাহার দাদা এ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, এমন যদি কোনো পাত্র পান, তিনটি মেয়েকেই একপাত্রে সম্প্রদান করবেন। মেয়ে তিনটিরও নাকি অমত ছিল না। শুনিয়াছিলাম বিবাহ করিতে ধ্রুবরাও খুব আগ্রহ। সে নিজে নাকি কাহাকে বলিয়াছিল, তাহাকে যে বিবাহ করিবে তাহার বাড়িতে উদুখলওয়ালী ডাকিতে হইবে না—সে একাই ঘন্টায় পাঁচ সের গম কুটিয়া ছাতু করিতে পারে।
>
> হায় হতভাগিনী বাঙালী কুমারী।...কে আর দরিদ্র দেহাতী বয়স্থা মেয়েকে বিনা পণে বিবাহ করিয়া পাল্কিতে তুলিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছে, মঙ্গলশঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে! শান্ত মুক্ত প্রান্তরে যখন সন্ধ্যা নামে, দূর পাহাড়ের গা বাহিয়া যে সরু পথটি দেখা যায় ঘনবনের মধ্যে চেরা সিঁথি মত, ব্যর্থ যৌবনা দরিদ্রা ধ্রুবা হয়তো আজও এত বছরের পরে সেই পথ দিয়া শুকনো কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া পাহাড় হইতে নামে—এ ছবি কতবার কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—[১৬]

এই ধ্রুবা, জবারাই কি পূর্ণতা পায় 'ইছামতী'র তিলু, বিলু, নীলু-তে এসে? যদি ধ্রুবাদের বিয়েও হতো আমরা প্রায় নিশ্চিত চরম দুর্যোগেও সতীন কলহ বাধত না।

এখন যদি প্রশ্ন ওঠে বিভূতিভূষণের এই সতীন সম্পর্কের চেনা পথে না হাঁটার কারণ কী? উত্তর হবে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা। তিনি বরাবরই যা নজরের বাইরে তা দেখেছেন, দেখানোর চেষ্টা করেছেন। যা আপাত অশোভন, তা তাঁর লেখায় গুরুত্ব পায়নি। তাই তো দেখি 'হিঙের কচুরি'-তে যেখানে অন্য কেউ বারবণিতা কুসুমের জীবনের অন্ধকার দিকটিকে মুখরোচকভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ হাতছাড়া করতেন না, সেখানে যৌনতার পরিবর্তে বিভূতিভূষণ দেখিয়েছেন গল্পকথক ছোটো ঠাকুরকে ঘিরে কুসুমের বাৎসল্যের কথা। গয়া মেম ('ইছামতী') তাই জীবনবোধে ও প্রেমচেতনায় পদী ('নীলদর্পণ')-কে পেরিয়ে যায় আলোকবর্ষের পথ। জীবনদর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থেকেই বিভূতিভূষণ প্রথানুগত্যের বিপ্রতীপে সতীনদের চেনা কূটকচালির বাইরে এক অচেনা সম্পর্কের মাধুর্যকে দেখিয়েছিলেন। বাস্তবতার দিক থেকে যা অচেনা লাগতে পারে বটে কিন্তু বিভূতিভূষণের জীবনবোধের ভাবনায় তা ছিল গভীরতর সত্য।

উৎসের সন্ধানে

১. ড. জয়শ্রী ভট্টাচার্য, 'বাংলা প্রবাদে নারীমন', পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯৭, পৃ. ২২
২. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, 'চণ্ডীমঙ্গল', সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৩ পৃ. ৬২
৩. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ইছামতী', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., চতুর্দশ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৪। পৃ. ৭
৪. তদেব, পৃ. ৯
৫. তদেব, পৃ. ৯
৬. তদেব, পৃ. ১৪
৭. তদেব, পৃ. ৩১
৮. তদেব, পৃ. ৫০
৯. তদেব, পৃ. ১৩৯
১০. তদেব, পৃ. ৪৩
১১. তদেব, পৃ. ৩০
১২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আরণ্যক', আদিত্য পুস্তকালয়, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ৫
১৩. তদেব, পৃ. ১৬৮
১৪. তদেব, পৃ. ৯৫
১৫. তদেব, পৃ. ১২৮
১৬. তদেব, পৃ. ১৩৭-১৩৮

পথের দেবতা পথের মানুষ

ত্রয়ী চ্যাটার্জ্জী

মানুষের জীবন-যাপন যদি একপ্রকার পথ চলা হয়, তাহলে সেই পথ চলা অবশ্যই গন্তব্য অভিমুখী। মানুষের জীবনের গন্তব্যস্থল মানুষের আকাঙ্ক্ষা-নির্ভর হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে আকাঙ্ক্ষা ইতিবাচক পরিণতি পায়, তেমনটা নয়। তাই মানুষের হতে চাওয়া আর হয়ে ওঠার মধ্যে দেখা দেয় বিস্তর ফারাক। 'অপরাজিত'-র অপু, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-র শশী বা 'ধাত্রীদেবতা'-র শিবনাথের পথ চলা তাই কোনোদিনই শেষ হয় না। নিয়তিকে জয় করে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার লক্ষ্যে তাদের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। শিকড়ের আকর্ষণকে কাটিয়ে উঠে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে আধুনিক মানুষ, তাদের নিয়ে কাহিনি রচনা করতে বসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাঙতে হয় কথাসাহিত্যের চেনা ছক। পাঁচালির কাহিনি নির্মিত হয় কোনো দেবী বা দেবতাকে কেন্দ্র করে নয়, আধুনিক মানুষকে কেন্দ্র করে, তার জীবনে নিয়তির হস্তক্ষেপকে কেন্দ্র করে, সর্বোপরি তার জীবনের পথকে কেন্দ্র করে।

সরস্বতী পুজোর দিন বিকেলে গ্রামের বাইরে নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে যাচ্ছে নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোক। সেই দলে হরিহরের সাথে অপুও আছে। কাহিনি অনুসারে, গৃহস্থের উঠোন, আমবাগানের সীমা টপকে অপুর সেই প্রথম গ্রামের বাইরে যাওয়া। চারদিকে ঝোপঝাড়—অপুর দুই চোখে অসীম কৌতূহল—

> বেশ জমিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ হরিহরের ছেলেটি মহা উৎসাহে পাশের একটা উলু খড়ের ঝোপের দিকে আঙুল তুলিয়া চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া গেল—ওই যাচ্ছে বাবা, দ্যাখো বাবা, ওই গেল বাবা, বড়ো বড়ো কান, ওই—

এখান থেকেই শুরু প্রকৃতির মাঝে অপুর নিজেকে চিনতে শেখা, পারিপার্শ্বকে আবিষ্কার করা। 'অপরাজিত'-তে সংসার-বিচ্ছিন্ন, নিস্পৃহ, আত্মমগ্ন যে অপুকে আমরা পাই—তারই সম্ভবনা দেখা গিয়েছিল সেদিনের সেই ছোট্ট অপুর মধ্যে। দিদি দুর্গার সাথে বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়ানো, বনভোজন করা, বাছুর খুঁজতে যাওয়া, গা ছমছমে আতুরি বুড়ির বাড়ির চারপাশে ঘুরে ঘুরে ছোট্ট অপু স্বাধীন হতে শিখেছিল।

এরপর একদিন দিদির মৃত্যু—জীবনের এই অবশ্যম্ভাবী সত্যের মুখোমুখি হল অপু বালক বয়সেই। নিজের অজান্তেই যেন ধীরে ধীরে অপু হয়ে উঠেছে পিছুটানহীন এক আত্মকেন্দ্রিক মানুষ।

সংসারে থেকেও সংসার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে অবস্থান করা মানুষের কথা বিভূতিভূষণের উপন্যাসে বারে বারে ফিরে এসেছে। যেমন—ইছামতীর ভবানী—আধ্যাত্মিক মার্গে জীবনযাপন করে একাকী মোক্ষলাভের মতো স্বার্থপরতা তিনি করেননি। বরং গ্রামবাংলার তিন অনূঢ়া কুলীন কন্যাকে বিবাহ করেছেন সন্ন্যাস ত্যাগের পরেই। অবিবাহিত কন্যাদের সামাজিক লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর গার্হস্থ্য জীবনযাপনে যেন অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তির স্বাদ উপলব্ধি করার আনন্দ লক্ষিত হয়।

'অশনি সংকেত'-এর গঙ্গাচরণ চক্কত্তি-ও এমনই একজন। ভবানী বাড়ুঁজ্যের মতো তিনি অধ্যাত্ম পথের পথিক নন ঠিকই, কিন্তু এক অস্থির পথিক সত্তা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। ভাগ্যান্বেষণের তাগিদে বারবার সংসার গুটিয়ে তাঁকে আর অনঙ্গ বউকে পথে নামতে হয়েছে—

> ...আশ্বিন মাসে পুজোর পরই ওরা প্রথমে এলো এই ভাতছালা। এখানে প্রথম প্রথম ভালোই চলেছিল, পরে একটু অসবিধা হয়ে গেল। তার প্রধান কারণ, ভাতছালায় এরা এসেছিল স্থানীয় গোয়ালারা ধানের জমি করে দেবে আশা দিয়েছিল বলে।...বিরক্ত হয়ে ওরা এখান থেকে উঠে যায় বাসুদেবপুরে। সেখানে অন্য সুবিধে মন্দ ছিল না, কিন্তু ম্যালেরিয়াতে অনঙ্গ বৌ মরে যাওয়ার জোগাড় হল। তখন নতুন গাঁয়ের কাপালীদের সঙ্গে বাসুদেবপুরের হাটেই আলাপ হয় গঙ্গাচরণের, কাপালীরা পাঠশালার মাস্টার চাইচে শুনে গঙ্গাচরণ যেতে রাজি হয়। ওরাও খুব আগ্রহ করে নিয়ে যেতে চায়। সেই থেকেই নতুন গাঁয়ে বাস।

'পথের পাঁচালী'-র হরিহরও এমনই এক পথের মানুষ। ভাগ্যান্বেষী হরিহর কৃষ্ণনগর থেকে নিশ্চিন্দিপুর ফিরেছেন পুজোর সময়। নিয়ে এসেছেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য নতুন কাপড়-জামা। তিনি জানেন না যে, দুর্গা আর বেঁচে নেই। ঠিক যেমন স্ত্রী সর্বজয়া কবে কিশোরী থেকে ধীরে ধীরে যুবতি হয়ে উঠেছেন সে খবরও জানতেন না হরিহর। পশ্চিমে ভবঘুরে জীবন কাটিয়ে দীর্ঘদিন পর সর্বজয়াকে দেখে নতুন করে সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। একই সঙ্গে তাঁর অন্তরের পথিক সত্তাকেও বহন করে চলেন। এই অস্থির জীবনের জন্য দারিদ্র্যই যে একমাত্র দায়ী, তা কিন্তু নয়। দুর্গার মৃত্যুর পর একটা শূন্যস্থান, হারানোর বেদনা, স্মৃতির হাতছানি—এই সমস্তই হরিহরের সংসারকে ঘরছাড়া করেছিল। সেইসময় থেকে অপুর পথিক জীবন শুরু। হরিহর যেন তার ভবঘুরে সত্তার উত্তরাধিকার দিয়ে দিলেন অপুকে সেদিনই—

> হঠাৎ অপুর মন এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভরিয়া গেল। তাহা দুঃখ নয়, শোক নয়, বিরহ নয়, তাহা কী সে জানে না। কত কী মনে আসিল অল্প এক মুহূর্তের মধ্যে...কতদিনের কত হাসি খেলা...পটু...দিদির মুখ...দিদির কত না মেটা সাধ... পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যে অবাক ভাষা, চোখের জলে আত্মপ্রকাশ করিয়া যেন এই কথাই বারবার বলতে চাহিল—আমি চাইনি দিদি, আমি তোকে ভুলিনি—

ক্রমে এই আত্মদ্বন্দ্ব অপুর মধ্যে আরোও স্পষ্টভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। নিজের বংশ পরিচয়কে ছাড়িয়ে আত্মপরিচয় গড়ে তোলার প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করে সে। তাই কাশীতে চরম অভাবের মধ্যেও সে কোনোদিন তার বাবার মতো কথকতা পড়ে পয়সা উপার্জন করতে যায়নি। বরং বাবার মৃত্যুর পর মায়ের ছত্রছায়া ছেড়ে চলে গেছে কলকাতায়। পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করবে সে জীবনে স্বচ্ছলতা আসবে, নাম করা লেখক হবে—এই তার স্বপ্ন। তবু দরিদ্র হরিহরের ছায়া যেন সবসময় ঘিরে রেখেছে তাকে। একসময় মায়ের মুখে কাশীদাসী মহাভারত শুনে কল্পনার জাল বুনত বালক অপু। রথের চাকা মাটিতে আটকে যাওয়ায় বীর কর্ণের অসহায় অবস্থা ব্যথিত করতো তার কোমল চিত্তকে। আজ যেন মহাভারতের সেই চরিত্রটিই ভর করেছে তার উপর। দারিদ্র্য তার জীবনরথের চাকাকে ক্রমাগত গতিহীন করতে বদ্ধপরিকর। আর সেই প্রতিকূল অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ক্রমাগত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে ইচ্ছে অপূর্বকে।

অপূর্বর জীবনপথে বারংবার বাঁকবদল ঘটিয়েছে মৃত্যু। দুর্গার মৃত্যুর প্রসঙ্গ আগেই এসেছে। দিদির মৃত্যুর ঘটনা অপুর জীবনে যে কতখানি সুদূরপ্রসারী তা 'অপরাজিত'-এর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর 'মৃত্যু' এক নতুন তাৎপর্যে ধরা দিয়েছে অপুর মননে। 'মৃত্যু' অর্থাৎ 'মুক্তি'। তাই সর্বজয়ার মৃত্যুর পর আমরা কোনো কাতরতা দেখি না। অপু যেন উপলব্ধি করেছে মৃত্যুতে মুক্তি শুধুমাত্র তার মায়েরই হয়নি, সে নিজেও মুক্ত। দায়ভারহীন এক অন্য জীবনকে দ্রুত বরণ করে নিয়েছে সে দার্শনিক নিস্পৃহতায়। আর অপর্ণার মৃত্যু তার মধ্যে এনেছে বৈরাগ্য। সংসারের সমস্ত সম্পর্ককে অস্বীকার করে অজ্ঞাতবাসী হয়েছে সে। অপুর চরিত্র নির্মাণে বিভূতিভূষণ এক বিস্ময়কর বৈপরীত্যের সঞ্চার করেছেন। সংসার থেকে একদিকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে অপু। মৃত্যু এসে ছিন্ন করে দিচ্ছে একে অপরের মুষ্টিবদ্ধ হাত। অপরদিকে, হাজার যোজন মাইল দূরে নিভৃত জীবনযাপনে অপু অতীত জীবনের আস্বাদ নিচ্ছে স্মৃতিচারণার মাধ্যমে। বিষণ্ণ রোমান্টিকতার সাথে মিশে যাচ্ছে নিস্পৃহ জীবনদর্শন।

আপাতদৃষ্টিতে, আমাদের অনেকসময়ই মনে হয় অপূর্ব তথা সমগ্র পথিক মানুষের এই সংগ্রামী পথ চলা অনেকখানি বেদনাদায়ক। কিন্তু 'পথের পাঁচালী'-র শেষ কয়েকটি

লাইন এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। কিশোর অপু বিধবা মাকে নিয়ে কাশী থেকে ফিরতে চায় নিশ্চিন্দিপুরে। 'ঠিক যেন নিশ্চিন্দিপুরে যাওয়া হয়'—অপুর এই অন্তরের আর্তি। দীর্ঘ প্রবাসের পর সে শিকড়ের টানে ফিরতে চায় জন্মভূমিতে। একটা স্থায়ী আশ্রয়ের জন্য তার উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা। কিন্তু—

> পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটলতায় কী ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়? তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইচ্ছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে...পথ আমার চলে গেল সামনে...দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডি এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে...
>
> সে পথের বিচিত্র আনন্দ-যাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি!...

এই আনন্দযাত্রার সত্যকার অংশীদার হতে পেরেছে 'অপরাজিত'-র অপূর্ব বা আরণ্যকের সত্যচরণ, সে কথা বলাই বাহুল্য। অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয় কেবলমাত্র এক 'বিপন্ন বিস্ময়'-কে সঙ্গী করে পথ চলেছে তারা। পথের দেবতা তাদের জন্য অবারিত রেখেছে জীবন-মরণ, মাস-বর্ষ-মন্বন্তর-মহাযুগ পার হয়ে যাওয়া এক অনন্ত পথ। অমোঘ সেই পথের আকর্ষণ। নাঢ়া বইহারের জঙ্গালে একাকী বিচরণ করতে করতে সত্যচরণ উপলব্ধি করেছে সেই রহস্যকে—

> প্রকৃতির সে মোহিনীরূপের মায়া মানুষকে ঘরছাড়া করে, উদাসীন ছন্নছাড়া ভবঘুরে হ্যারি জন্‌স্টন্, মার্কোপোলো, হাডসন, শ্যাকল্‌টন করিয়া তোলে—গৃহস্থ সাজিয়া ঘরকন্না করিতে দেয় না—

এমনকি পথের বাঁকে বাঁকে নিজেকে আবিষ্কারের আনন্দ যে মৃত্যুভয়কেও কেড়ে নেয় তার প্রমাণ আমরা পাই সত্যচরণের সরস্বতী কুণ্ডী, জয়ন্তী পাহাড়ের জঙ্গাল ভ্রমণের মধ্য দিয়ে।

এই পথের দেবতা—তাঁকে super natural power, নিয়তি, ভাগ্যদেবতা, জীবন দেবতা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই অলক্ষ্য শক্তির উদ্দেশ্যেই একসময় বলেছিলেন—

> তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
> আছে কী হোথায় নবীন জীবন,
> আশার স্বপন ফলে কী হেথায় সোনার ফলে?
> মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল কথা না বলে।

এ এমন এক শক্তি যা মানুষকে চালনা করে, যার সাথে মানুষের সম্পর্ক নিবিড় হলেও পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে। পথের বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে রাখে অপার বিস্ময়।

ইছামতীর তীরে আড়ম্বরহীন গার্হস্থ্য জীবন, চকমকিটোলায় ভানুমতির আতিথেয়তা, কুন্তার আত্মসম্মান বোধ, দোবরু পান্নার স্মৃতিশৌধের শুভ্রতা, বন্য হরিণের চোখের চাহনিতে আত্মজকে খুঁজে পাওয়া—এই সমস্তই পথিকের জীবন পথের পাথেয় হয়ে যায়। এই অদৃশ্য পরিচালক জন্ম-মৃত্যুর সীমানা ছাড়িয়ে পথকে প্রসারিত করে দেয় অনন্তের দিকে। হরিহরের ভিতরকার যে পথিক সত্তা একদিন বাসা বেঁধেছিল অপূর্বর মধ্যে তা-ই একসময় অজান্তেই সঞ্চারিত হয় কাজলের মধ্যেও।

সহায়ক গ্রন্থ

১. বিভূতি রচনাবলী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.।
২. বিভূতিভূষণ : বিচার ও বিশ্লেষণ, সম্পাদনা পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, পাণ্ডুলিপি।
৩. শতবর্ষের আলোকে বিভূতিভূষণ, সম্পাদনা অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উথক প্রকাশনী।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসে মুসলিম নর-নারী

কামরুজ্জামান

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের কাল থেকেই হিন্দু-মুসলমান আপন আপন স্বাতন্ত্র্যকে সযত্নে রক্ষা করেছে পরস্পরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েই। জাতি-ধর্মের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই, মানুষের মধ্যে এক ব্যাপক বিশ্বজনীনতা রয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে এই গভীর উপলব্ধির কথা শুনতে পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মুসলিম প্রভাব যেমন দেখতে পাওয়া যায়, দীর্ঘকাল একত্রে বসবাসের জন্য পরস্পরের উপরে প্রভাব বিস্তার এক অনিবার্য পরিণতি। আর তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যিকের সচেতন লেখাতেই—

> মানুষকে শুধু চলতে হবে, চলাই তার ধর্ম। পথের লেখা তোমাকে আশ্রয় করুক। যুগে যুগে তোমাকে আসতে যেতে হবে—পথের বাঁকে বাঁকে ডালি সাজিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে—অনন্ত জীবনপথে কতবার তুমি তাদের পাবে। আবার পেছনে ফেলে চলে যাবে—আবার পাবে।...চরণ বৈ মধু বিন্দতি।...জীবনে অনন্তকে চিনতে হবে...গতির মধ্যে দিয়ে অন্তরের স্বরূপ চোখে ধরা দেবে। হে জীবন পথের পথিক, পথের ধারে ঘুমিয়ে পড়ো না। নির্জন গ্রহের নির্জন পর্বতে যুগ অক্ষয় তরুণ দেবতার কথা মনে পড়ে।...সম্মুখে তার বিশাল অজানা বিশ্ব। দেবতা হয়েও সব জানেনি। অশান্ত প্রাণ-পাখী আর মানে না—সবদিকের বন্ধনহীন, নিঃসঙ্গ, উদাস, অনন্ত, অকূল নীলব্যোমে মুক্তপক্ষে ওড়বার জন্যে ছটফট করছে—উড়তে চায়—উড়তে চায়—পরিচিত বহুবার দৃষ্ট—একঘেয়ে গতানুগতিক গণ্ডীর মধ্যে আর নয়...হয়তো দূরে দূরে কত শ্যামসুন্দর অজানা দেশ সীমা—তুহিন শীতল ব্যোমপথে দেবলোকের মরু পর্বত, আলোর পক্ষে ভর দিয়ে শুধু যেখানে যাওয়া যায়, অন্যভাবে নয়।...জীবনটাকে বড় করে উপভোগ করো, বাঁচার পাখীর মতো থেকো না। ('স্মৃতির রেখা')

এই হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অচল-অনড়-স্থানু জীবন তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। ঘুরব-বেড়াব-দেখব, দেশ-বিদেশ-বিশ্ব—এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এই তীব্র গতি প্রতিফলিত।

বিভূতিভূষণের একটি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি যেকোনো স্তরের মানুষের সঙ্গে অনায়াসে মিশতে পারতেন এবং তারা তাঁকে নিজেদের স্তরের লোক বলেই মনে করতেন। এই আত্মীয়তাবোধ ও অন্যের চিন্তার অংশীদার হবার দুর্লভ ক্ষমতা নিয়ে এসেছিলেন বিভূতিভূষণ।

প্রকৃতি-মানুষ-ঈশ্বর—এই তিন বিন্দুতে বিভূতিভূষণের মনের পরিক্রমা। তিনি কখনো মানববিমুখী প্রকৃতিপ্রেমিক নন। মানুষের প্রতি টান তিনি সর্বদাই অনুভব করেছেন। তাঁর শৈশব, তাঁর গ্রাম, তাঁর গ্রামের সমাজ ও পরিবেশ সারাজীবন তাঁকে আকর্ষণ করেছে। সেই আকর্ষণে তিনি বহুমানুষকে আত্মীয় করে নিয়েছেন।

ইছামতী নদীর ধারে ব্যারাকপুর গ্রাম—'এত জায়গা থাকতে ও জায়গার কথা আমার এত মনে হয় কেন?' পুনশ্চ, 'মনে মনে তুলনা করে দেখলুম, এ ধরনের বৈকাল সত্যিই কোথাও দেখিনি—এই তো পাশেই চালকী, ওখানে এরকম বৈকাল হয় না। এত পাখী সেখানে নেই, এত ধরনের বেলগাছ নেই, সোঁদালি ফুল নেই...এমন চাপা আলোটাও হয় না...এ জিনিষ আর কোথাও দেখিনি তো। দেখবো না। ('তৃণাঙ্কুর')—এই জোর দিয়ে বলার মধ্যে বাস্তব সমর্থনের অপেক্ষা বেশি আছে লেখক মনের প্রবল ভালোবাসা। এটাই বিভূতিভূষণের অস্তিত্ব। আর এই অস্তিত্বকে কেন্দ্রে রেখে তিনি গ্রাম বাংলাকে দেখেছেন—কতো মানুষ, কতো তাদের বৈচিত্র্য। তাদের মধ্যে তিনি পেয়েছেন মুসলমান চরিত্রগুলোকে। তিনি যাদেরকে দেখেছেন তাদেরকে একেবারে পুরোপুরি দেখেছেন। পথে যেতে যেতে সামান্য আলাপ মাত্র নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। এটাই তাঁর মানবিকতা ও সহধর্মিতা। তিনি গরিব, নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সব ধর্মের মানুষের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পারতেন—

> দেশ বেড়িয়ে যদি মানুষ না দেখলুম তবে কি দেখতে বেরিয়েছি? চিরযৌবনা নিসর্গসুন্দরী সব কালে সব দেশেই মন ভুলায়, মন ভুলায় তার শ্যামল বেলাঞ্চল, বনময় ফুলসজ্জা, মধুমল্লীর সৌরভ ভরা তার অঙ্গের সুবাস। তাকে সব স্থানে পাওয়া যায় স্বরূপে, কিন্তু মানুষ সব জায়গাতেই আছে। প্রত্যেকের মধ্যেই একটা অদ্ভুত জগৎ, দেখতে জানলেই যে জগৎটা ধরা দেয়, তাই দেখতেই পথে বার হওয়া। মানুষের বিভিন্ন রূপ দেখবার আমার চিরকাল আগ্রহ। নতুন মানুষ দেখলেই মনে হয় ওর সঙ্গে বসে একটু আলাপ করে ওকে চিনি। দেখতে চেয়েছিলুম বলেই বোধহয় কত রকমের মানুষই যে তিনি দেখলেন জীবনে। মানুষকে চিনে লাভই হয়েছে, ক্ষতি হয়নি। একথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলবো, হয়তো কী কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপাতত ক্ষেতি বলে মনে হলেও, ভবিষ্যতে মনের খাতায় তাদের অঙ্ক পড়ে গেছে লাভের দিকেই। মানুষের অন্তর একটি রহস্যময় বিশ্ব, এর সীমা নেই, শেষ নেই। মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারের অভিযান, উত্তর-দক্ষিণ মেরু অভিযানের মতই কষ্ট ও অধ্যাবসায়-সাপেক্ষ, সেই রকমই বৈচিত্র্যময় ('অভিযাত্রিক')।

বিভূতিভূষণ কয়েকটি উপন্যাসে গরিব, সাধারণ মুসলিমদের অসাধারণ চরিত্রের মধ্যে এক ধরনের সারল্য ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মানসিকতার ঐশ্বর্য আবিষ্কার করেছেন। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ গরিব মুসলিম কৃষক বধূর ছবি অঙ্কন করেছেন। তাঁর শিল্পী হৃদয়ের মমতা-সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। 'পথের পাঁচালী'র সপ্তদশ পরিচ্ছেদ মুসলিম মানসের একটি মূল্যবান আলেখ্য। গ্রামের বিত্তশালী গৃহস্থ অন্নদা রায়ের হৃদয়হীনতা ও গরিব মুসলিম বধূর অসহায়তা প্রকাশ পেয়েছে—

> রায় মহাশয়...বলিলেন—কে? তোর আবার কি?
>
> কৃষক বধূটি আঁচলের খুঁট খুলিতে খুলিতে নিম্নকণ্ঠে বলিল—মুই কিছু টাকার যোগাড় করিচি অনেক অনেক কষ্টে, মোর টাকাডা নেন্—আর গোলার চাবিটা খুলে দ্যান, বড় কষ্ট যাচ্ছে মনিব ঠাকুর, যে আর কি বলো...
>
> অন্নদা রায়ের মুখ প্রসন্ন হইল, বলিলেন—হরি, নেও তো ওর টাকাটা গুনে, খাতাখানায় দেখো তারিখটা, সুদটা আর একবার হিসেব করে দেখো—
>
> কৃষক-বধূ আচঁলের খুঁট হইতে টাকা বাহির করিয়া হরিহরের সম্মুখে রোয়াকের ধারে রাখিয়া দিল, হরিহর গুনিয়া বলিল—পাঁচ টাকা?
>
> রায় মহাশয় বলিলেন—আচ্ছা, জমা করে নাও—তারপর আর টাকা কৈ?
>
> —ওই এখন ন্যান্, তারপর দেবে—মুই গতর খাটিয়ে শোধ করে তোলবো ও এখন ওই নিয়ে মোর গোলার চাবিডা খুলে দ্যান্, মোর মাগরে দুটো খেইয়ে তো আগে বাঁচাই, তারপর ঘরদোর ফুটো হয়ে গিয়েছে, সে হয়—এমন নিরুদ্বেগে কথা বলিতেছিল যেন গোলার চাবি তাহার করতলজাত হইয়া গিয়াছে। রায় মহাশয়কে চিনিতে তাহার বিলম্ব ছিল।
>
> রায় মহাশয় কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—ওঃ, ভারী যে দেখচি মাগীর আব্দার, চল্লিশ টাকার কাছাকাছি সুদ আসলে বাকি—পাঁচ টাকা এনিচি, নিয়ে গোলা খুলে দ্যান, ছোটলোকের কাণ্ডই আলাদা—যা এখন দুপুরবেলা দিক করিস্ নে—
>
> কৃষক-বধূ চণ্ডীমণ্ডপের অন্য কাহারও অপরিচিতা নহে, দীনু ভট্টাচায্যি চোখে ভাল দেখিতেন না, বলিলেন—কে ও অন্নদা?
>
> —ওই ওপাড়ার তমরেজের বৌ—দিন চারেক হল তমরেজ না মারা গিয়েছে? সুদে আসলে চল্লিশ টাকা বাকী, তাই মরবার দিনই বিকেল থেকে গোলায় চাবী দিয়ে রেখেচি, এখন গোলা খুলিয়া দ্যান্—হেন করুন—তেন করুন—পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেলেও তমরেজের বৌ অত চমকিয়া উঠিত না—সে ব্যাপার এখন অনেকটা বুঝিল, আগাইয়া আসিয়া বলিল—ও কথা বললেন না মানিব ঠাকুর, মোর খোকার একটা রূপোর নিমফল ছেল, ও-বছর গড়িয়ে দিইছিল। তাইই ভোঁদা সেক্‌রার দোকানে বিক্রী করে পাঁচটা টাকা দেলে—ছেলেমানুষের জিনিষ ব্যাচবার ইচ্ছে ছেল না, তা কি করি দুটো খেইয়ে বাঁচি, ভাবলাম এরপর দিন দেন মালিক তো মোর বাছারে মুই আবার নিমফল গড়িয়ে দেবো। তা দেন মনিব ঠাকুর চাবিডা নিয়ে—

> —যা যা এখন যা।...বাকি টাকা নিয়ে আয় তারপরে দেখা যাবে...তমরেজের বৌ আকুল সুরে বলিয়া উঠিল—কনে যান, ও মনিব ঠাকুর, মোর খোকার একটা উপায় করে যান, ওরে মুই খাওয়াবো কি, এক পয়সার মুড়ি কিনে দেবার যে পয়সা নেই—মোর গোলা খুলে না দ্যান, মোর টাকা কড়া মোরে ফেরৎ দ্যান্—
>
> রায় মহাশয় মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—যা যা সন্ধেবেলা মাগী ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস নে।...ওঁর ছেলে কি খাবে বলে দ্যাও—ছেলে কি খাবে তা আমি কি জানি? যা পারিস তো নালিশ করে খোলগে যা—

রায় মহাশয় এই সদ্য-বিধবা অসহায় কৃষক বধূর রোদনে কর্ণপাত না করে বাড়ি ভিতরে চলে গেলেন। চোখের জলে বুক ভেসে যায় তমরেজের বৌয়ের। তার দুঃখ নিরসনে কেউ নেই।

এই ঘটনার পর দীনু ভট্টাচায্যি তমরেজের বউয়েরে কাছে তমরেজের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ শুনছিলেন। কিন্তু অন্নদা রায় মশায়ের নবাগত জ্ঞাতিপুত্র এসে পড়াতে তাকে আপ্যায়িত করে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। তমরেজের বউ তার বুকভরা দুঃখ নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অপসৃত হল।

এটাই রিয়ালিটি। তমরেজের সদ্য বিধবা বউয়ের সম্পর্কে বিভূতিভূষণ এক গলা কান্নায় ভেসে যাননি। আপাত নির্লিপ্ততার মধ্য দিয়ে তিনি এই গরিব মুসলিম কৃষক বধূর দুঃখে গভীর সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন।

ব্যারাকপুরের প্রতিবেশিনী সাইমা পুঁটিদি ভীষণ স্নেহ করতেন বালক বিভূতিভূষণকে। ‘উৎকর্ণ’ দিনলিপিতে আছে, পুঁটিদির মা বালক বিভূতিকে একদিন বেলেডাঙায় আইনাদ্দি মণ্ডল নামে এক মুসলমানের কাছে পাঠায়। পুঁটিদির হাতের একটা ঘা কিছুতেই শুকোচ্ছে না। তার জন্যে তেলপড়া আনতে যায় বিভূতি। তেলপড়া আনতে গিয়ে পরিচয় হয় এক আশ্চর্য মানুষের সাথে। তাই সুযোগ পেলেই সে আইনাদ্দি চাচার বাড়ি যায়। ক্রমাগত যাতায়াত থেকে সেও এক চাচা হয়ে গেল। আর সেই সুবাদে আইনাদ্দির ছেলে আহাদও ওর বন্ধু হয়ে গেল। ওরাও বিভূতির বাবা কথকঠাকুর মহানন্দকে চেনেন, শ্রদ্ধা করেন। বিভূতিরও কি কম শ্রদ্ধা আইনাদ্দির চাচার প্রতি? সুযোগ পেলেই আইনাদ্দি চাচার কাছে এসে সে গল্প শোনে। হাঁ করে বালক বিভূতি ওর অদ্ভুত সব গল্প শোনে। আইনাদ্দি ওকে গল্প শোনায়—বহুরূপী সেজেছি বাপু, কাটা মুগুর খেলা খেলিচি, নাগরদোলা ঘুরিয়েছি—আগুন খাবো, শূন্যে উড়ে যাব। লাঠিতে বন্দুকে মারব না আমার গুরুর কৃপায়।

বলে কি চাচা! ভয়ে বিস্ময়ে গা শিউরে ওঠে বালক বিভূতিভূষণের। উত্তরকালে এই আইনাদ্দি চাচাকে অমর করে রেখেছেন ‘বিপিনের সংসার’ উপন্যাসে—

> আইনাদ্দির বাড়ীর পশ্চিমে বেলতার মাঠ, অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা, মাঠের ওপারে হরিদাসপুর গ্রামের বাঁশবন। সূর্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িলেও এখনও বেলা আছে,

মাঠের মধ্যে ফুলে ভরা বাবলা গাছের ডালে ডালে শালিক ও হাজারে পাখীর দল কলরব করিতেছে। নিকটে চাঁদমারির বিল থাকাতে বৈকালের হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা।

বিপিনের মন কেমন উদাস হইয়া গেল।

জীবনে তাহার সুখ নাই, একমাত্র সুখের মুখ যে সম্প্রতি দেখিতে পাইয়াছে, অকস্মাৎ এক ঝলক স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত মাগীর গত কয়দিনের কার্যকলাপ তাহার অন্ধকার জীবনে আলো আনিয়া দিয়াছে।

মানী কেন দুই দিনের যত্ন দেখাইয়া তাহাকে এমনভাবে বাঁধিল।

আইনাদ্দি বলিল, একখানা কুমড়ো খাবে তো চল আমার সঙ্গে। বিলির ধারে জলি ধানের ক্ষেতে আমার নাতি ব'য়ে পাখী তাড়াচ্চে, সেখান থে দেব এখন। ডাঙার ওপারেই কুমড়োর ভুঁই।

বিলের এপারে সবটাই জলি ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাঁশের মাচায় বসিয়া লোকে টিনের কানেস্তারা বাজাইয়া বাবুই পাখী তাড়াইতেছে।

আইনাদ্দির নাতির নাম মাখন। এ দেশের মুসলমানদের এ রকম নাম অনেক আছে—এমন কি ভুবন, নিবারণ, যজ্ঞেশ্বর পর্যন্ত আছে।

মাখনের বয়স চল্লিশের কম নয়, চুলে পাক ধরিয়াছে। তাহার বাবার বয়স প্রায় বাহাত্তর-তিয়াত্তর। মাখন বেশ জোয়ান লোক, শুধু জোয়ান নয়, এ অঞ্চলে মধ্যে একজন ভাল গায়ক বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে।

ঠাকুরদাদাকে আসিতে দেখিয়া মাখন বলিল, মোর জলপান কনে, হ্যাঁ দাদা?

পিছনে বিপিনকে আসিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি মাচা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, দাদাবাবু যে কখন আলেন? আপনি সেই কোথায় নায়েবী করচ শুনেলাম, তাই ইদিক বড় একটা যাওয়া আসা কর না বুঝি?

আইনাদ্দি বলিল, বাবাঠাকুরকে একটা বড় দেখে কুমড়ো এনে দে দিকি। ওই পুবির বেড়ার গায়ে যে কটা বড় কুমড়ো আছে, তা থেকে একটা আন।

—ওই দেখ বাবাঠাকুর, এক ঝাঁক বাবুই এসে জুটল আবার! সুমুন্দির পাখীগুলো তো বড্ড জ্বালালে দেখচি!—বলিয়া আইনাদ্দি নিজেই টিনের কানেস্তারা বাজাইতে লাগিল।

বেলা পড়িয়া রাঙা রোদ কতক জলি ধানের বিস্তীর্ণ ক্ষেতে, কতক বিলের বাবলা বনে পড়িয়াছে, আইনাদ্দির নাতি বিলের উপরের ডগায় কুমড়ো ক্ষেত হইতে সুকণ্ঠে গাহিতেছে—

যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে ব'সে ধান কাটি
ও মোর মনে জাগে তার লয়ান দুটি—

বাবুইপাখীর ঝাঁক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছে বৃদ্ধ আইনাদ্দি তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না, সুতরাং তাহারা নির্বিবাদে আবার আসিয়া জুটিতে লাগিল।

আইনাদ্দির নাতির গানের কয়টি চরণ শুনিয়াই বিপিন আবার অন্যমনস্ক হইয়া গেল।

> বিপিন কখনও প্রেমে পড়ে নাই জীবনে। প্রেমে পড়িবার অভিজ্ঞতা তাহার কখনও হয় নাই, মানীর সঙ্গে এই কয়দিনের ঘটনাবলীর পূর্বে।
>
> ইহাকেই কি বলে ভালবাসা?
>
> যে কোন কথাই সেই একটি মাত্র মানুষের কথা মনে আনিয়া দেয় বিপিনের জীবনে ইহা একেবারে নূতন।
>
> সে যে ভাইয়ের অসুখের সম্বন্ধে আইনাদ্দির সঙ্গে পরামর্শ করিতে গিয়াছিল, এ কথা বেমালুম ভুলিয়া গিয়া কুমড়াটি হাতে লইয়া বিপিন সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিল।

উপন্যাসে আইনাদ্দির ছবি একেবারে সহজ, সরল, পরিষ্কার—'বাবুইপাখীর ঝাঁক বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছে বৃদ্ধ আইনাদ্দি তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না।'

'অনুবর্ত্তন' শিক্ষকদের নিয়ে লেখা উপন্যাস। এক ব্যতিক্রমী মুসলিম চরিত্র মিঃ সফরুদ্দিন আলম। ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। হেড মাস্টারের খুব কাছের লোক—

> হেডমাস্টারের শঙ্কিত দৃষ্টির সম্মুখে নতুন টীচার গটগট করিয়া ক্লাসে চলিয়া গেলেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ক্লার্কওয়েল তো অবাক, তাঁহারা অধীনস্থ কোন মাস্টার যে তাঁহারা সম্মুখে দাঁড়াইয়া এ কথা বলিতে পারে, তাহা তাঁহারা কল্পনার অতীত। তিনি তখনই মিঃ আলমকে ডাকিলেন।
>
> —ইয়েস স্যার!
>
> —নতুন টীচার বেশ ভাল পড়ায়?
>
> —জানি না স্যার। বলেন তো দৃষ্টি রাখি।
>
> —রাখো।
>
> —কী রকম একটি অসামাজিক ধরনের—শুনলাম নাকি কবি। বাংলা কবিতা পড় তোমরা—পড়েছ কী রকম কবিতা লেখে?
>
> মিঃ আলম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত কড়িকাঠের দিকে উঠাইয়া থিয়েটারী ভঙ্গি করিলেন। তারপর সুর নীচু করিয়া বলিলেন, কিসের কবি। বাংলাদেশের সবাই কবিতা লেখে আজকাল। কবি!
>
> —তুমি বাংলা কবিতা পড় মিঃ আলম?
>
> —পড়ি বইকি স্যার!
>
> আলমের এ কথা সত্য নয়, বাংলা সাহিত্যের কোন খবর কোনদিনও তিনি রাখেন না।...
>
> মিঃ আলমের সঙ্গে একদিন নতুন মাস্টারের ঠোকাঠুকি বাধিল।
>
> মিঃ আলম ক্লাবে পড়াইতে গিয়া সামনের বেঞ্চির উপর একটি ছেলের পরীক্ষার খাতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের খাতা রে?
>
> —হিস্ট্রি।

মিঃ আলম খাতাখানা লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বলিলেন, নম্বর দেওয়া সুবিধে হয়নি।

—কেন স্যার?

—এর নাম কি মার্ক দেওয়া! এ আনাড়ীর মার্ক দেওয়া! এই খাতায় তুমি ষাট নম্বর কখনও পাও না—আমার হাতে চল্লিশের বেশী নম্বর উঠত না।...

হেড মাস্টারকে একা পাইয়া মিঃ আলম সাতখানা করিয়া তাঁহার কাছে লাগাইলেন, নতুন টীচারকে খাতা দেখতে দেবেন না স্যার!

—নতুন টীচারকে? কেন মিঃ আলম?

—উনি খাতা মনোযোগ দিয়ে দেখেন না।

—দেখেছিলে নাকি কোন খাতা?

—হ্যাঁ স্যার। ফোর্থ ক্লাসের সতীশকে উনি ষাট নম্বর দিয়েছেন যে খাতায়, তাতে চল্লিশের বেশী নম্বর ওঠে না। ভুল কাটেনও নি সব জায়গায়।

এই কথাটার মধ্যে মুশকিল আছে। সব ভুল নিখুঁতভাবে কাটিয়া কোন মাস্টারই খাতা দেখেন না—স্বয়ং মি আলমও না।

পরদিন নতুন মাস্টার সারকুলার বই দেখিয়া বাহির করিলেন—মিঃ আলাম ফার্স্ট ক্লাসের ইংরাজী গ্রামার ও রচনার খাতা দেখিয়াছেন। তিনখানি খাতা চাহিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে বাহির করিলেন, মিঃ আলম গড়ে প্রত্যেক পাতায় অন্তত তিনটি করিয়া ভুলের নীচে লাল দাগ দেন নাই।

নতুন টীচার খাতা কয়খানি হাতে করিয়া হেডমাস্টারের কাছে না গিয়া মিঃ আলমের কাছে গেলেন। খাতা দেখাইয়া বলিলেন, আপনারা খাতা দেখা যদি আদর্শ হিসেবে নিতে হয়, তা হলে প্রত্যেক খাতায় আমার তিনটি ভুলে লাল দাগ না দিয়ে রাখা উচিত ছিল। দেখুন খাতা ক'খানা!

মি. আলম উল্টাইয়া খাতাগুলি দেখিলেন। যুক্তি অকাট্য। গড়ে তিনটি করিয়া ভুলে লাল দাগ দেওয়া হয় নাই—খাঁটি কথা।

নতুন টীচার বলিলেন, আপনি বললেন কিনা হেডমাস্টারের কাছে আমার বড্ড ভুল থাকে খাতায়, তাই দেখালুম—ভুল সকলেরই থাকে। ওগুলো ওভারলুক করতে হয়। সব কথায় হেডমাস্টারের কাছে—

এ ব্যাপার কী করিয়া যেন অন্য টীচারেরা জানিতে পারিলেন, টীচারদের বসিবার ঘরে টিফিনের সময় এ কথা লইয়া বেশ গুলজার হইল। মিঃ আলমের অপমানে সকলেই খুশী।

একথা ওকথার পর যদুবাবু হঠাৎ বলিলেন, আজ আমরা খুব খুশী হয়েছি, বেশ শিক্ষা দিয়েছেন (মাখামাখি করিবার সাহস তাঁহার উঠিয়া গিয়াছিল) ওই ব্যাটাকে ও ব্যাটা হেডমাস্টারের কাছে প্রত্যেক বিষয়ে লাগাবে—ও একেবারে অন্ত্যজ—ওর যা অপমান করেচেন আজ!

নতুন টীচার বিরস কণ্ঠে বলিলেন, মিঃ আলমের ভুল হতে পারে। ভুল সবারই হয়। আমি তাঁর ভুল পয়েন্ট আউট করেছি মাত্র। আদারওয়াইজ হি ইজ এ ভেরি গুড টীচার—ভেরি অনেস্ট অ্যান্ড সিনসিয়ার টীচার।'

এই উপন্যাসটিতে শিক্ষকদের মূলত তিনটি চরিত্র ফুটে উঠেছে। প্রথমত, এক ধরনের শিক্ষক আছেন যারা শিক্ষকতার চেয়ে মাতব্বরি পছন্দ করেন। দ্বিতীয়ত, দু'জন শিক্ষকের লড়াইয়ের মজা নেওয়া। তৃতীয়ত, ভালো শিক্ষকও রয়েছেন। যারা শিক্ষককে মর্যাদা দেন, সম্মান করেন। নতুন টিচার রমেন্দ্র দত্তের ভাষায়—মিঃ আলম ইজ এ ভেরি গুড টীচার—ভেরি অনেস্ট অ্যান্ড সিনসিয়ার টীচার।

'হীরামানিক জ্বলে' কিশোরদের উপন্যাস। সুশীল গড়ের মাঠে মেটেবরুজের জামাতুল্লা নামে এক মুসলিম জাহাজের খালাসির কাছে গুপ্তধনের সন্ধান পায়। জামাতুল্লা ও তার বোম্বেটে বন্ধু ইয়ার হোসেনের সহায়তায় সুশীল মালয় উপদ্বীপের সুলুসীর নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আরব্য উপন্যাসের বর্ণিত আলিবাবার গুহার মতো গুপ্তধন অমূল্য হীরের সন্ধান পায়—

> লোকটি ঘাসের ওপর বসে পড়ল, বললে—আজ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে বাবুজি, আজ কোন কাজ হবে না।
>
> লোকটা কথা বলবে, সুশীল শুনবে। এতে দিনের অলোর কী দরকার, সুশীল বুঝতে পারলে না। বললে—কী কথা বলবে বলেছিলে—বলে যাও না?

এরপর বিভূতিভূষণ বিবৃতির ঢঙে আখ্যানকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন—লোকটা ধীরে ধীরে চাপা গলায় অনেক কথা বললে—মোটামুটি তার বক্তব্য এই : তার বাড়ির আগে ছিল পশ্চিমে। কিন্তু অনেকদিন থেকে যে বাংলা দেশে আছে এবং বাঙালি খালাসিদের সঙ্গে কাজ করে বাংলা শিখেছে। লোকটা মুসলমান, ওর নাম জামাতুল্লা। একবার কয়েকজন তেলেগু লস্করের সঙ্গে সে একটা জাহাজে কাজ করে—ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়ার বিভিন্ন দ্বীপে নারকেল কুচি বোঝাই দিয়ে নিয়ে যেত মাদ্রাজ থেকে। সেই সময় একবার তাদের জাহাজ ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে অচল হয়ে পড়ে। সৌরাবায়া থেকে তাদের কোম্পানির অন্য জাহাজ এসে তাদের জাহাজের মাল তুলে নিয়ে যাবার আগে সাতদিন ওরা সেইখানে পড়েছিল। একদিন সমুদ্রের বিষাক্ত কাঁকড়া খেয়ে জাহাজ সুদ্ধ লোকের কলেরা হয়।

> এইখানে সুশীল জিজ্ঞেস করলে—সবারই কলেরা হল?
>
> —কেউ বাদ ছিল না বাবু। খাবার পাওয়া যেত না, পাহাড়ের একটা গর্তে কাঁকড়া পেয়ে সেদিন ওরা তাই ধরেছিল। ছোট ছোট লাল-কাকঁড়া।
>
> —তারপর?
>
> —দু-জন বাদে বাকি সব সেই রাত্রে মারা গেল।। বাবুজি, সে রাতের কথা ভাবলে এখনও ভয় হয়। সতেরো জন দিশি লস্কর আর দু-জন ওলন্দাজ সাহেব—একজন মেট আর একজন ইঞ্জিনীয়ার—সেই রাত্রে সাবাড়, রইলাম বাকি কাপ্তেন আর আমি।
>
> তারপর জাহাজের কাপ্তান ওকে বললে—মড়াগুলো টান দিয়ে ফেলে দাও জলে।

ও বললে—আমি মুর্দাফরাশ নই সাহেব, ও আমি ছোঁব না—

সাহেব ওকে গুলি করে মারতে এল। ও গিয়ে লুকোলো ডেকের ঢাকনি খুলে হোডের মধ্যে। সেই রাত্রে কাপ্তান সাহেব মদ খেয়ে চিৎকার করে গান গাইছে—ও সেই সময় জাহাজের বোট খুলে নিয়ে নামতে গেল।

ডেভিট থেকে বেপাট নামাবার শব্দে সাহেবের মদের নেশা ভাঙ্গল না তাই নিস্তার—ডেকের ওপরে তখন দুটো মড়া পড়ে রয়েছে—মরণের বীজ জাহাজের সর্বত্র ছড়ানো, ভয়ে ও কিছু খায়নি সকাল থেকে, পাছে কলেরা হয়। সুতরাং অনাহারে ও ভয়ে খানিকটা দুর্বলও হয়ে পড়েছে।

দূরে ডাঙ্গা দেখা যাচ্ছিল, দুপুরের দিকে ও লক্ষ করেছিল। সারা রাত নৌকো বইবার পর ভোরে এসে বোট ডাঙায় লাগল। ও নেমে দেখে ডাঙ্গায় ভীষণ জঙ্গল—ওদেশের সব দ্বীপেই এ ধরণের জঙ্গল ও জানত। লোকজনের কোন চিহ্ন নেই কোনদিকে।

ওর সামনে প্রকাণ্ড সিংহদরজা—কিন্তু বড় বড় লতাপাতা উঠে একেবারে ঢেকে ফেলে দিয়েছে। সিংহদরজার পর একটা বড় পাঁচিলের খানিকটা—আরও খানিক গিয়ে একটা বড় মন্দির, তার চুড়ো ভেঙে পড়েছে—মন্দিরের গায়ে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি বলে তার মনে হল।

অবাক হয়ে সে আরও ঘুরে ঘুরে দেখলো জায়গাটা একট বহুকালের পুরোনো শহরের ভগ্নস্তূপ মনে হল। কত মন্দির, কত ঘর, কত পাথরের সিংহদরজা, গভীর বনের মধ্যে বড় বড় কাছির মত লতার নাগপাশ বন্ধনে জড়িয়ে কত যুগ ধরে পড়ে আছে।

সন্ধ্যা আসবার অর বেশি দেরি নেই দেখে তার বড় ভয় হয়ে গেল। এসব প্রাচীনকালের নগর শহর—জিন পরীর আড্ডা, তেলেগু লস্করেরা যাকে ওদের ভাষায় বলে 'বিহ্মমুনি'।

বিভূতিভূষণ তাঁর পাঠককে লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কার, ভয়-ভীতি সম্পর্কে পুনরায় জানালেন—'বিহ্মমুনি' বড় ভয়ানক জিন, হিন্দুদের পুরোহিত মারা যাওয়ার পর বিহ্মমুনি হয়। এই গহন অরণ্যের মধ্যে লোকহীন পরিত্যক্ত বহু প্রাচীন নগরীর অলিতে গলিতে ঝোপে ঝোপে ধূম্রবর্ণ, বিকটাকার, কত যুগের বভুক্ষু বিহ্মমুনির দল সন্ধ্যর অন্ধকার পড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিকারের সন্ধানে জাগ্রত হয়ে উঠে হাঁক পাড়ে—ম্যয় ভুখা হুঁ। তাদের হাতের নাগালে পড়লে কি আর রক্ষে আছে? অতএব এখান থেকে পালানোই একমাত্র বাঁচবার পথ।

সুশীল এক মনে শুনছিল—পালিয়ে গেলে কোথায়?

—সেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আবার দু-দিন তিন-দিন ধরে হেঁটে সমুদ্রের ধারে পৌঁছুলাম। জাহাজে উঠব এসে এই তখন খেয়াল।

—আবার সেই মড়া ভর্তি জাহাজে কেন?

—বুঝলেন না বাবুজি? যদি জাহাজে উঠি, তবে তো দেশে পৌঁছুবার ঠিকানা মেলে। নয়তো সেই জংলি মুলুকে যাবো কোথায়?

চারিধারে সমুদ্র, যদি জাহাজ না পাই তবে সেই জংলি মুলকে না খেয়ে মরতে হবে—নয়তো জংলি লোকেরা খুন করে ফেলবে, বাবুজি তখন এমন ডর যে রাতে ঘুমুতে পারিনে। একদিন প্রকাণ্ড এক বনমানুষের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম—নসিবের জোর খুব। অমন ধরনের জানোয়ার যে দুনিয়ায় আছে তা জানতাম না। গাছের ওপর একদল বনমানুষ ছিল—ধাড়িটা আমায় দেখতে পেলে না বাবুজি, দেখলে আর বাঁচতাম না।...

জামাতুল্লা ও সনৎ হাতড়ে হাতড়ে সোনার চাক্‌তি বের করে থলের মধ্যে একরাশ পুরে ফেললে—পাথরের নুড়িও কিছু নিলে—বলা যায় না যদি এগুলো কোন দামী পাথর হয়ে পড়ে! সনৎ ছেলেমানুষ, সে এত সোনার চাকতি দেখে কেমন দিশেহারা হয়ে গেল—উন্মত্তের মত আঁজলা ভরে চাকতি সংগ্রহ করে তার তামার জালার মধ্যে থেকে, আর থলের ভেতর পুরে নেয়। যেন এ আরব্য উপন্যাসের একটা গল্প-কিংবা রূপকথার মায়াপুরী— পাতালপুরী ধনভাণ্ডার! বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় বেলা দশটা থেকে বিকেল ছ-টা এস্তক কলম পিষে সাঁইত্রিশ টাকা না-আনা রোজগার করতে হয় সারা মাসে। সেই হল রূঢ় বাস্তব পৃথিবী—মানুষকে ঘা দিয়ে শক্ত করে দেয়। আর এখানে কী, না—হাতের আঁজলা ভরে যত ইচ্ছে সোনা নিয়ে যাও, হীরে নিয়ে যাও—এ আলাদা জগৎ—পৃথিবীর অর্থনৈতিক আইন-কানুনের বাইরে।

হঠাৎ কিসের শব্দে সুশীলের চিন্তার জাল ছিন্ন হল—বিরাট, উন্মত্ত, প্রচণ্ড শব্দ—যেন সমগ্র নায়েগ্রা জলপ্রপাত ভেঙে ছুটে আসছে কোথা থেকে—

জামাতুল্লার চিৎকার শোনা গেল সেই প্রলয়ের শব্দের মধ্যে—জল! জল! পালান ওপরে উঠুন—

জামাতুল্লার কথা শেষ না হতে সুশীলের হাঁটু ছাপিয়ে কোমর পর্যন্ত জল উঠল—

সুশীল সবিস্ময়ে ও সভয়ে চেয়ে দেখলে ঘরের ছাদের কাছাকাছি দুটো পয়োনালা দিয়ে ভীষণ তোড়ে জল এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে।

তারপর হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল—পুরোনো রাজাদের পোষ মানা বেতাল যেন কোথায় হা হা করে বিকট অট্টহাস্য করে উঠল—সম্মুখে মৃত্যু! উদ্ধার নেই! উদ্ধার নেই!

এ জলে সাঁতার দেওয়া যাবে না সুশীল জানে—এ মরণের ইঁদুরকল। বুক ছাপিয়ে জল তখন উঠে প্রায় নাকে ঠেকে ঠেকে—

কে যেন অন্ধকারের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠল—দাদা—দাদা—আমার হাত ধর—দাদা।

একজোড়া শক্ত বলিষ্ঠ হাত ওকে ওপরের দিকে তুললে টেনে। ঘন অন্ধকার সুশীলের প্রায় জ্ঞান নেই। সে ডাকছে—কে?

কোন উত্তর নেই। কেউ কাছে নেই।

সুশীলের ভয় হল। সে চেঁচিয়ে ডাকলে—সনৎ! জামাতুল্লা!

তার পায়ের তলায় উন্মত্ত গর্জনে যেন একটা পাহাড়ের মাথার হ্রদ খসে পড়েছে!

উত্তর দেয় না কেউ—না সনৎ, না জামাতুল্লা।

প্রায় দশ মিনিট পরে জামাতুল্লা বললে—বাবু জল্‌দি আমার হাত পাকড়ান—

—কেন?

—পাকড়ান হাত—উপরে উঠব—সাবধান!

—সনৎ, সনৎ কোথায়?

—সনৎবাবু তো পাতালপুরী থেকে ওঠেননি—তাঁকে খুঁজে পাইনি।

—কেন? সনৎ কোথায়? আমি তাকে ছেড়ে বাড়ী গিয়ে মার কাছে, খুড়ীমার কাছে কী জবাব দেব?

জামাতুল্লা নিজের কপালে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বললেন—নসীব, বাবুজি সুশীল ক্রমে সব বুঝলে ওপরে উঠে এসে মাথায় ঠান্ডা হাওয়া লাগানোর পরে। একটা গভীর শোক ও হতাশায় সে একেবারে ডুবে যেত হয়তো, কিন্তু ঘটনাবলীর অদ্ভুতত্বে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। কোথায় অন্ধকার পাতালপুরীতে পুরাকালের ধন ভাণ্ডার, সে ধনভাণ্ডার অসাধারণ উপায়ে সুরক্ষিত...এমন কৌশলে, যা একালে হঠাৎ কেউ মাথায় আনতেই পারত না।

জামাতুল্লা বললে—পানি দেখে তখনি আমার সন্দেহ হয়েছে। আমি ভাবছি, এত নোনা পানি কেন ঘরের মধ্যে?

সুশীল বললে—আমাদের তখনই বোঝা উচিত ছিল জামাতুল্লা। তাহলে সনৎ আজ এভাবে—

—যে স্বয়ং ভারত মহাসমুদ্র প্রাচীন চম্পারাজ্যের রাজভাণ্ডারের অদৃশ্য প্রহরী। কেউ কোনদিন সে ভাণ্ডার থেকে কিছু নিতে পারবে না, মানমন্দিরের রত্নশৈল তার একখানি সামান্য নুড়িও হারাবে না।

জামাতুল্লার দিকে চেয়ে বিষাদের সুরে বললে—এই হল তোমার আসল বিস্মামুনি—সমুদ্র, বুঝলে জামাতুল্লা?...

কলম্বোর এক জহুরীর দোকানে জামাতুল্লা হর্তুকির মত জিনিস দেখাতেই বললে—এ খুব দামী জিনিষ।

সবসুদ্ধ পাওয়া গেল প্রায় সত্তর হাজার টাকা, ইয়ার হোসেনকে ফাঁকি না দিয়ে ওরা তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্য দশহাজার টাকা পাঠালে—সেই মাদ্রাজী বিধবাকে পাঠালে বিশ হাজার—বাকি টাকা তিন ভাগ হল জামাতুল্লা, সনতের মা ও সুশীলের মধ্যে।

জামাতুল্লা নিজের ভাগের টাকা নিয়ে কোয়াল চলে গেল, তার সঙ্গে আর সুশীলের দেখা হয়নি। উপন্যাস শেষে জামাতুল্লার ছবি নেই, হদিস নেই, যদিও জামাতুল্লার জন্যই সুশীলের প্রাণ বাঁচালো। উপার্জিত অর্থ ইমানদারির সঙ্গে ভাগাভাগি হয়েছে।

লেখক এখানে সুশীল এবং জামাতুল্লার মনুষ্যত্বের দিকে জোর দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেনও।

'ইছামতী' বিভূতিভূষণের শেষ লেখা উপন্যাস। ইছামতী একটি ছোটো নদী, যশোর জেলার মধ্যে দিয়ে কিছুটা প্রবাহিত, কিছুটা নদীয়া জেলার উপর দিয়ে। বিভূতিভূষণ লিখছেন—

> ইছামতীর যে অংশ নদীয়া ও যশোর জেলার মধ্যে অবস্থিত, সে অংশটুকুর রূপ সত্যিই এত চমৎকার, যাঁরা দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা জানেন। কিন্তু তাঁরাই সবচেয়ে ভালো করে উপলব্ধি করতেন, যাঁরা অনেকদিন ধরে বার করছেন এ অঞ্চলে। ভগবানের একটি অপূর্ব শিল্প এর দুই তীর, বনবনানীতে সবুজ, পক্ষী-কাকলীতে মুখর।

মোল্লাহাটি নীলকুঠির বড় সাহেব শিপটন। এ অঞ্চলে বাঘের মতো ভয় করে লোকে। নীল চাষ নিয়ে উপন্যাস। শিপটন সাহেবের প্রিয় পাত্র এই অঞ্চলেরই রাজারাম রায়। তিনি জোর করেই নীলের দাম মেরেছেন পাঁচু শেখের ও তার শ্বশুর বিপিনগাজি নবু গাজির জমিনে। রাজারাম রায়ের প্রজা শোষণ করার একটি ছবি লেখক আন্তরিকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

> রাজারাম রায়কে ছোট সাহেব ডেকে পাঠিয়েচেন। কেন ডেকে পাঠিয়েচেন। রাজারাম তা জানেন। কোন প্রজার জমিতে জোর করে নীলের মার্কা মেরে আসতে হবে। রাজারাম দুর্ধর্ষ দেওয়ান, প্রজা কি করে জব্দ করা যায় তাঁকে শেখাতে হবে না। আজ আঠারো বছর এই কুঠিতে তিনি আছেন, বড় সাহেবের প্রিয়পাত্র হয়েছেন শুধু এই প্রজা জব্দ রাখবার দক্ষতার গুণে।
>
> পাঁচু শেখের বাড়ীর তেঘরা শেখহাটি। সেখানকার প্রজারা আপত্তি জানিয়ে বলেচে,—দেওয়ানজি, আপনাদের ঘাসের জমিতে নীল বুনুন, প্রজার জমিতে এবার আমরা নীল বুনতি দেবো না।
>
> রাজারাম জোর করে নীলের দাগ মেরে এসেচেন পাঁচু শেখের ও তার শ্বশুর বিপিন গাজি ও নবু গাজির জমিতে। এরা সে গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, বিপিন গাজির বাড়ীতে আটটি ধান বোঝাই গোলা, বিশ-পঁচিশটি হালের বলদ, দু'জোড়া লাঙল। তার ভাই নবু গাজি তেজারতি কারবারে বেশ ফেঁপে উঠেছে আজকাল। কমপক্ষেও একশো বিঘে আউশ ধানের চাষ হয় দুই ভায়ের জোতে। গ্রামে সব লোকে ওদের সমীহ করে চলে, এরাও বিপদে-আপদে সব সময়ে বুক দিয়ে পড়ে।
>
> নবু গাজি ছোট সাহেবের কাছে নালিশ করেচে। তাই বোধ হয় ছোট সাহেব ডেকেচেন, কি জানি। রাজারাম ভয় পান না। নবু গাজি কি করতে পারে করুক।
>
> ছোট সাহেব অনেকদিন এদেশে থেকে এদেশের গ্রাম্যলোকের মত বাংলা বলতে পারে। রাজরামকে ডেকে বললে,—কি বলছিল নবু গাজি, ও রাজরাম।

—কি বলুন হুজুর—

—ওর তামাকের জমিতে নাকি দাগ মেরে এসেচ?

—না মারলি ও গাঁ জব্দ রাখা যাবে না হুজুর।

—ও বলচে ওদের পীরির দরগার সামনের জমিও নিয়েচ?

—মিথ্যে কথা হজুর। আপনি ডাকান ওকে।

নবু গাজি বেশ জোয়ান মর্দ লোক, ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোকও সে নিতান্ত নয়। কিন্তু ছোট সাহেব ও দেওয়ানজির সামনে সে নিরীহের মত এসে দাঁড়ালো। নীলকুঠির চতুঃসীমার মধ্যে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে কথা বলবার সাধ্য নেই কোনো রায়তের।

ছোট সাহেব বললে,—কি নবু গাজি, এবার গুড় পাটালি করেছিলে?

নবু গাজি বিনম্রসুরে বললে,—না সায়েব, মোরা এবার গাছ ঝুড়িনি এখনো।

—পাটালি হলি খাতি দেবা না?

—আপনাদের দেবো না তো কাদের দেবো বলুন।

—দেবা ঠিক?

—ঠিক সাহেব।

—রাজারাম, তুমি এদের দরগাতলার জমিতে দাগ মেরেচ?

—না হজুর। জমির নাম দরগাতলার জমি, এই পর্যন্ত। পুরোনো খাতাপত্রে তাই আছে। সেখানে পীরের দরগা বা মসজিদ আছে কি না ওকেই জিজ্ঞেস করুন না। আছে সেখানে তোমাদের দরগা?

—ছেল আগে। এখন নেই দেওয়ানবাবু।

—তবে? তবে যে বড্ড মিথ্যে কথা বললে সায়েবকে?

—বাবু, আপনি একটু দয়া করুন, ও জমিতি মোরা হাজৎ করি।

অঘ্রান মাসের সংক্রান্তির দিন পীরের নামে রেঁধেবেড়ে খাই। হয়-না-হয় আপনি একদিন দেখে আসবেন। মুই মিথ্যে কথা কেন বলবো আপনারে, আপনারা হলেন দেশের রাজা। আমার জমিটা ছেড়ে দ্যান দয়া করে।

ছোট সাহেব রাজারামের দিকে চেয়ে সুপারিশের সুরে বলল—যাক্ গে, দাও ছেড়ে জমিটা। ওরা কি করে যে বলচে—

নব গাজি বললে—হাজৎ।

—সেটা কি আবার?

—ওই যে বললাম সাহেব, খোদার নামে ভাত গোস্ত রেঁধে ফকির মিচকিনিদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যা থাকে মোরা সবাই মিলে খাই।

ছোট সাহেব খুশি হয়ে বলে উঠলো—বেশ বেশ। আমারে একদিন দেখাতি হবে।

—তা দেখাবো সায়েব।

—বেশ, রাজারাম, ওর জমিটা ছেড়ে দিও। যাও—

নবু গাজি আভূমি সেলাম করে চলে গেল। কিন্তু সে বোকা লোক নয়, দেওয়ান রাজারামকে সে ভালো ভাবেই চেনে। বাইরে গিয়ে গাছের আড়ালে অপেক্ষা করতে লাগলো।

রাজরাম ছোট সাহেবকে বললেন—হুজুর, আপনি কাজ মাটি করলেন একেবারে।

—কেন?

—ও জমি এক নম্বরের জমি। বিঘেতে সাড়ে তিনমন নীলের গুঁড়ো পড়তা হবে। ও জমি ছেড়ে দিতে আছে? আর আপনি যদি অমন করে আশকারা দ্যান প্রজাদের, তবে আমাদের আর কি কেউ মানবে?—না কোনো কথা আমার কেউ শুনবে?

এখানে বিভূতিভূষণ সুন্দরভাবে তিনটি চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

চরিত্র—এক : ছোট সাহেব। তাঁর মন একটু উদার। ধর্মে ভক্তি আছে বোধহয়। মানুষকে বিশ্বাস করেন।

চরিত্র—দুই : রাজারাম রায়। বড় সাহেব শিপটনের প্রিয় পাত্র, শুধুমাত্র প্রজা জব্দ রাখবার দক্ষতার গুণে।

চরিত্র—তিন : নবু গাজি। গ্রামের অবস্থাপন্ন লোক। গ্রামের লোকেরা সমীহ করে। তিনিও বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য করেন। ধর্মের দোহাই দিয়ে জমি বাঁচালেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় সমাজের নানা স্তরের মানুষের কথা পাওয়া যায়। এই সুত্রেই এসেছে সমাজের নীচুতলার মানুষের কথা—মুসলমান জীবনের কথা। তিনি তাঁর নিজের জীবনে এমন কিছু সহৃদয় মুসলমান মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন যাদের কথা তিনি তাঁর সাহিত্যে উল্লেখ না করে পারেননি। তাঁর উপন্যাসের পাতায় এমন সব সাধারণ রক্ত-মাংসের মুসলিম মানুষের কথা উঠে এসেছে, যাদের কথা পড়লে মনে হবে এরা যেন আপনাদেরই একান্ত আপনজন, আমাদেরই চেনা-জানা জগতের বৃত্তের মধ্যেই চলাফেরা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মমতাময় লেখক যিনি গরিব হিন্দু-মুসলিম চরিত্রকে যত্নপূর্বক এঁকেছেন। তাদের দারিদ্র্যকে বড় করে তুলে ধরেননি, অন্তরের ঐশ্বর্যকে তুলে ধরেছেন। তিনি গ্রাম্য মানুষদের ধূর্তামি, চালাকি যেমন দেখান, তেমনি দেখান সরল-সততা ও অন্তরের ঐশ্বর্য। এইসব চরিত্রের উপর বর্ষিত হয় লেখকের স্মিতহাস্য ও প্রশ্রয়। তাঁর কলমে তারা পেয়ে যান অমরতা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, 'সাহিত্য আর কিছুই নয়—মানুষের ব্যথাহত আত্মার আকুতি।' সাহিত্যে নোবেলজয়ী আইভ্যান বুনিনের মতো তাঁরও মনে হয়েছিল সাহিত্য হচ্ছে 'The prayer, the music, the song of the human soul.' তাঁর সাহিত্যেও এই ব্যথাহত মানবাত্মার জয়গানে মুখরিত তাঁর সাহিত্যের সৃষ্ট চরিত্রগুলো যেন সকাল ধর্মান্ধতা ও ভেদবুদ্ধির উর্ধ্বে।

মুসলিম অনুষঙ্গে বিভূতিভূষণের ছোটোগল্প

আমিনুল ইসলাম

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের কাল থেকেই হিন্দু-মুসলমান আপন আপন স্বাতন্ত্র্যকে সযত্নে রক্ষা করেছে পরস্পরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েই। জাতি ও ধর্মের মধ্যে যে কোনো ব্যবধান নেই, মানুষের মধ্যে যে এক ব্যাপক বিশ্বজনীনতা রয়েছে— বিভূতিভূষণের সাহিত্যে এ গভীর উপলব্ধির কথা আমরা শুনতে পাই। হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতিতে প্রত্যক্ষ মুসলিম প্রভাব যেমন দেখতে পাই, দীর্ঘকাল একত্রে বসবাসের জন্য পরস্পরের উপরে প্রভাব বিস্তারও এক অনিবার্য পরিণতি। আর তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যিকের সচেতন রচনাতেই।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনড় জীবন মোটেই পছন্দ করতে না। ঘুরব বেড়াব দেখব—এই ছিল তাঁর ভাবনা। দেশ, বিদেশ, বিশ্ব—এই ছিল বাল্যকাল থেকে তাঁর ধ্যান। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এই তীব্র গতি প্রতিফলিত। বিভূতিভূষণের দিনলিপিগুলি ('স্মৃতির রেখা', 'অভিযাত্রিক', 'ঊর্মিমুখর', 'তৃণাঙ্কুর', 'বনে-পাহাড়ে', 'উৎকর্ণ', 'হে অরণ্য কথা কও') তাঁর ভ্রাম্যমান প্রকৃতিপ্রেমিক-মানবপ্রেমিক চরিত্রকে উন্মোচিত করে। বিভূতিভূষণের একটি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি যে কোনো স্তরের মানুষের সঙ্গে অনায়াসে মিশতে পারতেন এবং তারা তাঁকে নিজেদের লোক বলেই মনে করতেন। এই আত্মীয়তাবোধ ও অন্যের চিন্তার অংশীদার হবার দুর্লভ ক্ষমতা ছিল তাঁর।

এইসব ভ্রমণলিপি কেবল প্রকৃতিকেন্দ্রিক নয়, তা মানবকেন্দ্রিকও। সমাজের নানা স্তরের মানুষের কথা এগুলিতে পাই। এই সূত্রেই বিভূতিভূষণের সাহিত্যে এসেছে আমাদের সমাজের নীচুতলার মানুষের কথা—মুসলমান জীবনের কথা। বিভূতিভূষণ তাঁর নিজের জীবনে এমন কিছু সহৃদয় মুসলমান মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, যাদের কথা বিভূতিভূষণ তাঁর সাহিত্যে উল্লেখ না করে পারেননি।

'ঊর্মিমুখর' বিভূতিভূষণের মধ্যজীবনের রচিত দিনলিপি। এই সময়টায় (১৯৩৫-১৯৩৬ খ্রি.) বিভূতিভূষণ দীর্ঘ শহরজীবন ছেড়ে নতুনভাবে নিবিড় গ্রাম-সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। গ্রাম-সম্পর্ক তাঁর বরাবরই ছিল, কিন্তু এই সময় তা নিবিড় হয়।

তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অনেক উপকরণ এই সময়ে ভ্রাম্যমান-লেখক সংগ্রহ করেছেন। সমাজের নীচুস্তরের মানুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা ও সহমর্মিতার দলিল হয়েছে 'ঊর্মিমুখর'। এখানে মুসলমান সমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ মন্দির দেখে লেখক ফেরার সময় ট্রেনে পরবর্তী স্টেশনে নেমে বারিয়াডাল রওনা হন। বারিয়াডাল পার হয়ে পাহাড়ের পূর্ব সানুতে এসে অরণ্য অঞ্চলে ভ্রমণ করতে করতে বিভূতিভূষণ পৌঁছে যান আওরঙ্গজেবপুর নামে একটি গ্রামে। এই গ্রামটিতে কেবল মুসলিমদের বাস। সেখানকার অভিজ্ঞতা তথা আব্দুল লতিফ ভুঁইয়ার ব্যবহার চমৎকৃত করেছিল বিভূতিভূষণকে।

বিভূতিভূষণ গ্রাম-বাংলাকে দেখেছেন 'তৃণাঙ্কুর'-এ। কত মানুষ, কত তাদের বৈচিত্র্য। তাদের মধ্যেই তিনি পেয়েছেন মুসলমান চরিত্রগুলিকে। তাঁর অভিজ্ঞতালোকে তারা সাদরে গৃহীত হয়েছে।

'ঊর্মিমুখর' দিনপিলিতে বিভূতিভূষণের বেশকিছু গল্পের ও তিনটি উপন্যাসের ('আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'দৃষ্টিপ্রদীপ' ও 'ইছামতী') উপাদান পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণ যাদেরকে দেখেছেন, তাদেরকে একেবারে পুরোপুরি দেখেছেন। পথে যেতে যেতে সামান্য আলাপ মাত্র নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি। এটাই বিভূতিভূষণের মানবিকতা ও সহধর্মিতা।

পল্লিমঙ্গল সমিতি হয়েছে ব্যারাকপুরে। বিভূতিভূষণ তার অন্যতম উদ্যোগী। হপ্তার সভা বসবে চড়কতলায়। সেখানে গণি ও সয়ারামের বিচারের ভার তার ওপর। 'ওদের বিশ্বাস—কথকঠাকুরের পুত্তুর থাকলে অলেয্যিডা হতি পারবেনি কিছু।'

গোপালনগর স্কুলের সহপাঠী এক মুসলমান বন্ধু আব্দুল। দিনলিপিতে তাও লিখেছেন—

> আরামডাঙায় আব্দুলের বাড়ি গেলুম—কতদিন পরে। আমার বাল্যবন্ধু সেই আব্দুল। কত জায়গায় বেড়িয়েছি, কখনো ভেবেছি আব্দুলের বাড়ি যাবো?

আর একদিনের ঘটনা, ভাগলপুর জেলার রজৌন থানায় এক বিহারী মুসলমান দারোগার সৌজন্যে বিভূতিভূষণ মুগ্ধ হয়েছিলেন। শিক্ষক-জীবনে বিভূতিভূষণের কিছু মুসলিম ছাত্র ছিল, যাদের তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। যেমন—কালিমুদ্দি, সিরাজুল। কালিমুদ্দি ছিল বড়ো গরিব। পড়াশোনায় অত্যন্ত ভালো, বিভূতিভূষণ তাকে স্নেহ করতেন বড়ো বেশি। কেননা, বিভূতিভূষণের সঙ্গে তার ছিল আত্মিক সম্বন্ধ। কাঁচড়াপাড়া না কোথায় গিয়ে সে আর বাড়ি ফেরেনি এবং মারা গিয়েছে বলে বিভূতিভূষণ যখন শুনলেন তখন তাঁর চোখে জল, দিনলিপিতে লিখেছেন, 'কালিমুদ্দি মারা গিয়েছে শুনে বড় দুঃখিত হই'।

বিভূতিভূষণের দিনলিপি ও ছোটোগল্পের পাতায় এমন সব সাধারণ রক্তমাংসের মুসলিম মানুষের কথা উঠে এসেছে, যাদের কথা পড়লে মনে হয় এরা যেন

আমাদেরই একান্ত আপনজন; আমাদেরই চেনাজানা জগতের বৃত্তের মধ্যেই এদের চলাফেরা। মুসলিম চরিত্র নিয়ে লেখা গল্প ছড়িয়ে আছে বিভূতিভূষণের চোদ্দোটি গল্প সংকলনে। তাঁর ছোটোগল্পে নীচুতলার সাধারণ মুসলমান রমণীর মধ্যে অসাধারণত্ব আবিষ্কারের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। আর গরিব মুসলমান পুরুষ চরিত্রের মধ্যে এক ধরনের সরলতা ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত মানসিকতা দেখা যায়। তাদের জীবনে লেখক দেখেছেন মানবিকতার মহিমা। যেমন— 'ফকির' গল্প। এই গল্পের শেষাংশে আছে—খলসেখালি গ্রামের প্রান্তে নদীতীরে তেঁতুলগাছতলায় পর্ণকুটীরে একজন ফকির কোথা থেকে এসেছে। সন্ধ্যায় আকাশের নীলপটে মেঘের রচনার সঙ্গে সঙ্গে সে খেজুরচাটা বিছিয়ে নদীর ধারে যখন নামাজ পড়ে, তখন লোকে সবিনয়ে তার মুখে দেখেছে এক অদ্ভুত আলো, প্রভাতি তারার মৃদু জ্যোৎস্নার মতো।

'ফকির' গল্পে মুসলিম খেত-মজুরদের দুঃখ চিত্রিত হয়েছে। একটি গ্রাম্য ধর্ম-ভীরু মুসলমান চাষি ইচু মণ্ডলের সরল সততা 'ফকির' গল্পে রূপায়িত হয়েছে। জনমজুর ইচু আর তার স্ত্রী নিমিকে নিয়ে গল্পে। ইচু মণ্ডল বাল্যকাল থেকেই ধর্মভীরু, নামাজ না পড়ে সে কোনো কাজ করে না। একদিনও সে নামাজ বাদ দেয় না। যত দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি হোক সে নামাজ পড়া ছাড়ে না। লেখক বারবার দেখিয়েছেন, গরিবের অন্তরের মহত্ত্ব। ইচু মণ্ডলের মধ্যে আমরা তা প্রত্যক্ষ করি। দারিদ্র্য একটি মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্য, সততা, সারল্য নষ্ট করতে পারে না, দারিদ্র্য সত্ত্বেও একটি মানুষ মহান হয়ে উঠতে পারে, 'ফকির' গল্পে বিভূতিভূষণ তা দেখিয়েছেন।

বিভূতিভূষণের মুসলমান চরিত্রদের কাউকেই অসাধারণ বলা চলে না, কিন্তু চরিত্র-মাহাত্ম্যে তারা হয়ে ওঠে অসাধারণ। যেমন হয়ে উঠেছে 'ফকির' গল্পের ইচু মণ্ডল। তেমনই এক চরিত্র ব্যারাকপুরের গ্রাম্য বৃদ্ধ জমির দেওয়ালির বউ (ওরফে করাতি)। বিভূতিভূষণের দিনলিপি থেকে জানা যায়, জমির দেওয়ালির ছেলের সঙ্গে বিভূতিভূষণ একসঙ্গে পাঠশালায় পড়তেন। ছেলেটি শৈশবে মারা যায়। বিভূতিভূষণকে বুড়ি ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসত। প্রবাস থেকে বাড়ি ফিরে এসে বিভূতিভূষণকে বলত—

> গোপাল আমার এয়িলি, ও তারপর আঁচলের খুঁট খুলে একটা নোনা আতা বা পেয়ারা দিয়ে মায়ের মত স্নেহে বলত, তোর জন্যি নিয়ে অ্যালাম।

ওর ছেলে খালেদ ছিল বিভূতিভূষণের ছেলেবেলার খেলার সাথী। হঠাৎ সেই ছেলে মরার পর থেকে আরও বেশি করে লেখককে আঁকড়ে ধরেছিল জমির দেওয়ালি আর তার বউ। বিভূতিভূষণকে বলত—

> আমার খালেদ নেই, তুই আমার ছেলে। মরলে তুই আমার কাফনের কাপড় দিস। কবরে তোর হাতের মাটি পড়লেই আমি শান্তি পাব।

এই বৃদ্ধার মাতৃত্ব নিয়ে বিভূতিভূষণ লেখেন 'আহ্বান' গল্পে। 'আহ্বান' গল্পের বুড়ি—সকল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে, যে মাতৃস্নেহ অকম্পিত দীপ্তিতে উজ্জ্বল। এক হিন্দু যুবকের প্রতি একজন মুসলমান বৃদ্ধার স্নেহ-বাৎসল্যের কাহিনি। গল্পের শুরুতে দেখি, এই বৃদ্ধার বর্ণনা কী অপূর্ব ও মনোগ্রাহী—

> আমবাগানের মধ্য দিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছি, আমবাগানের ছায়ায় একটি বৃদ্ধার চেহারা ভারতচন্দ্রের বর্ণিত জরতাবেশিনী অন্নপূর্ণার মতো। কোনো তফাৎ নেই। বুড়িকে দেখেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। এ ধরনের বড়িকে দেখে আমার বড়ো মায়া হয়— নারীরূপের এ এক অপূর্ব পরিণতি।

এবার নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে গল্পের বৃদ্ধার স্নেহের সম্পর্ক স্থাপন। স্নেহের দান হিসেবে বুড়ির হাত থেকে দুধ ও ফল প্রভৃতি গ্রহণ। নায়কের কথাতেই—

> আমায় পেয়ে বুড়ী খুব খুশি হয়েছে। কত কি বলতে লাগলো, আমি বলতাম, কেন আস রোজ রোজ এতদূর থেকে?
>
> —এই পোকা নোনাডা ভাবলাম গোপালেরে দিয়ে আসি—
>
> তা হোক তুমি কষ্ট করে এসো না এরকম।
>
> —তুই তো আমারে দেখতি যাবি নে কোনোদিন—
>
> —সময় পেলেই যাব। এখন বাড়ি যাও।

বলাবাহুল্য, কথোপকথনটি উচ্চশিক্ষিত এক আধুনিক যুবকের সঙ্গে অশিক্ষিত অনাত্মীয়া এক গ্রাম্য বৃদ্ধার। তবু যেন কত আপনজন। তাই তুচ্ছ দানের মধ্যেও কী অপরিসীম ব্যাকুলতা। যেন দরিদ্রা জননী তাঁর সন্তানের জন্যে অসামান্য উপহারের মধ্যেই অন্নপূর্ণা রূপে মহিমাময়ী, আবার অসুস্থ বৃদ্ধার ভাঙা কুটিরে দর্শনেচ্ছু নায়ককে দেখে আনন্দের অশ্রুপাত এবং অন্তিম সময়ের জন্যে সকাতর আবেদন—

> বুড়ির দু'চোখ বেয়ে জল পড়ছে গড়ায়ে। আমায় বল্লে—গোপাল, যদি মরি আমার কাফনের কাপড় তুই কিনে দিস।

সেই বৃদ্ধার মৃত্যুতে নায়কের আত্মকথন—

> আমার মনে পড়ল বুড়ি বলেছিল, সেই একদিন আমি মরে গেলে তুই কাফনের কাপড় কিনে দিস বাবা। ওর স্নেহাতুর আত্মা বহুদূর থেকে বারাণসী থেকে আমায় কীভাবে আহ্বান করে এনেচে। আমার মন হয়তো ওর ডাক এবার আর তাচ্ছিল্য করতে পারেনি। কাপড় কেনার টাকা দিলাম।

গল্পের শেষাংশের উদ্ধৃতি বড়ই হৃদয়স্পর্শী—

> একটি প্রাচীন তিন্তিরাজ গাছের তলায় বৃদ্ধাকে কবর দেওয়া হচ্ছে। আমি গিয়ে বসলাম। প্রবীণ শুকুর মিঞা আসতে দেখে বল্লে—'এই যে বাবাঠাকুর, এসো। তামুক খাবা? বুড়ির মাটি দেওয়ার দিন তুমি কনে থেকে এলে, তুমি তো জানতে

> না? তোমার বড্ড ভালোবাসতো বুড়ি। তোমার কাছে কাফনের কাপড় নিয়ে তবে ওর মহাপ্রাণীডা ঠান্ডা হল। খাও তামুক—
>
> কবর দেওয়ার পরে সকলে এক এক কোদাল মাটি দিলে কবরের ওপর। শকুর মিঞা বলল—দ্যাখ বাবাঠাকুর, তুমিও দাও—তুমি দিলে মহাপ্রাণীডা ঠান্ডা হবে—দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো—অ মোর গোপাল।

এ কাহিনি থেকে মনে হয় সত্যিই কি দেশে হিন্দু-মুসলমানের ভেদরেখা চিরস্থায়ী? তা না যদি হয় তবে এত সহজে একজন কৃতী সাহিত্যিক কেমন করে এক মুসলমান বৃদ্ধার হৃদয়ে পুত্রস্নেহের আসন অধিকার করে।

আর এক অবিস্মরণীয় চরিত্র ব্যারাকপুরের প্রতিবেশি সীতেকাকা ওরফে রুপোকাকাকে কি আমরা কখনও ভুলতে পারি? 'রুপো বাঙাল' গল্পে লেখক বিভূতিভূষণের কথায়— রুপোকাকার আসল নাম রুপো বাঙাল, ও জাতে মুসলমান, আমাদের গাঁয়ের চৌকিদারও। লেখকের কথায়, রুপোকাকা নাকি সাজিমাটির নৌকাতে চড়ে ওর কুড়ি-বাইশ বছর বয়সের সময় দেশ থেকে আমাদের গ্রামের ঘাটে নিরাশ্রয় অবস্থায় এসে নেমেছিল। বিদেশ থেকে এসেছিল বলে উপাধি 'বাঙাল'।

রুপোকাকা লেখকের বাবাকে নাকি কোলেপিঠে করে মানুষ করে। লেখকের ভাষায়—

> আমাদের বাড়ির কৃষাণগিরি করছে আজ বহুদিন। সব দেখাশোনা করত। আশ্চর্যের কথা, বাবা বিশ্বাস করে এই সামান্য মাইনের মূর্খ কৃষাণকে এতসব বিষয়-আশয় দেখবার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

গল্পের শেষে লেখক বিভূতিভূষণের প্রশ্ন—

> বিশ্বস্ত লোকেদের জন্যে কি কোনো স্বর্গ আছে? যদি থাকে আমাদের বয়সের রুপোকাকার আসন অক্ষয় হয়ে আছে সেখানে। এইসব চোরাবাজারের দিনে, জুয়োচুরির দিনে, মিথ্যে কথার দিনে বড্ড বেশি করে রুপোকাকার কথা মনে পড়ে।

লেখকের 'কাঠ বিক্রি বুড়ো' গল্পটি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির আর একটি নিদর্শন। এক মুসলিম বৃদ্ধ কাঠ ক্রয় করে বিক্রি করে। এই মুসলমান বৃদ্ধকে লেখকের প্রকৃতি-বিরোধী বলে মনে হয়েছে। এই জন্যে লেখক তাকে ভালো চোখে দেখেননি। চব্বিশ দিন জ্বরভোগের পর এক তরুণ হঠাৎ মারা গেল, তার তরুণী স্ত্রীকে গ্রামের মেয়েরা ৪/৫ দিন ধরে সান্ত্বনা দিয়েও সুস্থ করতে পারেনি।

হঠাৎ একদিন লেখকের নজরে পড়ল, সেই মুসলমান বৃদ্ধ তরুণীর উঠোনে বসে তরুণীকে সান্ত্বনা দিচ্ছে—

> মা ঠাকরোন, বেঁচে চিরকাল কেউ থাকে না। তিনি অল্প বয়সে গিয়েছেন এই হল আসল কষ্ট। তা আপনার বাচ্চা কাচ্চাদের মুখির দিকি চেয়ে আপনি কোমর

> বাঁধুন।...আপনি অস্থির হলি ওরা কোথায় দাঁড়াবে মা ঠাকরোন? চোখের জল আর ফেলবেন না—আপনার চোখের জল দেখলে বুক ফেটে যায়।

লেখক দেখলেন বৃদ্ধ কথাগুলো বলছে আর তার ময়লা গামছায় নিজের চোখের জল মুছে ফেলছে। এর চেয়ে কোনো মধুর দৃশ্য শুধু লেখক কেন, কোনো মানুষই কল্পনা করতে পারে না।

বিভূতিভূষণের ছোটোগল্প বারবার দেখা দেয় গরিব মুসলমান চাষি-জনমজুর-ভবঘুরে-ফকির প্রভৃতিদের। বনগাঁর চালকি আর মরাগাঙের পাশে সামান্য কিছু ধানের জমি কিনিয়েছিলেন স্ত্রী কল্যাণী। বিভূতিভূষণের মুসলমান প্রজা বারিক মণ্ডল ওটা চাষ করে। মনিবকে বলে দেবতা, কিন্তু জোর তাগিদ ছাড়া ধান দেবে না। কল্যাণী যখন বলেন, কিছুই তো দিলে না। তাই তো! বারিককে বেশ মন্দকথা শুনিয়ে আসতে হবে। বলেই হয়তো বেরিয়ে পড়লেন কড়া মেজাজ নিয়ে। বারিক বাড়ি না থাকায় বারিকের মেয়ে বউ বসতে দিলে। বারিকের মেয়ে তামাক সেজে কল্‌কে নিয়ে এসে দাঁড়ায়—দাদাবাবু নেন। তামুক টানতে টানতে মনিবের মেজাজ একদম শরিফ। বারিক যখন ফেরে তখন আর গল্প ছাড়া কিছুই হল না। বারিকও খুশি—'দেবতুল্যি নোকের পেরজা মুই। নইলে কেরমের যা হচ্ছে দিনকাল, বাঁচতো কেডা!'

এই বারিক মণ্ডলকে আমরা পাই 'বারিক অপেরা পার্টি' গল্পে। 'কাঁচা-পাকা দাড়ীওয়ালা মুসলমান' বারিক মণ্ডলকে গল্পকথক প্রথম দেখেন জমি বিক্রির ব্যাপারে। বাবু জমি কিনলে সে হবে জমির ভাগচাষি। আসলে চাষবাসে বারিকের মন নেই। ছন্নছাড়া গরিব। কোনোমতে অন্ন জোটে। গান-বাজনা ছাড়া আর কিছু তার ভাল লাগে না। এহেন বারিক মণ্ডল সোৎসাহে বাবুকে গান শোনায় দুই ছেলেকে নিয়ে। সেদিন জন্মাষ্টমী। সে রাতেই গোঁসাই বাড়ির নাটমন্দিরে বারিক অপেরা পার্টির গাওনা হচ্ছে। কথক আসরে গিয়ে দেখলেন, বারিক বিদূষকের ভূমিকায় দাড়ি নেড়ে নেড়ে খুব লোক হাসাচ্ছে। পালা হচ্ছে 'সাধন সমর' বা 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ'।

অনাদায়ী টাকার খোঁজে লেখক একদিন বারিক মণ্ডলের বাড়ি গিয়ে দেখেন, মাত্র একখানা ঘর। ঘরের দরজা জানলার ফাঁকগুলো বাঁশের ঝাঁপ দিয়ে আটকানো। দোর পর্যন্ত নেই ঘরের। দেখেশুনে বেশি রাগ হইল না। তাগাদার চোটে তার ঘর থেকে সাড়ে সাত মন ধান বার করে দিয়ে বললে—

> বাবু আল্লার কিরে। ঘরে ধান নেই। সব দেলাম আপনাদের।
>
> —তুমি ছেলেপিলে নিয়ে খাবে কি? —তা আর কি করব বাবু। আমি নালিশকে বড্ড ভয় করি।

দু'দিন পরে দেখা গেল সন্ধেবেলা বারিক তার দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেহালা বগলে চলেছে—

> কোথায় যাচ্ছ? আজ্ঞে বাবু সালাম। মহল্লা দিতে যাচ্ছি। তুমি কি বেহালা বাজাও? ওই অমনি একটু একটু, খোদার মার্জিতে।

ক্রমে জানা যায়, জেলেপাড়ার একটা জীর্ণ ঘরে বারিক একটা যাত্রাদল খুলেছে। তার বেহালার দলের নাম তারই দেওয়া বারিক অপেরা পার্টি! লেখক জানান, নামটি বেশ সুন্দর। লেখকের তারিফ শুনে তারা বলে—

> বাবু মোরা তো ইংরিজি জানি নে। অন্য অন্য যাত্রাদলের কাগজে যেমন লেখা থাকে তাই দেখে মোরা একটা মিল খাঁটিয়ে করেছি।

'ভাল' হয়নি? অন্যের কাছে লেখক জানতে পারেন রামচরণ ময়রা বারিকের বলদজোড়া ক্রোক করে নিয়ে গেছে। ধান কর্জ পায় না বারিক কারুর কাছে, তাই একবেলা আহার জোটে বড়ো জোর। কাপড়ের অভাবে তার বউ বাইরে বেরুতে পারে না। ছেলেদুটো অন্যের বাড়ি খেয়েছে, ওদিকে বারিক সস্ত্রীক ক'দিন উপবাসী। অবাক হয়ে লেখক বলেন—

> সে কি কথা। গত সোমবার ওর গরু ক্রোক হয়েছে বলছ। সেই সোমবার সন্ধ্যের সময় যে ওকে বারিক অপেরা পার্টির ঘরে মহা আনন্দে দুই ছেলেকে নিয়ে গান করতে দেখেচি?

গল্পের উপসংহারে দেখা যায়, তার বড়ো ছেলে সাতদিনের জ্বরে মারা যায়। কবরের কাফন জোটে না এমন অবস্থায় লেখক ভাবলেন পরদিন সকালে বারিকের বাড়ি যাবেন। ভাগের জমি আবার ওর সঙ্গে বন্দোবস্ত করবেন। পুত্র শোকাতুর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত, সাহায্য করা উচিত। অথচ সেই রাতেই দশটা এগারোটা নাগাদ কানে এল বাঁশি বেহালা ডুগি তবলা ও বেহালার রব। গোঁসাই বাড়ির নাটমন্দিরে জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে বারিক অপেরা পার্টির গাওনা হচ্ছে। ক্ষুৎপীড়িত বিপর্যস্ত লোকশিল্পীর এই অনবদ্য কাহিনি বিভূতিভূষণকে জাত হিসেবে চিনিয়ে দেয়।

বিভূতিভূষণের কয়েকটি গল্পে গরিব মুসলমান চরিত্র এসেছে পার্শ্বচরিত্র হিসেবে। কিন্তু তাদের অন্তরের ঐশ্বর্য—মমতা, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা অল্পকথায় দু-চার রেখায় ফুটে উঠেছে। যেমন—'গল্প নয়' গল্পে রেল-কামরায় এক বৃদ্ধ মুসলমান যাত্রী মা-মরা এগারো-মাসের শিশুকে কোলে নিয়ে চলেছে। বোঝাই যায়, এই মাতৃহীন মৃত্যুপথযাত্রী শিশুটিকে বাঁচানো কঠিন। শিশুটিকে বাঁচানোর জন্য সেই বৃদ্ধের ব্যাকুলতা, তার মুখে বিস্কুট দেওয়া ও তাকে ভোলানোর আন্তরিক প্রয়াসে অন্য যাত্রীরা কান পাতে না, কেবল দুটি ময়লা-শাড়ি পরা দরিদ্র পল্লি-বধূর মমতা আকর্ষণ করে।

'অন্তর্জলি' গল্পে ডুমুরদহ গঙ্গার ঘাটে বিখ্যাত পাঁচালিকার ও কবিগান-রচয়িতা দীনদয়াল চক্রবর্তীকে অন্তর্জলির জন্য আনা হয়েছে। শেষ-প্রহরগুলিতে তার চেতন ও অবচেতন মনের ভাবনাগুলি লেখক নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। প্রায় শেষ মুহূর্তে

ডুমুরদহ ঘাটে এসে পড়েছে দীনদয়ালের গুণমুগ্ধ বর্ধমান কাছারির ডিহিনবিশ কাসেমালি মল্লিক। জাত ধর্মের বেড়া ডিঙিয়ে গিয়েছে কাসেমালি মল্লিক। প্রবীণ কবিয়ালের প্রতি তার যে একটা কর্তব্য আছে, তা সে ভোলেনি। সেজন্যই সে ছুটে এসেছে প্রকাশ করেছে আন্তরিক শ্রদ্ধা।

লেখক কেবল সরল সৎ গরিব মুসলমান চরিত্র এঁকেছেন, তা নয়। ঘুঘু ব্যবসাদারকেও তাঁর গল্পে এনেছেন। যেমন 'হাট' গল্পে। ঝিটকিপোতার পুরনো হাট ছেড়ে কুড়োন মণ্ডল, হারান মাঝি নতুন হাটে এসেছে যথাক্রমে পটল আর মাছ বেচতে। সেই পুরনো দিনের কথা। বারো পয়সা সেরে আধমন পটল বেচে কুড়োন মণ্ডল ভাবলে অনেক মুনাফা হয়েছে। তখন কুড়োন গেল অপর ব্যাপারী আবদুল শোভান ফকিরের কাছে। তার কাছ থেকে একছড়া পাকা মর্তমান কলা কেনে কুড়োন। দুজনের সংলাপে দুই ঘুঘু গ্রাম্য ব্যাপারীকে আমরা চিনে নিই।

কিশোরদের কৌতুক কাহিনি 'হারুন অল রসিদের বিপদ'-এ আছে। জানিপুর থেকে দুটি মুসলমান ছেলে পড়তে আসে স্কুলে। একজন হারুন, অপরজন আবুল কাসেম। একদিন সাহেবি পোশাক পরা ইন্‌সপেক্টর ওদের ক্লাসে এসে হারুনকে নাম জিজ্ঞেস করল। হারুন ভয়ে ভয়ে বললে—

> হারুন অল রসিদ। অ্যাঁ। স্যার। হারুন অল রসিদ। বোগদাদ থেকে কবে এলে? —আজ্ঞে স্যার? বলি বোগদাদ ছেড়ে এখানে ছদ্মবেশে নয় তো? হারুন বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। সরে এসো এদিকে, বলি ইতিহাস পড়েছ?—আজ্ঞে স্যার। কুতুবুদ্দিন কে ছিলেন? হারুন বললে—রাজা। কোথাকার রাজা, কোথায় থাকতেন? বিলেতে। বেশ!—আকবর কে ছিলেন? হারুন ভেবে বললে— সেনাপতি—কার সেনাপতি? রাজার। কোন্ রাজার?—বিলেতের।
>
> —বাঃ বাঃ হারুন অল রসিদ বোগদাদী বেশ ইতিহাসের জ্ঞান তোমার। বোগদাদের খবর কী? অ্যাঁ— হারুন ভাবলে বোধহয় তাদের গ্রামের ইংরেজি নাম। তাই সে বললে— খবর ভালো স্যার। হেডমাস্টার ও ইন্‌সপেস্টর হো হো করে হেসে উঠলেন। এর মধ্যে হাসবার ব্যাপার কী আছে, হারুন তা ভেবেই পেলো না।

'ভিড়' গল্পে ট্রেনের মধ্যে লুঙ্গি পরা এক পাঞ্জাবি মুসলমানের প্রতি ট্রেনের যাত্রীদের সমস্ত নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, উগ্র স্বার্থবোধ যাতে মানুষের পশুত্বের ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল, তা একমুহূর্তে ধুয়ে মুছে গিয়েছিল তার পুত্রশোকাতুর কান্নায়। মানুষের লজ্জা হয় এই মানবতার অপমানে।

বিভূতিভূষণ সেই মমতাময় গল্প-লেখক, যিনি গরিব হিন্দু-মুসলমান চরিত্রকে যত্নপূর্বক আঁকেন, তাদের দারিদ্র্যকে বড়ো করে তুলে ধরেন না, অন্তরের ঐশ্বর্যকে তুলে ধরেন। এক ধরনের গ্রাম্য ধূর্তামি ও চালাকি যেমন দেখান, তেমনি দেখান

সরলতা। এই সব চরিত্রের উপর বর্ষিত হয় লেখকের স্মিত হাস্য ও প্রশ্রয়। তাঁর কলমে তারা পেয়ে যায় অমরতা।

সবশেষে 'ঊর্মিমুখর' দিনলিপিতে উল্লিখিত একটি কাহিনি দিয়ে শেষ করব। ব্যারাকপুরে থাকতে বিভূতিভূষণ এক নিঃস্বার্থ সেবাব্রতী মুসলমান যুবক শিক্ষককে বড়ো ভালোবাসতেন। শিক্ষকটির ব্রত ছিল গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর চাষিদের লেখাপড়া শেখানো। এঁর মুখে গরিব ঘরের মোমেনা নামে একটি সুন্দরী মুসলমান মেয়ের করুণ কাহিনি শোনেন। মেয়েটির এগারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। সেই বয়সেই বিধবা হয়। উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষা দেওয়ার পর যখন পাশের খবর বেরলো তখন মেয়েটির দেওর তার বাপ মার কাছে যাতায়াত শুরু করলে, তাকে বিয়ে করবার জন্যে। মেয়েটির বাপ-মা রাজি হয়ে গেল। কিন্তু মেয়ের তাতে ঘোর আপত্তি। তার দেওর নিতান্ত মূর্খ চাষি। স্বাস্থ্যও অতি খারাপ। চেহারা কালো। মেয়েটি গ্রামের একটা শিক্ষিত সুশ্রী মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু বাপ-মায়ের মত নেই। দেওরদের নাকি খুব বড়ো ধানের গোলা আছে, ক্ষেত-খামার আছে। এ ছোকরার কিছুই নেই। মেয়েটির কথা কেউ শুনলে না। তাকে জোর করে বিয়ে দিলে তার দেওরের সঙ্গে। বিভূতিভূষণের মনে হল, 'গল্পটা আর কিছুই নয়— মানুষের ব্যথাহত আত্মার আকুতি'। সাহিত্যে নোবেলজয়ী আইভ্যান বুনিনের মতো বিভূতিভূষণেরও মনে হয়েছিল সাহিত্য হচ্ছে 'The prayer, the music, the song of the human soul.' বিভূতিভূষণের সাহিত্যেও এই ব্যথাহত মানবাত্মার জয়গানে মুখরিত। তাঁর সাহিত্যের সৃষ্ট চরিত্রগুলি যেন সকল ধর্মান্ধতা ও ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে। আজকের মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক হানাহানির দিনে বিভূতিভূষণের জীবন ও সাহিত্যের এইসব চরিত্রগুলি প্রাসঙ্গিকতার কথা বড়ো বেশি আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

<u>সহায়ক গ্রন্থ</u>

১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গল্প সমগ্র', ভূমিকা, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কলকাতা, ১৩৮২।
২. 'বিভূতি রচনাবলী', সম্পূর্ণ খণ্ড, ভূমিকা, জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১৩৮২, কলকাতা।
৩. পরমেশ আচার্য, ছোটোগল্পে মুসলমান সমাজ : সমীক্ষা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০১।
৪. চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, অপরাজিত, বিভূতিভূষণ, কলকাতা।
৫. বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, 'ছোটোগল্পে ত্রয়ী' : তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৮৫।
৬. গৌতম ঘোষ দস্তিদার, 'ভেদাভেদের কথাসাহিত্য', পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
৭. অলোক মণ্ডল, নানা রঙের বিভূতিভূষণ, ক্রিয়েটিভ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১০।

বিভূতি-ব্যঞ্জন

কৌশিক পণ্ডা

সমস্ত জীবন ভ'রে এবং সমস্ত জীবনের ভোরেও খাদ্য পরিবেশিত হয়ে থাকে। খাদ্য জীবন গঠনের স্বাভাবিক উপাদান, উপন্যাস রচনারও বটে। নিত্যদিনের আবহ নির্মাণে খাদ্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কর্মময় দ্রুত গতিশীল সংসারে খাদ্যই নির্মাণ করে সহজ-সরল-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবেশ, অভাবে বিপরীত আবহ পরিকল্পনা। খাদ্যগ্রহণের সময়ই প্রত্যেক মানুষ যেন তার অন্তরকে আপন ঢঙেই মুক্ত রাখে; সারাদিনের ক্লান্তির সুরটুকু সরিয়ে সুখটুকু খাদ্যগ্রহণের দ্বারাই শুযে নেয়। উপন্যাসে অথবা জীবনে খাদ্যই রচনা করে বাড়তি কথার আসর—মনের ভাব প্রকাশক এই আসরই চরিত্রের গভীরে যাওয়ার চাবিকাঠি। কখন স্নেহ-প্রসারিত কখনও বা স্নেহ-শাসিত, কখন শ্রেণি-চিহ্নিত কখনও আঞ্চলিক, কখনও হাস্যপ্লাবিত আবার কখনও জীবন ছাড়িয়ে অন্য কোনো পরাজীবনের আবহ নির্মাণে খাদ্যই হয়ে ওঠে জীবন চেনানোর অপরিহার্য চাবিকাঠি। আমার আলোচ্য বিষয় বিভূতিভূষণের সাহিত্য রচনায় খাদ্য বা খাদ্য উপাদান কীভাবে তাঁর শিল্প সুষমাকে আরও মধুর-রসাস্বাদনে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে।

উপন্যাস বা গল্প রচনার ক্ষেত্রে আবহ নির্মাণে লেখকের খাদ্যের প্রতি বিশেষ ঝোঁকের কথা তো বলতেই হবে, তবে তার আগে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের খাবারের প্রতি এক গূঢ় আকর্ষণের কথা এ প্রসঙ্গেই স্মরণীয়। 'সম্পাদকের বৈঠকে'-তে সাগরময় ঘোষ শনিবারের আড্ডায় সাহিত্যিকদের খাওয়া নিয়ে যে আলোচনা করেছিলেন, সেখানে 'খেতে পারেন বটে বিভূতিবাবু'—এই নিয়ে দ্বিমত ছিল না কারুরই। মেদিনীপুরে পৌঁছেই উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সভার বিষয় সম্পর্কে কথা না বলে, বিভূতিবাবুর 'প্রথম প্রশ্নই ছিল, দুপুরে আহারের বন্দোবস্ত কোথায় হল, কী কী রান্না হয়েছে'—তা নরেন্দ্রনাথ মিত্র উল্লেখ করেছেন।

খাবার সময় মেদিনীপুরের খাওয়ার বৈশিষ্ট্যের লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে উদ্যোক্তাদের কাছে 'কাঁকড়ার ঝোল' খাবার আবদার করেছেন। রাত্রে শোবার সময় ইঁদুরের খড়খড় শব্দে নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর সাহিত্যসভার জন্য আনা সিল্কের পাঞ্জাবিটা না কেটে দেয়—এমন ইতস্তত বোধ করলে বিভূতিভূষণ 'কাঁকড়া' বলে আশ্বস্ত করেন। নরেন

মিত্তিররা যখন কাঁকড়া বিছে ভাবলে তখন আবার বিভূতিভূষণ 'ওটা' 'ঝোলের কাঁকড়া' বলে সামনে সংগ্রহ করা কাঁকড়ার বস্তা দেখিয়ে বললেন—'কাল দুপুরে অর্ধেক রান্না হবে আর বাকি অর্ধেক পরশু ফেরবার সময় ট্রেনে তুলে দেবে।' যাইহোক ট্রেনে আর কাঁকড়াকে চড়ে কলকাতায় আসতে হয়নি। সে গল্পটি সরাসরি আমি এখানে তুলে দিলাম——

> পরদিন দুপুরে খেতে বসে খাওয়া কাকে বলে বিভূতিবাবু তা দেখিয়ে দিলেন। শুধু দেখানো নয়, দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন। নানারকম ভাজাভুজির পর যখন জামবাটির একবাটি করে কাঁকড়ার ঝোল দিয়ে গেল—শুধু তাকিয়ে দেখলাম বিভূতিদার চোখ-মুখের উল্লসিত ভাব। অন্যসব তরি-তরকারি সরিয়ে রেখে কাঁকড়ার ঝোলের বাটিটা টেনে নিয়ে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন তিনি। বাটিটা নিঃশেষ করে হুঁশ হল আমাদের দিকে তাকাবার। আমাদের বাটির ঝোল যেমন কে তেমনই আছে দেখে বিভূতিদা বিদ্রূপের সুরে বললেন—'শহরে থেকে তোরা ভাল জিনিস আর ভাল রান্নার কদর বুঝলি না। রেস্টুরেন্টে বসে কতকগুলো ফাউল কটলেট, মটন কটলেট, ব্রেস্ট কটলেট, কবিরাজি কটলেট খেয়ে খেয়ে তোদের রসনায় বিকৃতি ঘটেছে। আরে, ওগুলো তো সব ভেজাল সব বিষ।
>
> ততক্ষণে উকিল গিন্নি বিভূতিদার নিঃশেষিত বাটিটা আবার কাঁকড়ার ঝোলে ভরে দিলেন। বিভূতিদার দিক থেকে আপত্তির কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।
>
> আমরা আমাদের খাওয়া শেষ করে হাত গুটিয়ে বসে আছি। বিভূতিদার খাওয়া শেষ না হলে আসন ছেড়ে উঠতে পারছি না এবং বেশ বুঝতে পারছি আরও আধঘণ্টার আগে ওঠা সম্ভব হবে না। বিভূতিদা বাটি থেকে একটি একটি করে কাঁকড়া তুলছেন, তার দাঁড়াটা ভেঙে নিয়ে প্রথমে বেশ খানিকক্ষণ চুষিকাঠির মতন চুষে দাঁত দিয়ে কুটুস করে কামড়ে দাঁড়াটা ভেঙে নিয়ে তার ভিতরের মাংস কুরে কুরে খেতে লাগলেন।
>
> কী পরিষ্কার পরিপাটি খাওয়া! রসিয়ে খাওয়াও যে একটা আর্ট তা বুঝলাম সেদিন বিভূতিদার খাওয়া দেখে। দ্বিতীয় বাটি শেষ করবার পর গৃহকর্ত্রী যখন তৃতীয়বার কাঁকড়ার ঝোলে বাটি ভরতি করবার জন্য এগিয়ে এলেন—বিভূতিদা তখন একটা কাঁকড়ার আস্ত খোল মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে মৃদুস্বরে বললেন 'আমায় আর কেন'।
>
> অগত্যা আবার বাটি ভরতি হল, বিভূতিদা নিশ্চিন্ত মনে কাঁকড়া চিবোতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়েই আমরা তখন উঠবার অনুমতি চাইলাম। ততক্ষণে কাঁকড়ার ঝোল আমাদের চেটো আর আঙুলে শুকিয়ে আঠার মতো এঁটে গেছে। বিভূতিদা একটু সলজ্জ হেসে অনুমতি দিলেন। বললেন, 'তোরা ওঠ, আমার একটু দেরিই হবে। ভাল জিনিস রেখে চেখে না খেলে আমি তৃপ্তি পাইনে।

যাই হোক, শনিবারের বৈঠকী আড্ডায় নরেন মিত্রের মুখে শোনা বিভূতিদার খাবারের গল্প অন্যান্য সাহিত্যিক শ্রোতাদেরও সমান সরগরম করে রাখল বাকি কাঁকড়ার সদ্‌গতি বিষয়ে। নরেন বাবুরা চলে এলেও ডাক্তারি পরামর্শে বিভূতিভূষণ থেকে গেছিলেন। পরবর্তী ঘটনা মাস দুই পরে, বিভূতিদার সঙ্গে কলেজ স্ট্রিটে দেখা হলে বিভূতিদা 'মেদিনীপুরের প্রসঙ্গ নিজে থেকেই তুলে বললেন 'তিনদিন বিছানা থেকে উঠতে পারিনি। অবশ্য ওদের দোষ নেই। অসময়ে পুকুরের জাত কাঁকড়া জোগাড় করতে না পেরে ধানক্ষেতের কাঁকড়া ধরে এনেছিল। তাছাড়া রান্নাটা বড়ই উপাদেয় হয়েছিল রে। তাই লোভে পড়ে মাত্রাতিরিক্ত খেয়ে ফেলেছিলাম।'

গল্প বা উপন্যাসের নামকরণে বিভূতিভূষণের স্ব-মেজাজটাই পাই। যেমন—'অন্নপ্রাশন', 'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ', 'জলসত্র', 'তালনবমী', 'পুঁইমাচা', 'হিঙের কচুরি', 'আম আঁটির ভেঁপু' প্রভৃতি খাদ্যগন্ধী নামকরণ ছাড়াও চরিত্রনামে খাদ্যের ছায়াপাত রয়েছে। যেমন শ্রীনিবাস বাংলাদেশের মিষ্টত্বে 'চিনিবাস' হয়ে যায়। আর লোভী মেয়ে ক্ষেন্তির নাম তো সবার জানা। 'অপরাজিত' উপন্যাসে 'ননী' বেশ আদুরে নাম। নামের বৈচিত্র্য বাংলাদেশে শুধু চরিত্রে নয়, বিভিন্ন স্থানের নামকরণেও বটে। যেমন—'জলসত্র' 'কচুচুষির মাঠ' এছাড়াও আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন গাছের তলা যেমন সলতেখাগীর তলা (পথের পাঁচালীর আমগাছ), পেয়ারাতলা, আমতলা, লিচুতলা, সজনেতলা, হতুর্কিতলা, কাঁঠালতলা, যেগুলি ফলের সঙ্গে সম্পর্কিত সবই বিভূতিভূষণের উপন্যাস-গল্পের পরিসর জুড়েছে। এগুলি বাদ দিলে স্বাভাবিক নয় মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম খাবার স্থান লঙ্গরখানা, যেখানে হাজার হাজার নর-নারী খিচুড়ির জন্য আসতো। এঁর বর্ণনা 'অসাধারণ' গল্পে এবং 'অশনি সংকেত' উপন্যাসে পাই। কাহিনি, চরিত্র, স্থানের নামকরণে বিভূতিভূষণের সাহিত্য রচনায় খাদ্যের ঝুলিটিকেই খুব বেশি চিহ্নিত করেছে।

প্রকৃতির বিভিন্নতায় খাদ্যগ্রহণও ভিন্ন। 'আরণ্যকে' বাথুয়া শাক ও শ্যামঘাসের দানা প্রধান খাদ্য। গুড়মী ফল, বাঁশের কোঁড় সেদ্ধ, চীনাঘাসের দানা, কলাইয়ের ছাতু, মকাই সেদ্ধ, সজারুর মাংস খেয়ে এদের জীবনধারণ। দেশ অনুযায়ী ভাত এদের কাছে স্বপ্ন—'ভাত খেতে পাওয়াটা এরা ভোজের সমান বিবেচনা করে।' বাংলাদেশের প্রকৃতি সে তুলনায় নরম। 'ভেতো বাঙালি' তার অধিবাসীদের পরিচয়ের অন্য নাম। যদি এই ভাত ঘুম না হয়ে বাংলাদেশেই ভাতকেন্দ্রিক বিপ্রতীপ অবস্থা চিহ্নিত হয় তখন মহাবিপদ। যেই বিপদ বা আকালের ছবিই 'ফ্যান খাইতাম-ফ্যান খাইতাম' খাদ্য সংকটে মানুষের আর্তি। এই প্রকৃতি অবশ্য মনুষ্যসৃষ্ট। তাই সেদিন মেটে আলু, গেঁড়ি-গুগলি, পদ্মমূল, বুনোওল প্রভৃতি অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে মারা গেছে অসংখ্য মানুষ। বিভূতিভূষণ বলেছেন অপু-দুর্গার শৈশব-প্রকৃতির কথাও, যেখানে তাদের দাঁত টকে আম খেয়ে। জন্মে এরা ভাল জিনিস খেতে পায় না। পৃথিবীর মিষ্ট স্বাদ-আহ্লাদে এরা চিরলালায়িত 'এইসব

দারিদ্র্যঘরের বালক-বালিকাদের জন্যে তাই করুণাময়ী বনদেবীরা বনের তুচ্ছ ফুল-ফল মিষ্টি মধুতে ভরাইয়া রাখেন।' বাংলা ও বাংলার বাইরের প্রকৃতি ছাড়াও বিভূতিভূষণ ডুব দিয়েছিলেন আমাদেরই মধ্যে থাকা ভিন্ন এক শৈশব প্রকৃতিতে, সেখান থেকে খাদ্যগন্ধী মনি-মুক্তা আখর তো উঠবেই। 'অভিযাত্রিক'-এ বিভূতিভূষণ সাঁওতাল পরগনা, দক্ষিণ বিহার, সিংভূম, মধ্যপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অরণ্য অঞ্চল ঘুরে দেখেছেন মানুষের খাদ্য উপযোগী ফলের গাছ। পার্বত্য অরণ্য দেখাই যায় না বললেই চলে, আম, কলা, বেল, আনারস, লিচু প্রভৃতি ভালো জাতীয় ফল তো একেবারেই দেখা যায় না, দেখা যায় আমলকি, কেঁদ প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণির ফল, বড়জোর বিচি বোঝাই বুনো রামকলা যা মানুষের অখাদ্য। তাই তাঁর মতে—'সেকালের মুনি-ঋষিরা শোনা যায় বনের মধ্যে কুটির নির্মাণ করে নাকি বনের ফল খেয়ে জীবনধারণ করতেন! কথাটার মধ্যে কতদূর সত্যতা আছে জানি না।' খাদ্যকে কেন্দ্র করে প্রাচীন ভারতের ঋষি প্রকৃতিকে তিনি এখানে সমালোচিত করতে প্রয়াসী তবে কুরমি, ধুঁধুল, চিচিঙ্গে, ঢেঁড়স এবং পাখি, খরগোশ, গিরগিটি, সাপ, বুনো শিম, মহুয়ার তাড়ি (কুশল পাহাড়ী) বিরহোড় জাতের খাদ্যতালিকায় ঠাঁই জুড়েছে—তা লেখকের পথ চলার অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। এদেশে মহুয়ার তাড়ির মতো আমাদের বাংলাদেশে আগেকার দিনে চণ্ডীমণ্ডপে তামাক সেবন অপরিহার্য ছিল। এখন তামাকের জায়গায় চা-সিগারেট জুটেছে। এক্ষেত্রে মনে আসে লেখকের গল্প। 'একটি ভ্রমণ কাহিনি'র পরিকল্পনা অনেক চায়ের কাপে শেষ হয়। বিড়ি-সিগারেটের নেশা প্রকৃতি নির্মাণে সম্ভব হয়েছে কেদাররাজার গিরীনের মদ্যপ চরিত্রের দ্বারা। এছাড়া বিড়ি জঙ্গলমহলে কোথাও 'পিকা' নামে পরিচিত তা 'কালচিতি' গল্পে বলেছেন। খাদ্য কীভাবে মানুষের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে তা বিভূতিভূষণের সাহিত্যে বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

শ্রেনিবিন্যাসের উপাদান হিসাবে খাদ্য বিভূতিভূষণের রচনায় এক বিশেষ পরিসর জুড়েছে। পরের বাড়ি মোহনভোগ খেতে গিয়ে অপু নিজের অবস্থা ক্রমশ বুঝতে শিখছে—'সে যেন আবছায়া ভাবে বুঝিল তাহার মা গরীব—তাহারা গরীব—তাই তাহাদের বাড়ী ভাল খাওয়া-দাওয়া হয় না।' এমনি নগ্ন দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর রূপ ছোটোবেলায় যেমন সর্বজয়া অপুর চোখের আড়ালে রাখত তেমনি বড় হয়ে অপুও মার সঙ্গে একই কাজে পোক্ত হয়েছে, হস্টেলে থাকাকালীন প্রাতঃকালীন জলযোগের কাল্পনিক বিবরণ দেবার দ্বারা। 'অপরাজিত'-তে অপু তার বন্ধু প্রণবের বাড়ী এসে তার মাসীমার কাছে খেয়ে অনুভব করে 'অনেকদিন অপুর অদৃষ্টে এত যত্ন বা এত ভাল খাওয়া-দাওয়া জোটে নাই। চিনি, ক্ষীর, মশলা, কর্পূর, ঘৃত জীবনে কখনও তাহাদের দরিদ্র গৃহস্থলীতে এ সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে নাই। মায়ের সংসারে চালের গুঁড়া, গুড় ও সরিষার তৈলের কারবার ছিল বেশি।' খাদ্য ক্রমশ মানুষকে শ্রেণি সচেতন করায়।

সত্যচরণের দৃষ্টিতে আরণ্যকে সেই পার্থক্যের সত্যতা বুঝতে যেন দেশীয় গণ্ডি অতিক্রম করেছেন লেখক—"এদের দেশের সাধারণ লোকেদের তুলনায় বাংলাদেশের গরীব লোকেও অনেক বেশী অবস্থাপন্ন।" চীনাঘাসের দানা, ভেলিগুড়, লাড্ডু, টক দই মাথায় করে দূর-দূরান্ত থেকে কাছারিতে এই গরিব প্রজারা এসেছে শুধু খাবার জন্য। সত্যচরণের মধ্যবিত্ত মন এই দোসাদপাড়ার মেয়েদের ও বাচ্চাছেলেদের লুচি, মাংস, ক্ষীর, দই, পায়েস, চাটনি খাইয়ে তাদের চোখ-মুখের হাসি-আনন্দ দেখে কতদিন সুখ পেয়েছে।

'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এ খাবার কেন্দ্রিক শোষণ হাজারি সহ্য করে না। বাজারের কাঁচা মাছ, পোকা বেগুন, কম দামী ডাল এনে খদ্দেরকে খাওয়ায়; হাজারিকে দিয়ে সারা রাত ধরে লুচি বেলা থেকে ভাজা পর্যন্ত করিয়ে নেয় পদ্মঝি, অতিরিক্ত খাবার, মাছের মুড়ো নিয়ে তার সঙ্গে প্রতিদিন মানসিক শোষণ চলে অথচ এই হাজারির জন্যই বা তার সেরা রান্নার পদ চচ্চড়ির জন্যই হোটেলের এত নাম। এই অত্যাচার থেকে নিজেকে ও খদ্দেরদের উদ্ধার করার জন্যই হাজারির আদর্শ হিন্দু হোটেলের পরিকল্পনা ও বাস্তব রূপায়ণে তাঁর মানব দরদি সহানুভূতি ও নিরলস কর্ম প্রবণতা, যা পরে তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। শ্রেণি বদল ঘটলেও তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি।

ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের লোক দেখানো জমিদারীর রূপ পাই 'বিপিনের সংসার'-এ। জামাইয়ের জন্য কোনোরকমে ক্ষুদ্র হাঁড়ির এককোণে পোলাও রাঁধিয়াছেন, তাহা হইতে তাহাকে দিতে গেলে চলিবে কেন? তবু রোজ পোলাওয়ের ব্যবস্থা করিয়া বড়মানুষি দেখানো চাই।' 'অশনি সংকেত'-এ উল্লেখ আছে 'রেঙ্গুন চাল' ভারতের চাহিদা মেটাত কিন্তু জাপানীরা রেঙ্গুনকে ব্রিটিশদের থেকে নিয়ে নেবার জন্য সে চাল আর মিলল না। সৈন্যদের চাল ভারত থেকে জাহাজ বোঝাই হয়ে চলে যাওয়ায় এবং কালোবাজারি চক্রান্তে বাজার থেকে চাল 'কর্পূরের মত উধাও'। লক্ষ লক্ষ মানুষের অনাহারে কুখাদ্যে শীর্ণ হতে হতে প্রাণ যাওয়া, মতিবাগদিনীর মৃত্যু সংকেত লেখক দিয়েছেন, উচ্চমধ্যবিত্তের কালোবাজারি আর ব্রিটিশদের গোপনে কৃষক হত্যার নীতিতে বিপর্যস্ত গ্রাম বিত্তহীন মানুষের পথে পথে মৃত্যুর মিছিল আর ন্যূনতম চাহিদা অপূরণে মারণান্তিক আর্তনাদে সেদিনের বাংলা শ্মশান হয়ে গেছিল। 'অসাধারণ' গল্পে লেখকের বর্ণনায়—

> এই সময় মন্বন্তর শুরু হইয়া গেল। চাউলের দাম আগুন হইয়া উঠিতেছে দিনদিন। আমাদের এই ক্ষুদ্র টাউনের আশেপাশের পল্লীগ্রাম হইতে দলে দলে ক্ষুধার্ত নরনারী হাঁড়ি ও মালসা হাতে ফ্যান ভিক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল ফ্যানও অমিল। দশবিশ সের ফ্যান কোন গৃহস্থবাড়িতে থাকে না, যাহা থাকে তাহা প্রথম মহড়াতেই ক্ষুধা-ক্লিষ্ট নরনারীদের মধ্যে বিলি হইয়া যায়—একটু বেলায় যাহারা আসে, তাহাদের শুধু হাত ফিরিতে হয়। লোক দু-একটি করিয়া

> মরিতে শুরু করিল তাদের মধ্যে। টাউনের কুণ্ডু বাবুরা ও দাঁ বাবুরা প্রতিদিন একশত দেড়শত লোককে খিঁচুড়ি খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু অর্ধোলঙ্গ অনশনক্লিষ্ট দিশাহারা নরনারীদের সংখ্যর তুলনায় তাহা নিতান্তই অল্প। ইহার মধ্যে আবার ত্রিপুরা জেলা হইতে বহু নরনারী আসিয়া কোথা হইতে জুটিল, তাহাদের কথা ভালো বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া যে গৃহস্থের দোরে যায়, তথা হইতে তাহারা বিতাড়িত হয়, কোথাও তাহারা তেমন সহানুভূতি পায় না।

ভাত নয় ফ্যানের গল্প, মানুষ নয় উদ্বাস্তু জীবের গল্প, যারা শুধু বাঁচতে চায়, এমনই দুর্দশার দিন তৈরি হয়েছিল উঁচুতলার মানুষ ও সরকারের যাঁড়াশি প্রচেষ্টায়। অনাহারের ইতিহাস অনেক লেখকরই প্রাণে লেগেছিল। বিভূতিভূষণ ব্যতিক্রম নয়। উচ্চবিত্তের আভিজাত্যের প্রকাশ বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে দেখি। ভেট বা নজরানা দানের দ্বারা 'আরণ্যকে' সত্যচরণ, দোবরুপান্না ও 'ইছামতী'তে দেওয়ান রাজারামকে প্রজারা সম্ভ্রম দেখিয়েছে। নারী চরিত্রের মধ্যে 'আরণ্যকে' কুন্তা শত দারিদ্র্যের মধ্যেও নিজেই নিজের সম্মানটুকু ধরে রেখেছে, কারোর কাছে হাত পাতেনি। তবে বিভূতিভূষণ পথের সৌন্দর্যের কবি। সুন্দরগড়ের অরণ্য প্রকৃতির লীলা নিকেতনে পথ চলার সময় তিনি ভাবেন যেন পথ না শেষ হয়—"শেষ হলেই তো এ মায়া ফুরিয়ে যাবে আবার পড়বে লোকালয়। তখুনি শুরু হবে ব্ল্যাকমার্কেট, খবরের কাগজ, হপ্তায় একদিন ভাত খেও-না উপদেশ। উদ্বাস্তু সমস্যা ('কুশল পাহাড়ী')। লেখকের মধ্যবিত্ত মন যেন হাঁপিয়ে ওঠা পরিস্থিতি থেকে এর মধ্যে একটু বিশ্বাস খোঁজে।

খাদ্যসচেতনতা তৈরিতেও বিভূতিভূষণ অনবদ্য। রাজু পাঁড়ের সঙ্গে সত্যচরণ 'আরণ্যকে' ভয়াবহ এশিয়াটিক কলেরা আক্রান্ত শুয়োরমারি বস্তিতে ঘুরেছে। ডাক্তার, ঔষধ, পথ্য, বিশুদ্ধ জল, শবদাহের ব্যবস্থাহীন গ্রামে ক্ষুধার্ত বালিকার শিয়রে পাথরের খোরায় দেখেছেন পান্তাভাত—কলেরার পক্ষে যা 'বিষাক্ত অন্ন, যার প্রতি গ্রাসে নিষ্ঠুর মৃত্যুর বীজ।' 'অশনি সংকেত'-এ নাঙ্গাচরণ 'স্বাস্থ্য প্রবেশিকা' পড়ে পুরোহিতগিরি করার জন্য। চাল পুঁটুলি বাঁধা গ্রামীন বামুন খাদ্য সচেতনতার মাধ্যমে তার অলৌকিকত্ব বজায় রাখতে চায়, তাই 'স্বাস্থ্য প্রবেশিকা'র বুলি আওড়ায় 'ডাবের জল ছাড়া আমি অন্য জল খাবো না। তোমরাও নদীর জল ব্যবহার বন্ধ কর এক্কেবারে।...বাসি পচা জিনিস খাবে না। মাছি বসলে সে খাবার তখুনি ফেলে দেবে। সবাইকে বলে দাও।' 'কবি কুণ্ডু মশায়' গল্পে রয়েছে চেঞ্জে যাবার প্রসঙ্গ। রায়সাহেব তাঁর শরীর খারাপের জন্য কাঁচকলা আর পটল দিয়ে মাগুর মাছের ঝোল খান ডাক্তারি পরামর্শ অনুযায়ী স্বাস্থ্য ফেরাতে। 'উইলের খেয়াল' গল্পে কাঁচা নিমপাতা বাটা লিভারের পক্ষে বড় উপকারী, শরীর বড়ই ঠান্ডা রাখে—এমনি মত দুবেলা খাবার সংগ্রহ করতে না পারা পূর্ণবাবুর। 'অন্নপ্রাশন' গল্পে খোকার 'হিক্কা' ওঠার প্রতিষেধক হিসাবে ডাবের জল'-কেই

নির্দেশ করা হয়েছে। বিভূতিভূষণ মনে করতেন ভারতবর্ষের প্রধান শত্রু দারিদ্র্য-অজ্ঞতা অশিক্ষা-কুসংস্কার। এগুলি না কাটালে ভারতবর্ষ কখনই খাদ্য সচেতনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠবে না।

মনস্তত্ত্বের দিকগুলি খাবার পরিবেশনেই খুব ভাল খোলে। এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের ছোটভাইয়ের জন্য পাত্রী সন্ধানের যে গল্পটা 'সম্পাদকের বৈঠকে' রয়েছে, তাতে বিভূতিভূষণের ধারণা ছিল—'ভাল রাঁধুনী না হলে ভাল গৃহিনী হওয়া যায় না' যদিও দুমাস ধরে এক জেলা থেকে আরেক জেলায় পাত্রীর স্বহস্তে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভিন্ন রান্নার স্বাদগ্রহণের পিছনে বিভূতিভূষণের যে অন্য একটি মনস্তত্ত্ব ছিল তা হল—'বিভূতিদা ভাল করেই জানতেন যে, পাত্রী সু-রাঁধুনী হোক চাই না হোক, পাত্রীর মা-দিদিমা-ঠাকুমারা তাদের পাত্রীকে পার করবার জন্য রাঁধুনি জীবনের অভিজ্ঞতার যাবতীয় এলেম দিয়ে শুক্ত-চচ্চড়ি-ঘণ্ট ইত্যাদি রান্না করে পাত্রীর নামেই চালাবেন।' সুশীল রায় এই ব্যাপারটিকেই আরেকটু স্পষ্ট করেছেন—'বিভূতিবাবু সত্যিই খেতে ভালবাসতেন। ওঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল খেয়ে দেখা, মেয়ে দেখা ছিল উপলক্ষ্য।' সে যাই হোক 'পথের পাঁচালী' শুরু হয়েছে এভাবে—হরিহরের 'ছয় বৎসরের মেয়ে দুর্গা ইন্দিরের কাঁসার বাটির দিকে সকরুণ ও হতাশভাবে চেয়ে রয়েছে—দু'-একবার কি বলি কি বলি করিয়াও যেন বলিতে পারিল না'। শিশু মনস্তত্ত্ব বুঝে ইন্দির বলে 'এমা তোর জন্য দুটো রেখে দেলাম না', আর দুর্গা 'তা হোক পিতি, তুই খা।' বললে এক অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি হয় আপনা আপনিই। এই সম্পর্ক পোক্ত হয়েছে যখন সর্বজয়ার দ্বারা ভিটেচ্যুত ইন্দিরের কাছে মুড়কি আর কদমা নিয়ে এসেছে দুর্গা। আবার পেয়ারা, বৈঁচি, নারকেল, আমড়া, কামরাঙ্গা, কলাই দুর্গার শিশুমনের নখদর্পণে, দারিদ্র্যই এই সন্ধানে বাধ্য করেছে। এছাড়া রয়েছে বড়া ও চালভাজা কেন্দ্রিক অপু সর্বজয়ার মান-অভিমানের পালা, যেখানে সর্বজয়া অপুকে বলেছে—'তোমার আজ হয়েছে কি, তোমার কপালে আজ ছাই লেখা আছে।' কাঁঠালকেন্দ্রিক খোকার প্রতি ভবানী-তিলু-নীলুর বাৎসল্য স্নেহের উৎসের ভিন্ন মনস্তত্ত্ব ধরা আছে 'ইছামতী' উপন্যাসে। 'সীতানাথের বাড়ি ফেরা' গল্পে সীতানাথের সঙ্গে কর্মসূত্রে তার ছোট্ট খোকার বিচ্ছেদ বিরহের অবসান ঘটেছে বাড়ি ফিরে খোকার আদরে—'সে যার কোল থেকে নেমে দৌড়ে হাত বাড়িয়ে ওর দিকে ছুটে আসতে আসতে বললে—বাবা-ও বাবা—তুই কোথায় গেইলি? আমার জন্য মুকি এনেছ?...ও বাবা—' এই আদর অবশ্যই অনেকটাই মুড়কির সূত্র ধরে। 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসে খাদ্যকেন্দ্রিক প্রেম-মনস্তত্ত্বের উৎসার দেখা গেছে। বাবার শ্রাদ্ধের দিন মানীর 'অন্তর্যামী' গুণের পরিচয় পেয়েছে সকাল থেকে অভুক্ত থাকা বিপিন। এই উপন্যাসে দত্তমশায়ের মেয়ে শান্তিও মানীর অনুরূপ—'লোককে খাওয়াইয়া

মাখাইয়া সে খুশী।' বিপিনের প্রতি তার সহজ সরল আন্তরিকতা আগ্রহ বিপিনকে প্রেমের পথের পথিক করেছে। 'অশনি সংকেতে' আকালের দিনে গরম তেলে বড়ি ভাজা দেখে অনঙ্গ বৌয়ের জন্য নিয়ে যাবার সাধ জেগেছে গঙ্গাচরণের। দুর্গার জন্য নিমন্ত্রণ বাড়িতে লুচি দেখে অপুর এমনটিই মনে জেগেছিল। প্রেমের আগ্রহ ভরা আন্তরিকতা উজাড় করে দিয়েছিল সত্যচরণকে ভানুমতী এমনি খাবার প্রদানের দ্বারা। 'বিপদ' গল্পে হাজু গ্রামে এর বাড়ি ওর বাড়ি চুরি করে খেত। সে আজ শহরে বেশ্যা হয়ে যাদের বাড়িতে চুরি করে খেত তাদেরকেই অভ্যর্থনা করেছে। হাজু গ্রামের কথক হাজুর বাড়িতে এসে না খাওয়ার সংকল্প ঠিক রাখতে পারেনি। সন্দেশ, পেঁপে কাটা আগ্রহ ভরে হাজু কথকের সামনে রাখায় কথক গ্রহণ করলেও তার অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি 'সত্যিই আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করছিল।' এর ঠিক বিপরীতে রাখা যায় লেখকের 'হিঙের কচুরি' গল্পটিকে। কথক এখানে তিরিশ বছর আগের বেশ্যা কুসুমকে খুঁজে বার করেছে। কুসুমের মাতৃমন যে পাল্টায়নি তা কথকের উক্তিতেই চিহ্নিত—

> আমারও মনে ছিল না। খেতে গিয়ে মনে হল। বড় বড় হিঙের কচুরি চারখানা। তখুনি মনে পড়ে গেল কুসুমের সেই বাবুর কথা, সেই হিঙের কচুরির কথা। মনে এল ত্রিশ বছর পরে আবার সেই লোভী ছেলেটির ছবি ও তার কচুরিপ্রীতি। কুসুমের নিশ্চয় মনে ছিল। কিংবা ছিল না তা জানিনে। কচুরি খেতে খেতে আমার মন সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের ধূসর ব্যবধানের ওপারে আমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে একেবারে নন্দরাম লেনের গলির সেই অধুনালুপ্ত গুড়ের আড়তটা ও রাস্তার কলটার সামনে, যেখানে কুসুম আজও পঁচিশ বছরের যুবতী, যেখানে তার বাবু আজও সন্ধ্যেবেলায় ঠোঙা হাতে হিঙের কচুরি নিয়ে আসে নিয়মমত।

সমাজ বহির্ভূত সম্পর্কের মাধ্যম এখানে খাদ্য। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে দু'রকম সমাজমনকে আমাদের চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। ব্যতিক্রমী মনস্তত্ত্বের চিহ্নায়নে গল্প দুটি বিভূতিভূষণের খাবারকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্ব চর্চার বিস্তৃত অঙ্গনটিকেই চিহ্নিত করেছে।

জাতপাত সংকীর্ণতার গল্প-কথা অনেক উপন্যাসে বা গল্পে রয়েছে। 'অন্নপ্রাশন' গল্পে সেকালের ব্রাহ্মণশাসিত গোলমেলে সমাজের অপশাসন চিহ্নিত যেখানে পান থেকে চুন খসলেই নিমন্ত্রিত তিনশ ব্রাহ্মণ হৈ চৈ বাধিয়ে শুভকাজ পণ্ড করে দিতে পারে। এই বিচার-বুদ্ধিহীন প্রাচীনদের জন্য নিমন্ত্রণ বাড়ির কর্তা সান্যালমশায় তটস্থ। এর মধ্যেই বরদা বাঁড়ুজ্যে মশায় বললেন—

> একটা কথা আমার আছে। এ গাঁয়ে হারান চক্কোত্তি সমাজে একঘরে, তাদের বাড়ির কারুর কি নেমন্তন্ন হয়েচে আজ কাজের বাড়িতে? যদি হয়ে থাকে বা তাদের বাড়ির কেউ যদি এ বাড়িতে এসে থাকেন, তবে আমি অন্তত দেউলে সরাবপুরের ব্রাহ্মণদের তরফ থেকে বলচি যে, আমরা এখানে কেউ জলস্পর্শ করব না।

আবার এই জাতপাত সংকীর্ণতার ওপরে মানবিতার জয় ঘোষিত হয়েছে কচুচুষির মাঠের 'জলসত্রে'। শিরোমণি মশাই কলুর দেওয়া জলসত্রকে প্রথমে ঘৃণা করেন তাঁর বংশগৌরবে তাঁরা 'অশূদ্রে প্রতিগ্রাহী' চিরদিনই বলে, কিন্তু যখন 'তাঁর আটবছরের পাগলী মেয়ে উমার মতোই ছোট একটি মেয়ে এই বটতলায় অসহ্য পিপাসায় জল অভাবে বুনো কচুর ডাঁটার কটু রস চুষেছিল, আজ তারই স্নেহ করুণা এই বিরাট বটগাছটার নিবিড় ডালপালায় বেড়ে উঠে এই জলকষ্ট পীড়িত পল্লী প্রান্তরের একধারে পিপাসার্ত পথিকদের আশ্রয় তৈরি করেছে' অনুভবে সদ্‌গোপের হাত থেকে জল-সন্দেশ খেতে ব্যগ্র হয়ে পড়েন। হাস্যরস পরিবেশনে বিভূতিভূষণ খাবারকেই আশ্রয় করেছেন, 'আরণ্যকে' ছুঁড়ে মারলে জখম হতে পারে এমন শক্ত পিঠে রাজু পাঁড়ের খাবার বর্ণনা করেছেন সত্যচরণ এভাবে—'রাজু পাঁড়ে কাহাকেও মনে কষ্ট দিল না। পিষ্টক ভক্ষণের সীমা অতিক্রম করিয়া রাজু পাঁড়ে ক্রমশ অসীমের দিকে চলিতে লাগল দেখিয়া আমিও গণনার হাল ছাড়িয়া দিলাম।' 'ইছামতী' উপন্যাসে হলা পেকের খাবার বর্ণনাও চমকপ্রদ। এই উপন্যাসেই উল্লিখিত বিদেশি ইংরেজরা অনেকদিন বাংলাদেশে থাকার ফলে এদেশের গ্রাম্য লোকের মতো হয়ে গেছে। 'ওরা কাঁঠালের রস দিয়ে ভাত খায়। অনেকে হুঁকোয়-তামাক খায়'। যার জন্য বিদেশ থেকে আগত ওদের বন্ধুরা 'Gone native' বলে হাস্য করে। 'পথের পাঁচালী'-তে রাজীদের বাড়িতে গিয়ে অপু পোস্তকে যষ্টিমধু মনে করে খেয়ে নেয়। দুর্গা এই গল্প মায়ের কাছে বলে—'এমন বোকা না মা?' এইজন্য অপু দিদির সঙ্গে আড়ি করে দেবে বলে। এমনি ছোট্ট হাসির ঘটনায় আমাদের শৈশব ভেসে ওঠে। সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক মনে হয় সেই গল্পটি—অপুর প্রথম চুরুট টানার অভিজ্ঞতা। মার কাছে না ধরা পড়ার জন্য সেদিন অপু পাকা কুল অনেক করে খেয়ে হাই হাতে নিয়ে তবেই মানুষের সমাজে দ্বিতীয়বার প্রবেশ করেছিল। 'উইলের খেয়াল' গল্পে পূর্ণবাবুর নিমপাতা বাটার সঙ্গে ভাত খাবার দারিদ্র্য জীবন এবং বর্তমান উদ্বৃত্ত খাবারের জন্য বদহজম হবার ভয়ে তিন-চার রকম ওষুধ খাবার জীবন বর্ণিত। এখানে হাস্যরস অবশেষে করুণায় ঝরে পড়ে। লেখক বর্তমানে তার ভোগ লালসায় উন্মত্ত জীবন দেখে বললেন—'জীবনে ওঁর যখন সুবৃষ্টি এল, জল না পেয়ে তখন তা আধ-মরা।' তাই বর্তমানে যখন ক্রমশ আয়ু ক্ষীণ হয়ে আসছে তখন তার খাওয়াও থামেনি। পূর্ণবাবু বলছেন—'আর হজম করতে পারিনে এখন। আমাদের পাড়ায় আছে গদাধর কবরেজ খুব ভালো চিকিচ্ছে করে, এক হপ্তার ওষুধ নেয় দুটাকা-তারই কাছে ভাবছি এবার—। পূর্ণবাবুর সেই নিমপাতা-বাটা মেখে ভাত খাওয়ার কথা আমার মনে পড়ল, আরও মনে পড়ল পূর্ণবাবুর প্রথম জীবনের শৌখিনতার কথা। এখন তিনি বুঝেছেন আর বেশিদিন বাঁচবেন না, চিরবঞ্চিত জীবনের সর্বগ্রাসী তৃষ্ণায় ভোগলালসা তাঁর—বিকারের রোগীর মত অসংযত, অবুঝ।' 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' তারানাথ

নিজের কাজে নিজেই করুণার পাত্র হলেন যখন পাগলী মড়া পোড়ানোর পোড়া কাঠ কয়লা তুলে অসম্বন্ধ খিল খিল এসে 'খা-খা ক্ষীরের বরফি খা' বললে, তখন 'আমার মনে হল এতো দেখছি পুরো পাগল, কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, এর কথায় মড়া পোড়ানো কয়লা মুখে দেব—ছিঃ ছিঃ? কিন্তু তখন আর ফেরবার পথ নেই। অনেক দূরে এগিয়েছি। দিলাম সেই কয়লা মুখে পুরে, যা থাকে কপালে! পরক্ষণেই থু থু করে সেই বিশ্রী, বিস্বাদ চিতার কয়লার টুকরো মুখ থেকে বার করে ফেলে দিলুম। পাগলী আবার খিল খিল করে হেসে উঠল।' বিশ্বাসের এমন ভাঙনে আমাদেরও হাস্যরস উদ্রেক করে বইকি যখন পাগলী তাকে 'রাবড়ি, মর্তমান কলা খেতে শ্মশানে এয়েছে পেটুক জানোয়ার' বলে গালিগালাজি করে। এমন বিচিত্র হাস্যরসের উদ্রেককারী লেখককে অবশ্যই সাধুবাদ দিতে হয়।

লোক-সংস্কৃতির বহুবিধ উপাদান পাই আরণ্যকে প্রজাদের ভেট দেবার সময়ে। এছাড়াও এই উপন্যাসেই পাই ননীচোরা নাটুয়ারূপী ধাতুরিয়ার নাচ 'সেই খুঁৎ খুঁৎ করিয়া ছেলেমানুষের মত কান্না—সেই চোরাননী বিতরণ করিবার ভঙ্গী—তাহাকে আরও মানাইল এইজন্য যে সে সত্যিই বালক।' দুর্গা-অপুর ছড়া শৈশবকে ধরে রেখেছে—'নেবুর পাতায় করমচা/হে বৃষ্টি ধরে যা'। অথবা 'ইছামতী'-তে বিধুর মুখে উক্ত—'আজ বলেচে যেতে/চাল সুপারি খেতে/চালের ভেতর সুপারি বাটা...'—এই ছড়ায় খাদ্যগন্ধ লেগে রয়েছে। আবার লোকছড়ায় এসেছে লোকপ্রবাদ-প্রবচনের দিক—'লাথি ঝাঁটা পায়ের তল/ভাত কাপড়টা বুকের বল।' অথবা 'অশনি সংকেতে' লোকবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে অনঙ্গ বৌ বলেছে—'তুমি আমি দেবার মালিক? যিনি দেবার তিনিই দেবেন?' ব্রাহ্মণ বিভূতিভূষণ শাস্ত্রীয় আচার হিসেবে পিণ্ডদান প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন 'অপরাজিত' উপন্যাসে—'পরদিন বৈকালে গয়ায় নামিয়া সে বিষ্ণুপাদমন্দিরে পিণ্ড দিল। ভাবিল, আমি এসব মানি, বা না মানি, কিন্তু সবটুকু তো জানি নে? যদি কিছু থাকে, বাপমায়ের উপকারে লাগে! পিণ্ড দিবার সময়ে ভাবিয়া ভাবিয়া ছেলেবেলায় বা পরে যে সেখানে মারা গিয়াছে বলিয়া জানা ছিল, তাহাদের সকলের উদ্দেশে পিণ্ড দিল। এমন কি, পিসিমা ইন্দির ঠাকরুনকে সে মনে করিতে না পারিলেও দিদির মুখে সবই শুনিয়াছে—তাঁর উদ্দেশে আতুরী ডাইনী বুড়ীর উদ্দেশেও।' বৃত্তি পেয়ে অপু যখন গ্রাম ছেড়ে বাইরে পড়তে যাবে তখন সর্বজয়া 'দধিযাত্রার আবশ্যকীয় দই একটা ছোট পাথরবাটিতে পাতিয়া রাখিল।' এছাড়া আছে 'ইছামতী'তে 'তেরের পালুনি'র কথা—ভাদ্রমাসের তের তারিখে পাঁচ পোতার গ্রাম্য বউ-ঝিদের বনভোজন। এই উপন্যাসেই উল্লিখিত চৌদ্দ শাকের কথা—কাঁদামনি, বৌটুনটুনি, সাদা নটে, রঙ্গিন নটে, গোয়াল নটে, ক্ষুদে ননী, শান্তি শাক, মটরের শাক, কাঁচড়াদাম, কলমি, পুনর্ণবা, রাঙা আলুর শাক, ছোলার শাক, পালং শাক যা কালী পুজোর আগের দিন খাবার রীতি।

'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ' গল্পে উল্লেখ আছে ভাদ্রমাসে লক্ষ্মীপুজোয় অরন্ধনের নিমন্ত্রণের কথা। 'অন্নপ্রাশন', 'তালনবমী' প্রভৃতি লেখকের গল্পেরই নাম। 'ডাইনী' গল্পে ডাইনী অপবাদে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর মনোমালিন্য ও খাওয়া বন্ধের অলিখিত প্রথা। 'বোতাম' গল্পে হো ভাষায় ভাতের অন্য নাম 'মান্তি'র উল্লেখ পাই। 'উপেক্ষিতা' গল্পে ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে কলাপাতায় মোড়া চন্দ্রপুলি, গোকুল পিঠে খাদ্য বা রসনা চর্চার লৌকিক দিকটিকেই চেনায়, 'নুটিমন্তর' শিখে হাবুর লোভদৃষ্টি ও নিবারণার্থে পায়রাগাছির রোজাকে পায়ে পড়ে হাবুর কাতরোক্তি একটু হাস্যাস্পদই বটে। এছাড়া রয়েছে 'মুখ চুন', 'পান থেকে চুন খসা', 'খুদকুঁড়ো', 'অন্নদাস', 'বাপের পয়সায় খৈ ছড়ানো' প্রভৃতি শব্দগুলি যা সত্যিই বাংলার নিজস্ব লৌকিক সংস্কৃতির উৎসজাত। 'সরস মুখরোচক পরনিন্দা' পরনিন্দাকে যেন উপভোগের মতন করে তোলে, বিভূতিভূষণের লেখনীও যেন বাংলার লোকসংস্কৃতি আরও একটু নিজস্বতা বাড়িয়ে দেয়।

সেবাব্রতের অপরিহার্য উপাদান খাদ্য। এক্ষেত্রে মনে অসে 'বুধোর মায়ের মৃত্যু', 'কেদার রাজা' এবং 'আরণ্যক' রচনায় উল্লিখিত কিছু প্রসঙ্গ। 'আরণ্যকে' দোসাদপাড়ার মেয়েদের ও বাচ্ছাছেলেদের লুচি-মাছ-মাংস-ক্ষীর-দই-পায়েস-চাটনি খাইয়ে সত্যচরণের হৃদয়ের প্রসারতার অনুভব আমাদের অনুভবকেও বিস্তার ঘটায়। 'জলসত্র' গল্পেও এই মানবিক প্রসারণ আমাদের চোখ এড়ায় না। 'বুধোর মায়ের মৃত্যু' গল্পে জগন্নাথ ক্ষেত্রে এসে জানতে পারে অজানিত সেবাব্রতে সে নিজেই অন্নদান মহাযজ্ঞের অংশীদার। রুক্মিণীর মা জগন্নাথ দেবের কীর্তন করতে গিয়ে বলেন কলিকালে অন্ন ব্রহ্ম, অন্নদান মহাসেবা, মহাযজ্ঞ; আর জাগ্রত দেবতা জগন্নাথ দু'হাতে অন্নদান করছেন। সকলকে পেট ভরে খাওয়াচ্ছেন তিনি। একথা শুনে স্মরণে আসে বুধোর মা গতবছরে মুচিদের ধান কর্জ দেবার কথা, কাউকে শুধু হাতে ফিরিয়ে না দেবার প্রকল্প; যেভাবে 'আজ সিউরীগিন্নির মুখে জগন্নাথের অন্নদান-মাহাত্ম্য শুনে ওর বুকখানা দশহাত হল। ভগবান তাকে ঠিক পথেই চালিয়ে নিয়ে গিয়েছেন তাহলে। সবাই তাকে মন্দ বলে তাদের গাঁয়ে, তারা এসে দেখুন এখানে।' 'কেদার রাজা'য় 'কেদার ছত্র' খুলবার স্বপ্ন দেখেছে শরৎকুমারী। না, শরৎকুমারী বিশ্বনাথের বারানসীর কেউ নয়, বাংলার গড়শিবপুরের রাজা কেদারের মেয়ে ভাগ্যচক্রে বিশ্বনাথের অলিতে গলিতে ভাণ্ডারা দেখার মধ্যে দুঃখ-তপ্ত মানুষের দু'মুঠো অন্নসংস্থানের সম-অনুভবী। নাটকোটা, তৈলিঙ্গি, পাঁড়ে, আমবেড়ে প্রভৃতি ছত্তর দেখে, তাদের সীমিত আয়োজন দেখে, পরিবেশনকারিনীর সঙ্গে ভোজনকারীদের নির্লজ্জ অনুযোগ দেখে তাঁর বাবার নামে 'কেদার ছত্রে'র স্বপ্ন পরিকল্পনা—

> শরৎ স্বপ্ন দেখে, সে প্রকাণ্ড ছত্র খুলেছে, কেদার ছত্র, বাবার নামে। কত লোক এসে খাচ্ছে—অবারিত দ্বার। বাবার ছত্র থেকে কোনো লোক ফিরবে না, অনাহারে কেউ

> ফিরে যাবে না। সে নিজে দেখবে শুনবে—সকলকে খাওয়াবে। সে দুহাতে অন্নদান করবে। সকলকেই—ব্রাহ্মণ শূদ্র নেই, তুণ্ডমুণ্ড নেই, বাঙাল ঘটি নেই—সকলেই হবে তার পরম সম্মানিত অতিথি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে খাওয়াবে সে। এই দেখার নেশা তাকে পেয়ে রয়েছে। সে দেখতে চায় দুচোখ ভরে এই বিরাট অন্নব্যয়, অকুণ্ঠ সদাব্রত—সেখানে গনেশ মহল্লার পাগলীর মত, ওই অন্ধ রেণুকার মত, তার নিজের মত, ওই সত্তর বছরের মাজা-ভাঙা বুড়ীর মত নিরন্ন, নিঃসহায় মানুষকে দুবেলা খেতে দিচ্ছে। ওই দেখতে তার খুব ভালো লাগে খুব-খুব ভাল লাগে। ওই সব ছত্রেই বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা প্রত্যক্ষ বিরাজ করেন বুভুক্ষু অভাজনদের ভোজনের সময় মন্দিরে তাঁদের দেখার ছেয়েও সে দেখা ভালো। অনেক, অনেক ভালো। 'মানব সেবাই মাধব সেবা' বা 'Service to man is service to God' আধুনিক সেবাব্রতের শ্রেষ্ঠ উচ্চারণে শরৎকুমারী সত্যিই বিভূতিভূষণের আদর্শস্থানীয় মহিলা চরিত্র। এই চরিত্রের অন্নপূর্ণা মূর্তিতেই বিভূতিভূষনের লেখনীর পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেছে।

ভাষাগত উপস্থাপনা রীতি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় বারিদবরণ ঘোষ বলেছেন—'এইসব গল্প লেখার জন্যে লেখক যে ভাষা-বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করে গেছেন তা একান্তভাবেই বৈভূতিক।' 'পুঁইমাচা' গল্পে তিনি লেখেন 'ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন।' আবার দেখুন তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তি 'নসুমামা ও আমি' গল্পে—'নসুমামা আমায় দেখে হেসে বলে—আয় পাঁচি, বোস। কাল দই পেতেছিলাম, দইটা বসেনি। উনুনের পাড়ে রেখে দেবো, কি বলিস? ...কাল বুঝলি, এক কাঠা মুগের ডাল ভাজলাম, ভাঙলাম। বেলা গেল ডালডুল করতে। গা হাত পা ব্যথা।' এছাড়াও উপভাষা প্রয়োগের নমুনা 'যাচাই' গল্পে পাই—'একটা ক্ষুদ্র ভাঁড়, চেঁচে-মুছে ঘি বেরুলো আধ-ছটাক খানেক।' আবার 'কুশল পাহাড়ী'তে মঙ্গল টুডুর সাঁওতালী কথা—'কোন ঘরে রান্না করচিস তুরা?...ঘাটোয়ালী বাংলোয় যা, ...লিয়ে যাবো চল্ সেখানে।' 'কেদার রাজা'য় শরতের মুখে শুনি 'হাড় ভাজাভাজা হয়ে গেল আমার—'। ভাষা বৈশিষ্ট্যের অপর স্থানজুড়ে আছে শিশুদের গভীর পর্যবেক্ষণ—'অন্নপ্রাশন' গল্পে 'ছোট মেয়ে সুবু তো কেবলই জিজ্ঞাসা করিতেছে—পিছিমা, ওদের বালি থেকে ডাকতে আছবে কখন? পায়েছ খাব, ছন্দেশ খাব, না পিছি? আমি যাব, ওবু যাবে, দাদা যাবে, মা যাবে—'। 'পথের পাঁচালী'র অপুর প্রথম স্পষ্ট কথার শুরু বোধহয় বর্ষাকালে। সর্বজয়া বলছে—"কি জানি কি করিয়া শিখিল 'ভিজে'। একদিন অপুকে কদমা হাতে বসাইয়া রাখিয়াছিল।—কেমন খেলি ও খোকা? অপু দন্তহীন মুখে কদ্মা চিবাইতে চিবাইতে ফুলের মত মুখটি তুলিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল 'ভিজে'। হি-হি ভাবিলে এখনও সর্বজয়ার হাসি পায়।" ভাষা বৈশিষ্ট্যের পর্যবেক্ষণযোগ্য এমন

উদাহরণের জুড়ি মেলা ভার। 'সীতানাথের বাড়ি ফেরা' গল্পে কেকওয়ালার কেক বিক্রির ডাক—

> চাই কেক্, ভাল কেক? এতে আছে মাখন, ডিম, কিশমিশ, বাদাম, পেস্তা। বাজারে যার দাম দু'আনা, আমাদের কোম্পানী প্রচারের জন্য তাই দিচ্ছে এক আনায়। বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের জন্যে নিয়ে যান, আগে খান পরে দাম।...ভাল কেক্, প্রতুল কোম্পানীর ইংলিশ কেক।...নিয়ে যান না। মশায়। এই গাড়ীতে আজ এক বছর ধরে আমি কেক্ বিক্রী করচি। সবাই আমায় জানে। প্রতুল কোম্পানীর কেক্ বললে সবাই চেনে। ভালো না লাগে লাইনের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিন, দাম ফেরৎ দেবো—এরপরেও কি আপনার মনে হয় যে কেক্ বিক্রি হয়নি, তাহলে গল্পটা পড়েই দেখতে হবে।

'সম্পাদকের বৈঠকে'ই উল্লিখিত "আজ যদি বিভূতিবাবু বেঁচে থাকতেন এবং গল্প উপন্যাস না লিখে একখানা প্রমাণ সাইজের গবেষণামূলক বই লিখে তার নাম দিতেন 'বাংলার রান্না ও রাঁধুনি' বা 'পশ্চিমবঙ্গ রন্ধন সংস্কৃতি' তা হলে আকাদেমি না পেলেও রবীন্দ্র পুরস্কারটা মারে কে!" একথার সঙ্গে বোধহয় দ্বিতীয় মত পোষণ করবেন না কেউই। 'তুচ্ছ' বা অতিতুচ্ছকে তিনি 'অসাধারণ'ত্বে উত্তীর্ণ করিয়েছেন নিজের শিল্পগুণেই। খাদ্য—জীবন ভাবনার ক্ষেত্রে উপাদানের বৈচিত্র্য নিয়ে তার উপন্যাসে, গল্পে হাজির হবে তা স্বাভাবিকই।

'অশনি সংকেত' উপন্যাসের শেষ হয়েছে আকালের দিনে শুধুমাত্র চালের জন্য কপালী-বৌকে অনঙ্গ বৌ দেহ ব্যবসা হতে যদু পোড়ার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার মধ্যে দিয়ে। মতি বাগদিনীর মৃত্যু সংকেতের মধ্যেও বিভূতিভূষণের এই বিরল মনুষ্যত্বের সৌরভ মানুষী-যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে প্রয়াসী। অপুর মনে পড়ে মধুময় চৈত্রমাসের বিকেলে মায়ের হাতে বেলের শরবৎ খাবার স্মৃতি যা আইনস্টাইনের চেয়েও বড়ো বিশ্বদৃষ্টির দিকে তাকে ঠেলে দেয়—'বড় লোকের মেয়েরা নতুন মোটর কিনে যে আনন্দ পায়, মা অবিকল সেই আনন্দই পেতেন যদি নেমন্তন্ন থেকে আমি ভালো ছাঁদা বেঁধে আনতে পারতুম, আমার দিদি সেই আনন্দই পেত যদি বন-ঝোপে কোথাও পাকা ফলে ভরা মাকাল লতা কি বৈঁচি গাছের সন্ধান পেত।'—এই বিরাট কালসায়রে পৃথিবীর অনবরত ঘটনাস্রোত নিজের গতিতেই বয়ে চলতে চলতে কোথায় মিলিয়ে যায়, মানুষ তার কুল পায় না; তবুও মানুষ পরাজয় না মেনে অতীতকে স্মৃতির মধ্যে আশ্রয় দিয়ে অভিনব কৌশলে স্মৃতিকে উত্তরাধিকারীদের জন্য সঞ্চিত প্রসারিত করে জীবনের মহত্ত্ব অনুভব করে।

কালজয়ী, জগৎজয়ী, জীবনজয়ী এই স্মৃতিই প্রতিদিনের কর্মজীর্ণ অগভীর একঘেয়ে জীবনের মাঝে শাশ্বত পরিপূর্ণ আনন্দে ভরা গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনীর প্রস্রবনটিকে খুলে দেয়। অপুর স্মৃতিমেদুর মন্দাকিনী অপুকে যেমন প্রতিনিয়ত উজ্জ্বল করেছে,

তেমনি বাঙালিদেরও। সেই নস্ট্যালজিক রিয়ালিটির রহস্যময় অনুভবের জগতে প্রবেশ করতে হলে, স্মৃতির আশ্রয়ে রহস্যের গ্রন্থিমোচনে খাদ্য, খাদ্যের গন্ধ, তার স্মৃতির কাছেই ফিরে আসতেই হবে বার বার। বিভূতিভূষণের রচনায় উল্লিখিত মাকাল ফল পরিচিত 'কল্পনাসৃষ্টি বীজঞ্চ' নামে, উপন্যাস গল্পে ও অন্যান্য রচনায় প্রাপ্ত খাদ্য প্রসঙ্গের নামে, শিল্প-সৌন্দর্যও তেমনি তবে হাজারির চচ্চড়ির মত রন্ধন হল কিনা, জিবে-গজা, মালাই-মিঠা কিংবা স্বর্গীয় আনন্দ নাড়ুর পরিবেশন যথাযথ হল কিনা—পাঠকদের তৃপ্তির ঢেঁকুরে তার প্রকাশ ঘটবে।

আকর গ্রন্থ

বিভূতি-রচনাবলী; ১-১০ খণ্ড, সম্পাদক গজেন্দ্র কুমার মিত্র, শ্রী চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট।

সহায়ক গ্রন্থ

১. রচনা সংগ্রহ, সাগরময় ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই ২০১২, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন।
২. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ গল্প, সম্পাদনা বারিদবরণ ঘোষ, জানুয়ারি ২০১১, দীপ প্রকাশন, কলকাতা-৭০০০০৬।

এক নজরে বিভূতিভূষণ

বিভূতিভূষণের জীবনপঞ্জী

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর (১৩০১ বঙ্গাব্দের ২৮ ভাদ্র) বুধবার হালিশহরের মুরারিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা মৃণালিনী দেবী। পিতার জীবিকা ছিল যজমানি এবং পূজা-অর্চনা। ফলে দারিদ্র্য ছিল তাঁদের নিত্যসঙ্গী। কাশী থেকে তিনি শাস্ত্রী উপাধি পেয়েছিলেন সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য। তাঁর বংশ পরিচয় একটু জেনে নেওয়া যাক—

তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
|
মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
|
হেমাঙ্গিনী দেবী (প্রথমা স্ত্রী) নিঃসন্তান
|
মৃণালিনী দেবী (দ্বিতীয়া স্ত্রী)

বিভূতিভূষণ (১৩০১) ও গৌরী দেবী এবং রমা (কল্যাণী) | তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৫৪)	ইন্দুভূষণ (১৩০৪) পাঁচ বছর বয়সে মারা যায়।	জাহ্নবী (১৩০৫) ১৯৩৯-এ ইছামতীতে ডুবে মারা যায়।	সরস্বতী (১৩০৮) বিবাহের অল্প কিছুদিনের মধ্যে মারা যায়।	নুটু বিহারী (১৩১২—১৩৫৭)

বিভূতিভূষণের শিক্ষাজীবন শুরু হয় গ্রামের হরি রায়ের পাঠশালায়। তারপর পর্যায়ক্রমে মুরারিপুরের বিপিন মাস্টারের পাঠশালায় এবং শাগঞ্জের কেওটায় প্রসন্ন গুরুমশাই-এর পাঠশালায়। ১৯০৮-এ বনগাঁ হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন।

কিছুদিন যাতায়াত করার পর তিনি স্কুলের বোর্ডিংয়ে থেকে যান। তিনি যখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র তখন তাঁর পিতা প্রয়াত হন। সেই সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সস্নেহ ভালোবাসায় তিনি নানাভাবে উজ্জীবিত হন। এই স্কুল থেকেই ১৯১৪ খ্রি. প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর কলকাতায় রিপন কলেজ থেকে ১৯১৬-তে প্রথম বিভাগে আই.এ. এবং ১৯১৮ তে ডিস্টিংশন সহ বি.এ পাশ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে এম.এ-তে ভর্তি হন। একই সঙ্গে আইন কলেজে ক্লাস করতে থাকেন। এই কলেজে পড়ার সময়েই বসিরহাটের পাণিতর গ্রামের কাশীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা গৌরীদেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। এক বছরের মধ্যেই নিউমোনিয়ায় গৌরীদেবীর মৃত্যু হয়। একই বছরে বিভূতিভূষণের সহোদরা আশালতাও মারা যান।

এই সময় বিভূতিভূষণের পরিবার নিদারুণ আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়। ফলে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় এখান থেকেই। বসিরহাট ছেড়ে চলে আসেন হুগলির জাঙ্গিপাড়ায়। ১৯২১-এর ফেব্রুয়ারিতে শুরু করেন শিক্ষকতা। মেয়াদ এক বছর তিন মাস। সোনারপুরে হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতা করেন কিছুদিন। তখন তাঁরা থাকতেন রায়পুরের নগেন বাগচীর বাড়িতে। এই বাড়িতে থাকাকালীন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। এই সময় তাঁর সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত ঘটে 'উপেক্ষিতা' গল্প দিয়ে।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দেই বিভূতিভূষণ কেশোরাম পোদ্দারের গোরক্ষণী সভার প্রচারকের চাকরি নিয়ে চলে যান পূর্ববঙ্গে। সেখান থেকে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের সুযোগ ঘটে যায়। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ব্রহ্মদেশ, আরাকান-ইয়ামোর ঘন জঙ্গল, আগরতলা নোয়াখালি ঢাকা বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূত্রে গেলেও সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সন্ধানে তাঁর ভ্রমণ পিপাসু মন কল্পনার জাল বিস্তার করে। 'অভিযাত্রিক' (১৯৪৪) দিনলিপিতে লেখা হয়ে যায় এই সময়ের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

গোরক্ষণী সভার কাজ সেরে খেলাৎচন্দ্র ঘোষ কোম্পানীর গৃহশিক্ষক ও প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজে নিযুক্ত হন। এই কোম্পানিতে প্রথমে গৃহশিক্ষক ও পরে প্রাইভেট সেক্রেটারি হন। এই এস্টেট ছিল ভাগলপুরে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কাজে যোগ দিয়ে ১৯২৪-এর জানুয়ারিতে এস্টেটের সহকারি ম্যানেজার হিসেবে ভাগলপুরে যান। সেখান থেকে তাঁকে প্রায়ই দিরা-ইসলামপুর জঙ্গল পরিদর্শনে যেতে হতো। এখানকার দিনগুলোই স্থান পেয়েছে 'আরণ্যক' (১৯৩৯) উপন্যাসে। এখানে বসেই লেখেন 'পথের পাচাঁলী' (১৯২৯)।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিভূতিভূষণ ভাগলপুর থেকে চলে এসে কলকাতায় ধর্মতলা স্ট্রিটের খেলাৎচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের 'খেলাৎচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্সটিটিউশন'-এ শিক্ষকতা কর্মে নিযুক্ত হন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ঘাটশিলায় বাড়ি

কেনেন। একদিকে সুবর্ণরেখা আর অন্যদিকে পাহাড়, গালুডির উপত্যকা, শালপিয়ালের মনোরম প্রাকৃতিক শোভায় আবিষ্ট তাঁর প্রিয় বাড়িটির নাম রাখেন 'গৌরীকুঞ্জ'। গৌরীদেবীর মৃত্যুর তেইশ বছর পর ১৯৪০-এর ডিসেম্বর মাসে যোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা রমা দেবী (কল্যাণী)-কে বিবাহ করেন। ১৯৮২-এর জানুয়ারিতে খেলাৎচন্দ্র ইন্সটিটিউশনের চাকরি ছেড়ে দেন। এই সময় থেকেই ব্যারাকপুরের বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। প্রায়ই তখন ঘাটশিলা, চাঁইবাসা, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণে বের হতেন। ১৯৪২-এর এপ্রিলে গোপালনগর স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন বিভূতিভূষণ। বিভূতিভূষণ বনগাঁ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫০-এর ১ নভেম্বর ঘাটশিলার বাড়িতে রাত ৮টা ১৫ মিনিটে তাঁর পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

সজনীকান্ত দাসের উৎসাহে বিভূতিভূষণের সম্পাদনায় ১৯৩০-এর ১৫ নভেম্বর থেকে সাপ্তাহিক 'চলচ্চিত্র' পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। আঠারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ব্যারাকপুরের স্মৃতি বিজড়িত 'ইছামতী' (১৯৫০) উপন্যাসটি মরণোত্তর রবীন্দ্রপুরস্কারে ভূষিত হয়।

এক নজরে বিভূতিভূষণ

১৮৯৪ সাল—জন্ম ১২ সেপ্টেম্বর (২৮শে ভাদ্র ১৩০১)। মাতুলালয়ে জন্ম। কাঁচরাপাড়ার কাছে ঘোষপাড়া-মুরারিপুর হল জন্মস্থান।

১৯০০ সাল—হরি রায়ের পাঠশালায় ভর্তি।

১৯০১ সাল—বিপিন মাস্টারের পাঠশালায় ভর্তি।

১৯০২ সাল—কথকতা উপলক্ষে পিতার সঙ্গে কলকাতায় যাত্রা।

১৯০৬ সাল—কথকতা উপলক্ষে পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রংপুর যাত্রা।

১৯০৭ সাল—১৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার উপনয়ন।

১৯০৮ সাল—বনগাঁ স্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তি ও স্কুল বোর্ডিং-এ বসবাস।

১৯১১ সাল—পিতা জটিল রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগেই মৃত্যু।

১৯১৪ সাল—বনগাঁ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও রিপন কলেজে ভর্তি।

১৯১৬ সাল—প্রথম বিভাগে আই.এ পরীক্ষায় পাশ।

১৯১৭ সাল—কালিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা গৌরী দেবীর সঙ্গে বিবাহ।

১৯১৮ সাল—ডিস্টিংশনসহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সঙ্গে এম. এ. (দর্শন) ও ল' ক্লাসে ভর্তি। নভেম্বর মাসে স্ত্রী গৌরী দেবীর কলেরায় মৃত্যু।

১৯১৯ সাল—৬ ফেব্রুয়ারি হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়ায় মাইনর স্কুলে শিক্ষকতার চাকরিতে যোগদান।

১৯২০ সাল—৩১ জাঙ্গিপাড়া স্কুলের চাকরিতে ইস্তফা। ২১ জুন সোনারপুর হরিনাভি স্কুলে সহ-শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।

১৯২১ সাল—মাতা মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু।

১৯২২ সাল—*প্রবাসী* তে মাঘ সংখ্যায় প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয়। হরিনাভি স্কুল থেকে ইস্তফা। কেশোরাম পোদ্দারের গোরক্ষণী সভার প্রচারকের চাকরিতে যোগদান। চাকরি-সূত্রে পূর্ববঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও আরাকানের বহুস্থানে ভ্রমণ।

১৯২৩ সাল—পাথুরিয়াঘাটায় খেলাত ঘোষের বাড়িতে প্রাইভেট সেক্রেটারি পদে যোগদান।

১৯২৪ সাল—খেলাত ঘোষের ভাগলপুর জঙ্গলমহলের অ্যাসিস্‌ট্যান্ট ম্যানেজারের পদে যোগদান।

১৯২৬ সাল—ভাগলপুরে 'বড়বাসা' নামে একটি বাড়িতে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস রচনা শুরু।

১৯২৮ সাল—'পথের পাঁচালী' রচনা শেষ ও *বিচিত্রা* পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সূচনা।

১৯২৯ সাল—২ অক্টোবর 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ। খেলাতচন্দ্র ইন্সটিটিউশনে যোগদান।

১৯৩০ সাল—'চিত্রলেখা' পত্রিকার সম্পাদনা ও নাগপুর ভ্রমণ।

১৯৩৩ সাল—সম্বলপুর ভ্রমণ। ৬ই এপ্রিল প্রশান্ত মহলানবিশের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৩৩৬ সাল—শিলং যাত্রা। ঘাটশিলায় বাড়ি ক্রয়।

১৩৩৭ সাল—পাটনা ও শিলং যাত্রা।

১৯৩৮ সাল—পাটনা কলেজে বক্তৃতা। ব্যারাকপুর গ্রামে বাড়ি ক্রয়।

১৯৪০ সাল—৩ ডিসেম্বর ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা রমা দেবীর সঙ্গে বিবাহ।

১৯৪১ সাল—খেলাতচন্দ্র ইন্সটিটিউশনে চাকরীতে ইস্তফা।

১৯৪২ সাল—বনগাঁ গোপালনগর স্কুলে যোগদান।

১৯৪৫ সাল—মীরাটে অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে কথা-সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব।

১৯৪৬ সাল—বিহারের সারাণ্ডা জঙ্গলে ভ্রমণ।

১৯৪৭ সাল—পুত্র তারাদাসের জন্ম।

১৯৪৮ সাল—বর্ধমানে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে যোগদান, মেদিনীপুর সাহিত্যসভায় যোগদান। হাজারিবাগ ভ্রমণ।

১৯৪৯ সাল—সারাণ্ডার জঙ্গলে ভ্রমণ।

১৯৫০ সাল—বনগাঁ কলেজে বাংলার অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত। ১৯শে অক্টোবর ঘাটশিলায় হঠাৎ অসুস্থ। মৃত্যু ১লা নভেম্বর, বুধবার, রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিট। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৬ বছর।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাপঞ্জি

উপন্যাস

১.

<u>পথের পাঁচালী</u>

প্রথম প্রকাশ : *বিচিত্রা*, আষাঢ় ১৩৩৫—আশ্বিন ১৩৩৬ (কার্তিক ১৩৩৫ সংখ্যা বাদে)।

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : মহালয়া, আশ্বিন ১৩৩৬।

প্রকাশক : রঞ্জন প্রকাশালয়।

উৎসর্গ : 'পিতৃদেবকে'।

পরবর্তীকালে পৃথকভাবে প্রকাশিত

- **ছোটোদের পথের পাঁচালী**
  প্রকাশ কাল : শ্রাবণ ১৩৫১।
  প্রকাশক : বোস প্রেস।
- **আম-আঁটির ভেঁপু**
  প্রকাশ কাল : আশ্বিন ১৩৫১।
  প্রকাশক : সিগনেট।

২.

<u>অপরাজিত</u>

প্রথম প্রকাশ : *প্রবাসী*. পৌষ ১৩৩৬—আশ্বিন ১৩৩৮।

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : প্রথম খণ্ড, মাঘ ১৩৩৮।
দ্বিতীয় খণ্ড, ফাল্গুন ১৩৩৮।

প্রকাশক : রঞ্জন প্রকাশালয়।

উৎসর্গ : 'মাতৃদেবীকে'।

পরবর্তীকালে পৃথকভাবে প্রকাশিত

- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপু'-র দ্বিতীয় খণ্ড **অপরাজিত।**

৩.

দৃষ্টিপ্রদীপ

প্রথম প্রকাশ : *প্রবাসী*, ফাল্গুন ১৩৪০—চৈত্র ১৩৪১

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : ভাদ্র ১৩৪২।

প্রকাশক : পি.সি. সরকার অ্যান্ড সনস।

পরবর্তীকালে পৃথকভাবে প্রকাশিত

- **ছোটদের দৃষ্টিপ্রদীপ** : বীণা রাণা ও সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।
  প্রকাশকাল : ১৯৫৩।
- **দৃষ্টিপ্রদীপ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ :** চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।
  প্রকাশকাল : ১৯৬৫।

৪.

চাঁদের পাহাড়

প্রথম প্রকাশ : *মৌচাক*, আষাঢ় ১৩৪২—চৈত্র ১৩৪৩।

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : আশ্বিন ১৩৪৪।

প্রকাশক : এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স।

উৎসর্গ : 'খুকুকে দিলাম'।

৫.

আরণ্যক

প্রথম প্রকাশ : *প্রবাসী*, কার্তিক ১৩৪৪—ফাল্গুন ১৩৪৫।

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : চৈত্র ১৩৪৫।

প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল।

উৎসর্গ : 'গৌরীকে দিলাম'।

পরবর্তীকালে পৃথকভাবে প্রকাশিত

- **ছেলেদের আরণ্যক**
  প্রকাশকাল : অগ্রহায়ণ ১৩৫৩
  প্রকাশক : জেনেরাল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স।
- **লবটুলিয়ার কাহিনী**
  প্রকাশকাল : আশ্বিন ১৩৬২।

৬.

মরণের ডঙ্কা বাজে

প্রথম প্রকাশ : *মৌচাক* পত্রিকা, পৌষ ১৩৪৪—আশ্বিন ১৩৪৬।

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : পৌষ ১৩৪৬।

প্রকাশক : বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস।

৭.

আদর্শ হিন্দু-হোটেল

প্রথম প্রকাশ : *মাতৃভূমি* পত্রিকা, মাঘ ১৩৪৫—ভাদ্র ১৩৪৭।

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : আশ্বিন ১৩৪৭।

প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল।

উৎসর্গ : 'কল্যাণীয় শ্রীমান নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে'।

৮.

বিপিনের সংসার

প্রথম প্রকাশ : *অলকা* পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৪৫—ভাদ্র ১৩৪৬।

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৩৪৮।

প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল।

উৎসর্গ : 'চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইল'।

৯.

দুই বাড়ী

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : মহালয়া ১৩৪৮।

প্রকাশক : ইম্পিরিয়াল আর্ট কলেজ।

১০.

মিস্‌মীদের কবচ

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : চৈত্র ১৩৪৮।

প্রকাশক : দেবসাহিত্য কুটীর।

*এটি ছোটোদের উপন্যাস

১১.

অনুবর্ত্তন

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৩৪৯।

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০।

প্রকাশক : মিত্রালয়।

১২.

দেবযান

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : আশ্বিন ১৩৫১।

প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ।

উৎসর্গ : 'শ্রীযুক্ত যোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায় শ্রীচরণেষু'।

- **ছোটদের দেবযান**

  প্রকাশকাল : ১৩৮৩।

১৩.

কেদার রাজা

প্রথম প্রকাশ : *মাতৃভূমি* পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ (সম্ভবত)

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৩৫২।

প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল।

উৎসর্গ : 'আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট (ট্রাস্ট?) ট্রাইবুনালের বিচারপতি সুসাহিত্যিক শ্রী নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত এম. এ. ব্যারিস্টার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অলোকরঞ্জনের স্মৃতিতর্পণে'।

১৪.

হীরা মাণিক জ্বলে

প্রথম প্রকাশ : *মৌচাক* পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৪৮—চৈত্র ১৩৪৯।

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : আষাঢ় ১৩৫৩।

প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরি।

১৫.

অথৈ জল

প্রথম প্রকাশ : *প্রভাতী* পত্রিকা, চৈত্র ১৩৫০—পৌষ ১৩৫৩।

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : কার্তিক ১৩৫৪।

প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরি।

১৬.

ইছামতী

প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৭ সালের মধ্যভাগ থেকে, *অভ্যুদয়* পত্রিকায় বেরিয়েছিল।

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : পৌষ ১৩৫৬।

প্রকাশক : মিত্রালয়।

উৎসর্গ : 'কল্যাণী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে'।

১৭.

অশনি সংকেত

প্রথম প্রকাশ : *মাতৃভূমি* পত্রিকা, মাঘ ১৩৫০—মাঘ ১৩৫২।

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : ভাদ্র ১৩৬৬।

প্রকাশক : বিভূতি প্রকাশন।

১৮.

দম্পতি

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : ফাল্গুন ১৩৫৯।

প্রকাশক : দেবসাহিত্য কুটীর।

১৯.

অনশ্বর*

গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৩৭৯।

প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ।

---

* অধ্যাপিকা রুশতী সেন জানিয়েছেন, বিভূতিভূষণ উপন্যাসটি শেষ করে যাননি। প্রথম ছয়টি পরিচ্ছেদ তিনি লিখেছিলেন। সপ্তম পরিচ্ছেদটি লেখেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র। অষ্টম থেকে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত লিখে তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থভুক্তির আগে 'অনশ্বর' শেষ করেন।

গল্পগ্রন্থ

১.

<u>মেঘ-মল্লার</u>

প্রকাশকাল : শ্রাবণ, ১৩৩৮।

গল্পসূচি : মেঘমল্লার, নাস্তিক, উমারাণী, বউ চণ্ডীর মাঠ, নব-বৃন্দাবন, অভিশপ্ত, খুকীর কাণ্ড, ঠেলাগাড়ী, পুঁইমাচা, উপেক্ষিতা।

প্রকাশক : বরেন্দ্র লাইব্রেরি।

উৎসর্গ : 'মেজমামা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের করকমলে'।

২.

<u>মৌরীফুল</u>

প্রকাশকাল : ভাদ্র, ১৩৩৯।

গল্পসূচি : মৌরীফুল, জলসত্র, রোমান্স, রাক্ষসগণ, হাসি, প্রত্নতত্ত্ব, দাতার স্বর্গ, খুঁটিদেবতা, গ্রহের ফের, মরীচিকা।

প্রকাশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরি।

উৎসর্গ : 'স্নেহাস্পদ শ্রীমান বিভূতিভূষণ বসুকে'।

৩.

<u>যাত্রাবদল</u>

প্রকাশকাল : কার্তিক, ১৩৪১।

গল্পসূচি : ভণ্ডুলমামার বাড়ি, পেয়ালা, উইলের খেয়াল, কনে দেখা, সার্থকতা, একটি দিন, বাইশ বছর, বৈদ্যনাথ, ডানপিটে, যাত্রাবদল।

প্রকাশক : পি.সি. সরকার।

উৎসর্গ : 'ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু'।

৪.

<u>জন্ম ও মৃত্যু</u>

প্রকাশকাল : আশ্বিন, ১৩৪৪।

গল্পসূচি : যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ, জন্ম ও মৃত্যু, সই, রামশরণ দারোগার গল্প, খুড়ীমা, বায়ুরোগ, অরন্ধনের নিমন্ত্রণ, লেখক, বড়বাবুর বাহাদুরি, অন্নপ্রাশন, তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, ডাকগাড়ী, অকারণ।

প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল।

উৎসর্গ : 'সুপ্রভাকে'।

৫.

কিন্নর দল

প্রকাশকাল : কার্তিক, ১৩৪৫।

গল্পসূচি : মণি ডাক্তার, পুরনো কথা, খোসগল্প, একটি দিনের কথা, বাটিচচ্চড়ি, তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প, ডাইনী, বুধীর বাড়ী ফেরা, বিধুমাস্টার, উন্নতি, কিন্নর দল।

প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল।

৬.

বেণীগীর ফুলবাড়ী

প্রকাশকাল : বৈশাখ, ১৩৪৮।

গল্পসূচি : বেণীগীর ফুলবাড়ী, মাস্টারমশায়, তিরোলের বালা, জনসভা, প্রত্যাবর্তন, প্রাবল্য, বাঁশি, পাঁচুমামার বিয়ে, শান্তিরাম, কুয়াশার রঙ, ফিরিওয়ালা, নিষ্ফলা।

প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল।

উৎসর্গ : 'কল্যাণীয়া জাহ্নবীকে দিলাম'।

৭.

নবাগত

প্রকাশকাল : মাঘ, ১৩৫০।

গল্পসূচি : দ্রবময়ীর কাশীবাস, আমার লেখা, ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল, পারমিট, মুক্তি, গায়ে হলুদ, ঠাকুরদার গল্প, ভিড়, আরক, থিয়েটারের টিকিট, পার্থক্য, স্বপ্ন-বাসুদেব।

প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ।

উৎসর্গ : 'অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সুহৃদ্বরেষু'।

৮.

তালনবমী

প্রকাশকাল : বৈশাখ, ১৩৫১।

গল্পসূচি : তালনবমী, রঙ্কিনী দেবীর খড়্গ, মেডেল, মশলাভূত, বামা, বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি, অরণ্যে, গঙ্গাধরের বিপদ, রাজপুত্র, চাউল।

প্রকাশক : কালিকা প্রেস।

৯.

উপলখণ্ড

প্রকাশকাল : বৈশাখ, ১৩৫২।

গল্পসূচি : আহবান, একটি ভ্রমণকাহিনী, নসুমামা ও আমি, দৈবাৎ, বিড়ম্বনা, ভুবন বোষ্টুমী, শাবলতলার মাঠ, পৈতৃক ভিটা, দুর্মতি, ফকির, আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা।

প্রকাশক : গুপ্ত প্রকাশিকা।

১০.

বিধুমাস্টার

প্রকাশকাল : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২।

গল্পসূচি : বাক্সবদল, মূলো-র‍্যাডিশ—হর্স র‍্যাডিশ, সুলোচনার কাহিনী, বেচারী, অভয়ের অনিদ্রা, অসমাপ্ত, কবি কুণ্ডুমশায়, সঞ্চয়, সুহাসিনী মাসীমা, বিধুমাস্টার, অভিশাপ।

প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল।

১১.

ক্ষণভঙ্গুর

প্রকাশকাল : ভাদ্র, ১৩৫২।

গল্পসূচি : সিঁদুরচরণ, একটি কোঠাবাড়ীর ইতিহাস, বুধোর মায়ের মৃত্যু, ছেলেধরা, রামতারণ চাটুজ্যে—অথর, নুটিমন্তর, ফড়খেলা, হাট, অরণ্যকাব্য।

প্রকাশক : গুপ্ত প্রকাশিকা।

উৎসর্গ : 'স্বর্গতা মৃণালিনী দেবীর উদ্দেশে'।

১২.

অসাধারণ

প্রকাশকাল : বৈশাখ, ১৩৫৩।

গল্পসূচি : অসাধারণ, নদীর ধারে বাড়ী, বিপদ, জন্মদিন, কাঠ-বিক্রী বুড়ো, হারুণ-অল রসিদের বিপদ, সুলেখা, রূপো বাঙাল, তেঁতুলতলার ঘাট,

দুইদিন, মাকাললতার কাহিনী, বংশলতিকার সন্ধানে, কমপিটিশন, ব্ল্যাকমার্কেট দমন কর, তুচ্ছ, পিদিমের নীচে।

প্রকাশক : মিত্রালয়।

উৎসর্গ : 'স্বনামখ্যাত বন্ধু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের করকমলে'।

১৩.

<u>মুখোশ ও মুখশ্রী</u>

প্রকাশকাল : অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪।

গল্পসূচি : মুখোশ ও মুখশ্রী, বাসু হাড়ি, দৈব ঔষধ, বারিক অপেরা পার্টি, উডুম্বর, মাছ চুরি, বেসাতি, কলহান্তরিতা, উল্টোরথ, মুক্তপুরুষ হরিদাস, অন্তর্জ্জলি, বোতাম, খোলস, চৌধুরাণী।

প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ।

উৎসর্গ : 'পূজনীয় মাতুল বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের করকমলে'।

১৪.

<u>আচার্য কৃপালনী কলোনি</u>

প্রকাশকাল : আশ্বিন, ১৩৫৫।

গল্পসূচি : আচার্য কৃপালনী কলোনি, নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব, বরো বাগদিনী, প্রভাতী, সাহায্য, গিরিবালা, চিঠি, মড়িঘাটের মেলা, হাজারি খুঁড়ির টাকা, প্রত্যাবর্তন, পড়ে পাওয়া, আমার ছাত্র।

প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স।

উৎসর্গ : 'সুহৃদ্বর শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে দিলাম'।

১৫.

<u>জ্যোতিরিঙ্গণ</u>

প্রকাশকাল : চৈত্র, ১৩৫৫।

গল্পসূচি : সংসার, হিঙের কচুরী, দুই দিন, অনুশোচনা, দাদু, বাসা, বন্দী, থনটন কাকা, কালচিতি, দিবাবসান, মুস্কিল, গল্প নয়।

প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ।

উৎসর্গ : 'পণ্ডিতপ্রবর বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়'।

১৬.

<u>কুশল পাহাড়ী</u>

প্রকাশকাল : পৌষ, ১৩৫৭।

গল্পসূচি : কুশল পাহাড়ী, ঝগড়া, বড়দিদিমা, অবিশ্বাস্য, খেলা, জাল, আবির্ভাব, মানতালাও, বেনিয়ম, অভিমানী, শিকারী, পরিহাস, জওহরলাল ও গড, গল্প নয়, সীতানাথের বাড়ি ফেরা, হরিকাকা, এমনিই হয়, ঝড়ের রাতে, চাউল, পথিকের বন্ধু, আর্টিস্ট, শেষ লেখা।

প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ।

উৎসর্গ : ‘কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের করকমলে’।

১৭.

<u>রূপহলুদ</u>

প্রকাশকাল : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪।

গল্পসূচি : ননীবালা, বিরজা হোম ও তার বাধা, বুড়ো হাজরা কথা কয়, কাশী কবিরাজের গল্প, ছোটনাগপুরের জঙ্গলে, মায়া, আমার ডাক্তারি, বর্শেলের বিড়ম্বনা, কাদা, ভৌতিক পালঙ্ক।

প্রকাশক : ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং।

১৮.

<u>অনুসন্ধান</u>

প্রকাশকাল : মাঘ, ১৩৬৬।

গল্পসূচি : অনুসন্ধান, টান, চ্যালারাম, সান্ত্বনা।

প্রকাশক : বিভূতি প্রকাশন।

১৯.

<u>ছায়াছবি</u>

প্রকাশকাল : ফাল্গুন, ১৩৬৬।

গল্পসূচি : ছায়াছবি, বিপদ, কবিরাজের বিপদ, আমোদ, সতীশ, অভিনন্দন সভা, মরফোলজি. ডালুর বিপদ।

প্রকাশক : তাপসী প্রেস।

দিনলিপি

১.

<u>অভিযাত্রিক</u>

প্রকাশকাল : চৈত্র, ১৩৪৭।

প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ।

উৎসর্গ : 'কল্যাণী উমাকে'।

২.

<u>স্মৃতির রেখা</u>

প্রকাশকাল : শ্রাবণ, ১৩৪৮।

প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ।

উৎসর্গ : 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর আত্মার উদ্দেশে'।

৩.

<u>তৃণাঙ্কুর</u>

প্রকাশকাল : চৈত্র, ১৩৪৯।

প্রকাশক : মিত্রালয়।

উৎসর্গ : 'সুহৃদ্বর সজনীকান্ত দাসের করকমলে'।

৪.

<u>উর্মিমুখর</u>

প্রকাশকাল : শ্রাবণ, ১৩৫১।

প্রকাশক : মিত্রালয়।

৫.

<u>বনে-পাহাড়ে</u>

প্রকাশকাল : আশ্বিন, ১৩৫২।

প্রকাশক : মিত্রালয়।

৬.

উৎকর্ণ

প্রকাশকাল : বৈশাখ, ১৫৫৩

প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ।

উৎসর্গ : 'জীবনের যাত্রাপথে যারা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, সাহিত্য রচনায় দিয়েছে প্রেরণা, অভিষিক্ত করেছে আনন্দ রসধারায়—অথচ দাবি করেনি কিছু—তাদেরই কথা আজ স্মরণ করলাম'।

৭.

হে অরণ্য কথা কও

প্রকাশকাল : মাঘ, ১৩৫৪।

প্রকাশক : আরতি এজেন্সী।

উৎসর্গ : 'বন্ধুবর বিজয়রত্ন কবিরাজকে'।

৮.

অন্তরঙ্গ দিনলিপি

প্রকাশকাল : ভাদ্র, ১৩৮৩।

প্রকাশক : পুস্তক প্রকাশনী।

৯.

বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপি

প্রকাশকাল : বৈশাখ, ১৩৯০।

প্রকাশক : নাথ পাবলিশিং।

সম্পাদক : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদকের উৎসর্গ : 'পূজনীয়া মেজদি রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে'।

১০.

বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত রচনা

প্রকাশকাল : ভাদ্র ১৩৯৫।

প্রকাশক : মণ্ডল বুক হাউস।

সম্পাদক : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

---

*তথ্যঋণ ও কৃতজ্ঞতা

রুশতি সেন : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মে ১৯৯৯।